সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান

اسلامی ریاست

سید ابو الاعلی مودودی

ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ

আবদুস শহীদ নাসিম

আকরাম ফারূক

আবদুল মান্নান তালিব

মুহাম্মদ মূসা

সম্পাদনা

আবদুস শহীদ নাসিম

মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা

ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

প্রকাশক

আবদুস শহীদ নাসিম

পরিচালক

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা

৪৯১/১ এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন ঃ ৮৩১২৯২

বাংলা ১ম সংস্করণ

জুন ১৯৯৭

কম্পিউটার কম্পোজ

এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

৪৩৫/এ-২ বড় মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট

৩য় তলা, ঢাকা-১২১৭। ফোন ঃ ৯৩৪২২৪৯

মুদ্রণ

এস, খান প্রিন্টার্স

৪৯৪ এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ

হামিদুল ইসলাম

মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা মাত্র।

ISLAMI RASTRO O SHONGBIDHAN

by

Sayyed Abul A'la Maudoodi (R)

Published by

Abdus Shaheed Naseem

Director

Sayyed Maudoodi Research Academy

491/1 Elephant Road, Moghbazar

Dhaka - 1217, Phone : 831292

Price : Tk. 250.00 only

আমাদের কথা

আধুনিক বিশ্বে ইসলাম এক অনন্য আদর্শ ও দুর্জয় আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইসলামকে এখন আর সেকেলে ধর্ম আর সাম্প্রদায়িকতা বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার কোনো সুযোগ নেই। মুসলিম নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতার কারণে মুসলিম দেশগুলো যখন আধিপত্যবাদীদের করতলগত হয়, তখন তারা ইসলামকে যেভাবে দাবিয়ে রেখেছিল, ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে যেভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল আর ইসলামকে খৃষ্টবাদ কিংবা হিন্দু/বৌদ্ধ ধর্মের মতো একটা সাম্প্রদায়িক ধর্ম হিসেবে সুচতুরভাবে অপপ্রচার করেছিল, এখন আর সেদিন নেই। এখন ইসলাম তার আসল সুমহান আদর্শিক রূপ নিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে সমুপুস্থিত। এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপেরে বিভিন্ন দেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। এসব দেশে যুবক যুবতীরা ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিপক্ষের হাতে চরম নির্যাতিত হচ্ছে, রক্ত দিচ্ছে , শহীদ হচ্ছে। কোনো কোনো দেশ ইসলাম প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এভাবে একদিকে আন্দোলন সংগ্রামের কাজ এগিয়ে চলছে।

অপরদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজও এগিয়ে চলছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে চিন্তাবিদগণ বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক আলোচনা করছেন। একদিকে তাঁরা কুরআন সুন্নাহ থেকে ইসলামের মূলনীতি পেশ করছেন, খুলাফায়ে রাশেদীনের রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করছেন। অপরদিকে যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে আধুনিককালে ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগীতা, বাস্তবতা ও অকাট্যতার প্রমাণ পেশ করেছেন।

এ উভয় ক্ষেত্রেই সাইয়েদ মওদূদী অন্যাদের অগ্রজ। একদিকে তিনি আধুনিক বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। অপরদিকে কুরআন সুন্নাহর অগাধ পান্ডিত্য, ইসলামের ইতিহাসের নির্যাস, শানিত যুক্তি আর অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা দিয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বাস্তবতা ও বাস্তব রূপরেখা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছেন।

তাঁর এ **গ্রন্থটি ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে একটি অনন্য গ্রন্থ। ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলনীতি, ইসলামী শাসনের মূলনীতি এবং ইসলামী বিপ্লব সাধনের পদ্ধতির উপর এ গ্রন্থে তিনি প্রমাণ ও বাস্তবতার নিরিখে পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন।** সাইয়েদ মওদূদীর এ সংক্রান্ত লেখাগুলো বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও

পুস্তক পুস্তিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। সেগুলোকে **'ইসলামী রিয়াসাত'** শিরোণামে সুসংকলিত করেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী আধুনিক বিশ্বের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ প্রফেসর ডক্টর খুরশীদ আহমদ। প্রথমে তিনি সাইয়েদ মওদূদীর এ সংক্রান্ত লেখাগুলোর ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন **'Islamic Law and Constitution'** নামে। ইংরেজি গ্রন্থটি সারাবিশ্বে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায় এবং অচিরেই তার দ্বিতীয় সংস্করণও নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন প্রবলভাবে দাবি উঠতে থাকে ইংরেজি সংস্করণের পাশাপাশি সাইয়েদ মওদূদীর ইসলামী রাষ্ট্র সংক্রান্ত সমস্ত লেখা একত্রে সংকলিত করে মূল উর্দু ভাষায় একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হোক। সেই দাবি ও চাহিদার প্রেক্ষিতেই প্রফেসর খুরশীদ আহমদ ইসলামী রাষ্ট্র সংক্রান্ত তাঁর সমস্ত লেখা একত্র করে **'ইসলামী রিয়াসাত'** গ্রন্থ তৈরি করেন ১৯৬০ ঈসায়ি সালে। ইংরেজি **'Islamic Law and Constitution'** গ্রন্থটি ৪১২ পৃষ্ঠা আর উর্দু **'ইসলামী রিয়াসাত'** গ্রন্থটি ৭২০ পৃষ্ঠা। দু'টি গ্রন্থই বিশ্বব্যাপী দারুণভাবে সমাদৃত।

ঢাকাস্থ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী সাইয়েদ মওদূদীর সমস্ত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। আলহামদুলিল্লাহ ইতোমধ্যেই আমরা তাঁর প্রায় সমস্ত গ্রন্থই অনুবাদ করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছি। ইসলামী রিয়াসাত গ্রন্থটি অনুবাদে হাত দিয়েছি আমরা দেরিতে। বছর তিনেক আগে অনুবাদ কাজ সম্পন্ন হয়। কয়েক হাতের অনুবাদ কাজের মধ্যে ভাষাগত সামাঞ্জস্য বিধান এবং অনুবাদকে যথাসাধ্য নির্ভুল করার লক্ষ্যে আমরা গ্রন্থটিকে সম্পাদনা করে দিয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সরাসরি প্রুফ দেখতে না পারায় গ্রন্থটিতে কিছু কিছু প্রিন্টিং মিসটেক রয়ে গেছে। সেজন্যে আমরা দুঃখিত।

যারা মানবতার কল্যাণের লক্ষে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী ও আকাংখী, এ গ্রন্থ তাদের উদ্যোগ ও আকাংখাকে এগিয়ে দেবে অনেক দূর। এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে যেকোনো মত ও পথের লোকই উপলব্ধি করতে পারবেন ইসলামী রাষ্ট্র এবং ইসলামের শাসন ও বিধান কতো যুক্তিসংগত, বাস্তব, সুবিচারমূলক ও মানবতার কল্যাণ বিধায়ক। এ গ্রন্থ পাঠকের সামনে এ মহাসত্য উন্মোচিত করে দেবে যে, ইসলামী রাষ্ট্র শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়, বরং গোটা বিশ্ব মানবতার অধিকারের সংরক্ষক ও নিরাপত্তার যিম্মাদার।

এ অমূল্য গ্রন্থটি অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গ্রন্থটি প্রকাশে যারা যারা সহযোগিতা করেছেন, আমরা তাদের কল্যাণাকাংখী।

গ্রন্থটি বাংলাভাষীদের চিন্তা এবং মত ও পথের দিশারী হোক, এই আমাদের কামনা।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা।

সূচিপত্র

গ্রন্থকারের ভূমিকা

●

সংকলকের অনুবন্ধ

গ্রন্থকারের ভূমিকা

বিগত বিশ পঁচিশ বছরে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার অনেক কথা বলা এবং লেখার সুযোগ হয়। এই মূল বিষয়টি এবং প্রাসংগিক অন্য বেশ কিছু বিষয়ের উপর আমি মৌলিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা করেছি। বর্তমান কালে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের বাস্তব রূপরেখা কি হবে সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। এই প্রবন্ধ ও নিবন্ধগুলো উপরোল্লিখিত দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন সুযোগ এবং সময়ের দাবী অনুযায়ী লেখা হয়, কিংবা বক্তৃতা আকারে পেশ করা হয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন আকারে সেগুলো মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়ে আসছে। কিন্তু এযাবতকাল পর্যন্ত সেগুলো একত্রিত করে একটি পূর্ণাংগ গ্রন্থাকারে সংকলিত করা সম্ভব হয়নি। কয়েক বছর আগে খুরশীদ আহমদ "ইসলামী রিয়াসাত" [ইসলামী রাষ্ট্র] শিরোনামে এ সংক্রান্ত আমার বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলিত করেন। কিন্তু তখন তাতে আমার এ সংক্রান্ত সবগুলো লেখা সংকলিত করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, তাতে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা এবং পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সংগ্রাম সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলোই সংকলিত হয়। এখন জনাব খুরশীদ আহমদ 'ইদারায়ে মাআরিফে ইসলামীর' তত্ত্বাবধানে এ বিষয় সংক্রান্ত আমার সবগুলো প্রবন্ধ নিবন্ধকে একত্রিত করে দু'খন্ডে সংকলন করে দিয়েছেন। প্রথম খন্ডে স্থান পেয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র সংক্রান্ত যাবতীয় তাত্ত্বিক আলোচনা। আর দ্বিতীয় খন্ডে স্থান পেয়েছে পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সংগ্রাম সংক্রান্ত প্রবন্ধরাজি। একজন পাঠক এখন এই গ্রন্থটির মাধ্যমে ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পূর্ণাংগ চিত্র সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এই গ্রন্থটি সংকলিত হবার পূর্বে বিভিন্ন সময়ে এই পূর্ণাংগ চিত্রের বিভিন্ন খন্ডিত অংশ দেখানো হয়ে আসছিলো। কিন্তু এক নযরে একটি পূর্ণাংগ চিত্র সামনে আসতে পারেনি। সংকলনটির প্রকৃত উপকারিতা এটাই।

পূরো গ্রন্থটি আমি নতুনভাবে দেখে দিয়েছি। বিষয়সূচী সাজানোর ব্যাপারেও আমার পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমি আশা করি বর্তমান সংকলনটি থেকে কেবল সাধারণ পাঠকরাই উপকৃত হবেননা রবঞ্চ ইসলামী শিক্ষা এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরাও তাদের নিজ নিজ বিভাগের পড়াশুনায় এর দ্বারা ব্যাপক উপকৃত হবে।*

লাহোর
৬ শাওয়াল ১৩৮৬ হি ঃ
১৮ জানুয়ারী ১৯৬৭ ইং

বিনীত
আবুল আ'লা

---

* অনুবাদ করেছেন আবদুস শহীদ নাসিম।

সংকলকের অনুবন্ধ*

মানুষ তার সামাজিক জীবনের শৃংখলা ও উন্নয়ন সাধনের জন্যে যেসব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছে তন্মধ্যে রাষ্ট্র সংস্থা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক। রাষ্ট্র এমন একটি রাজনৈতিক কাঠামো যার মাধ্যমে কোনো ভূখন্ডের অধিবাসীরা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে নিজেদের সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করে।

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ এ সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বস্তুত গোটা মানব ইতিহাসই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল ও শক্তিশালী করা, এর ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, শৃংখলা রক্ষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন এবং এর প্রসার ও উন্নতি সাধন করার ইতিহাস।

আধুনিক কালে প্রযুক্তি ও কর্মকৌশলের উন্নতি সাধন এবং সামাজিক জীবনে নিত্যনতুন চিন্তা ভাবনার পথ পেয়ে যাবার ফলে রাষ্ট্রের কার্য পরিধি দিন দিন বেড়েই চলেছে। এখন বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই রাষ্ট্রের কাজ কেবল শান্তি শৃংখলা এবং আইন ও নিরাপত্তা রক্ষাই নয়, বরঞ্চ সামষ্টিক সুবিচার, সামাজিক উন্নয়ন এবং সাফল্য অর্জনও বটে। বর্তমানে রাষ্ট্র একটি প্রতিষ্ঠিত ভূমিকা [Role] পালন করছে। এখন সে জীবনের প্রায় প্রতিটি বিভাগকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে।

১. রাষ্ট্র এবং ইসলাম

ইসলাম তার গোটা ইতিহাসে কখনো রাষ্ট্রের গুরুত্বকে উপেক্ষা করেনি। আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম তাঁদের স্ব স্ব সময়কালের সামাজিক ও সামষ্টিক শক্তিকে ইসলামের অনুগত ও অনুসারী বানাবার চেষ্টা সংগ্রাম করেছেন। তাঁদের গোটা দাওয়াতী মিশনের কেন্দ্রবিন্দু এই ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে, ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে এবং শির্ক তা গোপন ও প্রকাশ্য যে রূপেই বর্তমান থাকুকনা কেনো তাকে খতম করে দেয়া হবে। তাঁদের প্রত্যেকের এই একই আহবান ছিলো ঃ

> "হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ্ নেই।"১ [সূরা আরাফ ঃ ৬৫]

---

* এ অংশ অনুবাদ করেছেন আবদুস শহীদ নাসিম।

১ **ইলাহ, রব, ইবাদত, দীন** এই মৌলিক পরিভাষাগুলোর সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনের জন্যে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। প্রকাশক ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

আর তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে স্ব-স্ব জাতির নিকট এই দাবী করেছিলেন ঃ

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর আমার আনুগত্য করো।" [সূরা আশ শুয়ারা ঃ ১৬৩]

আল্লাহর এই প্রেরিত বান্দারা মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগকে পরিশুদ্ধ করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা সংগ্রাম করেছেন, যাতে করে আল্লাহর যমীনে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর আইন ও বিধান চালু এবং কার্যকর হয়। তাঁদের এই প্রাণান্তকর চেষ্টা সংগ্রাম ছিলো পুর্ণাংগ জীবনের সংশোধনের জন্যে। আর রাষ্ট্রের সংশোধন ছিলো সেই সংশোধনেরই একটি গুরুত্বপুর্ণ মাধ্যম। কুরআন অধ্যয়ন থেকে জানা যায়, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এবং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তা আদর্শিক মানে পরিচালনা করেছিলেন। ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্টের অধ্যয়ন থেকে এই সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, বনী ইসরাইলের অন্যান্য নবীগণও রাষ্ট্র সংস্থার সংশোধনের চেষ্টা করেছেন এবং ভ্রান্ত নেতৃত্বের অবাধ সমালোচনা করেছেন। ইসলামী চিন্তাধারায় রাষ্ট্র যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা এই বিষয়টি থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, স্বয়ং আসমান ও যমীনের স্রষ্টাই তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ দোয়া করতে শিখিয়ে দেন ঃ

"আর তুমি দোয়া করো ঃ হে প্রভু, আমাকে যেখানেই নিয়ে যাবে সত্যতা সহকারে নিয়ে যাও আর যেখান থেকেই বের করবে সত্যতা সহকারে বের করো, আর তোমার নিকট থেকে একটি সার্বভৌম শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।" [সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৮০]

আয়াতটি হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছিলো। এই ঐতিহাসিক পটভূমি দ্বারা দোয়াটির গুরুত্ব আরো স্পষ্ট হয়ে যায় এবং এথেকে রাষ্ট্র সংস্থার অপরিসীম গুরুত্ব পুরোপুরি অনুধাবন করা যায়। মাওলনা মওদূদীর ভাষায় আয়াতটির গুরুত্ব এরূপ ঃ

"প্রভু হয় আমাকেই রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করো, আর না হয় অপর কোনো রাষ্ট্রকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও, যেনো আমি তার শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে পৃথিবীর এই মহাভাংগন ও বিপর্যয়কে সংশোধন করতে পারি, অশ্লীলতা ও নাফরমানীর এই মহাপ্লাবনকে প্রতিরোধ করতে পারি এবং তোমার সুষম আইন ও বিধানকে চালু ও কার্যকর করতে পারি।"

হাসান বসরী এবং কাতাদাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি আয়াতটির এই তাফসীরই করেছেন। ইবনে কাসীর এবং ইবনে জরীরের মতো শ্রেষ্ঠ মুফাস্সিরগণও এই মতই গ্রহণ করেছেন। হাদীস থেকেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"আল্লাহ তা'য়ালা রাষ্ট্র ক্ষমতা দ্বারা সেসব জিনিসই বন্ধ করে দেন, যা শুধুমাত্র কুরআন দ্বারা বন্ধ করা যায়না।"

এথেকে জানা গেলো, ইসলাম পৃথিবীতে যে সংশোধন ও সংস্কার চায় তা শুধুমাত্র ওয়ায নসীহত দ্বারা সম্ভব নয়, বরঞ্চ তা কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা অপরিহার্য। তাছাড়া আল্লাহ তা'য়ালাই যখন তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, তখন তাথেকে এ জিনিসটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দীন প্রতিষ্ঠা করা, শরীয়াহ্ কার্যকর করা এবং আল্লাহ্র আইন জারি করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা চাওয়া এবং তা লাভ করার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম চালানো শুধু বৈধই নয়, বরঞ্চ তা একান্ত কাম্য ও বাঞ্চনীয়। যারা একাজকে দুনিয়াদারীর কাজ বলে ব্যাখ্যা করেন তারা সাংঘাতিক ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছেন। কোনো ব্যক্তি যদি নিজের জন্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চায় তবে সেটা দুনিয়াদারীর কাজ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর দীন কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা পেতে চাওয়া দুনিয়াপুরস্তি নয়, বরঞ্চ খোদা পুরস্তিরই অনিবার্য দাবী।"[১]

নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায় ঃ

"আমরা আমাদের রসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি এবং হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। সেসাথে কিতাব এবং মীযান [মানদন্ড]ও দিয়েছি, যেনো লোকেরা ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাছাড়া আমরা লোহা [রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা]ও অবতীর্ণ করেছি। যাতে রয়েছে দোর্দন্ড শক্তি এবং মানুষের জন্যে বিপুল কল্যাণ।" [সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫]

"তিনিই [আল্লাহ তা'য়ালা]তো সেই সত্তা যিনি স্বীয় রাসূলকে হিদায়াত এবং সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেনো সে তাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করে দেয়। তা মুশরিকদের জন্যে সহ্য করা যতোই কঠিন হোকনা কেনো।" [সূরা আসসফ ঃ ৯]

"আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী ফয়সালা করেনা তারা কাফির।" [সূরা আল মায়িদা ঃ ৪৪]

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

'ইসলাম এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দুই সহোদর ভাই। তাদের একজন অপরজনকে ছাড়া সংশোধন হতে পারেনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইসলাম হচ্ছে কোনো অট্টালিকার ভিত আর রাষ্ট্র ক্ষমতা হচ্ছে তার পাহারাদার। যে অট্টালিকার ভিত নেই তা যেমন পড়ে যেতে বাধ্য, তেমনি যার পাহারাদার ও রক্ষক নেই তাও ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য।" [কান্‌যুল উম্মাল]

মুসলমানরা সবসময় নিজেদের রাষ্ট্রকে ইসলামের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে আসছে, ফলে ইসলামী দর্শনে ধর্ম ও রাজনীতি দুটি আলাদা জিনিস হবার কোনো সুযোগ বা অবকাশ নেই। এই চেষ্টা সংগ্রাম তাদের দীন ও ঈমানেরই দাবী। তারা কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে যেমন উত্তম চরিত্র এবং সদাচারের শিক্ষালাভ করে, তেমনি সমাজ, সভ্যতা, অর্থনীতি এবং রাজনীতির বিধানও তা থেকেই গ্রহণ করে। এই শেষোক্ত অংশের উপর আমল করার জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র অপরিহার্য। এই অংশের উপর আমল করা নাহলে শরীয়তের একটি অংশ বাদ পড়ে যায় এবং

---

১. তাফহীমুল কুরআন সূরা বনী ইসরাইল টীকা ঃ ১০০।

কুরআন চিত্রিত সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবে রূপলাভ করেনা। এ কারণেই উম্মতের ফকীহগণ সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম [রাষ্ট্র প্রধান] নির্বাচিত করাকে ফরয বলে ঘোষণা করেছেন। এ ব্যাপারে অসতর্কতা প্রদর্শনকে তাঁরা দীনি বিধান বাস্তবায়নে অসতর্কতা বলে গণ্য করেছেন। আল্লামা ইবনে হাযম তাঁর "আল ফাসলু বাইনাল মিলাল ওয়ান নাহল" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"গোটা আহলে সুন্নাত, মারজিয়া, শীয়া এবং খারেজীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কাউকে ইমাম নির্বাচন করা ওয়াজিব এবং উম্মতের উপর এরূপ ন্যায় পরায়ণ ইমামের আনুগত্য করা ফরয, যিনি আল্লাহ তা'য়ালার বিধান কায়েম করবেন এবং সেই শরীয়তের বিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন, যা নিয়ে এসেছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"[১]

শাহ্ অলি উল্লাহ্ দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন ঃ

"দীনি দৃষ্টিতে পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন খলীফা নিযুক্ত করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিবে কিফায়া। এ হুকুম তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।"[২]

এ এমন একটি বিষয়, যে সম্পর্কে গোটা উম্মাহ্র ইজমা [ঐক্যমত্য] রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বাস্তবে নেতৃত্বকে কতটা গুরুত্ব দিতেন তা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরবর্তী ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়। তাঁরা তাঁকে দাফন করার পূর্বেই ইমাম নির্বাচিত করেন, যিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ধরে রাখেন এবং পূর্ণ কেন্দ্রীয় মর্যাদার সাথে সকল কাজ সম্পাদন করেন। ইসলাম বস্তুগত ক্ষমতা করায়ত্ব করতে চায়। এছাড়া সে তার পূর্ণ মিশন সফল করতে পারেনা। এই নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কেবল ক্ষমতা হিসেবে লাভ করাটাই উদ্দেশ্য নয়, বরঞ্চ দাওয়াতের পূর্ণতা এবং মানবতার সংশোধন কাজের মহান দায়িত্ব পালন করার জন্যেও নেতৃত্ব অপরিহার্য মাধ্যম। তাই কুরআন এ দৃষ্টিভংগি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ইসলামের জাগতিক নেতৃত্ব তার আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের মাধ্যম এবং এরই ফলশ্রুতিতে সততার প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও দুস্কৃতির উৎপাটন সম্ভব ঃ

"এই মুসলমানরাই সেই লোক, আমরা যদি পৃথিবীতে তাদের ক্ষমতা দান করি [অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি তারা কর্তৃত্ব পায়] তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সততার নির্দেশ দেবে, অন্যায় অপকর্মে বাধা দেবে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম ফলতো আল্লাহরই হাতে।" [সূরা হজ্জ ঃ ৪১]

এযাবত আমরা যাকিছু আলোচনা করলাম তার সারমর্ম এই দাঁড়ায় ঃ

১. রাষ্ট্র সংস্থা মানব সমাজের একটি বুনিয়াদী প্রয়োজন। রাষ্ট্র ছাড়া সুশৃংখল ও সুসংগঠিত সমাজ জীবন কল্পনা করা দুস্কর।

২. ইসলাম পূর্ণাংগ মানব জীবনের জন্যে পথনির্দেশিকা। সমাজ জীবন নির্বাহের সুস্পষ্ট পথনির্দেশ এতে রয়েছে।

৩. ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য রাখেনা এবং পূর্ণাংগ মানব জীবনকে খোদায়ী বিধানের অধীন করে দিতে চায়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য

---

১. ইবনে হাযম ঃ ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ঃ ৮৭।
২. শাহ্ অলি উল্লাহ ঃ ইযালাতুল খিফা ঃ ১ম অধ্যায়।

ইসলাম রাজনীতিকেও ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চায় এবং ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রকে কাজে লাগাতে চায়।

৪. আত্মার আভ্যন্তরীন পাশবিকতা কিংবা বাইরের কোনো চাপ কিংবা ভীতির কারণে আল্লাহ্‌র কিছু আইনকে মেনে নেয়া এবং কিছু আইনকে উপেক্ষা করার নীতি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্‌র শাস্তি লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৫. ধর্ম, রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এতোই নিগুঢ় এবং অবিচ্ছেদ্য যে, রাষ্ট্র ও সরকার যদি অনৈসলামী হয় তবে তা হয় যুলুম ও বেইনসাফীর হাতিয়ার এবং তাদ্বারা সংঘটিত হয় চেংগিজী ধ্বংসলীলা। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র ও সরকার ব্যতীত ইসলাম হয়ে পড়ে খন্ডিত। বিজয়ী ও ক্ষমতাসীন হবার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র দীন হয় পরাজিত ও দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ। এজন্যেই রাষ্ট্রকে ইসলামের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করা, সরকার কর্তৃক ইসলামের পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করা এবং তা কার্যকর করার জন্য অবিরাম তৎপরতা চালানো অপরিহার্য।

২. আধুনিক কালে ইসলামী রাষ্ট্র

এযাবত ইসলামে রাষ্ট্রের দীনি গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কিন্তু আমরা যদি বর্তমান যুগের অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করি, তাহলে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া একালের সব চাইতে বড় প্রয়োজন।

পাশ্চাত্যে একটি বিশেষ পটভূমিতে ধর্মহীন রাষ্ট্রের ধারণা জন্ম নিয়েছে। সেখানে পোপতন্ত্র যে রূপ ধারন করেছিলো এবং ধর্মের নামে রাজাদের সাথে যোগসাজসের মাধ্যমে যেসব যুলুম নির্যাতনকে বৈধ বলে সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছিলো, সেগুলো এক বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। খৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে এমন আক্রোশ সৃষ্টি হয় যে, তারা স্বয়ং ধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে বসে। আর এই বিদ্রোহের পরিণতিতেই আত্মপ্রকাশ করে ধর্মহীন রাষ্ট্র।

জ্যাকব হোলেক যখন রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পবিত্র রাখার এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন, সে সময়ই ১৮৩২ সালে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হয়। প্রথম দিকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিলো দার্শনিক ও রাজনীতিবিদদের হাতে। এ ব্যবস্থাটি অতি অল্প সময়ে রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। সংক্ষেপে, এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, ধর্মের পরিধি ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত সীমিত থাকতে হবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তাকে প্রবেশ করানো যাবেনা। প্রথম প্রথম ধর্মনিরপেক্ষতা এবং পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা পর্যন্তই এর বক্তব্য সীমিত ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে এই আন্দোলনের একটি অংশ ধর্মের বিরোধিতা এবং আগ্রাসী বস্তুবাদ ও সমাজতন্ত্রের হোতা হয়ে দাঁড়ায়। পাশ্চাত্যে ধর্মহীন রাষ্ট্রের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় ঃ

১. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানুষের মধ্যে সংশয় এবং মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। মানুষের সামনে কোনো একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বাকি রাখেনি। মানুষের মধ্যে এক প্রকার হতাশা ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে দিয়েছে। এই মানসিক ও চৈন্তিক অস্থিরতার ফলশ্রুতিতেই সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের মতো আন্দোলন জন্ম নেয় এবং মানুষকে

বস্তুপূজার চরম সীমায় পৌঁছে দেয়। সমাজতন্ত্রের বিখ্যাত সমালোচক আর এন ক্রু হান্ট লিখেছেন ঃ

> "সামাজিক দূরবস্থা এবং দারিদ্রের কারণে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ নীচু দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের পরিবর্তে উচ্চ বেতনধারী শ্রমিক এবং শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদেরই সমাজতন্ত্র মূলত আকর্ষণ করেছিলো। আর জনগণের মধ্যে পুঁজিবাদী সমাজের অপকারিতা এবং অন্যায় ও বেইনসাফীর চেতনা সৃষ্টির ফুলশ্রুতি হিসেবেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
>
> সত্য কথা হলো আমাদের সর্বশেষ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সমাজতন্ত্র হচ্ছে সেইসব মতবাদ ও দৃষ্টিভংগিরই সমষ্টি, যেগুলো আমাদের জীবনের সেই শূন্যতাকে পূরণ করেছে, যে শূন্যতা পরিপাটি ধর্মীয় কাঠামোর ধ্বংসের ফলে সৃষ্টি হয়েছিলো এবং যা ছিলো সমাজ জীবনে ধর্মহীনতার বিজয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই দার্শনিক ব্যবস্থার [সমাজতন্ত্রের] যদি মোকাবেলা করতে হয়, তবে তা কেবল এমন একটি বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা দ্বারাই করা যেতে পারে, যা হবে এর চাইতে ভিন্নতর কোনো আদর্শের পতাকাবাহী।"[১]

আর যারা সমাজতন্ত্র গ্রহণ করেনি, তারা চরমভাবে আধ্যাত্মিক দুর্ভাবনা, চিন্তাগত অস্থিরতা এবং হতাশা ও বিশ্বাসহীনতার শিকার হয়েছে।

২. এ ধর্মহীন রাষ্ট্র ব্যক্তির সামনে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা চরিতার্থ করা ছাড়া আর অন্য কোনো লক্ষ্য অবশিষ্ট রাখেনি। জাতীয় পর্যায়ে সুযোগ ও সুবিধাভোগী নীতি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে যুলুমে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে স্থায়ী কোনো নৈতিক নীতিমালা আর অবশিষ্ট নেই। ফলে এ শতাব্দী এমন দু'টি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করলো, যাতে নিহত ও আহতের সংখ্যা গোটা মানব ইতিহাসের সমস্ত যুদ্ধের সম্মিলিত নিহত ও আহতদের তুলনায় অনেকগুণ বেশী।

৩. এই ধর্মহীন রাষ্ট্রের চারিত্রিক প্রভাবও ছিলো ধ্বংসাত্মক। এর মাধ্যমে দৃঢ়তা, স্বাধীন চিত্ততা, সাহসিকতা এবং বিশেষ করে সততা এবং দুষ্কৃতির মধ্যে পার্থক্য করার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হতে থাকে। অপরদিকে স্বার্থপরতা, সুবিধা ভোগ এবং ঝোপ বুঝে কোপ দেয়া নীতি ব্যক্তি ও সামষ্টিক চরিত্রের বুনিয়াদে পরিণত হয়। যার ফলে হাজারো সামাজিক ও সামষ্টিক অপরাধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যা সমাজকে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে।

৪. অভিজ্ঞতা বলে, মানুষের লক্ষ্য যখন নিরেট বস্তুগত স্বার্থে পরিণত হয় এবং কোনো উচ্চতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা বর্তমান না থাকে তখন মানুষ নিরেট বস্তুগত স্বার্থও লাভ করতে পারেনা। আরনল্ড টয়নবী সমাজতন্ত্রের পরিণাম পর্যালোচনা করে স্পষ্ট ভাষায় তার ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন ঃ

> "একথা এখন দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যদি কেবল পার্থিব সুখ আনন্দকেই জীবন উদ্দেশ্য বানানো হয় তবে তাতে ব্যক্তির বস্তুগত সুখ এবং পার্থিব শান্তি লাভও অসম্ভব। অবশ্য একথা জ্ঞেয় যে, যদি সমাজতন্ত্র থেকে উন্নত

---

১. R. N. Crew-Hunt: Theory and Practice of Communism , London 1951, P-6.

কোনো আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য লক্ষ্য হয় তবে একটি আনুষঙ্গিক পরিণতি হিসেবে মানুষ পার্থিব সুখ এবং আনন্দও লাভ করবে।"[১]

৫. আরো সত্য কথা হচ্ছে এই যে, সমাজতন্ত্র কেবল বাস্তবেই ব্যর্থ হয়নি, বরঞ্চ ইতিহাস এখন সমাজতন্ত্র থেকে অনেক সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেছে। ভালোভাবে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সমাজতন্ত্র আজ একটা কাহিনীগত ধারণায় পরিণত হয়েছে। সময়ের আবর্তন এর দিকে প্রত্যাবর্তন করার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। সমাজতন্ত্র ছিলো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কার্যকারণের ফসল এবং কেবল একটি নির্দিষ্ট পরিবেশেই তা কাজ করতে পারে। সেসব কার্যকারণের অবর্তমানে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব টিকে থাকা সম্ভব নয়।

আগেই বলেছি, সমাজতন্ত্র হচ্ছে সেই ব্যবস্থার নাম, যার রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মের কোনো প্রবেশাধিকার নেই। আরো অধিক বিশ্লেষণ করলে কথা এই দাঁড়ায় যে, সমাজতন্ত্র ধর্ম ও আদর্শ নিরপেক্ষতার দাবীদার। ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে জানা যায়, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করাই ছিলো সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির বুনিয়াদী ধারণা। আর এ সবগুলো ধারণাই পরস্পর সম্পৃক্ত। সমাজতন্ত্র কেবল তখুনি কামিয়াব হতে পারে, যখন রাষ্ট্র হবে একটি পুলিশি সংস্থা অর্থাৎ তার দায়িত্ব হবে শুধুমাত্র নিয়ম শৃংখলা বজায় রাখা এবং রাষ্ট্রকে বহির্হামলা এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ থেকে রক্ষা করা। এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই ব্যক্তিকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে। সেখানে ব্যক্তি যেমনভাবে চাইবে জীবন যাপন করবে। কেবল এরূপ অবস্থায়ই রাষ্ট্র [অন্তত আদর্শিক সীমার মধ্যে] ধর্মীয় ও আদর্শিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারে। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর ধারণা এটাই ছিলো। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রের ধারণা পাল্টে গেছে। আজ রাষ্ট্র কেবল একটি বিরাটকায় প্রতিমা নয়। একটি বিশেষ সীমা বাদ দিয়ে দেশে যা কিছু ঘটে সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাটা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি অনেক বিরাট এবং অত্যন্ত ব্যাপক। বর্তমানে রাষ্ট্র জীবনের প্রতিটি বিভাগের রূপরেখা তৈরী করে এবং নিজস্ব পলিসির মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রিত ও শৃংখলিত করে। এখন জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করা এবং নিরক্ষরতা নির্মূল করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। দারিদ্র দূর করা এবং সম্পদের সুষম বন্টনের কোশেশ করা তারই দায়িত্ব। সামাজিক যাবতীয় দুষ্কৃতির মূলোৎপাটন করা এবং নাগরিকদের নৈতিক এবং সামাজিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা তারই দায়িত্ব। অসুস্থদের চিকিৎসা করা মযলুমদের ফরিয়াদ শোনা এবং নির্যাতিতদের সাহায্য সহযোগিতা করা তারই দায়িত্ব। মোটকথা, বর্তমান রাষ্ট্র হচ্ছে কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র। তার জন্যে আদর্শিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাকে তো অবশ্যই কোনো একটা নীতি মেনে চলতে হবে, কোনো না কোনো আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। ভালমন্দ এবং সফলতা ও ব্যর্থতার কোনো না কোনো মানদন্ড অবলম্বন করতে হবে এবং তারই

---

১. Arnold J. Toynbee, Christianity among the religions of the world. P-56.

আলোকে নিজের গোটা পলিসিকে সাজাতে হবে। এ কারণেই বর্তমান রাষ্ট্রসমূহ আদর্শিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। আর যেসব ভিত্তির উপর সমাজতন্ত্রের দার্শনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত ছিলো, বর্তমানে ইতিহাসের স্মৃতি হিসেবে তো সেগুলো অবশ্যি মজুদ আছে। কিন্তু বাস্তব দুনিয়ায় সেগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। যেসব ভিতের উপর এই দূর্গটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সেগুলো ধ্বসে পড়ে গেছে। কেবল কামনা বাসনার দ্বারা এই শূন্যতা পূর্ণ করা যেতে পারেনা। বর্তমান বিশ্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার আর কোনো সুযোগ নেই। ইতিহাস তাকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। বর্তমান বিশ্বে প্রয়োজন আদর্শিক রাষ্ট্রের যা নাকি সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার আহবায়ক।

৩. ইসলামী বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সংগ্রাম

এই পটভূমিতে আমরা যখন মহা শক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালার বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন আমাদের কাছে এই ইংগিতই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর মুসলিম দেশগুলো যখন বহু বছরের গোলামী জীবন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে এবং তাদের মধ্যে প্রায় সবগুলো দেশেই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছে তাতে আধুনিক সভ্যতার পতনের ফলে উদ্ভুত শূন্যতা পূরণের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হচ্ছে। সত্য বলতে কি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সম্রাজ্যবাদ এক এক করে সবগুলো মুসলিম দেশ কব্জা করে নেয়। কেবল দু'তিনটি দেশই এই রাজনৈতিক গোলামীর তিমিরান্ধকার থেকে রক্ষা পায়। বিংশ শতাব্দীতে এসে অবস্থার মোড় পরিবর্তন হয়ে যায়। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর মুসলিম দেশগুলোর স্বাধীনতা লাভের সূচনা দেখা দেয়। বর্তমানে চৌত্রিশটি[১] স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে। এ রাষ্ট্রগুলো নিজেদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভবিষ্যত নির্মাণের জন্যে নিজেরাই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সাথে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাও দেখা দিয়েছে। মুসলমানরা যতো দিন সম্রাজ্যবাদী শক্তির গোলাম ছিলো ততোদিন ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে নিজেদের সামাজিক জীবনকে ঢেলে সাজানো সম্ভব ছিলোনা। তাদের দীন জীবনের একটি পূর্ণাংগ নীতিমালা তাদের দিয়েছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সবগুলো বিভাগে আল্লাহ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাকে কার্যকর না করা পর্যন্ত তারা ঈমানের দাবী পূর্ণ করতে পারেনা। স্বাধীনতা লাভের পর স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সামষ্টিক জীবন ব্যবস্থাকে বিশেষ করে রাষ্ট্র, আইন ও শাসনতন্ত্রকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে ঢেলে সাজানো হবে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জনগণের যে দাবী তার পেছনে এই অনুভূতিই তীব্রভাবে কাজ করছে।

ইতিহাসের বিশাল পটভূমিতে এ আন্দোলন এক দুঃসাহসিক আন্দোলন। আর এর সাথেই সম্পৃক্ত রয়েছে ভবিষ্যতের সমস্ত কল্যাণ। কিন্তু আরো একটি ভাববার বিষয়

---

১. এই নিবন্ধটি ১৯৬৭ সালে লেখা হয়েছিলো। এরি মধ্যে আরো বেশ কিছু মুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীন হয়েছে। বর্তমানে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যা পঞ্চাশোর্ধ্ব। -অনুবাদক

রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, একটি মুসলিম দেশে কেন ইসলামী রাষ্ট্র দাবী করার প্রয়োজন পড়লো? তাতো স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া উচিত ছিলো, এবং তার সমস্ত শক্তি এই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হওয়া উচিত ছিলো, যেনো সবকিছু ইসলামের মাপকাঠির সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রকৃত অবস্থা তা নয়। এর মূল কারণ হলো, সম্রাজ্যবাদী শাসনের যুগে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছিলো তা মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণীকে ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। এদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক বলতে গেলে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানেইনা। তাদের মধ্যে একটা শ্রেণী এরকমও আছে যাদের মনমগজকে এতোটা বিষাক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, তারা ইসলাম সম্পর্কে চরম ভ্রান্ত ধারণার শিকার। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে রয়েছে তাদের কুধারণা। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের এরা দেখে পাশ্চাত্যের সৃষ্ট চশমা দিয়ে। এই শ্রেণীটি বর্তমান যুগে ইসলামকে প্রাচীন কাহিনী বলে মনে করে। অপরদিকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ তাদের দীন ও ঈমানে পরিণত হয়েছে। এই শ্রেণীটি স্বয়ং তাদের দেশবাসীর আবেগ ও অনুভূতির বিরুদ্ধে চরম যুদ্ধ ও সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে।

একদিকে রয়েছে চরম গাফলতি ও অজ্ঞতা, অপরদিকে রয়েছে ভ্রান্ত ধারণা ও শত্রুতা। এই জিনিসগুলো ইসলামী রাষ্ট্র বিকাশের পথে সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধকতা। আমাদের দৃষ্টিতে এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করার পন্থা হলো, একদিকে ইসলামী শিক্ষাকে অধিক ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং সাধারণ জনগণকে মানসিক ও চিন্তাগত প্রশিক্ষণ দিয়ে যেতে হবে। অপরদিকে জীবনের সকল বিভাগে এমন এক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দিতে হবে যা মুসলমানদের পরম সাধ ও আকাঙ্খার জজবা ও আবেগকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, ইসলামের প্রতি রাখবে পাকা ইয়াকীন এবং জীবনের প্রতিটি বিভাগে তাকে চালু ও কার্যকর করার জন্যে রাখবে প্রবল আকাঙ্খা। কেবল এই পন্থায়ই জাতির সকল যোগ্যতা ও শক্তি পারস্পরিক দ্বন্দ ও সংঘাতের পরিবর্তে সুদৃঢ় পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত হতে পারে এবং এভাবেই অতিক্রম করা সম্ভব বহু বছরের মনযিল কয়েক মাসে।

৪. এ গ্রন্থ সম্পর্কে কয়েকটি কথা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সবশ্রেষ্ঠ অবদান এটাই যে, তিনি একই সাথে উপরোক্ত দু'টি প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন। এক দিকে তিনি গোটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে দীনি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি প্রমাণসহ উপস্থাপন করেছেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে যুগ উপযোগী ভাষায় পেশ করেছেন। তাঁর লেখা অধ্যয়ন করলে জীবন সম্পর্কে পাঠকদের ইসলামী দৃষ্টিভংগির পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হয় এবং তারা ইসলামের গোটা চিত্রকে এক নযরে দেখতে সক্ষম হন। সকল প্রকার ভয় ভীতিকে পদদলিত করে তিনি বর্তমান যুগের সকল ফিতনার মোকাবিলা করেন এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণাংগতা প্রমাণ করেন।

এর চাইতেও বড় অবদান তাঁর এই যে, তিনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কেবল আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই প্রদান করেননি, বরঞ্চ বর্তমান যুগে এই জীবন ব্যবস্থাকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে এবং এ যুগের রাষ্ট্র ব্যাবস্থাকে কিভাবে ইসলামের ছাঁচে ঢেলে সাজানো যেতে পারে তাও তিনি বলে দিয়েছেন।

জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে তিনি ইসলামের উপযোগিতা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা এবং তার পরিচালনা ব্যবস্থার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছিলো তাঁর কাজের বিশেষ ক্ষেত্র। তিনি যেরূপ আস্থা ও ইয়াকীনের সাথে, যে ধরনের দূরদৃষ্টির সাথে এবং যেরূপ গভীর ও প্রশস্ত চিন্তা ভাবনার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সকল বিভাগের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তাতে একালে তার সমকক্ষ আর কেউ নেই। নিঃসন্দেহে একাজে গোটা আরব ও আজমের মধ্যে তিনি একক ব্যক্তিত্ব। যুগের দাবীকে সামনে রেখে তিনি ইসলামের পূর্ণাংগ চিত্র অংকন করেছেন। ইজতেহাদী অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির সাথে তা তিনি পেশ করেছেন এবং সকল বাস্তব সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি তা উপস্থাপন করেছেন। আর এটাই হচ্ছে তাঁর স্বতন্ত্র্য ও অনুপম অবদান।

ইসলামী রাষ্ট্র সংক্রান্ত তাঁর যেসব লেখা ও প্রবন্ধ নিবন্ধ এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, তা বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়েছিলো। এর মধ্যে কিছু কিছু বিভিন্ন পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়ে পাঠকগণ কর্তৃক দারুণভাবে সমাদৃতও হয়। কিন্তু সবগুলো লেখা একটি গ্রন্থাকারে পেশ করা সম্ভব হয়নি। আমি যখন মাওলানার ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংক্রান্ত লেখাগুলো ইংরেজী ভাষায় "Islamic Law & Constitution" নামে সংকলন করি, তখনই সরাসরি উর্দু ভাষায়ও এই সংকলনটি প্রকাশিত হবার প্রয়োজন অনুভব করি। কিন্তু মাওলানা তাঁর অতিরিক্ত ব্যস্ততার কারণে একাজ করতে পারেননি। অতপর যখন ইংরেজী গ্রন্থটি দ্বিতীয়বার পর্যালোচনা করে প্রস্তুত করি তখন এ অনুভূতি পুনরায় তাজা হয়ে উঠে এবং কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের বার বার অনুরোধের ফলে মাওলানার অনুমতিক্রমে উর্দু গ্রন্থটিও সংকলনের কাজ শুরু করি। সবগুলো লেখা একত্রিত করার পর ভাবলাম "ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা" এবং "ইসলামী আইন" এই দু'টি বিষয়ের উপর দু'টি পৃথক পৃথক গ্রন্থ তৈরী করতে হবে। দু'টি বিষয়ের সবগুলো লেখা নিয়ে একটি গ্রন্থের কলেবর অনেক বেড়ে যাবে। তাই ১৩৮০ হিজরী মোতাবেক ১৯৬০ ঈসায়ীতে আমি "ইসলামী রিয়াসাত" নামে মাওলানার গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধসমূহ সংকলন করে ফেলি। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, গ্রন্থটি খুবই সমাদৃত হয়। শিক্ষিত সমাজ গ্রন্থটি খুবই পছন্দ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই গ্রন্থটি কয়েকদিক থেকে অপূর্ণাংগ ছিলো এবং তাতে আমার মূল অভিপ্রায়ও প্রতিভাত হয়নি। যেহেতু গ্রন্থটির পরিপূর্ণতা সাধনের সময় সুযোগ হাতে ছিলোনা, সেজন্যে সে অবস্থাতে তা মুদ্রণের জন্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আলহামদুলিল্লাহ্ "ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী " মাওলানার সকল লেখা সংগ্রহ করেছে এবং এখানে মাওলানার সবগুলো লেখাকে নতুনভাবে সাজানোর কাজ চলছে। এখানে কয়েক মাসের পরিশ্রমের পর গ্রন্থটিকে পরিবর্ধিত কলেবরে উপস্থাপন করছি। এখন এই গ্রন্থে মাওলানার ইসলামী রাষ্ট্র সংক্রান্ত সকল লেখা একটি বিশেষ সূচী পরম্পরায় সংকলিত করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা এবং এ দেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সংগ্রাম সংক্রান্ত লেখা বিমিশ্রিত ছিলো। এখন সেগুলোকেও পৃথক পৃথক করে দেয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে এখন শুধুমাত্র আদর্শিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনাই সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থে "তরজমানুল কুরআন" পত্রিকার পুরানো ফাইল থেকে সেইসব প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে যা এযাবত কোনো প্রকার গ্রন্থ বা

পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য আমরা পুরানো লেখা থেকে কেবল এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত অংশগুলোই গ্রহণ করেছি। আর যে অংশগুলো সমকালীন ধরনের ছিলো কিংবা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো এবং তাদের তৎকালীন দৃষ্টিভংগির সাথে সম্পৃক্ত ছিলো সেগুলো আমরা বিলুপ্ত করে দিয়েছি। যেহেতু পুরানো তর্ক বহছ তাজা করে তোলা আমাদের লক্ষ্য নয়, সেজন্যে এখন সেগুলো নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য আমরা ঐ সকল অংশেরই হিফাযত করেছি যেগুলোতে আদর্শিক ও মূলনীতিগত আলোচনা ছিলো। কারণ সেগুলো চিরন্তন ও শাশ্বত। তরজমানুল কুরআনের ফাইল ছাড়াও আমরা তাফহীমূল কুরআনকে এ উদ্দেশ্যে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি এবং এর টীকায় রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংক্রান্ত যতো আলোচনা ছিলো সেগুলো বের করে এনেছি। দু'টি পৃথক শিরোনামে সেগুলো সংকলিত করেছি। তাই এ দু'টো প্রবন্ধ বর্তমান অবয়বে প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হচ্ছে। এ দু'টি প্রবন্ধ থেকে পাঠকগণ অনুভব করতে পারবেন তাফহীমুল কুরআনে আনুষংগিক বিষয়ে কতো বিপুল আলোচনা হয়েছে এবং সেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে সেগুলো থেকে এক নযরে উপকৃত হওয়া সম্ভব ছিলোনা।

সংকলক এ ব্যাপারে বিশেষভাবে চেষ্টা করেছেন যাতে করে মাওলানার লেখাগুলো সর্বাংগীন সুন্দরভাবে সংকলিত হয় এবং সেগুলোর যৌক্তিক পারম্পার্য অক্ষুন্ন থাকে। এ প্রসংগে তাকে কিছু পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের কাজও করতে হয়। তার পক্ষে মাওলানার লেখার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন করাও বিরাট কষ্ট ও দুঃসাধ্যের ব্যাপার ছিলো। কিন্তু যেসব প্রবন্ধ নিবন্ধ বিগত প্রায় পঁচিশ বছর সময়কালে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনকে সামনে রেখে এবং গ্রন্থাকারে সংকলিত করার দৃষ্টিভংগি ছাড়াই লেখা হয়েছিলো, এখন সেগুলোকে গ্রন্থের রূপ দেবার প্রাক্কালে কিছুটা পরিবর্তন আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। একাজ স্বয়ং মাওলানার নিজ হাতেই হবার দাবীদার ছিলো। কিন্তু ব্যস্ততা তাকে কোনো প্রকার অবকাশ দেয়নি। অথচ পরিবেশ পরিস্থিতি দাবী করছিলো এই মূল্যবান লেখাগুলো সুগ্রথিত হয়ে শিক্ষিত সমাজের সামনে আসুক। নিজের জ্ঞানগত মূলধনের স্বল্পতার পূর্ণ অনুভূতি আমার রয়েছে এবং সম্ভবত একাজ আমি কখনো করতে পারতামনা যদিনা স্বয়ং মাওলানাই আমাকে সাহস যোগাতেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমার উপর এতোটা আস্থা রেখেছেন এবং এই বিরাট খেদমত আন্জাম দেবার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ গ্রন্থটি প্রস্তুত করার কাজ আমার জন্য এক বিরাট সৌভাগ্যের মর্যাদা রাখে। আমি আনন্দিত যে, স্বয়ং মাওলানা প্রতিটি কদমে আমাকে নিদের্শনা এবং পরামর্শ দান করে উপকৃত করেছেন। এখন আল্লাহ্ই ভাল জানেন এ দায়িত্ব আমি কতোটা পালন করতে পেরেছি। এতে যদি আমি কিছুমাত্র সফল হই তবে তা আল্লাহ্রই মেহেরবানী এবং যতোটুকুই ক্রটি থেকে থাকে তার দায়িত্ব আমার।

২৭ সফর ১৩৮৬ হিজরী

প্রফেসর খুরশীদ আহমদ
ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী করাচী

ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন

- ধর্ম ও রাজনীতি
- ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ
- কুরআনের রাজনৈতিক দর্শন
- খিলাফতের তাৎপর্য
- জাতীয়তার ইসলামী ধারণা

প্রথম অধ্যায়

ধর্ম ও রাজনীতি

১ ধর্ম সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি

২ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজন কেন?

৩ ইসলাম ও কর্তৃত্ব

৪ ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করার ভ্রান্ত মতবাদ

৫ ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করার মতবাদ খন্ডন

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়নকালে আমাদের সামনে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন দেখা দেয়, তাহলো ইসলাম 'ধর্ম' সম্পর্কে কি ধারণা পেশ করে আর রাজনীতি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এবং সামাজিক জীবনের সামাগ্রিক বিষয়েই বা ইসলামের দৃষ্টিভংগি কি? ধর্ম সম্পর্কে সীমাবদ্ধ ধারণার কারণে ধর্মই অধিকতর বিভ্রান্তিকর ধারণার শিকার হয়েছে। শুধু রাজনৈতিক মহলই নয়, ধর্মীয় মহলও এ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। তাই আমরা এ গ্রন্থের সূচনাই করতে চাই ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনের আলোচনার মধ্য দিয়ে।

আধুনিক কালের ইসলামী চিন্তা গবেষণার ময়দানে এ বিশেষ অবদান কেবল মাওলানা মাওদূদীরই যে, তিনি ধর্ম ও রাজনীতির পার্থক্যকরণের উপর হেনেছেন এক কার্যকর আঘাত। আয়নার মতো স্বচ্ছ করে পেশ করেছেন ইসলামের পূর্ণাংগ ও বৈপ্লবিক রূপরেখা। এ অধ্যায়টিকে আমরা সজ্জিত করেছি তাঁর কয়েকটি অমূল্য রচনার সমন্বয়ে। বিভিন্ন সময়ে রচিত এ প্রবন্ধগুলোকে এখানে আমরা মুক্তার মালার মতো গেঁথে দিয়েছি বাস্তব পরম্পরায়। **-সংকলক**।

ধর্ম ও রাজনীতি*

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবূয়্যত লাভের পূর্বে পৃথিবীতে ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এই ছিলো যে, জীবনের অনেকগুলো দিক ও বিভাগের মধ্যে এটাও একটা বিভাগ। অন্য কথায়, এটা মানুষের পার্থিব জীবনের একটা লেজুড় বিশেষ, যা পরপারের জীবনে ত্রাণ লাভের জন্যে একটা সার্টিফিকেট হিসেবে ব্যবহৃত হবে। মানুষ ও তার উপাস্যের মধ্যে যে সম্পর্ক, ধর্মের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে কেবলমাত্র সেই সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে ব্যক্তি মুক্তির উচ্চতর মর্যাদা প্রত্যাশা করে, তার জন্যে পার্থিব জীবনের অন্য সকল বিভাগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবল এ বিভাগটির কাজে নিয়োজিত ও নিবেদিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এতো উচ্চ মর্যাদা যার কাম্য নয়, বরং শুধুমাত্র মুক্তিলাভ করাকেই সে যথেষ্ট মনে করে এবং সেই সাথে এটাও তার প্রত্যাশা যে, তার মাবুদ তার ওপর অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করতে থাকুক এবং তাকে পার্থিব জীবনের সমস্ত তৎপরতায় কল্যাণ ও সমৃদ্ধি দান করুক, সে ব্যক্তির জন্যে তার পার্থিব জীবনের সাথে ধর্মের এ লেজুড়টাও জুড়ে রাখা যথেষ্ট। দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্ম যেমন চলছে তেমনই চলবে, সেই সাথে কিছু কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার মাধ্যমে মাবুদকেও খুশী করা হতে থাকবে। নিজের সত্তার সাথে, সমাজের অন্যান্য লোকদের সাথে এবং আশপাশের সমগ্র জগতের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক, তা এক জিনিস। আর আপন মা'বুদের সাথে তার যে সম্পর্ক, সেটা ভিন্ন আরেক জিনিস। এ দু'সম্পর্কের মধ্যে কোনো পারস্পরিক যোগসূত্র নেই। এ ছিলো জহেলিয়াতের ধ্যান ধারণা। এ ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে কোনো মানবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইমারত গড়ে ওঠা সম্ভব ছিলোনা। সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে মানুষের গোটা জীবনকেই বুঝায়। যে জিনিস মানব জীবনের জন্যে নিছক লেজুড় বিশেষ, তার ওপর যে সমগ্র জীবনের ইমারত কিছুতেই তৈরী হতে পারেনা, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এ কারণেই

---

* এ অংশ সংকলন করা হয়েছে 'উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান' গ্রন্থ থেকে।

দুনিয়ার সর্বত্র ধর্ম এবং সভ্যতা কৃষ্টি সব সময়ই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো। যদিও এ উভয় জিনিস পরস্পরের ওপর কমবেশী প্রভাব বিস্তার করেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা ছিলো একান্তই পরস্পর বিরোধী কতিপয় বস্তুর একত্র অবস্থানের ফলে সৃষ্ট প্রভাবের মতই। তাই এ প্রভাব কোথাও এ দু'টির কোনোটির জন্যই উপকারী ও ফলপ্রসূ হয়ে দেখা দেয়নি। ধর্ম যখন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করেছে, তখন তাতে ঢুকিয়ে দিয়েছে বৈরাগ্যবাদ, বস্তুগত সম্পর্ক ও সংযোগের প্রতি ঘৃণা, পার্থিব স্বাদ সম্ভোগে বিতৃষ্ণা ও অনীহা, জাগতিক উপায় ও উপকরণের সাথে সম্পর্কহীনতা, মানবীয় সম্পর্ক ও বন্ধনসমূহের ব্যাপারে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও বৈষম্য এবং সংকীর্ণতা ও গোড়ামীর উপাদান। এ প্রভাব কোনো অর্থেই উন্নতি ও প্রগতির সহায়ক ও পোষক ছিলোনা। বরং পার্থিব অগ্রগতির পথে তা ছিলো এক বিরাট প্রতিবন্ধক। পক্ষান্তরে সে সভ্যতা ও সংস্কৃতি যা ছিলো আগাগোড়াই বস্তুবাদ ও স্বেচ্ছাচার ভিত্তিক, তা যখনই ধর্মের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তাকে দুষিত ও নোংরা করে ছেড়েছে। প্রবৃত্তি পূজার যাবতীয় পংকিলতা আবীলতা ও কদর্জতা দিয়ে তাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। প্রবৃত্তির প্রতিটি নিকৃষ্ট ও জঘণ্য কামনা বাসনাকে সে ধর্মীয় পবিত্রতা ও মাহাত্ম্যের পোশাক পরিয়ে দিয়ে সর্বদা এরূপ স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করেছে যেনো নিজের বিবেকও তাকে দংশন না করতে পারে এবং অন্য কেউও তার বিরোধিতা করতে সক্ষম না হয়। এরূপ প্রভাব বিস্তারের কারণেই আমরা কোনো কোনো ধর্মের আনুষ্ঠানিক উপাসনাতে পর্যন্ত ভোগাসক্তি ও নির্লজ্জতার এমনসব আচরণ দেখতে পাই, যাকে ধর্মীয় অংগনের বাইরে স্বয়ং সেইসব ধর্মের অনুসারীরাও চরিত্রহীনতার কাজ বলে আখ্যায়িত না করে পারেনা।

ধর্ম ও সভ্যতার এ পারস্পরিক প্রভাব আদান প্রদানকে উপেক্ষা করলেও যে বাস্তব সত্যটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে, তা হলো, পৃথিবীর সর্বত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইমারত ধর্মহীনতা ও চরিত্রহীনতার ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

প্রকৃত ধর্মপরায়ণ লোকেরা আপন মুক্তির চিন্তায় দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছে। আর দুনিয়াদাররা দুনিয়াবী কর্মকান্ডকে আপন প্রবৃত্তির কামনা ও বাসনা এবং আপন আপন অসম্পূর্ণ ও অপরিপক্ক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতার অধীনে সম্পন্ন করেছে। যদিও তাদের সে অভিজ্ঞতাকে প্রত্যেক যুগেই পরিপক্ক ও নির্ভুল বলে ধরে নেয়া হয়েছে। এবং সে যুগ অতিক্রান্ত হলেই তা অপরিপক্ক ও ত্রুটিপূর্ণ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। দুনিয়াদাররা দুনিয়াবী কর্মকান্ড স্বেচ্ছাচারীভাবে সম্পন্ন করলেও প্রয়োজন মনে করলে সেই সাথে আপন প্রভুকে খুশী করার জন্য একটু আধটু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও পালন করেছে। যেহেতু ধর্ম তাদের কাছে জীবনের নিছক একটা লেজুড় বিবেচিত হতো, তাই তাদের দুনিয়াবী কর্মকান্ডের পাশাপাশি যেটুকু ধর্মের অবস্থান ছিলো, সেটুকু নেহায়েত লেজুড়ের আকারেই ছিলো। সকল রকমের যুলুম-নির্যাতন, অর্থনৈতিক অবিচার, সামাজিক ভারসাম্যহীনতা এবং সাংস্কৃতিক ভ্রষ্টতা ও অনাচারের সাথেই এ লেজুড়টি সংযুক্ত ছিলো। দস্যুবৃত্তি ও ঠগবাজির সাথে যেমন তার সহাবস্থান ছিলো। আগ্রাসন, লুটতরাজ, শোষণ, ত্রাস, সুদখোরী, অর্থলোলুপতা, অশ্লীলতা ও বেশ্যাবৃত্তির সাথেও তার নিরন্তর সহগামিতা এবং সহযোগিতা ছিলো।

১. ধর্ম সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন যে, ধর্ম সংক্রান্ত জাহেলী ধ্যান ধারণার অপনোদন করে একটি যুক্তিসঙ্গত ও সুষ্ঠু চিন্তা-ধারণা পেশ করবেন। আর পেশ করেই শুধু ক্ষান্ত হবেননা, বরং তার ভিত্তিতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি পরিপূর্ণ কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে কার্যকরভাবে ও সফলতার সাথে তা চালু করে দেখিয়েও দেবেন। তিনি বললেন, ধর্ম যদি জীবনের নিছক একটা বিভাগ বা লেজুড় হয়, তবে তা নেহায়েৎ ফালতু ও অর্থহীন জিনিস। এমন জিনিসকে ধর্ম নামে আখ্যায়িত করাই ভুল। আসলে ধর্ম বা দীন কেবল সেই জিনিসকেই বলা যাবে, যা জীবনের কোনো অংশ বিশেষের নয়, বরং গোটা জীবনের আদর্শ হতে পারে। হতে পারে মানুষের সমগ্র জীবনের প্রেরণার উৎস ও পরিচালিকা শক্তি। হতে পারে বুদ্ধি, বিবেচনা, উপলব্ধি, চিন্তা ও দৃষ্টির পথ প্রদর্শক, ন্যায় ও অন্যায় এবং ভুল ও নির্ভুল যাচাই করার কষ্টিপাথর। যা দেখাতে পারবে জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে ও প্রতিটি পদক্ষেপে হকপথ ও বাতিল পথের পার্থক্য, যা মানুষকে বাঁচাতে পারবে অন্যায় ও অসত্য পথ থেকে আর সত্য ও ন্যায়ের পথে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকা ও সামনে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি যোগাবে এবং দুনিয়া থেকে আখিরাত পর্যন্ত বিস্তৃত জীবনের এ সুদীর্ঘ ও অফুরন্ত অভিযাত্রায় মানুষকে কামিয়াবী ও সৌভাগ্যের সাথে প্রতিটি মঞ্জিল অতিক্রম করাতে পারবে।

এ ধর্মের নামই ইসলাম। এটা জীবনের লেজুড় হয়ে থাকার জন্য আসেনি। তাকে যদি প্রাচীন জাহেলী ধ্যান ধারণা অনুসারে জীবনের একটা লেজুড় বলে ধরে নেয়া হয়, তবে তার আগমনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। ইসলাম মানুষ ও আল্লাহ্‌র সম্পর্ক নিয়ে যতোটা আলোচনা করে, ঠিক ততোটাই আলোচনা করে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে এবং ঠিক ততোটাই আলোচনা করে মানুষের সাথে বিশ্ব প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়েও। ইসলামের আবির্ভাব শুধু এ তত্ত্বটাই মানুষকে জানানোর জন্যে যে, সম্পর্ক ও সম্বন্ধের এ বিবিধ ক্ষেত্রগুলো পৃথক নয় কিংবা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটি সমষ্টিরই সমন্বিত ও সংগঠিত অংশ মাত্র। মানুষের সাথে বিশ্ব প্রকৃতির সম্পর্ক সঠিক হতেই পারেনা যতক্ষণ না মানুষের সাথে বিশ্ব স্রষ্টার সম্পর্ক সঠিক হয়। কাজেই এ দু'সম্পর্ক পরস্পরের পরিপূরক ও পরিশোধক। উভয়ে মিলিত হয়ে একটি সফল জীবন গড়ে তোলে। ধর্মের আসল কাজ হলো, সফল জীবনের জন্যে মানুষকে মানসিক ও চারিত্রিকভাবে প্রস্তুত করা। যে ধর্ম এ কাজটি করেনা তা ধর্মই নয়। আর যে ধর্ম এ কাজটি করে থাকে, তারই নাম ইসলাম। এ জন্যই বলা হয়েছে ঃ

"আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান।" [আল কুরআন]

ধর্ম ও সংস্কৃতি

বস্তুত ইসলাম হলো চিন্তার একটা বিশিষ্ট প্রণালী [Attitude of mind] এবং গোটা জীবন সম্পর্কে একটা বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভংগিও [Out look on life]। তাছাড়া ঐ বিশেষ চিন্তা প্রণালী এবং জীবন সংক্রান্ত বিশেষ দৃষ্টিভংগির আলোকে

নির্মিত একটা অনন্য কর্মপদ্ধতিও। এ চিন্তা প্রণালী ও কর্মপদ্ধতির সংযোগ ও সমন্বয়ে যে কাঠামো গড়ে ওঠে, সেটাই হলো দীন ইসলাম। সেটাই ইসলামী সভ্যতা ও কৃষ্টি। এখানে দীন এবং সভ্যতা সংস্কৃতি কোনো আলাদা আলাদা বস্তু নয়, বরং এসব কয়টি মিলে একটা সুসমন্বিত সমষ্টির জন্ম হয়। এই একই চিন্তা পদ্ধতি ও জীবন যাপন প্রণালী মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করে। মানুষের ওপর আল্লাহ্‌র অধিকার কি কি, তার নিজের কি কি অধিকার, মা, বাপ, স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয় স্বজন, পাড়া পড়শী, লেনদেন ও কায়কারবারের অংশীদারের, স্বধর্মী এবং বিধর্মী শত্রু ও বন্ধু, গোটা মানব জাতি, এমনকি বিশ্ব প্রকৃতির বস্তু ও শক্তি নিচয়ের কি কি অধিকার? এসমস্ত অধিকারের মধ্যে ইসলাম পূর্ণ ভারসাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। একজন মানুষের মুসলমান হওয়াই এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, সে এসকল অধিকার পূর্ণ সততা ও ন্যায় নিষ্ঠতার সাথে প্রদান করবে এবং অন্যায়ভাবে এক অধিকার আদায় করতে গিয়ে অন্য অধিকার বিনষ্ট করবেনা।

চিন্তার এ বিশিষ্ট পন্থা ও জীবন সংক্রান্ত এ বিশেষ মতবাদ মানব জীবনের জন্য এক অতি উন্নত ও মহৎ নৈতিক লক্ষ্য এবং একটা পবিত্র আধ্যাত্মিক মঞ্জিলে মকসুদ নির্ধারণ করে দেয়। জীবনের সকল চেষ্টা সাধনাকে তা সে যেকোনো কর্মক্ষেত্রেই হোকনা কেন, এমন কতোগুলো রাজপথে নিয়ে পৌছেঁ দেয়, যে রাজপথগুলো সকল দিক থেকে একই কেন্দ্রের দিকে ধাবমান।

এ কেন্দ্র হলো একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী বিষয়। প্রতিটি জিনিসের মান নির্ধারিত হয় এরই নিরীখে এবং প্রতিটি জিনিসের যাচাই হয় এ মানদন্ডে। এ কেন্দ্রীয় মঞ্জিলে মকসুদে পৌছার ব্যাপারে যে জিনিস সহায়ক, তা গ্রহণ করা হয়। আর যা এর পথে অন্তরায় তা করা হয় বর্জন। ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বিষয় থেকে শুরু করে সমাজ জীবনের বড় বড় ব্যাপারেও এ মানদন্ড সমানভাবে প্রযোজ্য। পানাহারে, পোশাক পরিচ্ছেদে, ব্যবহারে, শিল্প কারখানার পারস্পরিক সম্পর্কে, লেনদেনে, কথাবার্তায় মোটকথা জীবনের প্রতিটি কাজকর্মে কোনো ব্যক্তির কি কি সীমা ও বিধিনিষেধ মেনে চলা দরকার এবং মেনে চললে সে মঞ্জিলে মকসুদ অভিমুখী সোজা পথে অগ্রসরমান থাকতে পারবে এবং বক্র ও ভ্রষ্ট পথে পা বাড়াবেনা, তারও ফয়সালা এ মানদন্ড দ্বারাই হয়ে থাকে। একই মানদন্ড এও নির্ণয় করে দেয় যে, সামষ্টিক জীবনে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক কোন্ নীতিমালার ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ হলে সামাজিক আচার আচরণ, অর্থনৈতিক লেনদেন, রাজনৈতিক কার্যকলাপ এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রের বিকাশ ও উন্নয়ন উক্ত মঞ্জিলে মকসুদ অভিমুখী পথ ধরেই সম্পন্ন হতে পারবে এবং উক্ত মঞ্জিলে মকসুদ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এমন পথে সম্পন্ন হবেনা। আকাশ ও পৃথিবীর যেসকল উপায় উপকরণের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যেসকল জিনিসকে তার অনুগত ও বশীভূত করে দেয়া হয়েছে, তাকে সে কোন্ কোন্ পন্থায় ব্যবহার করলে তা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হবে এবং কোন্ কোন্ পন্থায় ব্যবহার করলে তা তার সাফল্যের পথে অন্তরায় হবে বলে তা তার এড়িয়ে চলা উচিত, সে সম্পর্কেও ঐ মানদন্ডের নিরীখেই সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব। একই মানদন্ডে এ

ব্যাপারেও ফায়সালা করা সম্ভব যে, ইসলামী সমাজের লোকদেরকে অনৈসলামী সমাজের সাথে শত্রুতায় ও মিত্রতায়, যুদ্ধে ও সন্ধিতে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ঐক্যে ও বিভিন্নতায়, বিজয়ী অবস্থায় ও পরাজিত অবস্থায়, বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান প্রদানে কোন্ নীতিমালা অনুসরণ করা কর্তব্য, যাতে করে আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের এসব বিভিন্ন স্তরে তারা আপন লক্ষ্য হারিয়ে না বসে বরং যতোদূর সম্ভব, মানবজাতির এ অজ্ঞ ও বিপথগামী সদস্যদেরকে দিয়েও ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, সচেতনভাবে কিংবা অবচেতনভাবে, সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের কাজ নিতে পারে, যা মূল স্বভাব ধর্মের বিচারে মুসলমানদের মতো তাদেরও জীবনের উদ্দেশ্য।

·মোটকথা, মসজিদ থেকে শুরু করে বাজার ও রণাঙ্গণ পর্যন্ত, ইবাদত উপাসনার নিয়মকানুন থেকে শুরু করে রেড়িও ও উড়োজাহাজের ব্যবহারবিধি পর্যন্ত; ওজু, গোসল, পবিত্রতা অর্জন ও পেশাব, পায়খানার খুঁটিনাটি মাসয়ালা মাসায়েল থেকে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের মূলনীতি পর্যন্ত, মকতবের হাতে খড়ি শিক্ষা থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীর পর্যবেক্ষণ ও মহাজাগতিক নিয়মাবলীর সর্বোচ্চমানের তত্বানুসন্ধান ও গবেষণা পর্যন্ত জীবনের সকল চেষ্টা সাধনা এবং চিন্তা ও কর্মের সকল বিভাগকে ঐ একই দৃষ্টিভংগি এমন একটি সুসমন্বিত এককে পরিণত করে, যার সকল অংশ উদ্দেশ্যগতভাবে সুবিন্যাস্ত এবং স্বেচ্ছাগতভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। এ সবগুলো একটি বৃহত্তর কারখানার যন্ত্রাংশের মত এমনভাবে মিলিত হয় যে, এগুলোর সম্মিলিত ক্রিয়া ও চালনা দ্বারা একই ফল উৎপন্ন হয়।

ধর্মের জগতে এটা ছিলো এক বৈপ্লবিক ধারণা। নিরেট জাহেলিয়াত থেকে উদগত মস্তিষ্কে এ ধারণা কখনো পুরোপুরিভাবে স্থান লাভ করতে পারেনি। জ্ঞান বিস্তার ও বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে আজকের পৃথিবী খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর চাইতে অনেক বেশী অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও এত সেকেলে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা বিরাজমান যে, ইউরোপের বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরাও এ বৈপ্লবিক আদর্শকে উপলব্ধি করতে ঠিক ততখানিই অক্ষম, যতখানি অক্ষম ছিলো আদিম জাহেলী সমাজের গন্ডমূর্খ নির্বোধ লোকগুলো। হাজার হাজার বছর ধরে ধর্ম সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা পুরুষানুক্রমে চলে আসছে, তাদের মস্তিষ্ক আজও তার বজ্র আঁটুনীতে আবদ্ধ। যুক্তিভিত্তিক সমালোচনা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণেও সে বন্ধন খোলা সম্ভব হচ্ছেনা। মসজিদ ও খানকার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অবস্থানকারীরা যদি ধার্মিকতার অর্থ নির্জনে বসে আল্লাহ আল্লাহ জপ করা মনে করে এবং দীনদারী বলতে আনুষ্ঠানিক ইবাদত উপাসনার গন্ডীতে আবদ্ধ থাকা বুঝে, তাহলে সেটা তেমন বিস্ময়ের ব্যাপার হয়না। কেননা তারা তো আদতেই 'রক্ষণশীল'। অজ্ঞ জনসাধারণ যদি ধর্মকে বাদ্য বাজানো তাজিয়া অনুষ্ঠান এবং গোপূজার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করে তাহলে তাতেও অবাক হবার কিছু থাকেনা। কিন্তু বড় বড় বিদ্বান ও পন্ডিতদের কি হয়েছে যে, তাদের মস্তিষ্ক থেকেও সেকেলে ধ্যান ধারণার অন্ধকার দূরিভূত হলোনা? অমুসলিম

প্রাচীন জাহেলী ভাবধারার আওতাধীন ধর্মকে যে অর্থে গ্রহণ করে, ঠিক সেই অর্থেই ইসলামকে একটা 'ধর্ম' মনে করে থাকে এ পন্ডিত মহোদয়রা।

আমাদের রাজনীতিতে জাহেলী চিন্তাধারার প্রভাব

উপলব্ধির এ সীমাবদ্ধতা ও অনুধাবনের এ অক্ষমতার দরুন মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণীর একটা বৃহৎ অংশ শুধু যে নিজেরাই ভ্রান্ত পথে চলছে তাই নয়, বরং গোটা দুনিয়ায় তারা ইসলাম এবং ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে নিদারুণ ভুল ধারণার প্রসার ঘটাচ্ছে। মুসলিম জাতির যেসব প্রকৃত সমস্যা সমাধানের ওপর তাদের বাঁচা মরা নির্ভরশীল, সেগুলো তাদের একেবারেই বুঝে আসেনা। অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলোকেই তারা আসল সমস্যা মনে করে উদ্ভট পন্থায় সেগুলোর সমাধনের চেষ্টা করছে। এসমস্ত চেষ্টার মধ্য দিয়ে বস্তুত ধর্মের সেই পুরনো সংকীর্ণ ধারাই বিভিন্ন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। কেউ বলেন, আমি প্রথমে ভারতীয়, তারপর মুসলমান। এ কথাটা তারা যখন বলেন, তখন তাদের মন মস্তিষ্কে ধর্ম সম্পর্কে এ ধারণাই বিদ্যমান থাকে যে, ইসলাম ভৌগলিক অঞ্চলিকতায় বিভক্ত হওয়ার যোগ্য। তাদের মতে, তুর্কি ইসলাম, ইরানী ইসলাম, মিশরীয় ইসলাম, ভারতীয় ইসলাম, অতপর ভারতীয় ইসলামের মধ্যেও আবার পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, দাক্ষিণাত্মীয়, মাদ্রাজী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ইসলাম হতে পারে। প্রত্যেক অঞ্চলের মুসলমানরা নিজ নিজ আঞ্চলিক অবস্থা অনুপাতে আলাদা আলাদা চিন্তাধারা অবলম্বন করতে পারে ও জীবন সম্পর্কে ভিন্ন রকমের দৃষ্টিভংগি ও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন মূলনীতি ও মতাদর্শ অনুসারে যেসব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিজেদের মধ্যে চালু করে নিয়েছে তার মধ্যে তারাও মিলে মিশে যেতে পারে এবং তার পরেও তাদের মুসলমান থাকা সম্ভব। কেননা ইসলাম তো একটা 'ধর্মীয় লেজুড়' মাত্র, যা পার্থিব জীবনের যে কোনো পথ ও পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত হতে সক্ষম।

আরেক ভদ্রলোক বলেন, মুসলমানদের বৈষয়িক ও ধর্মীয় ব্যাপারগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করা উচিত। ধর্মের সম্পর্ক হলো মানুষ ও আল্লাহর মধ্যকার ব্যাপারগুলোর সাথে। অর্থাৎ আকিদা বিশ্বাস ও ইবাদাতের সাথে। এগুলোর ক্ষেত্রে মুসলমানরা স্বতন্ত্র নিয়মে চলতে পারে। কেউ তদেরকে এ পথ থেকে হটাতে চাইবেওনা, পারবেওনা। কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারগুলোর কথা আলাদা। সে ব্যাপারে ধর্মের নাকগলানোর দরকার নেই। দুনিয়ার অন্যান্য লোকেরা যেভাবে বৈষয়িক ব্যাপার আঞ্জাম দিয়ে থাকে, মুসলমানদেরও সেভাবে আঞ্জাম দেয়া উচিত।

অপর এক ভদ্র মহোদয় বলেন, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অধিকারের ক্ষেত্রে মুসলমানদের একটা আলাদা পদ্ধতি নিসন্দেহে থাকা চাই। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যে তাদের পৃথক সমাজ গঠনের প্রয়োজন নেই। এসব ব্যাপার মুসলিম ও অমুসলিমের ভেদাভেদ নিতান্তই অবান্তর ও কৃত্রিম। এ ক্ষেত্রে অন্য যেসব সম্প্রদায় ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসারে রাজনৈতিক ও সামাজিক

সমস্যাবলীর সমাধানের চেষ্টা করছে, তাদের সাথে মুসলিম জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর নিজ নিজ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য অনুসারে ভিড়ে যাওয়াই বাঞ্চনীয়।

মুসলিম জাতির ঝিমিয়ে পড়া সত্তায় নতুন প্রাণ সঞ্চারের উদ্যোক্তারূপে আবির্ভূত আরেক ভদ্রলোকের অভিমত হলো, আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন এবং কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ আসল জিনিস নয়, বরং জগতের বস্তু নিচয়কে বশীভূত করা, প্রাকৃতিক বিধিসমূহ অবগত হওয়া এবং আইন শৃংখলার শক্তি দিয়ে উক্ত বশীভূত বস্তুনিচয় ও আহরিত বিধিসমূহকে কাজে লাগানোটাই হলো আসল প্রতিপাদ্য বিষয়। এগুলোকে কাজে লাগানোর মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও পরাক্রম লাভ করা সম্ভব। এ ভদ্রলোক বস্তুগত ও বৈষয়িক উন্নতিকেই মানুষের আসল ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করেন। তাই এ উন্নতির সহায়ক উপায় উপকরণগুলোই তাঁর কাছে যথার্থ গুরুত্বের অধিকারী। পক্ষান্তরে জ্ঞান ও বুদ্ধির পশ্চাতে যে মন-মগজ ক্রিয়াশীল এবং যা আপন বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগির নিরীখে উন্নয়নের উপায়-উপকরণসমূহ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, সভ্যতা ও কৃষ্টির উৎকর্ষ ও অগ্রগতির পথ ও পন্থা এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও পরাক্রম লাভের প্রক্রিয়া নির্ণয় করে, সেই মন মগজের কোনো গুরুত্বই তাদের দৃষ্টিতে নেই। সে মস্তিষ্ক জাপানী, জার্মান, বা ইটালিয়ান হোক অথবা তা হোক ওমর ফারুক কিংবা খালেদ বিন ওলীদের মন মস্তিষ্ক, সেটা তাদের আদৌ বিবেচ্য বিষয় নয়। তাদের দৃষ্টিতে এসব একই রকমের "ইসলামী" মন মগজ। কেননা এ সবেরই কার্যক্রম তাদের চোখে একই ফল দর্শায়। অর্থাৎ একই পার্থিব প্রতিষ্ঠা ও পারাক্রম তার দ্বারা অর্জিত হয়। তাদের দৃষ্টিতে "পৃথিবীর উত্তরাধিকার" [অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব] যে পেয়েছে, সেই "ন্যায়নিষ্ঠ ও সৎ", চাই সে ইবরাহীমের মোকাবিলায় নমরূদই হোক। অন্য কথায় বলা যায়, যে ব্যক্তি পরাক্রান্ত ও বিজয়ী সেই "মুমিন", চাই সে হযরত ঈসার মোকাবিলায় রোম সম্রাটই হোক না কেন।

আর একটা বড় গোষ্ঠী মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে ময়দানে নেমেছে। তাদের মতে, মুসলমানদের ধর্ম ও সে ধর্মের বিধিবদ্ধ পারিবারিক আইন সংরক্ষণের আশ্বাস প্রদান, তাদের ভাষাকে বর্ণমালা সমেত অন্যতম সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান এবং একমাত্র ইসলামী বেশভূষা ধারীদেরকেই মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার প্রদান করা হলেই ইসলাম এবং ইসলামী সভ্যতা ও কৃষ্টি সংরক্ষিত হয়। নির্বাচনযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে ও সরকারী চাকুরীতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব তাদের মতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি এরূপ স্থির করে দেয়া হয় যে, মুসলিম প্রতিনিধিদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামের একান্ত ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো নিষ্পত্তি হবেনা, তাহলে তাদের মতে মুসলিম অধিকার যেনো ষোল আনাই আদায় হয়ে গেলো।

দেখলেন তো? বাহ্যিক রূপের কি বিস্তর পার্থক্য, কিন্তু ভেতরের মূল জিনিসটি এর সবকয়টিতে একই থেকে যাচ্ছে। এসরই হচ্ছে ধর্ম সংক্রান্ত সেসব জাহেলী ধ্যান ধারণার বিভিন্ন রূপ মাত্র, যা ইসলামী ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে প্রত্যেক যুগেই নিত্য নতুন আকারে বিদ্রোহ প্রকাশ করে আসছে।

তারা যদি যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন যে, মুসলমান কাকে বলে এবং সত্যিকার অর্থে 'ইসলামী সমাজ বা উম্মাহ' বলতে কোন্ গোষ্ঠীকে বোঝায়, তাহলে তাদের সকল ভুল ধারণার অপনোদন হওয়া সম্ভব। আইনগতভাবে তো যে ব্যক্তি মুখে কলেমা পড়ে এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো মেনে নেয়, সে 'মুসলিম' হিসেবে গণ্য। কিন্তু যিনি এ অর্থে 'মুসলমান' তাঁর মর্যাদা শুধু এতোটুকুই যে, তিনি ইসলামের চৌহদ্দীর ভেতরে আছেন। আমরা তাকে কাফের বলতে পারিনা এবং শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণের কারণে মুসলিম সমাজে তার যেসব অধিকার প্রাপ্য হয়, তা তাকে দিতে অস্বীকারও করতে পারিনা। এটুকুই আসল ইসলাম নয়, বরং কেবলমাত্র ইসলামের সীমানায় প্রবেশের অনুমতিপত্র। আসল ইসলাম হলো এই যে, গোটা মন মানস ইসলামের সাথে গড়ে ওঠবে। তার চিন্তা ভাবনার পদ্ধতি হবে হুবহু কুরআনের চিন্তাপদ্ধতি। জীবন ও তার সকল তৎপরতা ও আচরণের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভংগি হবে অবিকল কুরআনের দৃষ্টিভংগি। কুরআন সকল জিনিসের মূল্যমান নির্ণয়ের যে মানদন্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে, ঠিক সেই মানদন্ডেই সে সকল জিনিসের মান নির্ণয় করবে। তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে অবিকল তাই, যা কুরআন দেখিয়ে দিয়েছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে রকমারি মত ও পথ বর্জন করে তারা একটিমাত্র পথ বেছে নেবে এবং সেই বাছাই করার কাজটাও সম্পন্ন করবে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে যা কুরআন ও রাসূলের পথনির্দেশ থেকে তারা লাভ করেছে।

কোনো মুসলমানের মন মগজকে যদি এটা আকৃষ্ট করতে না পারে এবং কুরআনের মনোভংগির আলোকে তার মনোভংগি গড়ে উঠতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে ইসলামের চৌহদ্দীর মধ্যে ঢুকতে বা বহাল থাকতে কেউ তাকে বাধ্য করেনা। সততা ও বুদ্ধিমত্তার দাবী এই যে, এমতাবস্থায় তাদেরকে ইসলামের চৌহদ্দীর বাইরেই নিজের জন্যে উপযুক্ত স্থান খুঁজে নেয়া উচিত। পক্ষান্তরে তার মন মগজ যদি এ জিনিসটাকে গ্রহণ করে এবং সে নিজের মন মানসিকতাকে কুরআনের মতো করে গড়ে তুলতে চায়, তাহলে কুরআন যাকে মুমিনদের পথ বলে অভিহিত করা হয়েছে, তাথেকে তার মত ও পথ কোনো ব্যাপারেই স্বতন্ত্র বা পৃথক হতে পারেনা।

কুরআনী দৃষ্টিভংগি

ইসলামী মন-মানস বা কুরআন অনুসারী মন-মানস আসলে এক এবং অভিন্ন জিনিস। তা যে বিশেষ জীবন বিধানের আওতাধীন কতিপয় আকীদার ওপর ঈমান আনে, কতিপয় আনুষ্ঠানিক ইবাদাত নির্ধারণ করে, কতিপয় ধর্মীয় রীতিনীতি অবলম্বন করে, ঠিক সেই একই জীবন বিধানের অধীন সে পানাহারের দ্রব্যাদিতে, পরিধানের পোশাক পরিচ্ছদে, পোশাকের ধরন ও আকৃতিতে, সামাজিক রীতিনীতি ও চালচলনের পদ্ধতিতে, বাণিজ্যিক আদান প্রদানে, অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত ও লেন দেনে, রাজনীতির নিয়ম প্রক্রিয়ায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির রকমারি বহিপ্রকাশে, আর বস্তুগত উপায় উপকরণ ও প্রাকৃতিক নিয়ম বিধি সংক্রান্ত জ্ঞান প্রয়োগের বিবিধ কর্মপন্থায় কতোগুলোকে বর্জন ও কতোগুলোকে গ্রহণ করে থাকে। এ সবগুলোর ব্যাপারে যেহেতু

দৃষ্টিভংগি, চিন্তা পদ্ধতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গ্রহণ ও বর্জনের মাপকাঠি এক ও অভিন্ন, তাই জীবন যাপনের পদ্ধতি, চেষ্টা ও তৎপরতার পন্থা এবং পার্থিব জীবনের আচার আচরণের নীতি নিয়ম বিভিন্ন রকমের হতে পারেনা। একথা সত্যি যে, খুঁটিনাটি বিষয়ে বাস্তব কর্মপদ্ধতির বিভিন্নতা ও বৈচিত্র আর নির্দেশমালার ব্যাখ্যায় ও নিত্যদিনের ঘটনাবলীতে মূলনীতির প্রয়োগে কমবেশী মতপার্থক্য ঘটা স্বাভাবিক। একই মস্তিষ্কের চিন্তাধরার রকমারি রূপ পরিগ্রহ করাও বিচিত্র নয়। কিন্তু এ বিভিন্নতা নিছক বাহ্যিক রূপগত বিভিন্নতা, মৌলিক ও উপাদানগত বিভিন্নতা কখনো নয়। যে মূল ভিত্তির ওপর ইসলামে গোটা জীবনের জন্যে পূর্ণাংগ বিধান রচনা করা হয়েছে এবং জীবনের সকল অংশ ও বিভাগকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, তাতে কোনো ধরনের বিভিন্নতার অবকাশ নেই। আপনি ভারতীয় হোন কিংবা তুর্কী, কিংবা মিশরীয়, তাতে কিছু আসে যায়না। আপনি যদি মুসলমান হন, তাহলে আপনাকে এ পূর্ণাংগ বিধান পুরোপুরিভাবে তার অন্তর্নিহিত ভাবধারা সহকারেই গ্রহণ করতে হবে। আর যে কোনো বিধান স্বীয় মূলনীতি ও ভাবধারার বিচারে এ বিধানের বিরোধী হবে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

এখানে আপনার পক্ষে পর্থিব ও ধর্মীয় অংশগুলোকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করাই সম্ভব নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়া ও আখিরাত একই ধারাবাহিক জীবনের দু'টি ধাপ মাত্র। প্রথম ধাপটা হলো চেষ্টা ও কর্মের আর দ্বিতীয়টা কর্মফলের। জীবনের প্রথম ধাপে আপনি দুনিয়াকে যেভাবে গ্রহণ করবেন, পরবর্তী ধাপে সে ধরণের ফলই প্রকাশিত হবে। ইসলামের লক্ষ্য হলো আপনার চিন্তা ও কর্মকে এমনভাবে তৈরী করে দেয়া, যাতে জীবনের এ প্রাথমিক ধাপে আপনি দুনিয়াকে সঠিকভাবে গ্রহণ করেন এবং ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় ধাপে সঠিক ও সুষ্ঠু ফল লাভ করতে পারেন। কাজেই ইসলামে সমগ্র পার্থিব জীবনই 'ধর্মীয় জীবন'। এতে আকীদা বিশ্বাস ও ইবাদাত বন্দেগী থেকে শুরু করে সভ্যতা, কৃষ্টি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির ধারা উপধারা পর্যন্ত সবকিছু একই নৈতিক ও উদ্দেশ্যগত যোগসূত্রে বাঁধা।

আপনি যদি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ইসলামের নির্দেশিত বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করতে চান, তাহলে এটা হবে আংশিকভাবে ইসলামকে পরিত্যাগ করার শামিল, যা শেষ পর্যন্ত ইসলামকে পূরোপূরিভাবে পরিত্যাগ করার পর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়ে থাকে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনি ইসলামের শিক্ষাগুলোকে যাচাই বাছাই করে তার কতককে গ্রহণ ও কতককে বর্জন করলেন। ইসলামের আকিদা বিশ্বাস ও মৌলিক ইবাদাতসমূহকে তো আপনি গ্রহণ করেছেন আর এসব ইবাদতের ভিত্তিতে যে সর্বব্যাপী জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রথমত এ যাচাই বাছাই করাটাই ইসলামের দৃষ্টিতে ভুল। ইসলামের প্রতি যথার্থভাবে ঈমান রাখে এমন কোনো মুসলমান এ ধরনের কাজে প্রবৃত্ত হতেই পারেনা। কেননা তাহলে আল্লাহ যে সূরা বাকারার ৮৫ আয়াতে বলেছেন ঃ

"তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ করবে অস্বীকার?"

সেই কথাটাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি এ যাচাই বাছাই করে আংশিক ইসলামকে গ্রহণ করে ইসলামের গন্ডীর মধ্যে টিকে থাকারও সংকল্প নেন, তাহলেও আপনি এ গন্ডীর ভেতর বিশী দিন টিকে থাকতে পারবেননা। কারণ বাস্তব জীবন যাপন পদ্ধতির সাথে সংশ্রবহীন হওয়ার পর ইসলামী আকীদা ও ইবাদত সবই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। ওসবের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। অনৈসলামিক জীবনাদর্শের ওপর ঈমান আনার পর কুরআনের ওপর ঈমান বজায় থাকতেই পারেনা। কেননা কুরআন তো প্রতি পদে পদে ওসব বাতিল জীবনাদর্শকে খন্ডন করে।

পক্ষান্তরে আপনি যদি ইসলামী বিধান অনুসারে নিজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করতে চান, তাহলে আপনার আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত হবার দরকার নেই। একই দল অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দল এসব কাজের জন্যে যথেষ্ট। কেননা এখানে পুঁজিপতি ও শ্রমিক, ভূস্বামী ও চাষী, শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই। বরং তাদের মধ্যে সমন্বয় ও অংশীদারীত্ব সৃষ্টিকারী মূলনীতি বিদ্যমান। এসব মূলনীতি অনুসারে আপন জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংহতি ও সমন্বয় সৃষ্টির চেষ্টা আপনি কেন করবেননা? যাদের কাছে এসব মূলনীতি নেই, তারা যদি অনন্যোপায় হয়ে শ্রেণী সংগ্রামের আগুনে ঝাঁপ দেয়, তাহলে আপনিও সেই আগুনে ঝাঁপ দেবেন কোন্ কারণে?

অনুরূপভাবে আপনি যদি বস্তুগত উন্নতি চান, পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চান, তাহলে ইসলাম নিজেই এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তবে সে শুধু এটুকু চায় যে, আপনি ফেরাউন ও নমরূদের পরাক্রম এবং মূসা ও ইবরাহীমের পরাক্রমের মধ্যে যেনো পার্থক্য করেন। আজকের জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ড পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আবার সাহাবায়ে কিরাম এবং ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোর মুসলমানরাও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। দুটোই প্রতিষ্ঠা এবং দুটোই পার্থিব উপায় উপকরণকে করায়ত্ব করা, প্রয়োগ ও ব্যবহার করা এবং প্রাকৃতিক নিয়ম সংক্রান্ত জ্ঞান ও তা কাজে লাগানোরই ফসল। কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভংগিতে আকাশ পাতাল ব্যাবধান। এ উভয় ফসলের বাহ্যিক এবং একেবারেই আপাত দৃশ্যমান সাদৃশ্য আপনার চোখে পড়ছে। অথচ উভয়ের মধ্যে মৌলিক ও নৈতিক দিক দিয়ে যে সুমেরু কুমেরুর ব্যবধান বিরাজমান, তা আপনার নজরে আসছেনা। দুনিয়া পূজারীদের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা প্রাকৃতিক উপায় উপকরণ করায়ত্ব করণের এমন এক প্রক্রিয়ার ফল, যার মূলে সক্রিয় রয়েছে জীবনের পাশবিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে যে ধরনের প্রতিষ্ঠা ও পরাক্রমের প্রতিশ্রুতি কুরআন দিয়েছে যদিও সেটি পার্থিব উপায় উপকরণ করায়ত্ব করা ও প্রয়োগ করার দ্বারাই অর্জিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু তার গভীরে জীবনের উচ্চতম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য বর্তমান থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস যতক্ষণ পূরোপুরিভাবে বদ্ধমূল না হয় এবং নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের সাহায্যে যে লৌহ বেষ্টনীকে অধিকতর মজবুত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার অধীন জীবনের সকল কার্যকলাপ ও চেষ্টা সাধনা নিয়ন্ত্রিত না হয়, ততক্ষণ সেই উচ্চতম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের উপস্থিতি নিশ্চিত

করা অসম্ভব। অথচ ইসলামের উক্ত বুনিয়াদী স্তম্ভগুলোকে আপনারা 'মোল্লা-মৌলবীদের ভ্রান্ত ধর্ম বিশ্বাসে'র উদ্ভট আবিষ্কার বলে আখ্যায়িত করে থাকেন!

২. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজন কেন?*

আমরা আগেই একথা পরিষ্কার করে বলেছি, মুসলমানরা যদি মুসলমান হিসেবে জীবনযাপন করতে চায়, তবে তাদের নিজেদের গোটা জীবনকে আল্লাহ্র আনুগত্যের অধীন করে দিতে হবে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের সকল বিষয়ের ফায়সালা কেবলমাত্র আল্লাহর আইন ও শরীয়াহ মোতাবেক করতে হবে, এছাড়া দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই। আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান পোষণ করার ঘোষণা করবেন আর জীবনের সামগ্রিক বিষয়াদি পরিচালনা করবেন আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যদের আইন অনুযায়ী, ইসলাম কোনো অবস্থাতেই এমনটি বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত নয়। এর চাইতে বড় স্ববিরোধিতা আর কিছু হতে পারেনা। এই স্ববিরোধিতাকে বরদাশ্‌ত করার জন্যে নয়, নির্মূল করার জন্যে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আমরা যে ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসনতন্ত্র দাবী করছি, তার পেছনে এই অনুভূতিই কাজ করছে যে, মুসলমান যদি আল্লাহর আইনই মেনে না চলে, তবে তো তার মুসলমান হবার দাবীই সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। গোটা কুরআনই এই নির্জলা সত্য কথাটির প্রমাণ ঃ

১. কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ই সমস্ত জগত ও সাম্রাজ্যের মালিক। তিনি স্রষ্টা, সৃষ্টিজগত তাঁর। তাই স্বাভাবিকভাবেই শাসনের অধিকার [Right to Rule] কেবল তাঁরই থাকা উচিত। তাঁর রাজ্যে [Dominion] তাঁর সৃষ্টির উপর তাঁর ছাড়া অপর কারো শাসন সার্বভৌমত্ব চলা মূলতই ভ্রান্ত। সঠিক পন্থা কেবল একটিই। তাহলো, তাঁর খলীফা ও প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর প্রদত্ত আইন ও বিধান অনুযায়ী শাসন পরিচালিত হবে এবং কার্যসম্পাদিত হবে। তাঁর অকাট্য ঘোষণা হলো ঃ

ক. বলো ঃ হে সাম্রাজ্য ও সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে চাও রাজ্যক্ষমতা দান করো। আর যার কাছ থেকে ইচ্ছে ক্ষমতা কেড়ে নাও। [সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬]

খ. তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রভু প্রতিপালক। গোটা সাম্রাজ্য তাঁর। [সূরা ফাতির ঃ ১৩]

গ. রাজত্বে তাঁর কোনো অংশীদার [Partner] নেই। [সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১১]

ঘ. সুতরাং সমস্ত কর্তৃত্ব সমুচ্চ মহান আল্লাহ্র । [সূরা আল মুমিন ঃ ১২]

ঙ. তিনি তাঁর কর্তৃত্বে কাউকেও অংশীদার বানাননা। [সূরা আল কাহাফ ঃ ২৬]

চ. সাবধান! সৃষ্টি তাঁর, কর্তৃত্বও তাঁর। [সূরা আ'রাফ ঃ ৫৪]

ছ. ওরা জিজ্ঞেস করছে ঃ 'কর্তৃত্বে আমাদেরও অংশ আছে কি?' বলো ঃ কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্যে নির্দিষ্ট। [সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৪]

---

* 'এক আহম ইস্তেফতা' পুস্তক থেকে এ অংশ নেয়া হয়েছে।

২. এই মূলনীতির ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের অধিকার মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। কারণ, মানুষ তো হলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং তাঁর রাজত্বের প্রজা। তাঁর দাস এবং তাঁর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধীন। তাই মানুষের কাজ হলো কেবল তার স্রষ্টা রাজাধিরাজের আইন মেনে চলা। এক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত আইনের সীমার মধ্যে অবস্থান করে ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে প্রাসংগিক বিধি প্রণয়নের নিয়ন্ত্রিত অধিকারই কেবল মানুষের রয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল যেসব বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও সরাসরি কোনো হুকুম প্রদান করেননি, সেসব ক্ষেত্রেও শরীয়তের প্রাণসত্তা এবং ইসলামের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল বিধি প্রণয়নের অধিকারও মুমিনদের দেয়া হয়েছে। কেননা এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রসূলের সরাসরি কোনো বক্তব্য না থাকাটাই একথার প্রমাণ যে, এসব ক্ষেত্রে নিয়ম বিধি প্রণয়নের আইনগত অধিকার মুমিনদের দেয়া হয়েছে। কিন্তু যে মৌলিক কথাটি সূর্যালোকের মতো সম্মুখে স্পষ্ট থাকতে হবে. তাহলো, আল্লাহ প্রদত্ত আইনের আওতামুক্ত হয়ে যে ব্যক্তি বা সংস্থা নিজেই স্বাধীনভাবে কোনো আইন প্রণয়ন করবে, কিংবা অপর কারো রচিত আইন মেনে চলবে, সে তাগুত, বিদ্রোহী এবং খোদার আনুগত্য থেকে বিচ্যুত। আর এমন ব্যক্তির কাছে যে-ই ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত চাইবে এবং তার প্রদত্ত ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত মেনে নেবে সেও বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী। এসব ফায়সালা স্বয়ং আল্লাহর ঃ

ক. আর তোমাদের মুখ যেসব জিনিসের কথা উচ্চারণ করে, সেসব বিষয়ে তোমরা মনগড়াভাবে বলোনা যে, এটা হালাল [Lawfull] আর এটা হারাম [Unlawfull]। [সূরা আন নহল ঃ ১১৬]

খ. তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যাকিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তারই অনুসরণ করো। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো [মনগড়া] কর্তা ও পৃষ্ঠপোষকের অনুসরণ করোনা। [সূরা আ'রাফ ঃ ৩]

গ. আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী যারা ফায়সালা করেনা, তারা কাফির। [সূরা আল মায়িদা ঃ ৪৪]

ঘ. হে নবী! তুমি সেইসব লোকদের দেখনি যারা মুখেতো সেই হিদায়াতের প্রতি ঈমান এনেছে বলে দাবী করে যা তোমার এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে? কিন্তু তারা নিজেদের যাবতীয় বিষয়ে ফায়সালা করিয়ে নিতে চায় তাগুতদের দিয়ে! অথচ তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তাগুতকে অস্বীকার করতে। [সূরা আন নিসা ঃ ৬০]

৩. বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ্ তা'য়ালার এই পৃথিবীতে সঠিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা কেবল সেটাই, যা তাঁর নবী রসূলদের মাধ্যমে প্রেরিত আইনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এরি নাম হলো, খিলাফত। কুরআন বলে ঃ

ক. আমি যে রসূলকেই পাঠিয়েছি, এজন্যেই পাঠিয়েছি, যেনো আল্লাহ্‌র নির্দেশের ভিত্তিতে তার আনুগত্য করা হয়। [সূরা আননিসা ঃ ৬৪]

খ. হে নবী! পূর্ণ সত্যতার সাথে আমরা এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে আল্লাহ্‌র দেখানো সত্যালোকের মাধ্যমে তুমি মানুষের মধ্যে ফায়সালা করতে পারো। [সূরা আননিসা ঃ ১০৫]

গ. আর আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী তুমি তাদের মাঝে ফায়সালা করো। তাদের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করোনা। সাবধান থেকো, তারা যেনো তোমাকে ফিতনায় নিমজ্জিত করে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান থেকে এক বিন্দুও বিভ্রান্ত করতে না পারে। [সূরা আল মায়িদা ঃ ৪৯]

ঘ. তারা কি জাহিলিয়াতের শাসন ফায়সালা চায়। [সূরা আল মায়িদা ঃ ৫০]

ঙ. হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি। সুতরাং তুমি লোকদের মধ্যে সত্যের ভিত্তিতে শাসন চালাও। ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করোনা। তাহলে তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। [সূরা সোয়াদ ঃ ২৬]

৪. পক্ষান্তরে এমন প্রতিটি রাষ্ট্র ও বিচার ব্যবস্থাই খোদাদ্রোহী, যার ভিত্তি বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ্ তা'য়ালার নবী রসূলদের আনীত আইনবিধানের পরিবর্তে অপর কারো রচিত আইনবিধানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এসব রাষ্ট্র ও আদালতের ধরন প্রকৃতির মধ্যে যতোই বিভিন্নতা থাকুকনা কেনো, তাতে কিছু যায় আসেনা। এগুলোর সমস্ত কর্মকান্ড ভিত্তিহীন, বৈষম্যপূর্ণ ও ভ্রান্ত। শাসন পরিচালনা এবং রায় প্রদানের মূলতই তাদের কোনো বৈধ ভিত্তি নেই। রাজ্যও সাম্রাজ্যের প্রকৃত মালিকই যখন তাদেরকে Charter প্রদান করেননি, তখন কী করে তাদের রাষ্ট্র ও আদালত পরিচালনা বৈধ হতে পারে?[১] তারা যা কিছু করছে, আল্লাহ্‌র আইনের দৃষ্টিতে তাতো সবই নাস্তি। মুমিনরা [আল্লাহ্‌র অনুগত প্রজা] তাদের অস্তিত্বকে একটি Defacto হিসেবে স্বীকার করতে পারে, কিন্তু একটি Dejure হিসেবে স্বীকার করতে পারেনা। নিজেদের প্রকৃত মালিক [আল্লাহ্]-র বিদ্রোহীদের আনুগত্য করা এবং তাদের কাছে নিজেদের বিষয়াদির ফায়সালা চাওয়া মুমিনদের কাজ নয়। যদি কেউ এমনটি করে, তবে নিজেকে মুমিন ও মুসলিম দাবী করা সত্ত্বেও সে আল্লাহ্‌র অনুগতদের দল থেকে বিচ্যুত। একথা সরাসরি বিবেক বুদ্ধির সাথেও সাংঘর্ষিক যে, কোনো সরকার একটি গোষ্ঠীকে বিদ্রোহী বলেও আখ্যায়িত করবে, আবার স্বীয় প্রজাদের উপর সেই বিদ্রোহীদের কর্তাগিরি করাকেও বৈধ বলে মেনে নেবে এবং প্রজাদেরকে তাদের শাসন মেনে চলারও অনুমতি দেবে! দেখুন কুরআন কি বলে ঃ

---

১. এমন সরকার ও আদালতই বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তা'য়ালার Charter লাভ করে, যারা তাঁকেই বিশ্বজগতের মালিক এবং নিজেদেরকে তার খলীফা [প্রতিনিধি, স্বাধীন নয়] মনে করে, তাঁর প্রেরিত নবী রসূল ও কিতাবকে স্বীকার করে এবং তাঁর প্রদত্ত শরীয়ার অধীনে থেকে কাজ করতে নিজেদেরকে বাধ্য মনে করে। স্বয়ং কুরআনেই এ Charter প্রদান করা হয়েছেঃ "তাদের মধ্যে শাসন ফায়সালা করো আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী" [আল মায়িদা ঃ ৪৯]। Charter প্রদান বলতে আমরা এখানে একথাই বুঝিয়েছি।

ক. হে নবী, তাদের বলো ঃ আমরা কি তোমাদের বলবো, নিজেদের আমলের দিক থেকে সবচে' ব্যর্থ ও অসফল লোক কারা? তারা হলো সেইসব লোক, পার্থিব জীবনে যাদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনা বিপথগামী হয়েছে। [অর্থাৎ মানুষের চেষ্টাসাধনার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যান্য উদ্দেশ্য হাসিলের পথে ধাবিত হয়েছে।] অথচ, তারা মনে করছে যে তারা দারুণ ভালো কাজ করছে। এরা হলো সেইসব লোক, যারা তাদের মালিকের আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর নিকট উপস্থিত হবার বিষয়টিও বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের যাবতীয় আমল নিষ্ফল [শূণ্য] হয়ে গেলো। কিয়ামতের দিন আমরা তাদের কোনো গুরুত্বই দেবনা। [সূরা আল কাহাফ ঃ ৩-৫]

খ. এ হচ্ছে আ'দ [জাতি], যারা তাদের প্রভুর বিধান মানতে অস্বীকার করেছিলো এবং তাঁর রসূলদের আনুগত্য পরিহার করেছিলো আর অনুগামী হয়েছিলো সত্যদীন অমান্যকারী প্রত্যেক দাম্ভিক দুর্দন্ড দুশমনের। [সূরা হুদ ঃ ৫৯]

গ. আমরা আমাদের নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ মূসাকে ফিরাউন আর তার রাজন্যবর্গের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা ফিরাউনের নির্দেশেরই অনুগামী হলো, অথচ ফিরাউনের নির্দেশ সঠিক ছিলোনা [অর্থাৎ বিশ্বসম্রাটের হুকুমের অনুগামী ছিলোনা]। [সূরা হুদ ঃ ৯২]

ঘ. এমন কোনো ব্যক্তির আনুগত্য করোনা, যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে [অর্থাৎ আমি যে তার প্রকৃত মালিক ও মনিব এ অনুভূতি থেকে] গাফিল করে দিয়েছি এবং যে স্বীয় কামনা বাসনার অনুগামী হবার নীতি গ্রহণ করেছে আর যার কর্মনীতিই সীমালংঘণমূলক। [সূরা আল কাহাফ ঃ ২৮]

ঙ. হে মুহাম্মদ! বলো, আমার প্রভু অশ্লীলতাকে তার গোপনীয় ও প্রকাশ্য সকল দিক সমেত, পাপ কাজকে, অন্যায়ভাবে পরস্পরের প্রতি বাড়াবাড়ি করাকে এবং আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণ ছাড়াই কাউকেও আল্লাহ্‌র [কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে] প্রতিপক্ষ বানানোকে হারাম করে দিয়েছেন। [সূরা আল আ'রাফ ঃ ৩৩]

চ. আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা যাদের দাসত্ব করছো, তারাতো কতগুলো নাম ছাড়া আর কিছু নয়, যে নাম তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরা নিজেরাই রেখেছিলে। আল্লাহ্ সেগুলোর সপক্ষে কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। সার্বভৌম ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র। তাঁর নির্দেশ হলো, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো গোলামী করোনা। [সূরা ইউসুফ ঃ ৪০]

ছ. সঠিক পথ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেবার পরও যে ব্যক্তি রসূলের সাথে বিরোধ করবে এবং মুমিনদের নীতি আদর্শের বিপরীত পথে চলবে, তাকে আমরা সেদিকে চালাবো, যেদিকে সে নিজেই মোড় নিয়েছে। আর তাকে আমরা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো, যা খুবই নিকৃষ্ট স্থান। [সূরা আননিসা ঃ ১১৫]

জ. তোমার প্রভুর শপথ [হে মুহাম্মদ], তারা কিছুতেই মুমিন হতে পারেনা, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পারিক বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে তোমাকে বিচারপতি মেনে নেবে। [সূরা আন নিসা ঃ ৬৫]

ঝ. যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সেদিকে এসো এবং রসূলের নীতি গ্রহণ করো, তখন তুমি এই মুনাফিকদের দেখতে পাবে, তারা তোমার কাছ থেকে কেটে পড়ছে। [সূরা আননিসা ঃ ৬১]

ঞ. আর তিনি কাফিরদের [অর্থাৎ তাঁর রাজত্বের বিদ্রোহীদের] জন্যে মুমিনদের [তাঁর অনুগতদের] উপর জয়লাভ করার কোনো পথই খোলা রাখেননি। [সূরা আন নিসা ঃ ১৪১]

এগুলো হলো কুরআনের অকাট্য সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী। এগুলোতে সন্দেহ সংশয়ের কেনো অবকাশ নেই। আর এই হলো সেই কেন্দ্রীয় আকীদা বিশ্বাস, যার উপর ইসলামের চিন্তাদর্শন, নৈতিক চরিত্র ও সমাজ সভ্যতার ভিত স্থাপন করা হয়েছে। আর মুসলমানরা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঈমানের দাবী পূরণ করতে পারেনা, যতক্ষণ না তারা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। আল্লাহ্‌র আইনের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা ছাড়া মুসলমানরা মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে পারেনা। তাই তাদের দীন ও ঈমানের দাবীই হলো ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা [খিলাফত] প্রতিষ্ঠিত করা এবং নিজেদের যাবতীয় বিষয়াদি আল্লাহ্‌র আইনের ভিত্তিতে মীমাংসা ও পরিচালিত করা। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যেই নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন। সে জন্যেই তো হিজরতের পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানীতে এই দোয়া করানো হয়েছে ঃ

"প্রার্থনা করো ঃ প্রভু, আমাকে যেখানেই নিয়ে যাবে সত্যতার সাথে নিয়ে যেয়ো। আর যেখান থেকেই বের করবে সত্যতার সাথেই বের ক'রো। আর তোমার পক্ষ থেকে একটি ক্ষমতাসীন কর্তৃত্বকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।" [সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮০]

অর্থাৎ, হয় আমাকেই ক্ষমতা দান করো, নয়তো অপর কোনো রাষ্ট্রকে আমার সাহায্যকারী বনিয়ে দাও, যেনো আমি তার ক্ষমতার সাহায্য নিয়ে বিশ্বের এই মাহাবিপর্যয়কে প্রতিরোধ ও সংশোধন করতে পারি। যেনো অশ্লীলতা ও পাপের এই প্লাবনের মোকাবিলা করতে পারি। যেনো তোমার সুবিচারপূর্ণ আইনকে কার্যকর করতে পারি। হাসান বসরী এবং কাতাদা [র] এ আয়াতের এই তাফসীরই করেছেন। ইবনে কাসীর এবং ইবনে জরীরের মতো মর্যাদাবান মুফাসসিরগণও এ মতই প্রকাশ করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসটিও এ ব্যাখ্যারই সমর্থন করে। তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহ্ রাষ্ট্র ক্ষমতার সাহায্যে সেইসব জিনিসও বন্ধ করে দেন, যা কেবল কুরআন দ্বারা বন্ধ হয়না।"

এ থেকে প্রমাণ হলো, ইসলাম বিশ্বে যে সংস্কার সংশোধন চায়, তা শুধুমাত্র উপদেশ নসীহতের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারেনা। তা কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্রক্ষমতাও

অপরিহার্য। তাছাড়া আল্লাহ্ নিজেই যখন তার নবীকে এই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, তখন তা থেকে তো একথা পরিষ্কারভাবেই প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ্র দীনকে প্রতিষ্ঠা করা, তাঁর শরীয়াকে কার্যকর করা এবং তার আইন ও বিধানকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা পেতে চাওয়া এবং তা পাওয়ার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম করা যে শুধু জায়েয তাই নয়, বরঞ্চ কাম্য এবং মংগলজনকও বটে। যারা এই কাজকে দুনিয়া পূজা বা দুনিয়াদারী বলে মনে করে, তারা সাংঘাতিক ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত। তবে একথা সত্য, যদি কেউ নিজের জন্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চায়, তবে তা নিসন্দেহে দুনিয়া পূজা। কিন্তু ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা পেতে চাওয়া কোনোক্রমেই দুনিয়া পূজা হতে পারেনা। বরঞ্চ আল্লাহ্র গোলামী করার প্রকৃত দাবীই এটা।

৩. ইসলাম ও কর্তৃত্ব[১]

এ যাবতকার আলোচনা থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার কথা সুস্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন কারণে ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করণের শয়তানী দর্শন স্বয়ং মুসলমানদের মন মগজকেও প্রভাবিত করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে তারা এই বিভক্তির সপক্ষে অবকাশ সৃষ্টির অপচেষ্টা করছে, সেজন্যে এখন আমরা খতিয়ে দেখবো, আসলে ইসলাম কোন্ ধরনের বিপ্লব সংঘটিত করতে চায় আর এ ব্যাপারে যেসব ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রচার করা হচ্ছে সেগুলোর উৎস কোথায়? সূরা বাকারার ১৯৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

> "যতক্ষণ ফিতনার অবসান না ঘটে এবং দীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে না হয়ে যায় ততক্ষণ তদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাও। এরপর যদি তরা ক্ষ্যান্ত হয় তাহলে যালেমদের ওপর ছাড়া আর কারো ওপর বাড়াবাড়ি করা বৈধ নয়।"

তাফহীমুল কুরআনে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, "ক্ষ্যান্ত হওয়ার অর্থ কাফিরদের শিরক ও কুফরী পরিত্যাগ করা নয়, বরং ফিতনা থেকে ক্ষ্যান্ত হওয়া।" কাফির, মুশরিক, নাস্তিক প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে, যার যা ইচ্ছা আকীদা পোষণ করুক, যার খুশী পূজা উপাসনা করুক অথবা একেবারেই কারো পূজা উপাসনা না করুক। এ ভ্রষ্টতা থেকে তাকে বের করে আনার জন্য আমরা তাকে বুঝাবো এবং উপদেশ দেবো ঠিকই, কিন্তু তার সাথে লড়াইতে লিপ্ত হবোনা। তবে এ অধিকার তার কখনো নেই যে, আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র আইনের পরিবর্তে নিজের বাতিল আইন চালু করবে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করবে।

"তরবারী দিয়েই এ ফিতানার উচ্ছেদ ঘটাতে হবে এবং কাফিররা যতক্ষণ তাদের বর্তমান আচরণ থেকে বিরত না হবে, ততক্ষণ মুমিনরা অস্ত্র সংবরণ করবেনা।"

---

১. এ নিবন্ধটি তরজমানুল কুরআন ১৯৪২ইং সেপ্ট-নভেম্বর সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

তফসীরের এ রেখাচিহ্নিত অংশটুকু সম্পর্কে তরজুমানুল কুরআনের পাঠকবর্গের মধ্য থেকে জনৈক বিদ্বান ব্যক্তি নিম্নরূপ আপত্তি তুলেছেন ঃ

"ক. এর মানে হলো, ইসলাম যা কিনা শান্তি ও নিরাপত্তার সমর্থক, সে অন্যদের ধর্মে হস্তক্ষেপ এবং সে জন্য লড়াইয়ের অনুমতি দেয়। অথচ এ কাজটা সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতের لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ "ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই"-এর বিপরীত।

খ. ইসলাম বিরোধীদের নিজ নিজ ধর্ম ও আকীদা বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকার স্বাধীনতা সূরা কাফিরুনের শেষ আয়াত ঃ

"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম।"

এ থেকেও সুস্পষ্ট, যে ব্যক্তি আকীদা ও বিশ্বাসে স্বাধীন, তার সে আকীদা বিশ্বাস প্রচার করারও স্বাধীনতা থাকা উচিত, কেননা সে ঐসব আকীদাকেই সঠিক মনে করে। কুরআনের বক্তব্য থেকে এ স্বাধীনতার সমর্থন পাওয়া যায় এবং পারস্পরিক বিতর্কেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ঃ

"সর্বোত্তম পন্থায় ব্যতীত আহলে কিতাবের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়োনা।" [সূরা আনকাবূত ঃ ৪৫]

তাদের উপাসনালয় এবং উপাসনা পদ্ধতি ইসলামের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকেছে। এমনকি মসজিদে নববীতে পর্যন্ত আহলে কিতাবকে নিজস্ব পদ্ধতিতে উপাসনা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। মিসরের শাসক আযীয যার আকীদা ও কার্যকলাপ মুশরিকদের মতো ছিলো- হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম তার চাকরি করেছিলেন।

অবশ্য তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে ইসলামের প্রচার চালিয়ে গেছেন। যেমন সূরা ইউসুফের ৩৯ নং আয়াত ঃ

"হে আমা কারাগারের সাথীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রভু থাকা ভালো, না এক, অদ্বিতীয় ও মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্ ভালো?"

এ থেকে বুঝা যায় যে, এভাবে অন্যদেরও নিজ নিজ ধ্যান ধারণা প্রচার করার অধিকার রয়েছে।

গ. রেখাচিহ্নিত কথা কয়টির আলোকে মুসলমানরা কোথাও মিশ্র জনবসতিতে নিরুপদ্রব জীবন যাপন করতে পারেনা। অমুসলিমরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়েও মুসলমানদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও উদার নীতির ভিত্তিতে আচরণ করবে কোন্ কারণে, যখন তাদের রাজনৈতিক ও মৌলিক আকীদাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়? এ ধরনের মুসলমানরা ইরান ও তুরস্কে বসবাস করলেও আপনার কথামতো তাদেরকে সেখানেও জিহাদের পতাকা উত্তোলন করতে হবে। কেননা সেসব দেশে ইসলামের আইন ও ফৌজদারী বিধি চালু নেই। এযুগে বিশ্বরাজনীতি এমন ধারায় প্রবাহিত যে, কোনো দল অস্বাভাকি ও অপ্রচলিত পন্থায় অমুসলিমদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও লেনদেন চালাতে পারেনা। কেননা আপনার কথিত যুক্তি যে কোনো ধরনে যৌথ কর্মকান্ডের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। মুসলিম জনগোষ্ঠী যদি স্বীয় আকীদা বিশ্বাস প্রচার করার অধিকারী হয়, তাহলে অমুসলিমদেরকেও সে অধিকার

দিতে হবে, বিশেষত তারা যদি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। যে জিনিস নিজের জন্য পছন্দ নয়, তা অন্যের জন্য পছন্দ করোনা। রসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার ইহুদী জনগোষ্ঠীর সাথে পারস্পরিক আচরণবিধি স্থিরপূর্বক যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, সে চুক্তি এ ধরনের শর্তের ভিত্তিতেই সম্পাদিত হয়েছিলো? মক্কী জীবনের প্রাথমিক স্তরটা আপনার যুক্তির পক্ষে নয়। অন্য কথায়, একটি অমুসলিম সরকারের জন্য এ ধরনের জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব একটা প্রকাশ্য হুমকি, যে জনগোসী সুযোগ পেলেই ঐ সরকারের আইন ও শাসন ব্যবস্থা উৎখাত করার জন্য অস্ত্র ধারণ করবে। তাদেরকে কে বরদাশ্ত করবে?"

এ আপত্তির সংক্ষিপ্ত জবাব কয়েকটি মাত্র বাক্যে দিয়েও দেয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ আপত্তিটার মূলে রয়েছে ভুল বুঝাবুঝির এক বিরাট স্তূপ। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণাসমূহ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি এর ফলে মুসলিম জনগণ সামগ্রিকভাবে নিজেদের ধর্মের মৌলিক দাবী বুঝতেও অক্ষম হচ্ছে। এজন্য এখানে ব্যাপারটা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো।

ইসলামী মিশন

ইসলাম শান্তির ধর্ম কোন্ অর্থে? لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ এবং لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ এর প্রকৃত মর্ম কি? আর হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের লক্ষ্য নবুয়্যতের দায়িত্ব পালন করা ছিলো নাকি জীবিকার অন্বেষণ করা? সেসব আলোচনা পরে করা যাবে। এসব বিষয়ের আগে যে প্রশ্নের সমাধান হওয়া প্রয়োজন তাহলো, পৃথিবীতে ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? স্বৈরাচারী লোকেরা যাতে মানুষের ঘাড়ে চড়াও হতে পারে, তারই সুবিধা করে দেয়ার জন্য মানুষকে তৈরী করতে কি ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিলো? এক একজন স্বৈরাচারী একনায়ক যখনই পৃথিবীতে আপন প্রভুত্ব কায়েম করতে আসবে, তখন ইসলামের অনুসারীদেরকে যাতে নিজের অনুগত ভৃত্য হিসেবে পেতে পারে, সেজন্যই কি ইসলাম এসেছিলো? সে কি সারা পৃথিবীর সরকারসমূহের ও সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য শান্তিপ্রিয় প্রজা সংগ্রহ করে দেয়ার ইজারা নিয়েছিলো যে, যেকোনো ধরনের মতাদর্শের অনুসারী শাসকরা নিজেদের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার জন্য ইসলামের কারখানা থেকে তৈরী যন্ত্রাংশ পেয়ে কৃতার্থ হবে? ইসলামের কাজ কি শুধু এই যে, কিছু মৌলিক আকীদা ও নৈতিক আদর্শ শিক্ষা দিয়ে মানুষকে এতটা বিনয়াবনত ও নমনীয় করে গড়ে তুলবে যাতে সে সকল ধরনের সমাজ ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে? ব্যাপার যদি সত্যি তাই হয়, তাহলে ইসলাম বৌদ্ধ ধর্ম ও সেন্ট পলের গড়া খৃষ্ট ধর্ম থেকে পৃথক কিছু নয়। আর তেমনটি হলে এটা আমাদের জন্য দুর্বোধ্য যে, এমন ধর্মের গ্রন্থে قَاتِلُوْهُمْ [তাদের সাথে লড়াই কর]-এর মতো ভয়ংকর শব্দ উচ্চারণই বা হলো কেমন করে? এরতো নিজের অনুসারীদেরকে জিহাদ ও যুদ্ধের নির্দেশ দেয়ার পরিবর্তে শত্রুদেরকেই এবলা উচিত ছিলো :

"আমরা হতভাগাদের তোমরা কেন মারছ? আমরা শাসন ব্যবস্থায় কোনো বিপ্লবও আনতে চাইছিনা, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায়ও কোনো রদবদল ঘটাতে চাইছিনা। ক্ষমতা

যার হাতেই থাক, তার অধীনে শান্তশিষ্ট নাগরিক হিসেবে বাস করাই আমাদের নীতি এবং ক্ষমতাশীন সরকারের আনুগত্যই আমাদের ঈমান ও ধর্ম। এমতাবস্থায় আমাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা পোষণের কি কারণ থাকতে পারে? আমাদের ধর্ম বিশ্বাস ও পূজা উপাসনার রীতি প্রথা নিয়ে আপত্তি? কিন্তু এতে তোমাদের অসুবিধা কি? তোমাদের কোন্ সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং কোন্ স্বার্থ আমাদের পূজা উপাসনায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

এ জবাব যদি যথার্থ লাগসইভাবে দেয়া হতো এবং কার্যত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীগণ আনুগত্য সহকারে সমাজ সেবার কাজ চালিয়ে যেতেন, তাহলে মক্কার মুশরিকরা আমাদের ইংরেজ প্রভুদের তুলনায় এতো বেশী গোঁয়ার ও কান্ডজ্ঞানহীন ছিলোনা যে, মসজিদে আযান ও নামাযের স্বাধীনতা এবং ধর্ম প্রচারণামূলক সমিতি ইত্যাদি করার স্বাধীনতাও দিতোনা।[১]

কিন্তু বাস্তব ব্যাপার যদি সেরকম না হয়ে থাকে, বরং ইসলামের যদি নিজস্ব জীবন ব্যবস্থা যাতে আকীদা বিশ্বাস এবং আখলাক ও ইবাদাতের পাশাপাশি ব্যক্তিগত কর্মকান্ড ও সামষ্টিক জীবনের যাবতীয় তৎপরতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধি নির্দেশ থেকে থাকে, যদি ইসলামের আহবান তার সমগ্র জীবন ব্যবস্থার দিকে হয়ে থাকে এবং যদি তার দাবী এই হয়ে থাকে যে, একমাত্র তার জীবন ব্যবস্থাই সত্য ও নির্ভুল এবং একমাত্র তাতেই মানুষের সঠিক কল্যাণ নিহিত, আর এছাড়া অন্য প্রত্যেকটি জীবন ব্যবস্থাই বাতিল ও ভ্রান্ত, তাহলে এসবের সাথে সাথে এটাও অনিবার্য হয়ে উঠে যে, ইসলাম পৃথিবীতে নিজের জীবন ব্যবস্থাকে বিজয়ী এবং অন্য সকল ব্যবস্থাকে পরাভূত করার দাবী জানাবে। একটি জীবন ব্যবস্থাকে সত্য ও সঠিক বলে দাবী করার পর কার্যত তা প্রতিষ্ঠিত করার দাওয়াত না দেয়া একটা সম্পূর্ণ অর্থহীন ব্যাপার। আর এর চেয়েও অর্থহীন ব্যাপার হলো, অন্যান্য জীবন ব্যবস্থাকে বাতিলও বলা হবে আবার তার বিজয়কেও বরদাশ্‌ত করা হবে। তাছাড়া একটা জীবন ব্যবস্থার অধীন বসবাস করে আর একটা জীবন ব্যবস্থার অনুকরণ ও অনুসরণ করা একেবারেই অসম্ভব। তাই একই সময় নিজের উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থার অনুকরণেরও দাবী জানানো আবার সেই সাথে অন্য ব্যবস্থার অধীন শান্তিপূর্ণ ও আনুগত্যপূর্ণ জীবন যাপনের শিক্ষা দেয়া একজন উন্মাদের পক্ষেই সম্ভব।

সুতরাং ইসলাম যদি নিজের বিশেষ ধাঁচের জীবন ব্যবস্থার দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকে, তবে সেই দাওয়াতের স্বাভাবিক তাগিদেই তার এ দাবী জানানোও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় যে, অন্যান্য ব্যবস্থাকে উৎখাত করে তার স্থলে তার নিজস্ব ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। তাছাড়া যতো উপায়ে চেষ্টা তদবীর ও সংগ্রাম করলে এ উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে থাকে, তার সব ক'টি উপায় অবলম্বনের দাবী জানানোও তার জন্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। এমনকি যারা তার অনুসারী হবার দাবীদার, তারা জান মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে এই চেষ্টা ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, না বাতিল ব্যবস্থার অধীন জীবন

---

১. উল্লেখ্য যে, এ নিবন্ধ ১৯৪২ সালে লেখা হয়েছিলো।

যাপন করতে রাজী থাকে এ প্রশ্নকেই সে উক্ত দাবীদারদের ঈমান যাচাইয়ের মানদন্ড নির্ধারণ করা জরুরী মনে করে। কুরআন ও হাদীস দুটোই খুলে দেখুন। সুস্থ মন নিয়ে অধ্যয়ন করলে আপনি দেখতে পাবেন, ইসলামের আসল নীতি এটাই, আপনি যেটা বলছেন সেটা নয়।

এই যখন ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ এবং স্বরূপ জেনেই যখন আমরা ইসলামের প্রতি ঈমান এনেছি, তখন যেকোনো ইসলাম বিরোধী সরকারের জন্য আমাদের অস্তিত্বই যে হুমকি বলে বিবেচিত হবে, সেটা তো বলাই বাহুল্য। কেউ সহ্য করুক বা না করুক এবং অমুসলিমদের সাথে আমাদের সহযোগিতা ও পারস্পরিক সদ্ভাব সম্ভব হোক বা না হোক, আমরা আমাদের ঈমানে নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী হলে যেখানেই আল্লাহর আইন চালু নেই সেখানে তা চালু করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। আমাদের মুসলমান হওয়া এরূপ শর্তযুক্ত নয় যে, যারা আল্লাহর অবাধ্য তারা আমাদের এই চেষ্টা সাধনাকে বরদাশ্ত করলেই আমরা মুসলমান থাকবো এবং আল্লাহর আইন চালু করার চেষ্টা করবো অন্যথায় নয়। অমুসলিমদের সাথে সহযোগিতা ও সদ্ভাবও আমাদের জন্য এমন ব্যাপার নয় যে, যে জীবন ব্যবস্থার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি, তার বাস্তবায়নের চেষ্টা করলে অমুসলিমদের সাথে সহযোগিতা ও সদ্ভাব সম্ভব হবেনা বলে আমরা সে চেষ্টা পরিত্যাগ করবো। নিঃসন্দেহে ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষক ও সমর্থক। তবে তার দৃষ্টিতে যে শান্তি ও নিরাপত্তা আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর করার মাধ্যমে অর্জিত হয়, সেটাই প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা। শয়তানী শাসন ব্যবস্থার অধীন যাবতীয় কাজকারবার নিরুপদ্রবে চলতে থাকবে আর মুসলমানরা তাতে কিছুমাত্র বিব্রতবোধ করবেনা, এটাকে যারা শান্তি ও নিরাপত্তার অর্থ মনে করছেন তারা ইসলামের দৃষ্টিভংগিকে মোটেই বোঝেননি। তাদের জানা উচিত যে, ইসলাম কখনো এ ধরনের শান্তি ও নিরাপত্তার সমর্থক ও পক্ষপাতী নয়। বাতিল শক্তির প্রতিষ্ঠিত শান্তি নয়, বরং নিজের প্রতিষ্ঠিত শান্তিই তার কাম্য এবং এতেই সে মানুষের সার্বিক কল্যাণ দেখতে পায়।

এখন প্রশ্ন জাগে, তাহলে "ইসলামে জোর জবরদস্তি নেই" কথাটার মর্ম কি? এর মর্ম শুধু এই যে, ইসলাম তার আকীদা বিশ্বাসকে মেনে নিতে কাউকে বাধ্য করেনা। কেননা এটা জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার জিনিস নয়। অনুরূপভাবে, তার আকীদা বিশ্বাসের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত ইবাদতকেও সে কারোর ওপর বল প্রয়োগে চাপিয়ে দেয়না। কেননা সুষ্ঠু ঈমান ছাড়া এসব ইবাদাত একেবারেই অর্থহীন। এই দুটো ব্যাপারেই সে প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ইসলাম এটা সহ্য করতে প্রস্তুত নয় যে, সমাজ ও সভ্যতাকে পরিচালনাকারী যে আইন ও বিধানের ওপর রাষ্ট্রের কাঠামো ও বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ রচনা করে দিক, আল্লাহর বিদ্রোহী ও অবাধ্য লোকেরা আল্লাহ্‌র যমীনে তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করুক এবং মুসলমানরা তাদের তাবেদার হয়ে থাকুক। এব্যাপারে একটি জনগোষ্ঠীকে অন্য জনগোষ্ঠীর "ধর্মে" অবশ্যই হস্তক্ষেপ করতে হবে। মুসলমানরা যদি "কুফরী ধর্মে" হস্তক্ষেপ না করে তাহলে কুফরী আদর্শের অনুসারীরা "ইসলাম ধর্মে" হস্তক্ষেপ করেই

ছাড়বে। আর এর ফল এই দাঁড়াবে যে, মুসলমানদের জীবনের একটা বিরাট অংশে কুফরী ব্যবস্থা প্রচলিত হয়ে পড়বে। সুতরাং হস্তক্ষেপটা খোদাদ্রোহীদের পক্ষ থেকে না হয়ে মুসলমানদের পক্ষ থেকে হোক এবং মুসলমানরা সামনে অগ্রসর হয়ে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রকে দখল করে নিক এটাই ইসলামের দাবী ও তাগিদ। এ কাজটা সম্পন্ন হওয়ার পর কেবলমাত্র আকীদা বিশ্বাস ও ইবাদত উপাসনার প্রশ্নে অমুসলিমদের সাথে "ইসলামে জোর জবরদস্তি নেই" এই নীতি অনুসরণ করতে হবে।

উদারতার ভ্রান্ত ধারণা ও তার পর্যালোচনা

আলোচ্য আপত্তি উত্থাপক ভদ্রলোক যেসব যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন এবং যার ওপর তার সমমনা লোকেরা সাধারণত আস্থাশীল হয়ে থাকেন, এবার সেই যুক্তিগুলোর ওপর একটা নজর বুলানো যাক।

তার পয়লা যুক্তি হলো, আপনি যখন "ফিতনা" শব্দটি কুফরী ব্যবস্থার বিজয় এবং কুফরী ব্যবস্থার ধারকবাহক ও অনুসারীদের পরাক্রম ও প্রভুত্ব অর্থে গ্রহণ করেন, আর আপনার এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী যে জিনিস 'ফিতনা' পদবাচ্য তাকে উৎখাত করে তদস্থলে "আল্লাহর দীন" কায়েম করাকেই যখন জিহাদের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেন, তখন এটা স্বীকার না করে উপায় থাকেনা যে, ইসলাম একটা দুমুখো ও পরস্পর বিরোধী ভূমিকা অবলম্বন করবে। একদিকে সে ঘোষণা করছে যে, ইসলামে কোনো জবরদস্তি ও বল প্রয়োগের স্থান নেই। অপরদিকে সে অমুসলিমদের নিজস্ব আদর্শ ও মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার দিতে অস্বীকার করছে এবং তাদের আইন প্রয়োগ বন্ধ করে জোরপূর্বক তাদের ওপর "আল্লাহর দীন" চাপিয়ে দিতে চাইবে। একদিকে সে "তোমার জন্য তোমার ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম" বলে সকল ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে নিজ নিজ ধর্মমতের ওপর অবিচল থাকার স্বাধীনতা দেয়। অপরদিকে, তারা নিজেদের নীতি আদর্শ অনুসারে দুনিয়ার কর্মকান্ড পরিচালনা কেন করে এ প্রশ্ন তুলেই তাদের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। ইসলামে এতো বড় স্ববিরোধিতা যে থাকতে পারেনা, তা সর্বজন বিদিত। অতএব, আপনার ব্যাখ্যাটিই আসলে ভুল।

দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, ইসলাম বিরোধী সরকারের অস্তিত্বই যদি ইসলামের দৃষ্টিতে ফিতনা হতো এবং তার উচ্ছেদ ঘটানোর জন্য যদি মুসলমানরা আদিষ্ট হতো, তাহলে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক মিসরের অনৈসলামিক সরকারে মন্ত্রীত্ব চাওয়া কিভাবে সম্ভব হয়েছিলো এবং স্বীয় মন্ত্রীত্বের আমলে মিসরের রাজকীয় আইনের অনুগত থেকে কাজ করাই বা তার পক্ষে কিভাবে সঙ্গত হয়েছিলো। সূরা ইউসুফের ৭৬ নং আয়াত ঃ

"রাজকীয় আইনে আপন ভাইকে গ্রেফতার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলোনা।"

এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি রাজকীয় আইনের উর্ধে ছিলেননা।

তৃতীয় যুক্তি এই যে, আয়াতের যে ব্যাখ্যা আপনি দিয়েছেন তা সঠিক বলে মেনে নিলে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ইসলাম পৃথিবীতে একটা চিরস্থায়ী যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে সচেষ্ট এবং তার অনুসারীদেরকে আগ্রাসী যুদ্ধ চালানোর এমন দায়িত্ব অর্পণ করে যার

দরুন মুসলমানরা দুনিয়ার কোথাও শান্তিতে থাকতে পারেনা। সত্যি বলতে কি, এ তফসীর অনুসারে, শুধু দুনিয়ার সকল অমুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই নয়, বরং যেসব মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী আইন চালু নেই তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। আর এটাই যখন আমদের আদর্শ এবং ধর্মীয় কর্তব্য, তখন অমুসলিমরা আমাদেরকে তদের শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী ভেবে আমাদের সাথে নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে এবং অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহ তাদের আওতাভুক্ত এলাকায় আমাদের অস্তিত্ব বরদাশ্ত করবে এটা কিভাবে সম্ভব?

১. উল্লিখিত যুক্তিগুলোর মধ্যে প্রথমটা একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে উত্থাপন করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটা মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে একটা বিশেষ নিয়ম নীতি অনুসরণ করা এক কথা, আর তার নিজ মতাদর্শ অনুসারে সামষ্টিক জীবনের জন্য একটা পদ্ধতি গড়ে তোলা এবং সেই পদ্ধতিটা জোরপূর্বক একটি দেশের জনজীবনে চালু করে দেয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।[১] আপত্তি উত্থাপনকারীরা এই দুটো বিষয়কে এক মনে করে বসেছেন এবং দুটোর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা উপেক্ষা করে "ইসলামে জোর জবরদস্তি নেই" এবং "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম" এ দুটো আয়াতকে উক্ত দুটো বিষয়ের ওপর সামষ্টিকভাবে প্রয়োগ করেছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ আয়াত দুটোর সম্পর্ক প্রথম ব্যাপারটার সাথে। একথা সত্য যে, আমরা কোনো অমুসলিমকে তার আকীদা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ ও নিজস্ব ধর্মীয় পূজা অর্চনা পরিত্যাগ করে নামায, রোযা পালন করতে বাধ্য করবোনা। তবে আমরা তার এ অধিকার স্বীকার করতে পারিনা যে, সে নৈতিকতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ও আইন ইত্যাদি সামষ্টিক ব্যাপারে আপন মতবাদগুলোকে শাসকসুলভ ক্ষমতার বলে জোরপূর্বক আমাদের ওপর চাপিয়ে দিবে। অন্যদেরকে নিজস্ব নিয়মনীতি অনুসারে চলতে দেয়া নিঃসন্দেহে পরমত সহিষ্ণুতা। কিন্তু আমাদের নিজস্ব নিয়মনীতির বিরুদ্ধে আমাদের ওপর অন্যদের মতাদর্শ ও রীতিনীতি চাপিয়ে দেয়াকে বরদাশ্ত করা কোনো পরমত সহিষ্ণুতা নয়। দেশের শাসন ব্যবস্থা যে জীবন দর্শনের ভিত্তিতে গঠিত হবে ঐ দেশের সমস্ত আইন কানুন, সমগ্র প্রশাসনিক নীতি এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম সেই দর্শনের ভিত্তিতে চলতে বাধ্য। আর এ ধরনের শাসনব্যবস্থার অধীনে বাস করে আমাদের জীবনধারাকে আমাদের নিজস্ব ধর্ম ও মতাদর্শ অনুসারে পরিচালিত করা আমাদের পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আমরা রাজী হই বা না হই, বিরুদ্ধবাদী ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের রাজনৈতিক পরাক্রম ও আধিপত্যের দাপটে আপন মতাদর্শকে জোরপূর্বক আমাদের সমগ্র জীবনে প্রয়োগ ও বাস্তবায়িত করে ছাড়বে। এ ব্যাপারে নমনীয়তা, উদারতা বা পরমত সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের অর্থ হলো,

১. উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্র মূলত বল প্রয়োগ ও জবরদস্তিরই (Coercive) আর এক নাম। যে মতবাদ, মূলনীতি ও আইন কোনো রাষ্ট্রের ভিত্তিরূপে বিবেচিত হবে, সেটা যে ঐ রাষ্ট্রের আওতায় বসবাসকারী সকল মানুষের ওপর বল প্রয়োগেই চালু করা হবে, সেটা সর্বজনবিদিত।

তারা যদি ব্যভিচারকে বৈধ মনে করে এবং জনগণকে এ ব্যাপারে অবাধ অনুমতি দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের সরকারের নিরুপায় প্রজা হিসেবে স্বয়ং আমাদের সমাজে ব্যভিচারের বিস্তার ঘটতে থাকবে আর আমরা তা নীরবে বরদাশ্‌ত না করে পারবোনা। তারা যদি সুদকে বৈধ মনে করে এবং তাদের সরকার স্বয়ং সুদভিত্তিক লেনদেন করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তাহলে দেশের প্রশাসন তাদের হাতে থাকার কারণে আমাদের একজন অতি বড় পরহেজগার লোকও সুদের কলুষতা থেকে রেহাই পাবেনা। এমনকি একটা দিয়াশলাই এবং এক টুকরো রুটিও আমরা কিনতে পারবোনা যতক্ষণ না তার মূল্য থেকে সুদের একটা অংশ পরোক্ষ করের আকারে আমাদের পকেট থেকে বেরিয়ে যায়। তারা যদি নাস্তিক্যবাদী মতবাদে বিশ্বাসী হয় তাহলে দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা কাঠামো এই নাস্তিক্যবাদী চরিত্রের আলোকেই গড়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, এহেন নরকের দরজা ছাড়া দেশবাসীর জন্য উন্নতি ও সমৃদ্ধির অন্য সকল দরজা রুদ্ধ হয়ে যাবে। আর আমাদের অতি বড় কোনো খোদাভীরু লোকও আপন বংশধরকে সেই নাস্তিক্যবাদী মতাদর্শ ও নৈতিকতার প্রভাব থেকে বাঁচাতে সক্ষম হবেনা। তারা যদি আল্লাহর আইনকে বাতিল করে নিজস্ব আইন রচনা করে এবং দেশের সমাজব্যবস্থাকে নিজেদের রচিত আইনের ভিত্তিতে গড়ে তোলে, তাহলে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটা বিরাট অংশ আমরা যে আইনবিধির ওপর ঈমান এনেছি, তার আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে যেতে বাধ্য হবে এবং যে আইনবিধিতে আমাদের ঈমান ও আস্থা নেই তার অনুসরণ করতে আরম্ভ করবে। এটা কি ধরনের পরমত সহিষ্ণুতা এবং কি ধরনের উদার নীতি? "ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই" আয়াতটার এ অর্থ কোন্ যুক্তিতে এবং কোন্ বিবেকের রায় অনুসারে শুদ্ধ হতে পারে যে, অন্যদের পক্ষ থেকে আমাদের ধর্মের ওপর যে বল প্রয়োগ করা হবে তা আমরা বরদাশ্‌ত করবো?

রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা

একথা অনস্বীকার্য যে, সামষ্টিক জীবনের শৃংখলা বহাল রাখার জন্য সর্বাবস্থায়ই একটা বল প্রয়োগকারী শক্তি [Coercive Power] থাকা প্রয়োজন এবং তাকেই রাষ্ট্র বলা হয়। নৈরাজ্যবাদীরা ছাড়া কেউ এর প্রয়োজনীয়তা আজ পর্যন্ত অস্বীকার করেনি। সমাজতান্ত্রিক দর্শনেও এমন একটা স্তর কল্পনা করা হয়েছে, যেখানে পৌঁছে মানুষের সামষ্টিক জীবন রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা আর অনুভব করেনা।[১] কিন্তু এসব কথাবার্তা

---

১. এখানে গ্রন্থকার সমাজতন্ত্রের সর্বশেষ স্তরের প্রতি ইংগিত করছেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং এঙ্গেলস্ এবং লেলিনের বক্তব্য হলো, এতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ কাঠামো তিরোহিত হয়ে যাবে এবং এমন একটি শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, যা পরিচালিত হবে সামাজিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এবং যাতে রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব থাকবেনা। লেনিন লিখেছেন ঃ

> কেবল সমাজতন্ত্রই রাষ্টকে নির্ঘাত নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত করে দেয়। তাই সেখানে এমন কোনো শ্রেণী অবশিষ্ট থাকেনা যাকে দমন ও নির্মূল করা যেতে পারে। [Lenin: The state and revolution, N.Y., 1935, P-75]

এ প্রক্রিয়ার রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্রের পরিভাষায় বলা হয় The State within away [সংকলক]

আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। এসব কথার সপক্ষে কোনো অভিজ্ঞতা বা চাক্ষুস সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা সম্ভব নয়। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা এবং মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞান থেকে একথাই জানা যায় যে, সুসভ্য ও সমাজবদ্ধ মানব জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য একটা "দমনমূলক শক্তি"র প্রয়োজনীয়তা সন্দেহাতীত। তথাপি এ কথাও অনস্বীকার্য যে, আপন অজেয় ক্ষমতা ও পরাক্রমশীলতার জোরে সমাজ ও সভ্যতার অবকাঠামোকে সংরক্ষণকারী এই দমনমূলক শক্তি তথা রাষ্ট্র শক্তি নিজেও কোনো না কোনো মতবাদ এবং কোনো না কোনো সামষ্টিক নীতির প্রবক্তা ও পতাকাবাহী হয়ে থাকে। সেই মতবাদ ও নীতির আলোকে সে নিজের জন্য একটা কর্মসূচী রচনা করে। সে আপন দোর্দন্ড ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমাজ এই কর্মসূচীকেই জীবনে বাস্তবায়িত করে। আর এই দোর্দন্ড ক্ষমতার ধরন এবং এই কর্মসূচীর নীতিগত ও বিস্তারিত রূপটির ভূমিকা সভ্য সমাজ জীবনের ভাঙ্গাগড়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবল সামষ্টিক জীবন নয়, ব্যক্তিগত জীবনও অনেকাংশে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, রাষ্ট্রীয় আধিপত্য ও পরাক্রমের প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়ে যেতে বাধ্য হয়। একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীরা ঐ রাষ্ট্রের মতবাদ ও বিস্তারিত কর্মসূচীতে বিশ্বাসী ও সম্মত না হলেও তাদেরকে বাধ্য হয়ে নিজেদের বিশ্বাস ও আদর্শের শতকরা ৯০ ভাগকে পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রীয় আকীদা ও আদর্শ অনুসারে চলতে হয়। আর বাদবাকী ১০ ভাগেও তাদের আকীদা ও আদর্শের নিয়ন্ত্রণ ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে যেতে থাকে।

রাষ্ট্রের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি দান এবং সামষ্টিক জীবনে রাষ্ট্রের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করার পর একজন চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে একথা বুঝা মোটেই কঠিন নয় যে, কোনো মানবগোষ্ঠী যদি প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে কেবল "ধর্মের" অনুসারী না হয়ে একটা সর্বব্যাপী জীবন ব্যবস্থা অর্থাৎ "দীনের" প্রতি বিশ্বাসী হয়, তারা আপন বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী হয় এবং আপন বিশ্বাসের বিপরীত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে যে রাষ্ট্র সমাজ জীবনকে সর্বাত্মকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা এবং আপন শক্তি দ্বারা তাকে বহাল রাখার কাজে নিয়োজিত রয়েছে, সেই রাষ্ট্রকে করায়ত্ত্ব করার চেষ্টা করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। তারা যদি রাষ্ট্রকে করায়ত্ত্ব না করে, তবে অন্যরা করবে এবং তখন এই গোষ্ঠী নিজেদের জীবনের অন্তত শতকরা ৯০ ভাগ ব্যাপারে নিজেদের পছন্দসই 'দীন' বা জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্যদের জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। সুসভ্য মানব জীবনে বল প্রয়োগের এ কাজটা আমাদের কোনো না কোনো পক্ষকে করতেই হবে। আমরা না করলে খোদাদ্রোহীরা করবে। সুতরাং ইসলাম বিরোধীরা এ পরিমন্ডলে আমাদের ওপর বলপ্রয়োগ করবে এবং আমাদেরকে টেনে হিচঁড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে তার চেয়ে ভালো আমরাই তাদের ওপর বল প্রয়োগ করে তাদেরকে এমন অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য করি, যেখান থেকে তারা ইচ্ছা করলে সহজেই বেহেশতের পথের সন্ধান লাভ করতে পারে।

এ হলো ব্যাপারটার একটা দিক। এর আর একটা দিক হলো, পৃথিবীর মালিক আল্লাহ্ তায়ালা। তাঁর পৃথিবীতে বাস করে তাঁর নেয়ামতরাজি ভোগ করা এবং তাঁর মালিকানাধীন সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার কেবল তাঁর অনুগত বান্দাদেরই থাকতে

পারে, যারা তাঁর প্রাকৃতিক ও শরীয়তী আইন কানুন অনুসরণ করে। যারা তা করেনা তারা যালিম, অনধিকার চর্চাকারী ও বিদ্রোহী। তাদের এই অনধিকার চর্চা কেবল অন্যায়ই নয়, বরং পৃথিবীর প্রশাসনে অরাজকতা সৃষ্টি এবং পৃথিবীবাসীর জীবন বিপর্যস্ত ও অতিষ্ঠ করে তোলার নামান্তর। সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, যারা খোদাদ্রোহী এবং খোদার প্রাকৃতিক ও শরীয়তী বিধানের বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত, তাদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকারও থাকা উচিত নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র অতিশয় দয়া ও মহানুভবতা এবং তাঁর চরম সহনশীলতার গুণে তিনি তাদেরকে শুধু যে জীবন ধারণের সুযোগ দিয়েছেন তা নয়, বরং তদেরকে তাদের কুফরী, শিরক ও নাস্তিকতার ওপর টিকে থাকারও এতোখানি সুযোগ দিয়েছেন, যাতে তাদের খোদাদ্রোহিতা আল্লাহ্‌র অন্যান্য বান্দাদের জীবনে অরাজকতা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে না পারে। তাদেরকে এ অধিকার তিনি কখনো দেননি যে, আল্লাহর শরীয়তী বিধান বাতিল করে তারা নিজেদের মনগড়া আইন কানুন দ্বারা তার পৃথিবীর প্রশাসন চালাবে এবং এভাবে তার যমীনে অরাজকতার তান্ডব সৃষ্টি করবে। তাই ইসলাম তার শরীয়তী বিধানকে যারা মেনে নিয়েছে তাদেরকে নির্দেশ দেয় যে, অমুসলিমদেরকে আল্লাহর সত্য দীন গ্রহণ করতে বাধ্য করোনা। কিন্তু কুফরী ব্যবস্থার আধিপত্য ও প্রাধান্য এবং কাফিরদের কর্তৃত্ব প্রভুত্ব যা কিনা সাধারণ মানুষ ও মুমিনদের জন্য আল্লাহ্‌র সত্য দীনের আনুগত্য করার পথে প্রতিবন্ধক তাকে সর্বশক্তি দিয়ে উৎখাত করো, যেনো পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন কার্যত আল্লাহ্‌র দীনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে যারা আল্লাহ্‌র দীনকে মানেনা, তারা "কতৃত্বশীল" নয়, এবং প্রতাপান্বিত নয় বরং "অধিনস্ত" বরং বিনীত হয়ে থাকবে। সূরা তওবার ২৯ নং আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে ঃ

> "যতক্ষণ না তারা বিনীতভাবে স্বহস্তে জিজিয়া দেবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও।"[১]

ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব

২. উল্লিখিত তথ্যসমূহ হৃদয়ঙ্গম করার পর দ্বিতীয় যুক্তির প্রখরতা আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যদি যথার্থই আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী থেকে থাকেন তাহলে অন্যান্য নবীগণের পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যা ছিলো,

---

১. এ লড়াই করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, এর ফলে তারা ঈমান আনবে এবং ইসলাম পালন করতে শুরু করবে। বরঞ্চ এর উদ্দেশ্য হলো, এর ফলে তাদের স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যাবে এবং পৃথিবীতে তারা শাসক ও কর্তৃত্বসম্পন্ন হয়ে থাকতে পারবেনা। বিশ্বের জীবন ব্যবস্থার বাগডোর এবং কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষমতা অর্পিত হবে সত্যদীনের অনুসারীদের হাতে। আর ওরা এদের অধীনে অনুগত ও বাধ্যগত হয়ে থাকবে।

ইসলামী রাষ্ট্র যিম্মীদের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের যে দায়িত্ব পালন করে, জিযিয়া তারই বিনিময়। আর তারা যে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা মেনে নিয়েছে, তারও নিদর্শন বটে। স্বহস্তে জিযিয়া দেয়ার অর্থ সোজাসোজি ও সুস্পষ্ট আনুগত্যের ভাবধারা অনুযায়ী জিযিয়া প্রদান করা। আর বিনীতভাবে মানে বিশ্বে তারা কোনোদিক দিয়ে বড় বলে বিবেচিত হবেনা। বড় বিবেচিত হবে কেবল সেই মুমিনরা, যারা আল্লাহ্‌র খিলাফতের দায়িত্ব পালনে নিরত।

তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও নিশ্চিতভাবে তাই ছাড়া আর কিছু থাকতে পারেনা। অর্থাৎ অন্যসকল জীবন ব্যবস্থার ওপর আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা। এটা একটা মৌলিক তত্ত্ব। সকল নবীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এ তত্ত্বটাকে একটা সাধারণ মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আমরা যদি একথা স্বীকার করি যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর শাসনামলে মিসরে আল্লাহ্র দীনের পরিবর্তে রাজকীয় বিধি বিধান চালু করতেন, তাহলে তো তাঁর মধ্যে এবং স্যার সিকান্দার হায়াত খান ও এ কে ফজলুল হকের১ মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য থাকেনা। দুঃখের বিষয় যে, অনেকে এ ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তারা আসলে ইউসুফ আলাইহিস সালামের কিস্সাটা বুঝতেই পারেননি। তাদের ধারণা, ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে সমসাময়িক বাদশাহকে বলেছিলেন ঃ

"আমাকে এই ভুখন্ডের সহায় সম্পদের তদারকীর দায়িত্ব দিন।" [সূরা ইউসুফঃ ৫৫]

সেটা ছিলো নেহায়েতই তাঁর পক্ষ থেকে একটা চাকরির আবেদন। আর এর ফলে তিনি সম্রাট আকবরের দরবারে টোডর মল্লের পদের মতো একটা পদ সেখানে লাভ করেছিলেন। অথচ সেখানকার ব্যাপারটা ছিলো সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।

মহান নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম শুরুতে আল্লাহর সত্য দীন কায়েমের জন্য সকল নবীদের চিরাচরিত পন্থাই অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ প্রথমে সাধারণ দাওয়াত ও অতপর যারা ঐ দাওয়াত গ্রহণ করে তাদেরকে সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা, অতপর তাদেরকে সাথে নিয়ে দীন কায়েমের জন্য চেষ্টা সাধনা। দাওয়াতের কাজটা তিনি কারাগার থেকেই শুরু করে দিয়েছিলেন। সূরা ইউসুফের ৫ম রুকুতে তাঁর দাওয়াতী স্তরের একটা অতুলনীয় ভাষণ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আকস্মিকভাবে তিনি এমন একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেলেন, যার মাধ্যমে তিনি সংক্ষিপ্ত পথ ধরে আপন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, মিসর সরকারের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব 'আযীযে'র স্ত্রী ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে তিনি যে পবিত্র ও অনমনীয় চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তার পরে স্বপ্নের তাবীর করার মধ্যদিয়ে তিনি যে প্রজ্ঞার প্রমাণ দিয়েছিলে, তার কারণে মিসরের বাদশাহ তার প্রতি এতো অনুরক্ত হয়ে গেছেন যে, তিনি যদি তখন দেশ শাসনের পূর্ণাংগ ক্ষমতা তার কাছে চেয়ে বসেন তবে বাদশাহ নির্দিধায় তা দিয়ে দেবেন। এজন্য গণআন্দোলনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চাইতে সরকারী ক্ষমতা অবিলম্বে দখল করে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর কাছে নিকটতর ও সহজতর পথ মনে হলো। তাই তিনি বাদশাহর কাছে اِجْعَلْنِى عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ "দেশের যাবতীয় উপায় উপকরণ আমার কর্তৃত্বে দিয়ে দিন" এইদাবী করে বসলেন। এটা কেবল অর্থমন্ত্রীর

---

১. এ নিবন্ধ লেখার সময়ে পাঞ্জাবে স্যার সিকান্দার হায়াত ও বাংলায় এ কে ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এখন তাদের স্থলে যেকোনো অনৈসলামী সরকারের মুসলমান মন্ত্রীকে ধরে নেয়া যেতে পারে।

গদী লাভের দাবী ছিলোনা, যদিও কেউ কেউ এটাই মনে করে থাকেন। বরঞ্চ এটা ছিলো সর্বাধিনায়ক ও সার্বভৌম শাসকের পদের দাবী। এর ফলে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে পদমর্যাদা ও ক্ষমতা লাভ করলেন তা বর্তমানে ইতালীতে মুসোলিনী যে পদমর্যাদায় সমাসীন, তার প্রায় অনুরূপ।[১] পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, ইতালীর রাজা মুসোলিনীর ভক্ত নন, কেবল তার দলের প্রভাব প্রতিপত্তির দাপটে নতি স্বীকার করেছেন। আর মিসরের বাদশাহ স্বয়ং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মুরীদ হয়ে গিয়েছিলেন।[২]

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ক্ষমতা কিরূপ ছিলো সে সম্পর্কে আল্লাহ স্বয়ং সাক্ষ্য দেন যে ঃ

"এভাবে আমি ইউসুফকে সেই ভূখন্ডে ক্ষমতাসীন করলাম। সে ঐ ভূখন্ডের যে অংশে ইচ্ছা নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম ছিলো।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৫৬]

অর্থাৎ গোটা দেশে তার একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজ করতো। সূরা মায়েদাতে আমরা এ সম্পর্কে আরো সাক্ষ্য পাই। সেখানে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম স্বীয় জনগণকে বলেন ঃ

"হে আমার জাতি! আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ করো। তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, তোমাদেরকে শাসক জাতি বানিয়েছেন এবং পৃথিবীতে কাউকে যা দেননি, তা তোমাদেরকে দিয়েছেন।" [সূরা মায়েদা ঃ ২০]

এ থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম মিসরে যে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, তাঁর কল্যাণে সেখানে পরিপূর্ণ বিপ্লব সংঘটিত হয়, ফিরাউনদের পরিবর্তে বনী ইসরাঈলের শাসন চালু হয় এবং তারা উন্নতির এতো উচ্চ শিখরে আরোহণ করে, যা তাদের সমকালীন জাতিগুলোর মধ্যে আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি।

তাছাড়া হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিসরে যে ধর্মীয় প্রভাব প্রতিপত্তি রেখে যান, তার বিবরণ আমরা সূরা মুমিনে পাই। সেখানে জনৈক ঈমানদার কিবতী হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের ফিরাউনকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

"ইতিপূর্বে ইউসুফ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু প্রথমে তো তোমরা তাঁর নিয়ে আসা নিদর্শনের ব্যাপারে সন্দেহে লিপ্ত ছিলে। আর যখন সে মারা গেলো তখন তোমরা বললে ঃ এখন আল্লাহ্ আর কোনো রসূল পাঠাবেননা।" [সূরা মুমিন ঃ ৩৪]

অর্থাৎ তোমরা বললে যে, অমন উচু দরের মানুষ এখন আর আসতে পারেনা। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে এই নিগূঢ় তত্ত্ব জানার পর এরূপ যুক্তি

---

১. এ প্রবন্ধ লেখার সময় মুসোলিনী ইতালীর একনায়ক ছিলেন ।

২. প্রখ্যাত তাফসীরকার ইমাম মুজাহিদ বলেন যে, বাদশাহ হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালামের হাতে ইসলামও গ্রহণ করেছিলেন। [ইবনে জারীর]

প্রদর্শনের সাহস কে করতে পারে যে, তাই যেহেতু একজন নবী এরকম কাজ করেছেন? অবশ্য সূরা ইউসুফের ৭৬ নং আয়াত ঃ

"তার পক্ষে রাজকীয় আইনের অধীন আপন ভাইকে আটক করা সম্ভব ছিলোনা।"

এর আলোকে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম ফিরাউনী আইন মেনে চলতেন। এ আয়াতের মর্ম ও তাৎপর্য সম্পর্কে অনেক কিছু বলার অবকাশ রয়েছে। তথাপি এর যে অর্থ সচরাচর বর্ণনা করা হয় তা যদি সঠিক মেনে নেয়াও হয়, তবু তা থেকে বড় জোর একথাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের শাসন আমলের যে পর্যায়ে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে [পূর্বাপর বর্ণনা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, এটা প্রাথমিক যুগেরই ঘটনা। কেননা তাঁর মিসরের শাসক হওয়ার কয়েক বছর পরই সাত বছরব্যাপী ইতিহাসখ্যাত সেই দুর্ভিক্ষ শুরু হয়, যার করাল গ্রাসে পতিত হয়ে তার ভাইদেরকে খাদ্যশস্য নেয়ার জন্য মিসর আসতে হয়েছিলো।] তখন পর্যন্ত মিসরে পূর্বতন ফৌজদারী আইনই চালু ছিলো। একটা দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাকে যে রাতারাতি পাল্টানো যায়না, সেকথা সবার জানা। এ কাজ পর্যায়ক্রমেই সমাধা করা সম্ভব। স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলেও আরবের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা পাল্টাতে দশ বছর লেগে গিয়েছিলো। উত্তরাধিকার আইন বদলানো হয়েছিলো ৩য় অথবা ৪র্থ হিজরীতে। বিয়ে ও তালাকের বিধি হিজরতের পর পাঁচ ছয় বছরে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করা হয়েছিলো। ফৌজদারী বিধি সম্পূর্ণ করতে পুরো আট বছর লাগে। দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো পর্যায়ক্রমে ৯ বছরে পাল্টানো হয়। মদ চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হয় ৮ম হিজরীতে এবং সুদ পুরোপুরিভাবে রহিত করা হয় ৯ম হিজরীতে। এভাবে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামও যদি দেশের আইন সংস্কারের কাজ পর্যায়ক্রমে করে থাকেন এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাঁর শাসনামলে সাবেক আইন চালু থেকে থাকে, তাহলে তার ভিত্তিতে একথা কিছুতেই বলা চলেনা যে, একজন নবী আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত অনৈসলামিক আইনকে বৈধ মনে করে তা মেনে চলতেন।

৩. এবার আসুন তৃতীয় যুক্তির প্রসংগে। এটাকে আসলে যুক্তি না বলে অজুহাত বলাই সমীচীন। এ অজুহাতের জবাব আমি পূর্বেই দিয়েছি। এখানে শুধু আবু দাউদ বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"আমি যখন নবূয়্যত লাভ করেছি তখন থেকেই জিহাদের সূচনা এবং এই উম্মতের শেষ জনগোষ্ঠীর দাজ্জালের সাথে যিহাদে লিপ্ত হওয়ার সময় পর্যন্ত তা চালিয়ে যাওয়া উচিত। কোনো অত্যাচারীর অত্যাচার এবং কোনো ন্যায়বিচারকের ন্যায়বিচার জিহাদকে রহিত করতে পারেনা।"

অর্থাৎ আজ আমাদের ওপর চরম স্বৈরাচারী শাসকরা চেপে বসেছে, এই অজুহাতে যেমন জিহাদ বন্ধ করা চলবেনা, তেমনি কাফির শাসক হলেও মুসলমানদের প্রতি সুবিচার হচ্ছে এবং তারা শান্তিতে আছে এই বাহানা দিয়েও তা থেকে বিরত হওয়া চলবেনা। এমনকি মুসলমানদের নিজ দেশে সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব থাকলেও

তাদের নিশ্চিন্ত হওয়া এবং বাইরের জগতে যে যুলুম, নির্যাতন ও অশান্তির আগুন জ্বলছে, তার দিক থেকে চোখ বুজে থাকা বৈধ নয়।

৪. ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করার বাতিল মতবাদ এবং ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ঘটনা থেকে ভ্রান্ত যুক্তি গ্রহণ

তরজমানুল কুরআনের[১] জনৈক পাঠক লিখেছেন ঃ

সূরা ইউসুফের দুটো জায়গা সম্পর্কে আপনার কুরআন বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান থেকে উপকৃত হতে চাই।

কুরআন থেকে জানা যায়, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে পৃথিবীতে ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা দান করা হয়েছিলো এবং তিনি বিশিষ্ট পদমর্যাদা নিয়ে সরকারে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে একজন রসূল ছিলেন এবং সেজন্য নবূয়্যতের দায়িত্ব পালনও তাঁর জন্য জরুরী ছিলো সেকথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ফিরাউনের দরবারের একজন অকুতোভয় মুমিন তাঁর ভাষণে এ আভাস দিয়েছেন যে, ফিরাউনের লোকেরা হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের নবূয়্যতের প্রতি ঈমান আনেনি। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম নিজের ইন্তিকালের সময় পর্যন্ত নমনীয় ভাব বজায় রেখেছিলেন। এথেকে বুঝা যায়, তিনি নিজের নবূয়্যতের প্রতি ঈমান আনার আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরাউন ও তার লোকজন ঈমান আনেনি। এতদসত্ত্বেও হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম তাদের সরকারে অন্তর্ভুক্ত থাকেন। এখন প্রশ্ন উঠে, আল্লাহ্র একজন নবী একটি অনৈসলামিক সরকারে কিভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারলেন? অথচ তিনি সেই জাতির কাছে নিজের নবী হওয়ার কথা ব্যক্তও করেছিলেন এবং সেই জাতি তাঁর নবূয়্যত মেনে নেয়নি। ইসলামের দাওয়াতকে এভাবে যারা প্রত্যাখান করলো, তাদের সাথে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের জিহাদ করা উচিত ছিলো। নতুবা নিদেন পক্ষে তাঁর সেখান থেকে হিজরত করা উচিত ছিলো। কিন্তু তিনি না করলেন হিজরত, আর না করলেন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ, এমনকি তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ কিংবা অসন্তোষ ব্যক্ত করতেও তাঁকে দেখা যায়না। এ জটিল রহস্যের কোনো সমাধান কি আপনি দিতে পারেন?

জবাব

বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের যে যুগটি হযরত মুসা আলাইহিস সালামের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। বলতে গেলে সেটা একেবারেই অন্ধকারাচ্ছন্ন। এজন্য কুরআনের সংক্ষিপ্ত ইংগীতসমূহের বিস্তারিত তথ্য অবগত হওয়া খুবই কঠিন। তবু কুরআনের এইসব সংক্ষিপ্ত ইংগিত থেকেও একথা সন্দেহাতীতভাবে জানা যায়, মিসরে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম সরকারের একজন সাধারণ অংশীদার ছিলেননা। বরং একচ্ছত্র ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক ছিলেন। তিনি শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেনই এই শর্তে

---

[১] এ অংশটি তরজমানুল কুরআন রবিউসসানী ১৩৬৩ হিজরী মোতাবেক এপ্রিল ১৯৪৪ ঈসায়ী সংখ্যায় প্রকাশ হয়। -সংকলক।

যে, তাঁর হাতে সার্বিক ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। নিম্নের আয়াত দুটি মনোনিবেশ সহকারে পড়ে দেখুন ঃ

"ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম বললেন, আমাকে দেশের যাবতীয় সহায়-সম্পদের কর্তৃত্ব দান করুন। নিশ্চয়ই আমি যথাযথভাবে সংরক্ষক এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী। এভাবে আমি ইউসুফকে ঐ ভূখন্ডের কর্তৃত্ব দান করেছিলাম। সেখানে সে যথায় খুশী স্বীয় আবাস প্রতিষ্ঠা করতে পারতো।"[১] [সূরা ইউসুফ ঃ ৫৫-৫৬]

এই রেখা চিহ্নিত বাক্যগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে, তিনি সার্বিক ক্ষমতাই চেয়েছিলেন আর পেয়েছিলেনও সার্বিক ক্ষমতাই। "দেশের সহায় সম্পদ" কথাটা দেখে কেউ কেউ ভুল ধারণায় লিপ্ত হয়েছেন যে, এ পদটা বোধহয় অর্থমন্ত্রীর অথবা রাজস্ব কর্মকর্তা পর্যায়ের। অথচ প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হলো দেশের সমগ্র উপায় উপকরণ [Resources]। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের দাবী ছিলো, মিসর সাম্রাজ্যের সমস্ত উপায় উপকরণ তাঁর কর্তৃত্বে সমর্পণ করা হোক। আর এ দাবীর ফলে তিনি এমন ক্ষমতা লাভ করেছিলেন যে, গোটা মিসর ভূখন্ডে তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো। "সেখানে সে যথায় খুশী স্বীয় আবাস প্রতিষ্ঠা করতে পারতো।" কথাটারও অনেকে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাদের দৃষ্টিতে এর মর্ম শুধু এতটুকু যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম সর্বত্র বসবাস করার বা বাড়ী তৈরী করার অবাধ অনুমতি পেয়েছিলেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে একথাটা দ্বারা এটাই বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, এক ভূস্বামীর তার স্বভূমিতে যেরূপ অবাধ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকে, সমগ্র মিসর ভূখন্ডে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ঠিক তদরূপ একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

এরপর যে প্রশ্নটি অবশিষ্ট থাকে তা হলো, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের করায়ত্ব এই নিরংকুশ ক্ষমতা দ্বারা তিনি দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শ অনুসারে পরিবর্তিত করতে কতোখানি চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে তিনি কতদূর সাফল্য লাভ করেছিলেন? ইতিহাসে আমরা এ প্রশ্নের কোনো বিস্তারিত জবাব পাইনা। তবে সূরা মায়েদার একটি উক্তি থেকে পরোক্ষভাবে আমরা এতোটুকু নিশ্চতভাবে জানতে পারি যে, মিসরে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের শাসন কোনো ব্যক্তি বিশেষের ক্ষণস্থায়ী শাসন ছিলোনা। বরং তার পরেও দীর্ঘকালব্যাপী তাঁর উত্তরসূরীরা মিসরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁরা নিঃসন্দেহে মুসলমান ছিলেন। শুধু তাই নয়, এই শাসকবর্গ সমসাময়িক পৃথিবীতে নজিরবিহীন প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

"স্মরণ করো, যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিলো ঃ হে আমার জাতি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো, তিনি তোমাদের মাঝে নবীদেরকে আবির্ভূত

---

১. বাইবেল এবং তালমুদ থেকেও এ সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য জানা যায়না। আর মিসরের প্রাচীন ইতিহাস এবং প্রাচীন নিদর্শনাবলী থেকেও এ ব্যাপারে কিছু জানা যায়না।

করেছেন। তোমাদের শাসক বানিয়েছেন এবং পৃথিবীর কাউকে যা দেননি, তা তোমাদের দিয়েছেন।" [সূরা মায়েদা ঃ ২০]

এথেকে অনুমান করা চলে যে, এই সর্বাত্মক ইসলামী আধিপত্য ও বিজয় অনিবার্যভাবে দেশের সমগ্র কর্মকান্ডে প্রভাব বিস্তার করেছিলো।

সূরা আলমুমিনের যে আয়াত থেকে আপনি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কিবতী সম্প্রদায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে মেনে নেয়নি, আসলে সে আয়াতটি থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত নয়। আমার উপলব্ধি এই যে, সেখানে ভারতের মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো। দেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশ ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ মুশরিক থেকে গিয়েছিলো।[১] যে অংশ ইসলাম গ্রহণ করে সে অংশটিই দীর্ঘকালব্যাপী ক্ষমতাসীন ছিলো। কিন্তু ক্রমাগত নৈতিক ও আকীদাগত অধপতন তাদের গোলামী ও গোমরাহীর গভীর আবর্তে নিক্ষেপ করে। শেষ পর্যন্ত এই জনগোষ্ঠীটি ব্যক্তিপূজা ও ধর্মীয় বাড়াবাড়ীর বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে এমন অবস্থার শিকার হয় যে, অন্যান্য পৌত্তলিকদের সাথে তাদের কার্যত কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভেদ ছিলোনা। ফিরাউনের দরবারের ঈমানদার লোকটি এ বিষয়ের দিকে ইংগিত করেই বলেছেন ঃ

"ইতোপূর্বে ইউসুফ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন, তা নিয়ে তোমরা অনবরত সন্দেহে লিপ্ত রইলে। অতপর তিনি যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন তোমরা বললে, এখন ওর পরে আল্লাহ আর কোনো রসূল পাঠাবেননা।" [সূরা মুমিন ঃ ৩৪]

রেখা চিহ্নিত কথাগুলোর মধ্যে প্রথমটি থেকে বুঝা যায়, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের জীবদ্দশায় দেশের অধিকাংশ মানুষ তাঁর নবূয়্যত সম্পর্কে সন্ধিহান ছিলো, যেমনটি অধিকাংশ নবীদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। দ্বিতীয় কথাটি থেকে বুঝা যায়, তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর ভক্তরা তাঁর ব্যক্তিত্বের পূজারী হয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করে দেয় এবং বলতে থাকে যে, এখন আর কোনো রসূল আসতে পারেনা! এরই ভিত্তিতে তারা পরবর্তী নবীদেরকে অগ্রাহ্য করে। পরবর্তী সময়ে ইহুদী ও খৃষ্টানরা এ কাজই করেছিলো। অথচ হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম কিংবা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম এঁদের কারো পরেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবূয়্যত সমাপ্তির ঘোষণা দেয়া হয়নি।

তবে কোনো অবস্থাতেই আয়াতটির এরূপ মর্মোদ্ধারের অবকাশ নেই যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ওপর দেশের কেউ ঈমান আনেনি। বরং অন্যান্য আভাস-ইংগীত থেকে এটাই অনুমিত হয় যে, দেশে মুমিনদের একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিলো।

---

১. বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী মিসর থেকে মূসা আলাইহিস্ সালামের সাথে যেসব লোক বের হয়ে এসেছিলো তাদের মধ্যে ছয় লাখ কেবল যোদ্ধা পুরুষই ছিলো। এথেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, তাদের মোট সংখ্যা বিশ লাখের কম ছিলোনা এবং মিসরের জনসংখ্যার কমপক্ষে তারা ১০% শতাংশ ছিলো।

তারা বনী ইসরাঈলের সাথে মিলিত হয়ে দীর্ঘদিন **ইসলামী** শাসন চালু রেখেছিলো। তবে পরবর্তী সময় তারা ক্রমান্বয়ে অধোপতনের [Degenerate] শিকার হয়ে পড়ে।

৫. ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করার মতবাদ খন্ডন এবং তার পর্যালোচনা

["সূরা ইউসুফ সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন" শীর্ষক নিবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পর একজন খ্যাতনামা মনীষী, যিনি এখন জীবিত নেই, যিনি খান বাহাদুর উপাদিতে ভূষিত ছিলেন এবং ইউপিতে কালেক্টর ও ভারতের একটি রাজ্যে দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, আমার উক্ত নিবন্ধের দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। উক্ত মনীষীর সমলোচনা না পড়ে আমার জবাব বুঝা সম্ভব নয় বিধায় আমরা এখানে প্রথমে তার সমালোচনার সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করছি। এরপর আমাদের জবাব উদ্ধৃত করবো।][১]

প্রশ্নকর্তা যেকথা জানতে চেয়েছিলেন এবং যেকথা প্রকৃতপক্ষে বিবেচ্য বিষয়, তা শুধু এতোটুকুই যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের এ কাজটি ইসলামী দৃষ্টিভংগিতে জায়েয ছিলো কি না? মাওলানা মওদূদী সাহেব জবাবে বলেন, "হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের পদমর্যাদা মিসরে অনৈসলামিক সরকারের একজন অংশীদারের অনুরূপ ছিলোনা।" আশ্চার্য্যের বিষয় তিনি তাঁর এই মতের সমর্থনে কুরআনের সেই আয়াতই অর্থাৎ [সূরা ইউসুফ ঃ ৫৫] পেশ করেন, যা প্রকৃতপক্ষে এর বিপরীতটাই প্রমাণ করে।

উক্ত আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসানের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

"ইউসুফ বললেন, আমাকে নিযুক্ত করুন দেশের ধন ভান্ডার সমূহের দায়িত্বে। আমি প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী এবং রক্ষক। এভাবে আমি ইউসুফকে ক্ষমতা দিলাম সেই ভূখন্ডে। তিনি স্থান গ্রহণ করতেন সেই ভূখন্ডে যেখানে চাইতেন।"

লক্ষ্য করুন, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম ফেরাউনের কাছে আবেদন জানালেন, আপনি আমাকে দেশের ধন ভান্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন। ফিরাউন তার আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তিনি অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। স্পষ্টতই এর ফল দাঁড়ালো এই যে, তিনি ফিরাউনের সরকারের একজন সদস্য বা অংশীদার হয়ে গেলেন। এই স্বাভাবিক ফলশ্রুতিকে পাশ কাটানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী বলেন, "দাবী ছিলো নিরংকুশ ক্ষমতার এবং পেয়েছিলেনও নিরংকুশ ক্ষমতা।"....

প্রথমত নিরংকুশ বা সার্বিক ক্ষমতাবোধক শব্দ কুরআনে নেই। এ শব্দটা মাওলানা সাহেব নিজের পক্ষ থেকে কুরআনে সংযোজন করতে চান, যাতে কুরআন মাওলানার ব্যক্তিগত মতাদর্শের বাহক হয়ে যায়, এ জন্য নয় যে, মাওলানা নিজের ব্যক্তিগত মতবাদকে কুরআন অনুযায়ী শুধরে নেবেন। এ ধরনের মনোবৃত্তি সম্পর্কে সম্ভবত মরহুম

---

১. এ পর্যালোচনাটি তরজমানুল কুরআন জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ সংখ্যা থেকে সংকলিত।

কবি ইকবাল বলেছিলেন ঃ "তারা নিজেরা শুধরায়না। বরং কুরআনকে বদলায়।" কিন্তু এই সার্বিক বা নিরংকুশ শব্দটার অবৈধ সংযোজন সত্ত্বেও মাওলানার গবেষণা বা মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়না। ধরে নিলাম, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম অর্থ সম্পদ সংক্রান্ত সার্বিক ক্ষমতা চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেনও সার্বিক ক্ষমতাই। কিন্তু এই ক্ষমতা তিনি মিসরের ফিরাউনের কাছেইতো চেয়েছিলেন এবং মিসরের ফিরাউনইতো সেটা দিয়েছিলো। সুতরাং নিরংকুশ ও সার্বিক ক্ষমতা লাভ করা সত্ত্বেও তখনকার শাসন ব্যবস্থায় তাঁর অবস্থান একজন সদস্য বা অংশীদারের উর্ধের কিছু হতে পারেনা।

মাওলানা মওদূদী সাহেবের এ উক্তিও বাস্তবতার বিপরীত যে, "হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের দাবী ছিলো, মিসর সাম্রাজ্যের সকল উপায় উপকরণ আমার দায়িত্বে সমর্পণ করা হোক এবং দাবীর পরিণতিতে তিনি যে ক্ষমতা লাভ করলেন তাতে সমগ্র মিসরের ভূমি তাঁর নিজস্ব ভূমিতে পরিণত হলো।" একথা যদি মেনে নেয়াও হয় যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম অর্থ সংক্রান্ত সার্বিক ক্ষমতা দাবী করেছিলেন এবং অর্থ সংক্রান্ত একচ্ছত্র কর্তৃত্ব তার হাতে অর্পণ করা হয়েছিলো । তথাপি একথা সবার জানা, একটি রাষ্ট্রে অর্থ ছাড়া আরো বহু বিভাগ থাকে। যেমন- পুলিশ, সশস্ত্রবাহিনী ও বিচার বিভাগ। এসবের কোনোটির দায়িত্ব ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম চানওনি, ওগুলো তাঁর দায়িত্বে অর্পিতও হয়নি। তা যখন হয়নি, তখন মাওলানার একথা বলা যে, "তিনি যে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন তাতে সমগ্র মিসরের ভূমি তাঁর নিজের ভূমিতে পরিণত হয়েছিলো" সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

অতএব হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম মিসরের সমস্ত অর্থ সম্পদের দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেও তাঁর সাম্রাজ্যের ক্ষমতার একজন অংশীদার বা সরকারের সদস্যের পর্যায়েই থাকে যতক্ষণ কোনো উপায়ে প্রমাণিত না হয় যে, মিসরের ফিরাউন সাম্রাজ্যের শাসন থেকে অবসর নিয়েছিলো এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম তাঁর স্থলে মিসরের সম্রাট হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ তাঁর সম্রাট হওয়ার কথা ইতিহাস থেকেও প্রমাণিত হয়না, কুরআন থেকেও নয়। বরং কুরআন থেকে এ ধারণা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যাত। আলোচ্য আয়াতের অব্যবহিত পূর্বের আয়াতটি লক্ষ্যণীয় ঃ

> "সম্রাট বললো, তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের জন্য মনোনীত করবো। অতপর সে যখন ইউসুফের সাথে কথা বললো, বললো যে, নিশ্চয়ই আপনি আজ আমাদের কাছে সম্মানিত ও বিশ্বস্ত।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৫৪]

উভয় আয়াত থেকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, মিসরের ফিরাউন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে স্বীয় সাম্রাজ্যের সম্মানিত ও বিশ্বস্ত সদস্য এবং নিজের বিশেষ উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। এ আয়াত দুটিতে এমন কোনো আভাসও নেই যে, মিসরের ফিরাউন স্বীয় সাম্রাজ্য অথবা ক্ষমতা পরিত্যাগ করেছিলেন। এছাড়া পরবর্তী একটি আয়াত থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক মিসরের সকল অর্থ সম্পদের দায়িত্ব গ্রহণেরও অনেক পর পর্যন্ত মিসরে ফিরাউনের

রাজত্ব বহাল ছিলো এবং তাঁর ধর্মই দেশে চালু ছিলো। কেননা ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ভাইয়েরা যখন দ্বিতীয়বার খাদ্যশস্য আনার জন্য মিসরে আসে, তখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ইচ্ছা মোতাবেক তাঁর আপন ভাই বিন ইয়ামিনকেও নিয়ে আসে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর ভাই বিন ইয়ামিনকে নিজের কাছে রেখে দেন এবং তাকে জানিয়েও দেন যে, তিনি তাঁর আপন ভাই, কিন্তু তাঁর অন্যান্য ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করেননি। এই সময় যেহেতু ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম ভাইদের কাছে বিন ইয়ামীন তার আপন ভাই একথা প্রকাশ না করেই বিন ইয়ামিনকে নিজের কাছে রেখে দিতে চেয়েছিলেন, তাই এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ভাইদের জন্য যখন তাদের আসবাবপত্র প্রস্তুত করা হলো, তখন বিন ইয়ামিনের আসবাবপত্রের ভিতর একটা পানপাত্র লুকিয়ে রাখা হলো। অতপর কাফেলা রওনা দিতে আরম্ভ করলে এক ঘোষক চিৎকার করে বললো, ওহে কাফেলার লোকেরা! তোমরা নিশ্চয়ই চোর। ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ভাইয়েরা একথা অস্বীকার করলে ঘোষক বললো, তোমরা যদি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও, তাহলে এর কি শাস্তি গ্রহণ করবে? হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ভাইয়েরা বললো, যার আসবাবপত্রে এটা পাওয়া যাবে, সেই তার বদলায় যাবে। আমরা অপরাধীদের এরকম শাস্তিই দিয়ে থাকি। এরপর তল্লাশি চালানো হলে পানপাত্রটি বিন ইয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে বের হলো। এভাবে পানপাত্রের বদলায় বিন ইয়ামিনকে আটক করা হলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

> "আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া ইউসুফের পক্ষে বাদশাহর ধর্ম অনুসারে আপন ভাইকে আটক করা সম্ভব ছিলোনা।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৭৬]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, মিসরের রাজকীয় আইন তখনো দেশে প্রচলিত ছিলো এবং সে আইন অনুসারে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম স্বীয় ভাই বিন ইয়ামিনকে চুরির দায়ে ভাইদের কাছ থেকে ধরে রাখতে পারতেননা। কিন্তু আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর ভাইদের মুখ দিয়ে একথা বলিয়ে নিলেন যে, যার আসবাবপত্র থেকে পানপাত্র পাওয়া যাবে তাকেই তার বিনিময়ে থেকে যেতে হবে। এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী বলেন ঃ

> "অর্থাৎ ভাইদের মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরুলো, যার কাছে জিনিসটা পাওয়া যাবে তাকে গোলাম বানিয়ে নাও। এজন্যই তাকে গ্রেফতার করা হলো। নচেৎ মিসরের আইন এরকম ছিলোনা। তারা নিজেদের স্বীকারোক্তিতেই ফেঁসে যায়। এমন ফন্দি যদি না করা হতো তাহলে রাজকীয় আইন অনুসারে বিন ইয়ামিনকে আটক করা ছাড়া কোনো উপায় ছিলোনা।"

তাই বলে একথা বলা চলেনা যে, মিসরের মন্ত্রীত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম ইসলাম প্রচারের কাজ করেননি কিংবা নিজের নবুয়্যতের কথা ব্যক্ত করা থেকে বিরত থেকেছেন। বরঞ্চ তিনি জেলে থাকাকালেই তাওহীদের মর্মবাণী প্রচার করা শুরু করে দিয়েছিলেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম নিজের সহবন্দীদ্বয়কে সম্বোধন করে বলেন ঃ

"হে আমার কারা বন্দীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রভু ভালো, না একমাত্র মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্? তোমরা যেসব সত্তার পূজা করো সেগুলোতো কেবল তোমাদেরই নির্ধারিত কতকগুলো নাম ছাড়া আর কিছু নয়। যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। বিচার ফায়সালা ও শাসন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র। তিনি আদেশ দিয়েছেন, তাঁর ব্যতীত আর কারোর ইবাদত করোনা।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৩৯-৪০]

এমনিভাবে এটাও ধরে নেয়া যায় যে, মন্ত্রী হওয়ার পরও হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম ইসলাম প্রচারের কাজ অবশ্যই অব্যাহত রেখেছিলেন। তবে এ আয়াতগুলো থেকে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম একটা অনৈসলামিক সরকারের সদস্য হয়েছিলেন নিজেরই আগ্রহ ও আবেদনক্রমে। আর তাঁর সরকারের সদস্য হওয়ার পরও দেশে অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থা এবং অনৈসলামিক আইনই চালু ছিলো। তাঁর এ কাজে আল্লাহ্র তরফ থেকে কোনো তিরস্কারতো করাই হয়নি, অধিকন্তু তাঁর এক রকম প্রশংসাই করা হয়েছে। কেননা হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের মিসরের ভূখন্ডে প্রতিষ্ঠা লাভ করাকে আল্লাহ্র পুরস্কার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

"এভাবেই আমি ইউসুফকে সেই ভূখন্ডে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে সে তার যেখানেই ইচ্ছা নিজের স্থান করে নিতে পারে। আমি যাকে চাই, আমার অনুগ্রহে সিক্ত করি আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার আমি কখনো বিনষ্ট করিনা।"

এথেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সাধারণ মুসলমানতো দূরের কথা নবীদের পক্ষেও অনৈসলামিক সরকারের সদস্য হওয়া বৈধ। শুধু বৈধই নয়, ক্ষেত্র বিশেষে ফরযে কিফায়ার মতো অপরিহার্য কর্তব্যও বটে। কেননা হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের নিজ আগ্রহে মিসরের অর্থ ভান্ডারের দায়িত্বশীল হওয়া থেকে প্রমাাণিত হয়, এ কাজকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম নিজের জন্যে কেবল বৈধ নয়, কর্তব্যও মনে করতেন। তা না হলে ফিরাউনের কাছে তিনি কখনো এ ব্যাপারে নিজের অভিলাষ প্রকাশ করতেননা এবং এরূপ অভিলাষ প্রকাশ করার সময় নিজের অভিজ্ঞ ও রক্ষক হওয়ার কথাও ব্যক্ত করতেননা। কেননা তাঁর মতে যদি মিসরের ওজারতীর দায়িত্ব গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য না হতো, তাহলে তাঁর পক্ষে নিজেকে অভিজ্ঞ ও রক্ষক বলা অবান্তর আত্মপ্রশংসার পর্যায়ে পড়ে।

[এরপর তিনি নিজ বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকজন মনীষীর বক্তব্য উল্লেখ করেন। নিজের পক্ষ থেকে কিছু যুক্তিও পেশ করার চেষ্টা করেন। তাছাড়া হাবশার হিজরত থেকেও যুক্তি গ্রহণ করেন। যেহেতু তার যুক্তি প্রমাণের মণিমুক্তা উপরে এসে গেছে তাই দীর্ঘায়িত হবার ভয়ে বাকী অংশ এখানে উল্লেখ করা হলোনা।]

জবাব

আমি জনাব খান বাহাদুর সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞ যে, তিনি প্রশ্নটার অবতারণা করে আমাকে আরো একবার আমার দৃষ্টিভংগি পরিস্কারভাবে তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি শুধু এই আশায় এ আলোচনায় সময় ব্যয় করছি যে, এতে করে বহু

সংখ্যক সত্যানুসন্ধানী মানুষ সেইসব বিভ্রান্তিকর যুক্তির জবাব পেয়ে যাবেন, যেগুলো আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য শক্তি বা কর্তৃপক্ষের আনুগত্য করা অথবা অন্য কথায় আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য শক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করাকে বৈধ এবং কুফরী শাসন ব্যবস্থার গোলামী করাকে মুবাহ এমনকি ফরজে কিফায়া সাব্যস্ত করার জন্য পেশ করা হয়ে থাকে।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ঘটনার আলোচ্য দিকটি নিয়ে ইতিপূর্বে আমি দুবার আলোচনা করেছি। তন্মধ্যে প্রথম আলোচনাটা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে ও যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছিলো। আর দ্বিতীয়টা ছিলো সংক্ষিপ্ত। কিন্তু খান বাহাদুর সাহেব বিস্তারিত আলোচনাটা বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তুলেছেন। এটা কোন্ কারণে করলেন জানিনা। অথচ তিনি স্বীয় নিবন্ধে যেসব আপত্তি তুলেছেন, তার অধিকাংশ বরং সম্ভবত সব কটারই জবাব আমার প্রথম আলোচনায় পাওয়া যেতে পারতো।[১] সে যা হোক, এ পাশ কাটানোর কারণ যেটাই হোকনা কেন, আমাদের সামনে এর কল্যাণকর দিকটাই প্রধান হয়ে ফুটে উঠেছে। যে কথাগুলো আমরা নিজেরা বারংবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিষ্কার করে বলতে পারতাম না, অন্যদের খোঁচানোতে তা স্পষ্ট করে বলার সুযোগ আমাদের হস্তগত হয়েছে।

ইসলামে কি স্ববিরোধীতা আছে?

দুনিয়াতে একজন কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন ও সুস্থ বিবেকধারী মানুষের কাছ থেকে যেসব জিনিস আশা করা হয়, তার মধ্যে পয়লা জিনিস সম্ভবত এটাই যে, তার কথাবার্তা যেনো পরস্পর বিরোধী না হয়। একজন স্বল্প বুদ্ধির মুর্খ গোঁয়ার লোকও যখন কাউকে এ ধরনের পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা বলতে দেখে, তখন সংগে সংগেই তাতে আপত্তি তোলে। কেননা তারা অমন স্থূল বুদ্ধিও স্ববিরোধী কথাবার্তার বোকামী সহ্য করতে পারেনা। কিন্তু এটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, অত্যন্ত নিম্নমানের বুদ্ধির লোকের কাছ থেকেও যা আশা করা যায়না, সেটাই সেই আল্লাহ্র কাছ থেকে আশা করা হচ্ছে, যিনি নিজেই বিবেকবুদ্ধির সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত প্রজ্ঞা ও সুক্ষ্মজ্ঞানের অধিকারী। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আল্লাহ্র কাছ থেকে এহেন চরম নির্বুদ্ধিতা যারা আশা করছে, তারা কোনো অজ্ঞ ও নির্বোধ লোক নয়, বরং সারা দুনিয়ার মানুষকে জ্ঞান ও বুদ্ধির সবক শেখানোর কাজে নিয়োজিত বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এই পন্ডিতদের ক্ষুরধার বুদ্ধি নিরন্তর যুদ্ধে লিপ্ত। এমন সচেতন ও জাগ্রত বিবেকের অধিকারী হয়েও তারা চান এবং আশা করেন যে, আল্লাহ্র কথার স্ববিরোধীতা থাকুক। অর্থাৎ তিনি একদিকে বলবেন যে, আমি আকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট। আবার অপরদিকে তিনি পৃথিবীর কোনো কোনো অংশে অন্যের রাজত্ব ও আধিপত্য বহাল থাকাকেও স্বীকার করে নেবেন। একদিকে তিনি বলবেন, তোমরা সকলে একমাত্র আমার হুকুমের আনুগত্য করো। পরক্ষণে তিনিই আবার মানুষকে

---

১. এ বইয়ের ইসলাম ও কর্তৃত্ব শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সেইসব শাসকের আনুগত্য করার অনুমতি দেবেন, এমনকি আনুগত্য করাকে ফরয পর্যন্ত ঘোষণা করবেন, যেসব শাসক আল্লাহ্‌র আদেশের সার্টিফিকেট ছাড়াই বরঞ্চ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ দান করে থাকে। তিনি মানুষের জন্য একটা আইন রচনাও করবেন এবং একথাও ঘোষণা করবেন যে, এটাই আমার আইন, এ আইন ছাড়া আর সব কিছুই বাতিল। আবার সেই সাথে অন্যান্য আইন প্রবর্তন ও প্রচলনকেও বৈধ করে দেবেন এবং যে মানুষের জন্য তিনি নিজে আইন রচনা করেছেন, সেই মানুষকেই এ "অধিকার" দেবেন যে, ইচ্ছা হয় তারা নিজেরা নিজেদের জন্য কোনো আইন রচনা করে নিক, নতুবা অন্য কারো আইন ধার করে এনে অনুসরণ করতে থাকুক। পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্‌র দীন গ্রহণের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর নবীদেরকেও পাঠাবেন, আবার সেই নবীদেরকেই বা তাঁদের কাউকে এ অনুমতিও দেবেন [এমনকি খান বাহাদুর সাহেবের বক্তব্য অনুসারে এজন্য তাদেরকে অভিনন্দিতও করবেন] যে, আল্লাহ্‌র এ দীন ছাড়া অন্য কোনো দীনের আওতাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কর্মচারীও ভৃত্য হয়ে যাক এবং তাকে সফলতার সাথে পরিচালনা করতে নিজেদের যোগ্যতা ও প্রতিভাকে কাজে লাগাক। তিনি সারা দুনিয়ার অধিবাসীদের মধ্য থেকে বাছাই করে একটি বিশেষ উম্মত এ উদ্দেশ্যে তৈরী করবেন যে, তারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত সৎ কাজগুলোর আদেশ দেবে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক ধিকৃত অসৎ কাজগুলোকে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করবে। আবার খোদাদ্রোহীদের দৃষ্টিতে ভালো লাগা অসৎ কাজগুলোকে কায়েম করা ও চালু রাখার কাজে অংশ গ্রহণ এবং তাদের দৃষ্টিতে খারাপ বলে বিবেচিত সৎ কাজগুলোকে উৎখাত করা ও দমিয়ে দেয়ার কাজে ব্যবহৃত ও নিয়োজিত হওয়াকে সেই উম্মতের জন্যই বৈধও করে দেবেন, এমনকি তার কোনো কোনো "মনোনীত" বান্দার জন্য এ কাজকে ফরযে কিফায়াও ঘোষণা করবেন। এগুলো এমন সুস্পষ্ট স্ববিরোধী ব্যাপার যে, এগুলোর স্ববিরোধীতা বুঝতে কোনো গভীর চিন্তা গবেষণার প্রয়োজন পড়েনা। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, যারা কুরআনের তাফসীর লেখা এবং ফিকহ্ ও অন্যান্য যুক্তিনির্ভর বিদ্যায় অধ্যাপনা করার মতো পারদর্শিতা রাখেন, যারা কালেক্টরী ও দেওয়ানীর মতো বড় বড় পদের গুরুদায়িত্ব বহনের ক্ষমতা ও দক্ষতার অধিকারী, তারা এসব দু'মুখো কার্যকলাপে যেনো কোনো স্ববিরোধীতাই দেখতে পাননা। এমনকি স্বয়ং বিশ্বপ্রতিপালক সম্পর্কে তাদের ধ্যান ধারণা এতোই খারাপ যে, একজন নিরেট মূর্খ গোঁয়ার লোকও তার আশপাশের কোনো বন্ধুর মধ্যে যেসব বেকুফী ও গোঁয়ার্তুমী দেখে তা সহ্য করতে পারেনা। তা স্বয়ং আল্লাহ্‌র মধ্যেও থাকা সম্ভব বলে তারা মনে করেন। খান বাহাদুর সাহেব তাঁর উক্ত নিবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

> "পরবর্তী একটি আয়াত থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রমাণিত হয়, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের মিসরীয় অর্থ ভান্ডারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের পরও ফিরাউনের রাজত্ব বহাল ছিলো এবং ফিরাউনের বিধি বিধানই মিসরে প্রচলিত ছিলো।

"বাদশাহর প্রচলিত বিধান অনুযায়ী তিনি কখনো আপন ভাইকে নিতে পারতেননা, আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৭৬]
এবাক্যটি সুস্পষ্টরূপে বলে দিচ্ছে যে, ফিরাউনের রাজকীয় আইনই তখন পর্যন্ত মিসরে চালু ছিলো।"

দীন বলতে কি বুঝায়?

এ কথাগুলো লেখার সময় খান বাহাদুর সাহেবকে একটা নির্দিষ্ট তত্ত্ব প্রমাণ করার নেশায় এমনভাবে পেয়ে বসেছিলো যে, তাঁর এই মনগড়া তাফসীরের দরুন এখানে কুরআনের বর্ণনায় যে সুস্পষ্ট স্ববিরোধীতার উদ্ভব হয়, তা ক্ষণিকের জন্যও ভেবে দেখার ফুরসত তিনি পাননি। তাঁকে অনুরোধ করি, তিনি যেনো আমার দৃষ্টি আকর্ষণে সাড়া দিয়ে এখন অন্তত একটু ভেবে দেখেন। তাঁর উদ্ধৃত আয়াতে ফিরউনের সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধানকে "দীনুল মালিক" অর্থাৎ "রাজকীয় দীন" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এথেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, 'দীন' শুধু উপাসনালয়ে যে পূজা অর্চনা করা হয় তার নাম নয়, বরং যার বলে পুলিশ অপরাধীদেরকে পাকড়াও করে, যার অধীনে আদালত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার ফায়সালা করে, যার অনুসরণে দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয় এবং যার ওপর সমাজ ও সভ্যতার গোটা কাঠামো প্রতিষ্ঠিত, সেই আইন কানুন ও বিধি বিধানের নাম 'দীন'। মানব জীবনের এই সকল দিক ও বিভাগ সামগ্রিকভাবে যে নিয়ম নীতি ও প্রথা পদ্ধতি অনুসারে চলে, কুরআনী পরিভাষায় তাকেই 'দীন' বলা হয়। যেহেতু মিসরে প্রচলিত তৎকালীন নিয়ম নীতি ও প্রথা পদ্ধতি ফিরাউনের ইচ্ছা থেকেই উদগত ও উৎপন্ন হতো এবং তার সার্বভৌম ও নিরংকুশ ক্ষমতাই ছিলো তার উৎপত্তির উৎস ও ভিত্তি, তাই কুরআন সেটাকে "দীনুল মালিক" [রাজার দীন] বলে আখ্যায়িত করেছে। এথেকে বুঝা গেল যে, দীন" শুধু মসজিদের চার দেয়ালে এবং নামায রোযার মধ্যেই সীমিত উপাসনা ও পূজা পার্বনের অনুষ্ঠানের নাম নয়, বরং এটাও আল্লাহ্র গোটা শরীয়ত ব্যবস্থার আনুগত্যের নাম, যার উদ্ভব ঘটে আল্লাহ্র ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি থেকে, যার উৎপত্তি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব থেকে এবং যা মানুষের সামাজিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগ নিয়ে ব্যস্ত ও বিস্তৃত। এখন প্রশ্ন হলো, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম কোন্ কাজের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন? "আল্লাহ্র দীনের দাওয়াত দিতে, না, "রাজার দীন"কে চালু করতে এবং উৎকর্ষ দিতে? খান বাহাদুর সাহেবের ব্যাখ্যা এবং তিনি যে মনীষীদের নামোচ্চারণ করে আমাদেরকে ভড়কিয়ে দিতে চান তাদের তাফসীর যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে এ কথাও মেনে নিতে হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা একদিকে তাঁর নবীকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন, তিনি যেনো তাঁর বান্দাদেরকে- বিশেষত মিসরবাসী বান্দাদেরকে "আল্লাহ্র দীন' গ্রহণের দাওয়াত দেন, আর অপরদিকে সেই নবী স্বয়ং আল্লাহ্র নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে "রাজার দীন" কায়েম করা ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত হয়ে গেলেন। আরো মজার ব্যাপার হলো, এমন সুস্পষ্ট পরস্পর বিরোধী কার্যকলাপে কোনো বৈপরিত্য ও বৈসাদৃশ্য আছে কিনা আল্লাহ্ তা টেরই পেলেননা,

বরং নবীর ঐ কার্যকলাপকে খানবাহাদুর সাহেবের ভাষায় অভিনন্দন জানাতে ও প্রশংসা করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, কুফরী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাঁর নবীর ওজারতী লাভকে "খোদায়ী পুরস্কার" বলে আখ্যায়িত করতে লাগলেন। অর্থাৎ কিনা আল্লাহ্ মিয়া, নাউজুবিল্লাহ, আমাদের যামানার সেইসব ধর্মপ্রাণ মুরব্বীদের মতো, যারা নিজেরা তো কপালে কালো দাগ নিয়ে জায়নামাযে সিজদার ওপর সিজদা দিয়ে যান, কিন্তু স্বীয় পুত্ররত্ন যখন এম এ পাস করে আধা ইংরেজ হয়ে খৃষ্টান সরকারের অধীনে কাস্টম ইন্সপেক্টরের চাকরি পায়, তখন সেই আপাদমস্তক ধর্মের সাজে সজ্জিত মুরব্বী এজন্যে আল্লাহ্র শোকর আদায় করেন যে, তিনি তার বংশধরকে স্বীয় অনুগ্রহে সিক্ত করেছেন।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে খান বাহাদুর সাহেব আবার বলেন ঃ

"তাই বলে একথা বলা যায়না যে, মিসরের ওজারতীতে অভিষিক্ত হবার পর হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম ইসলাম প্রচারের কাজ করেননি, কিংবা নিজের নবূয়্যতের ঘোষণা দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন। বরঞ্চ তিনি জেলে থাকাকালেই তাওহীদের মর্মবাণীর প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন। ....তবে যেকথা এ আয়াত থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় তা হলো, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম একটি অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থায় নিজ আগ্রহে এবং আবেদনক্রমেই সদস্য হয়েছিলেন এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সে সরকারের সদস্য হওয়ার পরও দেশে অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থা এবং অনৈসলামিক আইনই কার্যকর ছিলো।"

এখানেও আবার সেই একই স্ববিরোধীতা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। অথচ খান বাহাদুর সাহেব নিজ মতের চিন্তায় বিভোর থাকার দরুন সেদিকে মনোযোগ দিতে পারেননি। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম যে তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রচার করেছিলেন সেটা কি ধরনের একত্ববাদ ছিলো? এই একত্ববাদের অর্থ যদি এটাই হয়ে থাকে যে, উপাসনালয়ে যে উপাসনা করা হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রশাসন ও নিয়ম শৃংখলা যে আইনানুগত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তার সবই হবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য, অন্য কথায় যার অর্থ হলো, সমগ্র জীবন আল্লাহ্র আনুগত্যের আওতাধীন হয়ে যাওয়া, তাহলে দেখা যায়, খান বাহাদুর সাহেবের ব্যাখ্যা অনুসারে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম বাদশাহ্র চাকরি করে নিজেই নিজের প্রচারিত সত্যের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। আর যদি তাঁর প্রচারিত তত্ত্ব এই হয়ে থাকে যে, উপাসনালয়ে আল্লাহ্র বিধান চালু হবে আর দেশ ও সমাজের গোটা ব্যবস্থা চলতে থাকবে রাজার বিধান অনুসারে, তাহলে এটা যে একত্ববাদের নয় বরং দ্বিত্ববাদের তথা দুমুখো নীতির প্রচার ছিলো, সেটা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

এখানে এ প্রশ্নও না উঠে পারেনা যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম তাহলে কোন্ অর্থে নিজের নবূয়্যতের ঘোষণা দিয়েছিলেন? তিনি যদি বাদশাহসহ সকল মানুষকে বলে থাকেন যে, আমি আসমান ও যমীনের মালিকের প্রতিনিধি! সুতরাং তোমরা আমার আনুগত্য করো। যেমন সকল নবী বলতেন ঃ

"আল্লাহ্কে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো।" [সূরা শুয়ারা ঃ ১০৮]।

তাহলে এরূপ ঘোষণার সাথে তাঁর একজন অমুসলিম রাজার প্রভুত্ব মেনে নেয়া এবং তাঁর আনুগত্যের আওতায় ইসলামী রাষ্ট্রের পরিবর্তে ইসলাম বিরোধী রাষ্ট্রের খিদমত করা কিছুতেই সামঞ্জস্যশীল হতে পারেনা। আর যদি তিনি একথা বলে থাকেন যে, ওহে জনগণ! আমি যদিও আকাশ ও পৃথিবীর রাজাধিরাজের প্রতিনিধি, তথাপি আমার নীতি হলো, মিসরের বাদশাহর আনুগত্য করবো আর তোমাদেরকেও দাওয়াত দিচ্ছি যে, আমার নয় বরং বাদশারই আনুগত্য করো, তাহলে এটা একটা সুস্পষ্ট স্ববিরোধী বক্তব্য, যাকে স্বাভাবিক ভাবগাম্ভীর্যের সাথে গ্রহণ করার তো প্রশ্নই উঠেনা, বরং তা অট্টহাসি দিয়ে উড়িয়ে দেয়ারই যোগ্য। আর এ ধরনের ঘোষণাকারীর মন্ত্রণালয়ে নয় বরং পাগলা গারদেই স্থান পাওয়ার কথা ছিলো। শুধু তাই নয়, কোনো আসমানী কিতাব যদি একদিকে এরূপ মূলনীতি বর্ণনা করে যে, আল্লাহ্ যাকেই রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন আল্লাহ্র নির্দেশে তার আনুগত্য করতে হবে।

> "আমরা যে রসূলই পাঠিয়েছি, পাঠিয়েছি এজন্যে যেনো আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হয়।" [সূরা আননিসা ঃ ৬৪]

অপরদিকে সেই কিতাবই যদি এমন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্র রসূল বলেও ঘোষণা করে যিনি আনুগত্য লাভ করাতো দূরে থাক, নিজেই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের আনুগত্য করেছেন এবং জনগণকেও গায়রুল্লাহর আনুগত্য করতে বলেছেন, তাহলে এ ধরনের কিতাবের ওপর আদৌ ঈমান আনা সমিচীন হতে পারেনা। কুরআন যে স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষে থেকেই প্রেরিত গ্রন্থ, সেকথা প্রমাণ করার জন্য সে যে মাপকাঠি দিয়েছে সেটি হচ্ছে ঃ

> "এ কিতাব যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারোর পাঠানো কিতাব হতো তাহলে মানুষ এতে অনেক স্ববিরোধী ও পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা দেখতে পেতো"। [সূরা আননিসা ঃ ৮২]

কিন্তু আমরা যদি জনাব খান বাহাদুর সাহেব ও তার সমমনা লোকদের ধ্যান ধারণা মেনে নিই, তাহলে দেখা যাবে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনায় এমন প্রকাশ্য স্ববিরোধীতা বিদ্যমান, যার দরুন কুরআন তার নিজেরই প্রতিষ্ঠিত মাপকাঠি অনুসারে আল্লাহ্র নয় বরং অন্য কারো গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর তাও কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট মানুষের গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবেনা।

আসল ব্যাপার হলো, খান বাহাদুর সাহেব যে চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি করছেন, তার পশ্চাতে নৈতিক অধোপতনের এক দীর্ঘ ও মর্মন্তুদ ইতিহাস রয়েছে।

ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে বিভাজনের ঐতিহাসিক এবং মানসিক পর্যালোচনা

মুসলমানরা যখন তাদের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে এবং তাদের সত্যিকার করণীয় কাজ পরিত্যাগ করে দুনিয়া পূজায় লিপ্ত হয়েছে, যখন দীনদারীর অর্থ তাদের কাছে হয়েছে ইবাদাত ও আচার আচরণে কিছু শরীয়তসম্মত রীতি নীতি মেনে চলা, তা সে জীবনের উদ্দেশ্য দুনিয়া পূজারীদের মতোই হোক না কেন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কর্তৃত্ব নেককার কিংবা পাপিষ্ঠ যাদের হাতেই থাকুক না কেন এবং

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব নীতিগত ও আদর্শগতভাবে ইসলাম হোক কিংবা ইসলামী **বিরোধী**। তখন এই উদাসীনতা ও শৈথিল্যের শাস্তি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এভাবেই দেয়া হয়েছে যে, তাদের বিরাট বিরাট অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী একে একে কাফেরদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা ও তাদের আলেম সমাজ তাকে শাস্তি মনে না করে এবং যে পাপের জন্য তাদের এ শাস্তি হয়েছে তার প্রতিকার না করে উল্টো এটাই ভাবতে শুরু করেছে যে, কাফের শাসিত ঐ রাষ্ট্র ও সমাজে কিভাবে "মুসলমানী জীবন" যাপন করা যায়। এজন্য "ইজতিরার" তথা "অনন্যোপায় অবস্থা"র ওজুহাত তুলে শরীয়তসম্মত মুসলমানী জীবনের এমন এক চিত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা অনৈসলামিক ও শরীয়ত বিরোধী সমাজ ও রাষ্ট্রে চালু রাখা যায়।

এর ফলে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আরো শাস্তির পালা শুরু হলো। তারা অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে, না গোমরাহীতে আরো দূরে সরে যায়, সেটা পরীক্ষা করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। যে অবস্থাটাকে প্রথমে একটা অনন্যোপায় অবস্থা ভাবা হয়েছিলো, আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি অনুসারে তা আরো বেড়ে গেলো এবং স্থায়ী ক্রমবর্ধমান ও অফুরন্ত আযাবের রূপ ধারণ করলো। প্রতিটি গোলামী মুসলমানদেরকে প্ররোচিত করতে থাগলো যে, একটা কুফরী ব্যবস্থার অধীন এবং তার অভ্যন্তরে ইসলামী জীবন যাপনের জন্য তোমরা যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছো, তা সংশোধিত করো এবং ক্রমান্বয়ে সংকুচিত করতে থাকো। কিন্তু আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আগত এসব আযাব মুসলমানদের সচেতন করতে পারলোনা। তারা স্থায়ীভাবে এই নীতি অবলম্বন করলো যে, অনন্যোপায় অবস্থায় যখন পড়েছি, তখন ইসলামী জীবনের পরিধি সংকুচিত করাই দরকার এবং কুফরীর আধিপত্য সম্প্রসারিত হতে থাকুক।

কিছুদিন যেতে না যেতে এই অনন্যোপায় গোলামীদশা তাদের বিবেককে দংশন করতে আরম্ভ করলো। কেননা অনন্যোপায় অবস্থার পশ্চাতে নিষিদ্ধতার ধারণা অবশ্যম্ভাবীরূপে বিদ্যমান থাকে। কোন বিবেকবান মানুষ এ সুস্পষ্ট ব্যাপারটা অনুভব না করে পারেনা যে, আপনি যখন নিছক অনন্যোপায় হওয়ার কারণে শূকরের গোশ্‌ত খাচ্ছেন, তখন শূকরের গোশ্‌ত যে হারাম, সে কথাটাতো আপনার ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। অতপর যখন ওটা মূলত হারাম জেনেও বাধ্য হয়ে খান, তখন আপনার মনে তার প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা না থেকে পারেনা। এটা একেবারেই অসম্ভব যে, আপনি মজা করে করে পেট ভরে খাবেন এবং ওটার কাবাব কোর্মা ও পোলাও বানানের চিন্তা করবেন। এধরনের ঘৃণা ও অবস্থার মানসিকতা সেই ক্ষেত্রেও অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয়, যেখানে আপনি সামগ্রিক জীবন ধারাকে মৌলিকভাবে হারাম বলে জানা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অপারগতা ও বিকল্প ব্যবস্থা না থাকর কারণে সাময়িকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু গোটা একটা জাতির পক্ষে এ ধরনের দোটানা জীবন যাপন সম্ভব নয়। একটি জাতির পক্ষে সফল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে সার্বক্ষণিকভাবে এরূপ জীবন ধারণ করা কার্যত সম্ভব নয় যে, নিজেকে শরীয়তের দিক দিয়ে এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অনন্যোপায় ও অক্ষমও ভাবতে থাকবে, আবার সে সমসাময়িক জীবনধারা থেকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সাথে পাশ কাটিয়েও চলতে থাকবে এবং শুধামাত্র যতোটুকু না

হলেই চলেনা ততোটুকু সম্পর্ক বজায় রাখবে। এধরনের পরিস্থিতি অল্প সময়ের জন্য ছাড়া বরদাশ্‌ত করা সম্ভব নয়। অচিরেই মানুষ এর আঘাতে জর্জরিত হয়ে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। মুসলমানদের মধ্যে এই ক্লান্তি ও অবসাদ যথাসময়েই এসেছে। কিন্তু আগে থেকে বলে আসা ধর্মীয় পশ্চাদপদতা এই অবসন্ন মস্তিষ্কগুলোকে নিজেদের ক্রুটি খতিয়ে দেখার দিকে মনোনিবেশ করতে দেয়নি। "কুফরী ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামী জীবন যাপন সম্ভব" এই মর্মে তারা ইতিপূর্বে যে মত স্থির করেছিলো, তা যে কতখানি ভ্রান্ত, সেকথা পুনরায় ভেবে দেখতে তাদের উদ্বুদ্ধ করেনি। যে অনন্যোপায় অবস্থার কারণে তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ জিনিষের মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছিলো এবং নোংরা অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, সেই অনন্যোপায় অবস্থার অবসান কিভাবে ঘটানো যায়, তা চিন্তা করার সুযোগ দেয়নি। বরং ক্রমাগত ধর্মীয় অধপতনের দরুন তারা একথাই ভাবতে প্ররোচিত হয়েছে যে, এই "অনন্যোপায় অবস্থার" অজুহাতটাকেই শেষ করে দেয়া দরকার, যাতে যেসব নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তুর বাধা বিপত্তিতে কুফরী সমাজ ব্যবস্থায় তাদের উন্নতি ও বিলাসিতা ব্যাহত হয়ে চলেছে, তার অবসান ঘটে এবং তা হালাল ও বৈধ হয়ে যায়।

এই উদ্দেশ্যে ধর্ম সম্পর্কে এক নতুন মতবাদ সৃষ্টি করা হয়েছে। মতবাদটা হলো, ধর্মের সম্পর্ক শুধু আকীদা বিশ্বাস, ইবাদত, উপাসনা ও বিয়ে তালাকের মতো কয়েকটা সামাজিক ব্যাপারের সাথে। কোনো শাসন ব্যবস্থা যদি এসব ব্যাপারে মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলেই ইসলামী জীবনের আসল উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়। এটুকু হলেই কুফরী রাষ্ট্র মুসলমানদের জন্য শান্তির আবাস ভূমিতে পরিণত হয়। তার আনুগত্য করা ও আইন মান্য করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই রাষ্ট্রের অধীন যাবতীয় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড [যা কিনা উক্ত নয়া মতবাদ অনুসারে ধর্মের বিপরীত দুনিয়াবী বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়] উক্ত কুফরীভিত্তিক আইন কানুন অনুসারেই সম্পন্ন হওয়া উচিত। আর এ রাষ্ট্রের আইনগত ও প্রশাসনিক অবকাঠামোকে পরিচালনা, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করাতে মুসলমানদের জন্যে কোনো আপত্তি নেই।

কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র "আপত্তি না থাকা" এবং হালাল ও বৈধ হয়ে যাওয়া পর্যন্তই থেমে থাকলোনা। অচিরেই অনৈসলামিক রাষ্ট্রে মুসলমানরা জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদে তাদের নব্য বংশধরকে কুফরী ব্যবস্থার সেবায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টায় নিয়োজিত হতে বাধ্য হলো, যাতে করে প্রথম দিকের কিছুকাল "আপত্তি" থাকার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ হয়। এজন্য সর্বশেষ যে যুক্তিটি তুলে ধরা হয় তা এই জন্য যে, মুসলমানদের উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের বেঁচে থাকাটাই সম্ভব নয়- যদি না তারা অনৈসলামি রাষ্ট্রের বিচার বিভাগে, আইন সভায়, প্রশাসনে, সামরিক বাহিনীতে, শিল্পকারখানায়- এক কথায় সকল বিভাগে বেশী বেশী করে অংশ গ্রহণ না করে। নচেৎ মুসলিম উম্মাহ্‌র সার্বিক ধ্বংস অথবা কমপক্ষে উন্নতি ও অগ্রসরতার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। এ যুক্তির ফলে সহসাই যে জিনিস একদিন আগে বৈধ বা মোবাহের পর্যায়ে ছিলো তা ফরযের পর্যায়ে উন্নীত

হলো। আর সবাই যদি নাও পারে, তবু অন্তত মুসলমনদের মধ্য থেকে একটা গোষ্ঠী যেন এ ফরয পালন করতে এগিয়ে আসা অব্যাহত রাখে। অর্থাৎ কিনা, আল্লাহর হুকুম যেখানে এরূপ ছিলো ঃ

"মুসলমনদের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে অন্তত একদল লোকের ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য বেরিয়ে পড়া উচিত, যাতে তারা ফিরে এসে নিজ জাতিকে সতর্ক করতে পারে। এভাবে আশা করা যায় যে, তারা সংশোধিত হবে।"

সেখানে আল্লাহ্‌র হুকুম তাদের দাবীতে এরূপ দাঁড়ালো ঃ

"মুসলমানদের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে অন্তত একটি গোষ্ঠীর কুফর সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য বেরিয়ে পড়া উচিত, যাতে তারা ফিরে এসে নিজ জাতিকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। এভাবে আশা করা যায়, তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।"

আর যেখানে আল্লাহ্‌র হুকুম ছিলো ঃ

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একদল লোক অবশ্যই গড়ে ওঠা চাই যারা মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকবে, ভালো কজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।"

সেখানে এই নব্য মতবাদের ধারক বাহকদের দাবীতে আল্লাহ্‌র হুকুম দাঁড়লো এরূপ ঃ

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি গোষ্ঠী অবশ্যই গড়ে ওঠা চাই যারা মানুষকে অকল্যাণের দিকে ডাকবে, মন্দ কাজের আদেশ দেবে ও ভালো কাজ থেকে বিরত রাখবে।"

ইসলামকে বিকৃত করার এই সর্বনাশা অপকীর্তির বদৌলতেই বড় বড় পরহেজগার ও ধর্মপ্রাণ লোক তসবীহ টিপতে টিপতে ইংরেজদের অধীনে ওকালতি ও মুনসেফীর পেশায় প্রবেশ করলেন। এভাবে তারা যে আইনের প্রতি তাদের ঈমান নেই, সেই আইন অনুসারে মানুষের বিরোধের মীমাংসা ও ফায়সালা করতে লাগলেন, আর যে আইনের প্রতি তাদের ঈমান ছিলো, তা কেবল ঘরে বসে তেলাওয়াত করতে লাগলেন। এ বিকৃতির দরুনই বড় বড় মুত্তাকী ও নেক্কার লোকদের সন্তানরা আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হলো এবং সেখান থেকে ধর্মহীনতা, বস্তুবাদ ও চরিত্রহীনতার সবক নিয়ে নিয়ে বেরুলো। অতপর তারা সেই অনৈসলামিক রাষ্ট্র ও সমাজের শুধু কর্মের মাধ্যমে নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরিত্র ও আকীদা বিসর্জন দিয়েও খিদমত করতে লাগলো। অথচ সেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শুরুতে তাদের পূর্বপুরুষদের দুর্বলতা ও শৈথিল্যের কারণে তাদের ওপর কেবল ওপর থেকেই চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এই বিকৃতি শেষ পর্যন্ত এমন সর্বাত্মক রূপ ধারণ করলো যে, পুরুষদেরকে অতিক্রম করে নারীদেরকেও তার সর্বব্যাপী জাহেলিয়াত, গোমরাহী ও চরিত্র ভ্রষ্টতার সয়লাবে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। তথাকথিত সেই "ফরযে কিফায়া" যা পালন করার জন্য প্রথমে পুরুষরা এগিয়ে গিয়েছিলো, এখন নারীদের ওপরও তা আরোপিত হলো। আর এই বেচারীরাও শেষ পর্যন্ত এই "ধর্মীয় খিদমত" আঞ্জাম দিতে এগিয়ে আসতে

বাধ্য হলো। এগিয়ে না এলে অমুসলিমরা তাদেরকে পেছনে ফেলে যাবে এই আশংকা ছিল।[১]

এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই যে, ইসলামের এই বিকৃত উপলব্ধি ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দানের পালা আজকেই নতুন শুরু হলো। আজ থেকে কয়েক শ' বছর আগে যখন তাতারী কাফিররা মুসলমানদের ওপর চড়াও হয়, তখন থেকেই এর সূচনা। "কুফরী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন কিভাবে ইসলামী জীবন যাপন করা যায়" সে ফর্মূলা যে সেযুগের আলেমরা শুধু আবিষ্কারই করেননি, বরং বড় বড় আলেম ও নেক্কার লোকেরা স্বয়ং সে আমলেই অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সেবা করতে আরম্ভ করেন। তাদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যাও প্রচুর, যাদের লেখা কিতাব পড়ে পড়ে আজকাল আমাদের আরবী মাদ্রাসাগুলোতে আলেম ও মুফতী তৈরী হয়ে থাকে। এই প্রচীনত্বের কারণেই এ ভুল এখন একটা পবিত্র ভুলে পরিণত হয়েছে। এযুগের প্রায় সকল মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফিকাহবিদকে যদি একই বিভ্রান্তিতে লিপ্ত দেখা যায়, তাহলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তবে একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, একটা ভুল অনেকদিন ধরে চলে আসছে বলেই তা বিশুদ্ধ ও নির্ভুল হয়ে যেতে পারেনা। আর বহু নামজাদা ব্যক্তি এতে আক্রান্ত- এই যুক্তিতেও তা সঠিক হয়ে যেতে পারেনা। সত্যকে প্রমাণিত করতে হলে একমাত্র আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লামের সুন্নাহ দ্বারাই করতে হবে।

অধপতনের এই যুগটা শুরু হয়েছে প্রাথমিক অনন্যোপায় অবস্থা থেকে উদ্ভুত "কুফরীর অধীনে ইসলাম" এই মতবাদ দিয়ে। অতপর ক্রমান্বয়ে কুফরী ব্যবস্থার খেদমত করা জায়েয হলো, তারপর মুস্তাহাব হলো, অতপর তা 'ফরযে কিফায়া' পর্যন্ত গিয়ে পৌছলো। এমনকি সর্বশেষে নামতে নামতে "ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানকারী শাসকদের আনুগত্যই ইসলামের যথার্থ দাবী" এহেন চরম অবমাননাকর ধারণা পোষণের মত সর্বনিম্ন গহ্বরে গিয়ে তা পতিত হলো। পতনোন্মুখ যুগের মুসলমানদের বরাবর এই চেষ্টায় নিয়োজিত থাকতে হয়েছে যে, পতনের প্রত্যেকটা স্তরে তাদের আরো নীচে নামার জন্য দলীল প্রমাণ যা কিছু প্রয়োজন, আল্লাহর দীন থেকেই সংগ্রহ করা চাই। এই তাগিদ অনুভব করার মূলে তো তাদের ধারণা মোতাবেক এই ফর্মূলাই কার্যকর ছিলো যে, "যেহেতু আল্লাহ্‌র দীন আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট, তাই এখন যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তা পূরণের জন্যও এই দীন থেকেই আমাদের পথ নির্দেশ লাভ করতে হবে।" কিন্তু আসলে এই লোক দেখানো ফর্মূলার পেছনে যে প্রকৃত ফর্মূলা লুকিয়ে ছিলো এবং যার ভিত্তিতে তারা বাস্তবে কর্মতৎপর ছিলো তা ছিলো এই যে, "আমরা যখন আল্লাহর দীনের প্রতি এতো অনুগ্রহ করেছি, তার প্রতি ঈমান এনে তাকে ধন্য করেছি, তখন এর বিনিময়ে ইসলামের ওপর

---

১. পাকিস্তান হওয়ার পর এব্যাপারে আরো অগ্রগতি হয়েছে। এখন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা যদি উন্মুক্ত ময়দানে সামরিক কুচকাওয়াজ না করে, মুসলিম মেয়েরা যদি নার্সিংয়ের ট্রেনিং নিতে পাশ্চাত্য দেশে না যায় এবং বিদেশে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পুরুষরা ছাড়া মেয়েরাও পালন না করে তাহলে তা মুসলিম উম্মাহ্‌র টিকে থাকার আর কোন উপায়ই নেই।

অন্ততপক্ষে এটুকু দায়িত্ব বর্তায় যে, সে আমাদের আগে আগে না চলে পেছনে চলতে আরম্ভ করবে।" অর্থাৎ এখন আর তার সাথে আমাদের এরূপ সম্পর্ক থাকবেনা যে, আমরা তাকে নিজেদের ওপর ও আল্লাহর যমীনের ওপর কায়েম করার চেষ্টা চালাবো এবং এই চেষ্টার ক্ষেত্রে আমরা যেসব প্রয়োজনের সম্মুখীন হই, তা পূরণ করার দায়িত্ব সে গ্রহণ করবে। বরং এখন সম্পর্কের রূপরেখা হবে এরকম যে, আমরা ইসলামকে কায়েমের চেষ্টা তো দূরের কথা, তার চিন্তাও করবোনা। বরং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণের জন্য আমরা যেমন খুশী, যেখানে খুশী যাবো, ইসলাম আমাদের পেছনে পেছনে ঘুরতে থাকবে। আমরা যে কোনো বাতিল ধর্মের অনুসারী হই, যে কোনো বাতিল ব্যবস্থার গোলামী করি, ইসলামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে ধরনের জীবন পদ্ধতিই অবলম্ব করি, ইসলাম সেক্ষেত্রে আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার নিশ্চয়তা দেবে।" এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগি নিয়েই তারা কুরআন ও হাদীস মন্থন করে পথ নির্দেশের সন্ধানে ব্যাপৃত হলো। এর ফল এই দাঁড়ালো যে, সমগ্র কুরআনের আর কোথাও তাদের দৃষ্টি পড়লো না- সূরা আনকাবুতেও না, বাকারাতেও না, আল ইমরানেও না, আনফালেও না, তাওবাতেও না- বরং শুধুমাত্র সূরা ইউসুফের ওপর গিয়েই তাদের দৃষ্টি থমকে দাঁড়ালো। আর তাও শুধু খান বাহাদুর সাহেবের যুক্তি সংগ্রহের পছন্দমাফিক জায়গাগুলোতে। অনুরূপভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীরও আর কোথাও তাদের অনুকরণীয় আদর্শ মিললোনা, মক্কার তপ্ত মরুতেও নয়, তায়েফের পাথর বর্ষণেও নয়, বদর ও ওহুদের ময়দানেও নয় বরং শুধু এই ঘটনায় যে, মুসলমানদের একটি দল হিজরত করে আবিসিনিয়ায় গিয়েছিলো এবং সেখানে এক খৃষ্টান রাজার অধীন কয়েক বছর প্রজা হিসেবে বসবাস করেছিলো।

কিন্তু যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মানসিকতা নিয়ে নয়, বরং সত্যসন্ধানী মনোভাব নিয়ে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে চায়, তার জন্য এ প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্ববহ যে, প্রকৃত পক্ষে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের আলোচ্য ঘটনাবলী এবং আবিসিনিয়া হিজরতের বৃত্তান্ত থেকে এই বিশেষ মহলটি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান, সত্যিই কি সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অবকাশ আছে? বেশ, আপাতত না হয় ধরে নিলাম, অবকাশ আছে। অর্থাৎ একথা মেনে নেয়ার অবকাশ আছে যে, জনৈক নবী আল্লাহর নির্দেশে একটি অনৈসলামিক রাষ্ট্রের খিদমত করা এবং অনৈসলামিক আইন [রাজকীয় আইন] চালু করা ও কার্যকরী করার দায়িত্ব এই জন্য গ্রহণ করছিলেন যে, এটা মূলতই একটা অভিষ্ঠ ও করণীয় কাজ ছিলো। একথাও না হয় মেনে নিলাম যে, একটি মুসলিম দলকে কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে কেবল মসজিদের ভেতরে ইচ্ছামত ইবাদাত উপাসনা করা, বুকের ভেতরে কিছু আকীদা বিশ্বাস পোষণ করা এবং মুখ দিয়ে সেই বিশ্বাসের সপক্ষে কিছু উচ্ছাস প্রকাশের অনুমতি দিলেই সেই সমাজ ও রাষ্ট্রে মুসলমানদের সম্পূর্ণ উপযোগী আবাসভূমিতে পরিণত হয় আর এজন্যই মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। কিন্তু এরপর আরো কতগুলো প্রশ্ন জন্ম নেয়। সে প্রশ্নগুলো উপরোক্ত প্রশ্নের তুলনায় অনেক বেশী মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী। কেননা উপরোক্ত কথা দুটো মেনে নেয়ার পর নিম্নের প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে বের করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

কতিপয় মৌলিক প্রশ্ন ও সেগুলোর জবাব

১. আল্লাহ তায়ালা নবীদের মাধ্যমে মানব জাতির জন্য যে দীন বা জীবন বিধান পাঠিয়েছেন, তা কি শুধু উপাসনালয়ের জন্যই নির্দিষ্ট ছিলো, না সমগ্র মানব জীবনের জন্য?

২. যে সমস্ত নবী এই দীন নিয়ে এসেছেন, তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি একটাই ছিলো, নাকি এক এক জন এক এক রকমের কিংবা পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন?

৩. মানুষের কাছে আল্লাহর প্রকৃত দাবী কি? সমগ্র জীবনেই তাঁর দাসত্ব করুক এবং তাঁরই আইন ও বিধান অনুসারে কাজ করুক, নাকি কেবল পূজাটা তার করুক, আর বাদবাকী সমস্ত কর্মকান্ড যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করুক?

এ প্রশ্নগুলোর একটা জবাব এরূপ হতে পারে যে, আল্লাহ যে দীন পাঠিয়েছেন তার সম্পর্ক শুধু আজকাল "ধর্মীয় জীবন" বলতে যে সীমাবদ্ধ জীবন বুঝায় তার সাথে। কিন্তু একথা মেনে নিলে কুরআনে ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি, সাক্ষ্যদানের বিধি এবং যুদ্ধ ও সন্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব নিয়মনীতি ও নির্দেশ দান করা হয়েছে, তা সব নিরর্থক হয়ে যায়। সেসব নির্দেশতো নির্দেশ নয় বরং নিছক উপদেশ ও সুপারিশমালায় পরিণত হয়। অর্থাৎ ওগুলো কার্যকরী করতে পারলে ভালো। আর না করলেও তাতে আল্লাহর বিশেষ কোনো আপত্তি থাকবেনা।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় প্রশ্নের একটা সম্ভাব্য জবাব সম্ভাব্যই বা বলি কেন, আজকাল নবূয়্যত সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণাই এই যে, বিভিন্ন নবী বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন। এমনকি এক নবী যদি কুফরী সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম চালাতে এবং তার স্থলে ইসলামী বিধানকে পৃথিবীতে শাসন ব্যবস্থা হিসেবে কায়েম করতে এসে থাকেন, তবে অন্য আরেক নবী ঠিক তার বিপরীত কুফরী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন সীমিত ধর্মীয় ও নৈতিক সংস্কার সাধন করেই ক্ষ্যান্ত থাকা, এমনকি সেই কুফরী ব্যবস্থার অনুগত থাকা মওকা পেলে তার পরিচালনার ও উৎকর্ষ সাধনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণেও প্রস্তুত থাকার লক্ষ্য নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এ বক্তব্য কি কুরআনের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল? আসলে তা বিবেকের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করছে, সকল নবীকে একই উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। অপরদিকে বিবেকও একথা বিশ্বাস করতে রাজী নয় যে, আল্লাহ তায়ালা এমন স্ববিরোধী ও পরস্পর সংঘর্ষমুখর কাজ করতে পারেন। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির কাছে এক সময় এক উদ্দেশ্যে এবং অন্য সময় ঠিক তার বিপরীত উদ্দেশ্যে নবী পাঠান, তবে তাকে কোনো সাধারণ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও বিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী বিশ্ববিধাতা হিসেবে মেনে নিতে পারেনা। এটাতো ভিন্ন কথা যে, কোনো নবী ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের সংগ্রামে সাফল্যের সর্বশেষ স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারেন, অপর নবী মধ্যবর্তী অথবা প্রথমিক কোনো স্তরেই সারা জীবন কাজ করে যেতে পারেন আর তৃতীয়

আর এক নবী দাওয়াত, প্রচার অথবা যুদ্ধবিগ্রহের পরিবর্তে বিকল্প কোনো কর্মপন্থাকে নিজের সময়কার বিশেষ ধরণের পরিস্থিতিতে কার্যোপযোগী পেয়ে সেটাই গ্রহণ করে নিতে পারেন। কিন্তু কর্মপদ্ধতির এতোসব বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকলের উদ্দেশ্য একই থাকে। সকলেই আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন বিধানকে পরিপূর্ণভাবে দুনিয়ায় বাস্তবায়তি করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকাকেই নিজেদের অভিন্ন লক্ষ্য হিসেবে মেনে নিয়ে থাকেন। কিন্তু এই পদ্ধতিগত ও প্রক্রিয়াগত বিভিন্নতার অর্থ যদি কারো কাছে এই হয় যে, নবীদের প্রেরণের উদ্দেশ্যই বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ছিলো, তবে সেটা হবে আল্লাহ্‌র ওপর জঘন্যতম অপবাদ আরোপের শামিল।

অনুরূপভাবে তৃতীয় প্রশ্নেরও একটা সম্ভাব্য জবাব এবং আজকালকার মুসলমানদের কাছে সচরাচর সহজবোধ্য কথাও এটাই যে, মানুষ আল্লাহ্‌র কেবল পূজা উপাসনা করবে এবং ওযু গোছল, পাক নাপাক ও কতিপয় নির্দিষ্ট হালাল হারামের বিধি মেনে চলবে, মানুষের কাছে এতোটুকুই আল্লাহর দাবী। এর চেয়ে বেশী কিছু তিনি চানও না, আর মানুষ তার জীবনের সামগ্রিক কর্মকান্ডে নিজের প্রবৃত্তির আইন মেনে চলে, নাকি আল্লাহর বিশাল পৃথিবীতে জেঁকে বসা মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানদের কথামতো চলে, তা নিয়েও আল্লাহ্‌র কোনো মাথা ব্যথা নেই। তবে এই জবাব এযুগের জড়বাদী মানুষের কাছে যতো তৃপ্তিদায়কই হোক না কেন এবং "সরল ও সহজ পন্থাই ইসলাম" এই হাদীস এবং "আল্লাহ তোমার ওপর ইসলামে কোনো কঠিন বিধি আরোপ করেননি।" এই আয়াতের মর্ম স্বেচ্ছাচার ও লাগামহীন ভোগাধিকার ধরে নিয়ে নিজের জন্য যত আয়েসী জীবনের পথই সুগম করুক না কেন, এটা যে আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামীর প্রকৃত তত্ত্বের পরিপন্থী, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

একজন বান্দা ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দুঘন্টার জন্য বান্দা হবে, আর বাদবাকী সময় স্বাধীন থাকবে অথবা মনিবকে শুধু সালাম ঠুকেই গোলামীর দায়িত্ব চুকিয়ে দেবে আর অন্যসব কাজ প্রভুর ইচ্ছার তোয়াক্কা না করে নিজের অথবা অন্যদের ইচ্ছামতো করার অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করবে, দাসত্বের এর চেয়ে হাস্যকর চিত্র বোধ হয় আর কিছু হতে পারেনা। তাছাড়া এমন খোদাকে তো খোদা মানার প্রশ্নই ওঠেনা, যিনি নিজেকে একদিকে মানুষের স্রষ্টা ও পালনকর্তাও বলেন, অপরদিকে মানুষের সমগ্র সত্তা, সকল শক্তি সামর্থ এবং সময় ও উপকরণ বাদ দিয়ে তার একটা অতি ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন অংশে নিজের প্রভূত্ব ও কর্তৃত্ব এবং তার গোলামী ও দাসত্বকে সীমিত রাখতে রাজী হয়ে যান। কোনো পিতা স্বীয় পুত্রের ওপর নিজের পিতৃত্বকে এরূপ সংকীর্ণ গন্ডিতে সীমিত করতে রাজী হতে পারেননা যে, আনুগত্যের প্রতীকস্বরূপ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক কাজ করেই সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং তারপর যখন যাকে খুশী পিতার আসনে বসাবে। অনুরূপ কোনো স্বামী স্বীয় স্ত্রীর ওপর নিজের স্বামীত্বের গন্ডি সীমাবদ্ধ করে বাদবাকী সময় সে স্বেচ্ছাচারিনী হয়ে যখন যার খুশী মনোরঞ্জন করে বেড়াবে এ অধিকার স্বীকার করতে পারেনা। একজন শাসকও পারেনা আপন প্রজাদের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতাকে এভাবে সংকুচিত করতে যে, প্রজারা কতিপয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা আনুগত্য প্রকাশ করেই দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং তারপর যার খুশী তার আইন মানবে,

যাকে খুশী কর খাজনা দেবে এবং যার ইচ্ছা তার হুকুমের আনুগত্য করবে। অথচ কেবল বিশ্ববিধাতা আল্লাহই এমন মনিব হয়ে গেলেন যে, যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই লালিতপালিত এবং তাঁরই সহায়তায় তার অস্তিত্ব টিকে আছে, তার ওপর কিনা তিনি নিজের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব সীমিত করে ফেলতে রাজী এবং তার কাছ থেকে গোলামীর স্বীকৃতিস্বরূপ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক কথা ও কাজ পেয়েই তিনি আহলাদে আটখানা হয়ে গিয়ে তাকে স্বাধীন করে দিতে বা যেকোনো মনিবের গোলামী করার অনুমতি দিতে প্রস্তুত!

দীন, নবূয়্যত এবং দাসত্বের দাবী সম্পর্কে এসব ধ্যান ধারণা যদি সঠিক না হয়ে থাকে, আল্লাহর প্রেরিত দীন যদি বাস্তবিক পক্ষে মানুষের সমগ্র ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে, বিশ্বপ্রভুর দাবী যদি তাঁর বান্দাদের কাছে এই হয়ে থাকে যে, জীবনের সর্বক্ষেত্র এবং সকল অবস্থায় তাঁর আইনেরই অনুগত এবং তাঁর হিদায়েতেরই অনুসারী ও আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে হবে এবং আল্লাহ যদি তাঁর নবীদেরকে এক খোদার আনুগত্য ভিত্তিক একমাত্র সত্য ও নির্ভুল জীবন বিধান কায়েম করার জন্য মানুষকে দাওয়াত দেয়া ও সেই জীবন বিধান কায়েমের চেষ্টায় নিজেদেরকেও নিয়োজিত রাখার জন্য পাঠিয়ে থাকেন, তবে একজন বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষে একথা মেনে নেয়া অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে যে, সমস্ত নবীদের মধ্যে একমাত্র হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামই এই সাধারণ নিয়মের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত ছিলেন। কোনো কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষই একথা স্বীকার করতে পারেনা যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এমন ব্যতিক্রমধর্মী অভিনব ধরনের নবী হয়ে এসেছেন, যাকে কিনা আল্লাহর দীন কায়েমের চেষ্টা বাদ দিয়ে ফিরাউনের কুফরী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন অর্থ মন্ত্রণালয়ের চাকরি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে কোনো বিবেকবান মানুষ এ দুটো বেখাপ্পা কথাকেও খাপ খাওয়াতে অক্ষম যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামতো একদিকে আরবের অনৈসলামিক সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অপরদিকে তাঁর কাছে আবিসিনিয়ার অনৈসলামিক ব্যবস্থাও এতোটা সঠিক ছিলো যে, একদল মুসলমানের জন্য তা একটা মানানসই স্থায়ী বাসস্থান হবার যোগ্য ছিলো। যারা ইসলামকে একটা যুক্তিসঙ্গত ও সুসংবদ্ধ জীবন দর্শন হিসেবে বিবেচনা করেনা বরং তাকে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর অসংবদ্ধ তত্ত্বের সমষ্টি মনে করে, তাদের পক্ষে তো নবীদের জীবনেতিহাস, কুরআনের শিক্ষা ও ইসলামের বিধিসমূহকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যেকটির আলাদা আলাদাভাবে এমন ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ যাতে করে তার একাংশ অপরাংশের এবং একদিক অপরদিকের সম্পূর্ণ বিপরীতরূপ ধারণ করে। কিন্তু যারা একে এক মহাবিজ্ঞানী সত্তার রচিত সুসংবদ্ধ, সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত বিধান হিসেবে বিবেচনা করে, তাদের পক্ষে এর প্রতিটা অংশ ও প্রতিটা দিকের এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অবলম্বন না করে উপায় থাকেনা, যা সামগ্রিক বিধানের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা এর এমন কোনো ব্যাখ্যা মেনে নিতেই পারেনা, যাকে আল্লাহ্র এই

সনাতন বিধানের মধ্যে বৈপরিত্য এবং এর শিক্ষার সাথে নবীদের কাজের সংঘাত অবির্য হয়ে দেখা দেয়।

এবার আমরা সূরা ইউসুফের আলোচ্য আয়াতগুলো এবং আবিসিনিয়া হিজরতের ঘটনাবলী নিয়ে সরাসরি আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ঘটনা থেকে ভ্রান্ত যুক্তি গ্রহণ

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ঘটনা সূরা ইউসুফে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তিনি নবূয়্যত লাভের পূর্বে নিজের ভাইদের বিশ্বাসঘাতকতা ও একটি বণিক দলের অসততার কারণে মিশরের "আযীয" উপাধিধারী জনৈক প্রভাবশালী মন্ত্রীর ক্রীতদাসে পরিণত হন। এই দাসত্বের সময় অথবা জেলখানায় আটক থাকাকালে আল্লাহ্ তাকে নবূয়্যতে অভিষিক্ত করেন। খুব সম্ভবত কারাবন্দী থাকাকালেই তিনি নবূয়্যত লাভ করেন। কেননা বন্দী হবার আগে তার কথাবার্তা নবীসুলভ উচ্চমার্গের না হয়ে একজন পূণ্যবান সদাচারী ব্যক্তিসুলভ মনে হয়। এ অবস্থায় নবূয়্যত লাভের সংগে সংগেই তিনি নবী হিসেবে দাওয়াতের কাজ শুরু করে দেন। নিজের সহবন্দী কয়েদীদেরকেই তিনি সর্বপ্রথম দাওয়াত দেন। সূরা ইউসুফে এই দাওয়াতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এটি অধ্যয়ন করে যেকোনো ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, তাঁর ডাক "ভিন্ন ভিন্ন মনিব"-এর দিকে ছিলোনা, বরং একমাত্র মনিবের গোলামী করার দিকে ছিলো। তিনি বার বার মিসরবাসীকে হুশিয়ার করেছেন যে, যে বাদশাহকে তারা খোদার আসনে বসিয়ে রেখেছে সে আমার প্রভু নয়। বরং আমার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ। আমি যে ধর্মের অনুসরণ করি তা আল্লাহর দাসত্বের জীবন ব্যবস্থা। জেলখানায় ইসলাম প্রচারের এই কাজ চালানোর সময়েই আকষ্মিকভাবে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে যে অসাধারণ সততা, বিশ্বস্ততা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার নিদর্শনাবলী ফুটে ওঠে, মিসরের সম্রাট তাদ্বারা গভীরভাবে অভিভূত হন। এতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের মনে এরূপ প্রত্যয় জন্মে যে, তিনি তার কাছে সাম্রাজ্যের নিরংকুশ ক্ষমতা চাইলেও তিনি তা তাঁর কাছে হস্তান্তর করতে রাজী হয়ে যেতে পারেন। ফলে এসময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সামনে দুটো পথ উন্মুক্ত হয়। একটি হলো, ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে ব্যাপক দাওয়াত ও প্রচারাভিযান চালানো, কঠোর চেষ্টা সাধনা, সংগ্রাম, সংঘাত ও যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যা সাধারণ অবস্থায় অবলম্বন করতে হয়। দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতার কল্যাণে যে সুবর্ণ সুযোগটি তাঁর মুঠোর ভিতর এসে গেছে, সেটাকে কাজে লাগানো এবং তাঁর গুণমুগ্ধ ও অনুরক্ত বাদশাহর কাছ থেকে যে সুদূর প্রসারী ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা হস্তগত করে দেশের চিন্তায় ও বিশ্বাসে, চরিত্রে, সমাজ ব্যবস্থায় ও রাজনীতিতে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করা। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দান করেছিলেন, তার আলোকে তিনি প্রথম পথটির চাইতে দ্বিতীয় পথটিকে অধিকতর সহায়ক ও নিজের লক্ষ্যের নিকটতর মনে করলেন এবং সেটাই গ্রহণ করলেন।

এটা তাঁর পক্ষে প্রতিষ্ঠিত অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থার অধীন নিছক জীবিকা উপার্জন, ব্যক্তিগত সম্মান ও মর্যাদা লাভ অথবা বাতিল ও দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার আংশিক সংশোধনের লক্ষ্যে গৃহীত একটি চাকরি ছিলোনা। বরঞ্চ এটা ছিলো একটা কৌশল। অন্যসকল নবীর মত হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, সেই একই উদ্দেশ্যে এ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিলো। যারা এটাকে নিছক একটা চাকরি মনে করেছেন এবং ধারণা করেছেন যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের উপায় হিসেবে নয় বরং খোদাদ্রোহী ব্যবস্থা যথারীতি বহাল রাখা এবং তার ক্রীড়নক অর্থমন্ত্রী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই চাকরিটা গ্রহণ করেছিলেন, তাদের দৃষ্টিতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মর্যাদা বর্তমান (ইংরেজ) সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারীদের চেয়ে উচ্চতর কিছুই নয়। এমনকি আমাদের এ দেশে কংগ্রেসী মন্ত্রী সভাগুলোর যতোটুকু মর্যাদা, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের মর্যাদা তারা ততোটুকুও মনে করেনা। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কার্যকলাপ এদেশের সকল মানুষই প্রত্যক্ষ করেছে। তাদের লক্ষ্য ছিলো ভারতের স্বাধীনতা। মন্ত্রীত্ব সেই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে, এব্যাপারে তাদের পূর্ণ বিশ্বাস না জন্মা পর্যন্ত তারা এবং তাদের একজন নিতান্ত অধোপতিত ব্যক্তিও মন্ত্রীত্ব গ্রহণের কথা চিন্তাও করেনি। অতপর মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর যখন তারা দেখেছে যে, আসল ক্ষমতা [Substance of power] তাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়নি। তখন তারা মন্ত্রীত্বের মুখে লাথি মেরে বিদায় নিয়েছে।

বাদশাহর কাছ থেকে ক্ষমতা চেয়ে নেয়া হয়েছিলো না কেড়ে নেয়া হয়েছিলো নাকি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ক্ষমতাসীন হওয়ার সংগে সংগেই বাদশাহকে গদিচ্যুত করা হয়েছিলো, না তিনি ক্ষমতায় বহাল ছিলেন, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। প্রকৃত গুরুত্ববহ প্রশ্ন এখানে এই যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম অনৈসলামিক ব্যবস্থাটাকেই চালিয়ে যাওয়া এবং তার অধীনে চাকরি করার উদ্দেশ্যেই কি তার উমেদার হয়েছিলেন, নাকি নিজের নবূয়্যতের লক্ষ্য তথা ইসলামী বিধান কায়েমের জন্যই উদ্যোগী হয়েছিলেন? দ্বিতীয় যে প্রশ্ন গুরুত্বের অধিকারী তা হলো, দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমূল ও সর্বাত্মক পরিবর্তন সূচিত করা যায় এমন ক্ষমতা তিনি যথার্থই পেয়েছিলেন কিনা? ইসলাম ও নবূয়্যত সম্পর্কে যে তত্ত্ব আমাদের মনে বদ্ধমূল, তার আলোকে আমি মনে করি, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম "দেশের উপায় উপকরণ আমার দায়িত্বে সমর্পণ করুন" কথাটা বলে আসলে দেশের সমস্ত উপায়-উপকরণকে [Resources] তাঁর নিরংকুশ কর্তৃত্বে সমর্পন করার দাবীই জানিয়েছিলেন। খান বাহাদুর সাহেব অনর্থক খাজায়েন শব্দটাকে 'অর্থ দফতর' অর্থে গ্রহণ করেছেন। অথচ কুরআনের কোথাও এ শব্দটা অর্থ দফতর বা অর্থ বিষয়ক কার্যক্রম অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

কুরআনের নির্দেশাবলী অনুসন্ধান করলে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, "উপায়-উপকরণ" বলতে যা বুঝায়, এ শব্দটার মর্মার্থ ঠিক তাই।[১] একটি দেশের যাবতীয় উপায় উপকরণ কারো হস্তগত হওয়া এবং সেই দেশের যাবতীয় বিষয়ে তার সর্বাত্মক ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়া একই অর্থবোধক। বাইবেল থেকেও এ কথার সমর্থন মেলে। সেখানে দ্ব্যার্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, মিসরের ফিরাউন নামমাত্র রাজা ছিলো। কার্যত গোটা দেশ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কর্তৃত্বাধীন হয়ে গিয়েছিলো।[২]

এবার আর একটি দাবীর বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন। সেটি হলো, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ক্ষমতা গ্রহণের পরও নাকি দেশে ফিরাউনের আইনেরই শাসন চালু থাকে।

"বাদশাহের দীনের ভিত্তিতে তার ভাইকে গ্রহণ করা সংযত ছিলোনা।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৭৬]

এ আয়াতটি থেকেই নাকি এই ধারণা জন্মে। এ সম্পর্কে পয়লা কথা হলো, এ আয়াতের সচরাচর যে অনুবাদ করা হয় তা সঠিক নয়। অনুবাদকরা এ আয়াতের এরূপ অর্থ করে থাকেন যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম রাজকীয় আইন অনুসারে তার ভাইকে গ্রেফতার করতে পারতেননা। অথচ এর বিশুদ্ধ অনুবাদ হলো, রাজকীয় আইন অনুসারে স্বীয় ভাইকে গ্রেফতার করাটা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পক্ষে শোভন বা

---

১. উদাহরণস্বরূপ নিম্নের আয়াত কয়টি লক্ষ্যণীয় ঃ
"তোমার প্রভুর যাবতীয় উপকরণ কি ওদের কাছে?" [তুর ঃ ৩৭]
"প্রতিটি জিনিসেরই উৎস আমার কাছে।" [সূরা হিজর ঃ ২১]
"আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় উপায় উপকরণ একমাত্র আল্লাহর।" [মুনাফিকুন ঃ ৭]
"দোজখবাসীরা জাহান্নামের কর্মকর্তাদেরকে বলবে............" [মুমিন ঃ ৪৯]
এসব আয়াতে 'খাজানা' শব্দটি রেখাংকিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. বাইবেলে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে ফিরাউনের যে সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ
"ফিরাউন তার ভৃত্যদেরকে বললো! আল্লাহর আত্মাধারী এই মহান ব্যক্তির মতো কোনো ব্যক্তি কি আমি খুঁজে পাবো? আর ফিরাউন ইউসুফকে বললো যেহেতু আল্লাহ তোমাকে এই সবই দিয়েছেন, তাই তোমার মত জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান আর কেউ নেই। সুতরাং তুমি আমার বাড়ীর মালিক হবে এবং আমার সমস্ত প্রজা তোমার হুকুম মতো চলবে কেবল সিংহাসনের মালিক বলে আমি শ্রেষ্ঠতর হবো। অতপর সে তাকে সমগ্র মিসরের শাসক বানিয়ে দিলো। ফিরাউন ইউসুফকে আরো বললো আমি ফিরাউন। তবে তোমার হুকুম ছাড়া সমগ্র মিসরে কেউ হাত পা পর্যন্ত নাড়াতে পারবেনা।" [আবির্ভাব পুস্তক, অধ্যায় ৪১, আয়াত ৩৮-৪৪]
উপরোক্ত রেখাচিহ্নিত কথাগুলো থেকে বুঝা যায় ফিরাউন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। সে যদি তাঁর নবুয়্যত স্বীকার নাও করে থাকে, তথাপি সে প্রথম সাক্ষাতেই ঈমান আনার কাছাকাছি চলে গিয়েছিলো। এর সাত আট বছর পর যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ভাইয়েরা মিসরে এলো, তখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে বললেনঃ এখানে তোমরা নয়, আল্লাহই আমাকে পাঠিয়েছেন এবং তিনি আমাকে বলতে গেলে ফিরাউনের পিতা এবং তার পুরো বাড়ীর শাসক বানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা তাড়াতাড়ি আমার পিতাকে গিয়ে বলো তোমার ছেলে ইউসুফ জানিয়েছে যে, আল্লাহ তাকে সমগ্র মিসরের মালিক বানিয়ে দিয়েছে।" [আবির্ভাব পুস্তক, অধ্যায় ৪৫, আয়াত ঃ ৮-৯]

সমিচীন ছিলোনা। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও আরবী ভাষার এই বাকধারাটা অক্ষমতা ও অপারগতা অর্থে গ্রহণ করা হয়নি বরং অশোভন ও অনুচিত অর্থেই গৃহীত হয়েছে। যেমন সূরা আল ইমরানের ১৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ
এ বাক্যটার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তোমাদেরকে অদৃশ্য বিষয়ে অবহিত করতে পারেননা, বরং এর তাৎপর্য হলো, তোমাদেরকে অদৃশ্য তথ্য ও তত্ত্ব জানানো আল্লাহর রীতি নয়। অনুরূপভাবে مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ [সূরা বাকারা ঃ ১৪৩] مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ এবং مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ এসব আয়াতে আল্লাহর অক্ষমতা বা অপারগতার কথা বলা হয়নি, বরং যুলুম করা, ঈমান ব্যর্থ করে দেয়া এবং মুমিন ও মুনাফিকদেরকে বাছাই না করে একাকার রেখে দেয়া আল্লাহর রীতিবিরুদ্ধ, একথাই বলা হয়েছে। সূরা ইউসুফেরই আলোচ্য আয়াতের পূর্বের একটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ [আয়াত ঃ ৩৮] এর অর্থও এটা নয় যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতে অক্ষম। বরং এর অর্থ হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। সুতরাং আলোচ্য আয়াতেও এরূপ অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম রাজকীয় আইন অনুসারে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু সে আইনে তার ভাইকে গ্রেফতার করতে পারছিলেননা। কুরআনের অনুসৃত বাকরীতি অনুসারে এর প্রকৃত মর্মার্থ এটাই যে, রাজকীয় আইনে স্বীয় ভাইকে আটক করা তার পক্ষে শোভন ছিলোনা। অবশ্য এ আয়াত দ্বারা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের ক্ষমতাসীন হওয়া সত্ত্বেও অনৈসলামিক ফৌজদারী বিধি অন্তত সাত আট বছর [হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইরা যখন সেখানে আসে] পর্যন্ত মিসরে কার্যকর ছিলো। তবে এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, একটি দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে রাতারাতি সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেয়া সম্ভব নয়। ক্ষমতা হাতে আসা মাত্রই জাহেলী যুগের সমস্ত রীতিপ্রথাকে তাৎক্ষণিকভাবে পাল্টে ফেলতে হবে ইসলামী বিপ্লবের এ ধারণা ঠিক নয়। স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলেও দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দিতে পুরো দশ বছর সময় লেগেছিলো। সুতরাং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের শাসনামলে কয়েক বছর অবধি অনৈসলামিক ফৌজদারী বিধি এবং সেই সাথে আরো কিছু অনৈসলামিক আইন যদি চালু থেকেও থাকে, তবে সেজন্য এ সিদ্ধান্তে আসা সঙ্গত নয় যে, ইসলামী আইন চালু করার ইচ্ছাই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ছিলোনা এবং তিনি অনৈসলামিক বিধি ব্যবস্থাই বহাল রাখতে চেয়েছিলেন।

হাবশার হিজরত থেকে ভ্রান্ত যুক্তিগ্রহণ

এবার আসুন, আলোচনার সমাপ্তি টানার আগে আবিসিনিয়ায় হিজরতের বিষয়টার ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নেয়া যাক।

এ ব্যাপারটাকে যেভাবে তুলে ধরা হয়ে থাকে তা হলো, আবিসিনিয়ায় একটি অমুসলিম সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের একটি দলকে সেখানে ঐ সরকারের প্রজা হিসেবে বসবাস করার জন্য পাঠান। অতপর

সাহাবায়ে কিরাম সেখানে গিয়ে অমুসলিম শাসকের অনুগত হয়ে গেলেন। কেননা তারা সেখানে নিজস্ব আকীদা বিশ্বাস পোষণ ও ইবাদত উপাসনা করার স্বাধীনতা ভোগ করতেন। অতপর যখন এক প্রতিবেশী রাজা তার রাজ্যের ওপর আক্রমণ চালায় তখন তারা তার সাফল্যের জন্য দোয়া করেন। কিন্তু এটা ঘটনার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিবরণ।

১. প্রথমত, মুসলমানদের একটা দলকে আবিসিনিয়ায় পাঠানোর সময়ই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারণা ছিলো, নাজ্জাশী একজন সত্য নিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ খৃষ্টান। হাদীসের ভাষা এরূপ, তিনি হিজরতকারীদেরকে নাজ্জাশীর রাজ্য সম্পর্কে বলেছিলেন যে, وَهِىَ اَرْضُ صِدْقٍ "ওটা সত্যের দেশ।"

২. দ্বিতীয়ত, মোহাজেরদেরকে সেখানে স্থায়ী প্রজা হয়ে বসবাস করার জন্য পাঠানো হয়নি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহাজেরগণকে হিজরতের পরামর্শ দেয়ার সময় বলেছিলেন ঃ

"আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্য একটা উপায় বের না করা পর্যন্ত তোমরা যদি আবিসিনিয়ায় চলে যেতে.......।"

একথা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, কাফিরদের সাথে সংঘাতের ঐ স্তরে যেসব মুসলমান অসহনীয় বিপদ মুসিবতের শিকার হচ্ছিলেন, তাদেরকে তিনি সাময়িকভাবে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলে মনে হয় এমন একটি জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। পরে যখন পরিস্থিতি অনুকূল হবে, তখন তারা আবার ফিরে আসবেন এটাই ছিলো উদ্দেশ্য। এ ঘটনাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কিভাবে সঠিক হতে পারে যে, কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে আকীদা ও ইবাদতের স্বাধীনতা পাওয়া গেলে সেটাই ঐ রাষ্ট্রের অনুগত প্রজা হয়ে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং এর চেয়ে বেশী কিছুর প্রয়োজন হবেনা?

৩. এরপর যখন মুসলমানরা সেখানে পৌঁছলো এবং মক্কার কাফিররা নাজ্জাশীর কাছ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য একটা প্রতিনিধিদল পাঠালো, তখন হাদীসবেত্তাগণ ও সীরাত বিশারদগণের সর্বসম্মত মত অনুসারে হযরত জাফর ও নাজ্জাশীর কথোপকথনের পর নাজ্জাশী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কুরআন বর্ণিত তত্ত্বকে সমর্থন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবূয়্যতকেও সত্য বলে স্বীকৃতি দেন। এরপর নাজ্জাশীর মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকতে পারে? ইমাম আহমদ এই ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বরাত দিয়ে নাজ্জামীর নিম্নরূপ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"তোমাদেরকে মুবারকবাদ এবং তোমরা যার কাছ থেকে এসেছো তাকেও মুবারকবাদ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রসূল, তিনি সেই ব্যক্তি যার বর্ণনা আমরা ইনজিলে পাই, তিনি সেই রসূল, যার সম্পর্কে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।"

এ উক্তি কি কোনো অমুসলিমের হতে পারে? বায়হাকীতে স্বয়ং আমর ইবনুল আস থেকে [যিনি মোহাজেরদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য মক্কার কাফিরদের তরফ থেকে

আবিসিনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন] বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ফিরে এসে মক্কাবাসীকে বলেন ঃ

"আসহাসা [নাজ্জাশী] বলে যে, তোমাদের সঙ্গী [মুহাম্মদ] নবী।"

প্রশ্ন হলো, কোনো মানুষ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবূয়্যত স্বীকার করে নেয়ার পরও কি অমুসলিম বিবেচিত হতে পারে?

সীরাতে ইবনে হিশামে হযরত আমর ইবনুল আ্সের ইসলাম গ্রহণের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে বুঝা যায়, প্রথম প্রথম নাজ্জাশীর প্রচারের ফলেই তার মনে ঈমানের জন্ম হয়। হোদাইবিয়ার সন্ধির আগে তিনি নাজ্জাশীর হাতে হাত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় নাজ্জাশী আমর ইবনুল আসকে যে কথাগুলো বলেন তা হলো ঃ

"আমার কথা শোনো এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়ে যাও।

কেননা নিশ্চিতভাবেই তিনি সত্যের ওপর রয়েছেন। মূসা আলাইহিস্ সালাম যেভাবে ফিরাউন ও তার বাহিনীর ওপর বিজয়ী হয়েছিলেন, সেইভাবে তিনিও তার বিরোধীদের ওপর অবশ্যই বিজয়ী হবেন।"

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার স্বীয় গ্রন্থ আল্ ইসতিয়াবে হযরত উম্মে হাবীবার সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়েবানা বিয়ে পড়ানোর সময় নাজ্জাশী যে খুৎবা দেন, তা উদ্ধৃত করেছেন। এই খুৎবায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নাজ্জাশী বলেন ঃ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, যার আগমন সম্পর্কে মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সংবাদ দিয়েছিলেন।"

এর চেয়েও অকাট্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনা বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃতি হয়েছে যে, নাজ্জাশীর মৃত্যুর খবর শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গায়েবানা জানাযা নামায পড়েন এবং বলেন ঃ

"আজ একজন পূণ্যবান মানুষ মারা গেছে। তোমরা প্রস্তুত হও এবং তোমাদের ভাই আসহামার জানাযার নামায পড়।"

এ রেওয়ায়েতের পর আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনার সূত্র ধরে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, তার ভিত্তিই চুরমার হয়ে যায়।

[তরজমানুল কুরআন, মুহাররম-সফর, ১৩৬৪ হিঃ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫]

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ

১ ইসলামী রাজনীতির উৎস

২ রাজনীতির গোড়ার কথা

৩ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ধরন

৪ খিলাফত ও তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

হিমালয়ান উপমহাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণ সাথে করে নিয়ে আসে অনেক প্রশ্ন ও জটিলতা। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিলো ভবিষ্যতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কেমন হবে? প্রতিটি মুসলমানের উদগ্র আন্তরিক আকংখা এই ছিলো এবং আছে যে, তার সামাজিক ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সবচাইতে বড় দূর্ভাগ্য হলো, তারা ইসলামকে ভালোবাসে বটে, কিন্তু ইসলামের সঠিক ধারণা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। এ কারণেই তারা ইসলামের জন্যে জান দিতে তৈরী থেকেও ইসলামের ভিত্তিতে বেঁচে থাকতে জানেনা।

মুসলমানদের এই মানসিক অবস্থা অনুধাবন করেই মাওলানা মওদুদী [র] ইসলামী জীবনব্যবস্থার মৌলিক বিষয়গুলোকে উপযোগী ব্যাখার সাথে উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসংগে ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে তিনি লাহোর ইন্টার কলেজিয়েট মুসলিম ব্রাদার হুড-এর সম্মেলনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ সময় পর্যন্ত মুসলমানরা নিজেদের কোনো সুস্পষ্ট জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেনি। মাওলানা তাঁর এই প্রবন্ধে মুসলিম উম্মাহকে জানিয়ে দিয়েছেন ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি কি? কি কি উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার বুনিয়াদী আদর্শই বা কি কি?

সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে প্রবন্ধটির পুনরীক্ষণ করার পর উপস্থাপন করা হলো। পুনরালোচনা থেকে বাঁচার জন্যে প্রবন্ধটির সে অংশ এখান থেকে বাদ দেয়া হলো যাতে নির্বাহী বিষয়ের আলোচনা ছিলো। কারণ সম্মুখের অধ্যায়গুলোতে সম্মানিত গ্রন্থকারের আরো যেসব লেখা সংকলিত হয়েছে, সেসব অধ্যায়ে সে আলোচনা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

-সংকলক

ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ

ইসলাম সম্পর্কে আপনারা প্রায়ই শুনে থাকেন, "ইসলাম একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা", "ইসলাম একনায়কতন্ত্রের সমর্থক", "ইসলাম সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী" ইত্যাদি ইত্যাদি। বিগত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এধরনের কথা বার বার উচ্চারণ করা হচ্ছে। কিন্তু কথাগুলো যাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে, আমার দৃঢ়বিশ্বাস তাদের মধ্যে হাজারে একজনও এমন নেই, যিনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে যথাযথ অধ্যয়ন করেছেন এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। তারা একথাও বুঝার চেষ্টা করেননি যে, ইসলামে গণতন্ত্রের ধরন ও মর্যাদা কি, কিংবা সামাজিক সুবিচার ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যে সে কি মূলনীতি পেশ করেছে? তাদের কেউ কেউতো ইসলামের সাংগঠনিক কাঠামোর দু'চারটি বাহ্যিক রূপ দেখে ইসলামের উপর গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্রের নামাংকিত করে দিয়েছেন। আর তাদের অধিকাংশের মানসিক অবস্থা হলো, পৃথিবীতে [বিশেষ করে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের জগতে অধিষ্ঠিত শক্তিসমূহ এবং নিজ নিজ দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকদের মধ্যে] যে জিনিস সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে, সেটাকে কোনো না কোনো ভাবে ইসলামের মধ্যে বর্তমান আছে বলে প্রমাণ করে দেয়াই তাদের দৃষ্টিতে এই ধর্মটির সবচাইতে বড় খেদমত। সম্ভবত তারা ইসলামকে ঐ এতীম শিশুটির মতো মনে করে, যে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেই ব্যস্ ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পারে। অথবা সম্ভবত তাদের ধারণা হলো, কেবল মুসলমান হিসেবে আমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা, বরঞ্চ আমাদের নীতির মধ্যে বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত কোনো নীতির অস্তিত্ব দেখাতে পারলেই আমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই মানসিকতার পরিণতি হলো, বিশ্বে যখন সমাজতন্ত্রের ধুম পড়ে গেলো, তখন মুসলমানদের মধ্যেই কিছু লোক চিৎকার করে উঠলো, সমাজতন্ত্রতো কেবল ইসলামেরই একটি নতুন সংস্করণ। আবার যখন একনায়কতন্ত্রের শাসন শুরু হলো, তখন আবার অন্য কিছু লোক এখানে আমীরের আনুগত্যের নমুনা দেখতে পেলো এবং বলতে শুরু করলো, ইসলামের গোটা সাংগঠনিক ব্যবস্থাই একনায়কতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মোটকথা, আজকে ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ একটি প্রহেলিকা ও ধুম্রজালে পরিণতি হয়ে আছে। এখান থেকে এমন সব জিনিসই বের করে দেখানো হয়, যার

বাজার গরম। বাস্তবিকপক্ষে ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ কি, তার যথাযথ বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। এর ফলে চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা এসব ভ্রান্ত ধারণাই কেবল দূর হবেনা, কেবল ঐসব লোকের মুখই বন্ধ হবেনা যারা ইদানিং প্রকাশ্যে লিখিতভাবে নিজেদের এ অজ্ঞতার ঘোষণা দিয়েছে যে, "ইসলাম আদতেই কোনো রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রস্তাব করেনা।" বরঞ্চ অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়া বিশ্বের সামনে এমন এক আলোর প্রদীপ উদ্ভাসিত হবে, বিশ্ব আজ যার বড় মুখাপেক্ষী। অবশ্য এই মুখাপেক্ষীতার চেতনাই সে আজ হারিয়ে বসেছে।

১. ইসলামী রাজনীতির উৎস

সর্বপ্রথম একথাটি ভালোভাবে বুঝে নিন যে, ইসলাম কেবল গুটিকয়েক বিক্ষিপ্ত বিশ্বাস এবং কর্মপন্থার সমষ্টিই নয়, যাতে এদিক ওদিক থেকে বিভিন্ন ধরনের মতের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। বস্তুত, ইসলাম একটি সুসংবদ্ধ ও সুষ্ঠু জীবন ব্যবস্থা। এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে কতিপয় আদর্শ ও মূলনীতির উপর। এর বড় বড় স্তম্ভ হতে শুরু করে একেবারে আনুষংগিক বিষয়াদি পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের সাথে এর আদর্শ ও মূলনীতির এক যুক্তিসংগত সম্পর্ক রয়েছে। ইসলাম মানব জীবনের সকল বিভাগ ও বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে যতো নিয়ম কানুন ও বিধি বিধান পেশ করেছে, তার সবগুলোরই আভ্যন্তরীণ প্রাণসত্তা ও বাহ্যিক রূপকাঠামো এর সেই প্রাথমিক মূলনীতিও আদর্শ থেকেই গৃহীত হয়েছে। এই আদর্শ ও মূলনীতি থেকে যাবতীয় আনুষংগিক বিষয়াদিসহ একটি পূর্ণাংগ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ঠিক সেভাবে গঠিত হতে পারে, যেভাবে একটি গাছের ক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পান বীজ থেকে শিকড়, শিকড় থেকে কান্ড, কান্ড থেকে শাখা এবং শাখা থেকে প্রশাখা ও পত্র পল্লব ফুটে বের হয়। গাছটি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়ে পড়লেও তার দূরবর্তী পাতাটি পর্যন্ত মূল শিকড়ের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে। সুতরাং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার যেকোনো দিক ও বিভাগকে বুঝার জন্যে এর মূলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অপরিহার্য। কেননা এছাড়া এর প্রাণসত্তা এবং মূল ভাবাধারা কিছুতেই হৃদয়ংগম করা যেতে পারেনা।

নবীদের মিশন

ইসলাম সম্পর্কে দুটি কথা প্রায় সকল মুসলমানেরই জানা আছে। একটি হলো, সব নবীর মিশনই ছিলো ইসলাম। এটা কেবল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিশনই নয়। বরঞ্চ মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম অধ্যায় হতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যতো নবীই এসেছেন, তাঁদের সকলের এই একই মিশন ছিলো। দ্বিতীয় কথাটি হলো, সকল নবীই মানুষকে এক আল্লাহ্র কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকার করানো এবং একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করানোর উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।

মুসলমান মাত্রই এ দু'টি সত্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অতিসাধারণ ব্যাপার। প্রত্যেক মুসলমান একথা শুনেই বলবে, এটাতো জানা কথা, একজন গ্রাম্য মুসলমানও এটা জানে। কিন্তু আমি চাই এ সংক্ষিপ্ত কথাটির আবরণ উন্মুক্ত করে আপনারা এর গভীরে প্রবেশ করুন। আসল ব্যাপার এই আবরণের অন্তরালে চাপা পড়ে আছে। অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভালোভাবে চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহর প্রভুত্ব স্বীকার

করানোর উদ্দেশ্য কি? একমাত্র তাঁরই আনুগত্য দাসত্ব করানোর অর্থ কি? আর এতে এমন কি কথাটি ছিলো যে, যখন আল্লাহ্‌র এক বান্দা [নবী] "আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই" বলে ঘোষণা করলেন, তখন সকল আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তি তাঁকে জংগলের বিষাক্ত কাঁটার মতো বিদ্ধ করতে শুরু করে দিলো? বিষয়টা কেবলমাত্র যদি এরকমই হতো, যেমন আজকাল মনে করা হয় যে, মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে সিজদা করো আর মসজিদের বাহিরে এসে ক্ষমতাসীন সরকারের [ক্ষমতায় যে-ই অধিষ্ঠিত থাকনা কেনো) শর্তহীন আনুগত্য ও অনুবর্তনে লেগে যাও, তবে এমন কোন্ সরকার আছে যে তার এধরনের অনুগত ও বাধ্যগত প্রজাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে?

আসুন, আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি, আল্লাহ্ সম্পর্কে আম্বিয়ায়ে কিরাম ও বিশ্বের অন্যান্য শক্তিগুলোর মধ্যে আসলে কোন্ কথাটির ব্যাপারে বিরোধ ও বিবাদ হয়েছিলো?

কুরআন মজীদ একাধিক স্থানে বিষয়টি পরিস্কার করে বলেছে, যেসকল কাফিরও মুশরিকদের সাথে নবীদের সংঘাত সংঘর্ষ হয়, মূলত তাদের কেউই আল্লাহ্‌র সত্তার অস্বীকারকারী ছিলোনা। তাদের সকলেই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলো। তারা স্বীকার করতো এবং বিশ্বাস করতো, আল্লাহ্‌ই আসমান যমীনের স্রষ্টা এবং স্বয়ং সেই কাফির মুশরিকদেরও স্রষ্টা। বিশ্ব জগতের গোটা ব্যবস্থাপনা তাঁরই ইংগিতে পরিচালিত হয়। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তাঁর হুকুম অনুযায়ী বায়ু গতিশীল । চন্দ্র, সূর্য এবং পৃথিবী সবকিছুই তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন ঃ

> "তাদের জিজ্ঞেস করো, পৃথিবী এবং এতে যাকিছু আছে তা কার, বলো, যদি তোমাদের জানা থাকে? তারা অবশ্যি বলবে ঃ 'আল্লাহ্‌র'। বলো, তবে কেন তোমরা ভেবে দেখনা? তাদের জিজ্ঞেস করো, সাত আসমান ও মহান আরশের মালিক কে? তারা বলবে ঃ 'আল্লাহ্'। তুমি বলো, তাহলে তোমরা তাঁকে ভয় করনা কেন? তাদের জিজ্ঞেস করো, প্রতিটি জিনিসের কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি সকলকে আশ্রয় দান করেন, যাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কাউকেও আশ্রয় দান করতে পারেনা, তিনি কে, বলো, যদি তোমরা জেনে থাকো! তারা বলবে ঃ 'আল্লাহ্'। তুমি বলো, তাহলে তোমরা কোন্ প্রতারণায় নিক্ষিপ্ত হয়েছো?" [সূরা মুমিন ঃ ৮৪]
>
> "আকাশ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করেছে? এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মানুগত করেছে, তা তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে ঃ 'আল্লাহ্'। কিন্তু তবুও এরা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে?" [সূরা আনকাবুত ঃ ৬১]
>
> "তাদের যদি জিজ্ঞেস করো, আকাশ হতে কে পানি বর্ষণ করে আর তা দিয়ে মৃত যমীনকে জীবন দান করে কে? তবে তারা নিশ্চয়ই বলবে ঃ 'আল্লাহ্'।" [সূরা আনকাবুত ঃ ৬৩]
>
> "তাদের যদি জিজ্ঞেস করো, তোমদের কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা নিশ্চয়ই বলবে ঃ 'আল্লাহ্'। তা সত্ত্বেও তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোথা চলে যাচ্ছে?" [সূরা যুখরুফ ঃ ৮৭]

অতএব এ আয়াতগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে এবং তাঁর সৃষ্টিকর্তা, আকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র মালিক ও প্রভূ হওয়ার ব্যাপারে মানব সমাজে কোনো কালেই কোনো মতভেদ ছিলোনা। জনগণ চিরদিনই এসব কথা স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করতো। কাজেই এসব কথার পুনঃ প্রচার এবং জনগণের দ্বারা তা স্বীকার করানোর জন্য নবী পাঠাবার কোনো প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে ছিলোনা। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, দুনিয়ায় নবীদের আগমনের উদ্দেশ্য কি ছিলো? আর প্রতিপক্ষের সাথে তাদের বিরোধ বিবাদই বা ছিলো কী বিষয়ে?

কুরআন মজীদ এর সুস্পষ্ট জবাব দিয়েছে। কুরআন বলে, সমস্ত বিরোধ বিবাদের মূল কারণই ছিলো নবীদের এই বক্তব্য ঃ "যিনি তোমাদের এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, বস্তুত তোমাদের 'রব এবং ইলাহ'ও একমাত্র তিনিই। অতএব তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও 'রব' এবং ইলাহ' বলে স্বীকার করোনা।" কিন্তু মানুষ নবীদের এই বক্তব্য মেনে নিতে মোটেও প্রস্তুত ছিলোনা।

আসুন একটু অনুসন্ধান করে দেখি কেন তারা নবীদের সাথে বিরোধ করলো? 'একমাত্র ইলাহ' বলতে কি বুঝায়? 'রব' কাকে বলে? আল্লাহ্‌কেই 'রব' ও 'ইলাহ' স্বীকার করো একথার উপর নবীরা কেন এতোটা অটলতা অবলম্ব করেছিলেন? আর প্রতিপক্ষই বা কেন একথার বিরোদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো?

'ইলাহ্' ও 'রবে'র অর্থ কি?

ইলাহ শব্দের অর্থ মা'বুদ বা উপাস্য, একথা সবাই জানে। তবে পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন, 'মা'বুদ' এর অর্থ মুসলমানরা ভুলে গেছে। মা'বুদ শব্দটা 'আব্‌দ' ধাতু থেকে এসেছে। আব্‌দ অর্থ হলো বান্দা, গোলাম বা দাস। ইবাদাতের অর্থ নিছক পূজা নয়। একজন বান্দা, গোলাম বা দাস যে জীবন দাসত্ব ও গোলামীর অবস্থায় অতিবাহিত করে, তার পুরোটাই আগাগোড়া ইবাদত। খিদমত বা সেবার জন্য দাঁড়ানো, ভক্তিভরে বুকে হাত বাঁধা, দাসত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ মাথা নোয়ানো, আনুগত্যের মনোভাব ও জজ্‌বায় সর্বক্ষণ উজ্জীবিত থাকা, হুকুম পালনের জন্য চেষ্টাসাধনা ও ছুটোছুটি করা, যে কাজ সম্পাদনের ইংগিত দেয়া হয় তা সম্পন্ন করা, মনিব যা চান তা প্রদান করা, তার শক্তি ও প্রতাপের সামনে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা, তার প্রবর্তিত আইনের আনুগত্য করা, যার বিরুদ্ধে তিনি নির্দেশ দেন তার ওপর আক্রমণ পরিচালনা করা, যে ব্যাপারে তার নির্দেশ থাকবে তার জন্য প্রয়োজনে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়া এসব হলো ইবাদাতের আসল অর্থ ও মর্ম। মানুষ এভাবে যার ইবাদত করে, তিনিই তার প্রকৃত মা'বুদ।

আর 'রব' অর্থ কি? আরবী ভাষায় রবের মূল অর্থ হচ্ছে লালনপালনকারী। যেহেতু দুনিয়ার রীতি হলো, যে লালানপালন করে, তারই আনুগত্য ও ফরমাঁবরদারী করা হয়। তাই রবের আরেকটি অর্থ দাঁড়ালো মালিক ও মনিব। এ কারণেই আরবীতে সম্পদের মালিককে 'রব্বুল মাল' [সম্পদের মালিক] এবং বাড়ীর মালিককে 'রব্বুদ্ দার' বলা হয়ে থাকে। মানুষ যাকে নিজের রিযিকদাতা ও লালনপালনকারী বলে জানে, যার কাছ থেকে অনুগ্রহ ও উন্নতির আশা করে, যার কাছ থেকে সম্মান, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার

প্রত্যাশী হয়, যার দয়ার্দ্র দৃষ্টি না পেলে নিজের জীবন বরবাদ হয়ে যাওয়ার আশংকা করে, যাকে নিজের মালিক ও মনিব বলে স্বীকার করে এবং কার্যত যার আনুগত্য করে, সে-ই তার রব।[১]

এই দুটো শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে একটু গভীরভাবে ভেবে দেখুনতো, মানুষের সামনে, আমি তোমার ইলাহ, আমি তোমার রব, এবং আমার ইবাদত ও দাসত্ব করো এই দাবী নিয়ে কে দাঁড়াতে পারে? গাছ কি পারে এমন দাবী করতে? পাথর কি এমন দাবী করার যোগ্যতা রাখে? সমুদ্র কি এরূপ দাবী করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে? এমন ঔদ্ধত্য দেখাতে পারে কি কোনো জীব জানোয়ার, চাঁদ, সূর্য বা নক্ষত্র? মানুষের সামনে এসে এই দাবী করার স্পর্ধা কি কারো আছে? না, কক্ষনো নয়। মানুষের ওপর খোদায়ী দাবী করা কেবল মানুষের পক্ষেই সম্ভব এবং মানুষই এ অপকর্মটি করে থাকে। প্রভুত্ব করার সখ ও সাধ একমাত্র মানুষের মাথায়ই জন্মে, অন্য কারো নয়। সীমাতিরিক্ত ক্ষমতার লালসা ও মাত্রাতিরিক্ত ভোগের স্পৃহা মানুষকে প্ররোচিত করে অন্য মানুষদের প্রভু হতে, তাদেরকে নিজের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করতে, তাদেরকে নিজের সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য করতে, তাদের ওপর নিজের হুকুম জারী করা, এবং তাদেরকে নিজের প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার হাতিয়ারে পরিণত করতে। মানুষের প্রভু বা খোদা হওয়া এতো মজাদার জিনিস যে, মানুষ আজ পর্যন্ত এর চেয়ে মজাদার কোনো জিনিসের সন্ধান পায়নি। যার যতটুকু শক্তিসামর্থ, ধনসম্পদ, চালাকী চাতুরী, বিচক্ষনতা ও প্রজ্ঞা অথবা অন্য কোনো ধরনের কোনো ক্ষমতা থাকনা কেন, সে এটাই কামনা করে যে তাকে যেভাবেই হোক নিজের বৈধ ও স্বভাবসিদ্ধ সীমানা অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে, চারদিকে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে হবে এবং নিজের খোদায়ীর দাপট ও প্রতাপ ছড়িয়ে দিতে হবে।

এধরনের প্রভুত্ব অভিলাষী মানুষ দু'ধরনের হয়ে থাকে এবং দুটো ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে থাকে।

১. সরাসরি দাবীদার

এক ধরনের মানুষ অপেক্ষাকৃত সাহসী হয়ে থাকে, অথবা তাদের কাছে প্রভুত্ব বিস্তারের প্রচুর উপকরণ বিদ্যমান থাকে। তারা সরাসরি নিজেদের খোদায়ী বা প্রভুত্বের দাবী তুলে থাকে। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো ফেরাউন। নিজের রাজকীয় ক্ষমতা ও সৈন্য সামন্তের ওপর নির্ভর করে সে মিসরের অধিবাসীদেরকে বলেছিলো ঃ "আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রভু" [সূরা আননাযিয়াত ঃ ২৪]। সে আরো বললো ঃ "আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মা'বুদ আছে বলেতো আমার জানা নেই" [সূরা কাসাস ঃ ৩৮]। যখন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তার সামনে আপন জাতির স্বাধীনতার দাবী পেশ করলেন এবং তাকে বললেন, তুমি নিজেও বিশ্বপ্রভুর দাসত্ব মেনে নাও, তখন সে বললো, আমি তোমাকে জেলে পাঠাতে পারি, কাজেই তুমি আমাকে খোদা মেনে নাও।

---

১. উক্ত পরিভাষা দুটির বিশদ ব্যাখ্যার জন্য গ্রন্থকারের "কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা" গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

"তুমি যদি আমাকে ছাড়া আর কাউকে খোদা মানো তাহলে আমি তোমাকে বন্দী করবো" [সূরা আশ্‌শুয়ারা ঃ ২৯]। অনুরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত হলো হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের সাথে যার বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সেই রাজা। কুরআনে যে ভাষায় এটি উল্লেখ করা হয়েছে তা লক্ষ্য করুন ঃ

> "তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখোনি, যে ইবরাহীমের সাথে ইবরাহীমের প্রভু কে, তাই নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো? এ বিতর্কে সে লিপ্ত হয়েছিলো এজন্য যে, আল্লাহ্ তাকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ইবরাহীম যখন বললো, জীবন ও মৃত্যু যার হাতে ন্যস্ত, তিনিই আমার প্রভু। তখন সে বললো ঃ জীবন ও মৃত্যুতো আমার হাতে। ইবরাহীম বললো ঃ বেশ, আল্লাহ্তো সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদিত করেন, তুমি পশ্চিম দিক থেকে ওটা উদিত করোতো দেখি! একথা শুনে সেই কাফের হতচকিত হয়ে গেলো।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৮]

ভেবে দেখুনতো, এই কাফের কি কারণে হতচকিত হয়ে গেলো? কারণ সে আল্লাহ্র অস্তিত্ব অস্বীকার করতোনা। আল্লাহ্ই যে, সমগ্র বিশ্বনিখিলের একমাত্র অধিপতি ও শাসক, তিনিই যে সূর্যকে উদিত ও অস্তমিত করেন তাও সে জানতো। বিশ্বনিখিলের মালিক ও মনিব কে? সেটা বিতর্কের বিষয় ছিলোনা। বিতর্কের বিষয় এই ছিলো যে, মানুষের বিশেষত ইরাকের অধিবাসীদের মনিব ও প্রভুকে। সে আল্লাহ্ হবার দাবী করতোনা, তার দাবী ছিলো শুধু এইযে, ইরাক সাম্রাজের অধিবাসীদের প্রভু ও মালিক মোক্তার আমি। আর এ দাবী সে এজন্য করতো যেহেতু শাসন ক্ষমতা তার হাতেই ছিলো। দেশবাসীর প্রাণ ছিলো তার হাতের মুঠোয়। সে যাকে ইচ্ছা ফাঁসিতে ঝুলাতে এবং যাকে খুশী ফাঁসি থেকে অব্যাহতি দিতে পারতো। সে মনে করতো, তার মুখ থেকে যেকথা বেরোয় সেটাই আইনের মর্যাদা রাখে এবং সকল প্রজার ওপর তার শাসন চলে। তাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে সে আদেশ দিয়েছিলো, তুমি আমাকে প্রতিপালক মেনে নাও এবং আমার ইবাদত ও দাসত্ব করো। কিন্তু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যখন বললেন, যিনি পৃথিবী ও আকাশের প্রভু এবং এই সূর্যও যাঁর আনুগত্য করে, আমি শুধু তাঁকেই প্রভু ও প্রতিপালক মানবো এবং তাঁরই ইবাদত ও দাসত্ব করবো। তখন সে হতভম্ব হয়ে গেলো এবং শুধু এই ভেবে হতভম্ব হলো যে, এ ধরনের লোককে আমি কিভাবে বশীভূত করি![১]

খোদায়ীর এই যে দাবী নমরুদ এবং ফেরাউন করেছিলো তা শুধু তাদের দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলোনা, দুনিয়ার সকল জায়গার সকল শাসকের দাবী এটাই ছিলো এবং এটাই আছে। ইরান সম্রাটের জন্য খোদা ও খোদাওয়ান্দ শব্দটি ব্যবহৃত হতো। আর তার সামনে বন্দনার যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হতো। অথচ কোনো ইরানী তাকে সকল খোদার বড় খোদা তথা আল্লাহ্ মনে করতোনা। এমনকি স্বয়ং রাজারাও সে দাবী করতোনা। এমনিভাবে ভারতেও শাসকরা নিজেদেরকে দেবতাদের বংশধর বলে দাবী করতো। এজন্য সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ইত্যাকার বংশীয় খেতাব

---

১. বিষয়টির আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য গ্রন্থকারের "কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা" দেখুন।

এখনো প্রসিদ্ধ। রাজাকে অন্নদাতা বলা হতো এবং তাঁর সামনে সিজদা করা হতো। অথচ কোনো রাজা যেমন নিজেকে পরমেশ্বর বা পরমাত্মা বলে দাবী করতোনা, তেমনি প্রজারাও তেমনটি ভাবতোনা। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থাও ছিলো তখন তথৈবচ এবং এখনো আছে। কোথাও কোথাও শাসকের জন্য ইলাহ ও রবের সমার্থক শব্দ এখনো খোলাখুলিভাবেই প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু যেখানে যেখানে এসব শব্দ প্রয়োগ করা হয়না, সেখানেও এসব শব্দের অর্থের ভেতর যে প্রেরণা ও ভাবধারা সুপ্ত রয়েছে সেটাই কার্যত বিরাজমান। এধরনের খোদায়ী দাবী করার জন্য স্পষ্ট ভাষায় ইলাহ বা রব হবার কথাই ঘোষণা করতে হবে এটা জরুরী নয়। নমরুদ এবং ফেরাউন মানুষের ওপর যে নিরংকুশ ও সার্বভৌম ক্ষমতা, যে স্বৈরাচারী শাসন এবং যে প্রভুত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলো, অবিকল সেই জিনিস যারাই প্রতিষ্ঠা করবে, তারা আসলে 'ইলাহ ও রব' দ্বারা যা বুঝায় তারই দাবী জানায়, চাই মুখে ইলাহ এবং রব শব্দ উচ্চারণ করুক বা না করুক। আর যারা তাদের আনুগত্য ও দাসত্ব করে তারা মুখ দিয়ে যাই বলুক না কেন আসলে তারা তাদেরকে ইলাহ ও রব বলেই মেনে নেয়।

২. পরোক্ষ দাবীদার

সারকথা হলো, এক ধরনের মানুষ সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে নিজের খোদায়ী ও প্রভুত্বের দাবী করে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় আর এক প্রকারের মানুষ আছে, যাদের কাছে এতো শক্তিও থাকেনা, উপায় উপকরণও থাকেনা যে, নিজেই এধরনের দাবী নিয়ে ময়দানে নামবে এবং জনগণকে তা মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে ফেলবে। তবে তাদের কাছে চাতুর্যও ধড়িবাজীর অস্ত্র থাকে এবং তা দিয়ে তারা সাধারণ মানুষের মনমগজে যাদু করতে সক্ষম হয়। এসমস্ত উপায় উপকরণ প্রয়োগ করে তারা কোনো আত্মা, দেবতা, প্রতিমা, কবর, নক্ষত্র অথবা কোনো গাছকে খোদা বানিয়ে দেয়। তারপর তারা জনগণকে বলে, এরা তোমাদের ক্ষতি ও উপকার করতে সক্ষম, তোমাদের মনস্কামনা পূরণ করতে সক্ষম এবং এরা তোমাদের অভিভাবক, রক্ষক ও সাহায্যকারী। এদেরকে যদি সন্তুষ্ট না করো তাহলে এরা তোমাদেরকে রোগ, মহামারি, দুর্ভিক্ষ ও নানা রকমের দুর্যোগে আক্রান্ত করবে। আর যদি ওদেরকে সন্তুষ্ট করে মনস্কামনা পূরণের প্রার্থনা করো, তাহলে তারা তোমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু তাদেরকে কিভাবে খুশী করা যায় এবং কিভাবে তাদেরকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় সেটা আমাদের জানা আছে। তাদের সান্নিধ্যে উপনীত হওয়ার মাধ্যম একমাত্র আমরাই হতে পারি। সুতরাং আমাদের বড়ত্ব ও বুজুর্গী মেনে নাও। আমাদেরকে খুশী করো এবং আমাদের হাতে তোমাদের জানমাল ও ইজ্জত সব সোপর্দ করে দাও। বহু নির্বোধ মানুষ এই ফাঁদে আটকা পড়ে। আর এভাবেই ভূয়া খোদাদের আড়ালে পুরোহিত, পূজারী ও খাদেমদের খোদায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

এই শ্রেণীর মধ্যেই আর একটা গোষ্ঠী আছে। তারা জ্যোতির্বিদ্যা, তাবীজ-তুমার ও যাদুমন্ত্র ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত হয়। তাছাড়া আরো কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও দাসত্বের স্বীকৃতি দেয় বটে, তবে তারা এও বলে যে, তোমরা সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছতে পারবেনা। তাঁর দরবারে পৌঁছার মাধ্যম আমরা।

ইবাদাতের আচার অনুষ্ঠান আমাদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে। তোমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আমাদের হাতেই সম্পন্ন হবে। এমন আরো কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহ্র কিতাবের রক্ষক ও পারদর্শী, কিন্তু সাধারণ লোকদেরকে তার জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে, আর নিজেরা আল্লাহ্র স্বকল্পিত বরকন্দাজ সেজে হালাল হারামের মনগড়া বিধি চালু করতে থাকে। এভাবেই তাদের মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি কথাই আইনে পরিণত হয়। তারা মানুষকে আল্লাহ্র নয় বরং নিজেদের হুকুমের দাসে পরিণত করে। পৃথিবীর আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন নামে ও ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে দেশে দেশে ও অঞ্চলে অঞ্চলে যে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পোপতন্ত্র চালু রয়েছে, তার মূল কথা এটাই, এরই বদৌলতে কোনো কোনো বংশ, বর্ণ ও শ্রেণী সাধারণ মানুষের ওপর নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে।

বিভ্রান্তির উৎস

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে জানা যাবে, পৃথিবীতে সকল বিভ্রান্তি এবং সকল বিপর্যয় ও অশান্তির মূল উৎস হলো মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব - চাই তা প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা পরোক্ষভাবে। যাবতীয় অনাচার ও দুষ্কৃতির সূচনা এই জিনিস থেকেই হয়েছে এবং এথেকেই আজও প্রস্ফুটিত হচ্ছে হাজারো বিষাক্ত ঝর্ণা। মানব স্বভাব প্রকৃতির যাবতীয় রহস্য আল্লাহ্ তায়ালারতো এমনিই জানা আছে। কিন্তু এখন হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা দ্বারা খোদ আমাদেরও একথা পুরোপুরিভাবে জানা হয়ে গেছে যে, মানুষ কাউকে না কাউকে ইলাহ বা রব না মেনে থাকতেই পারেনা। কেউ তার প্রভু বা ইলাহ না হলে তার যেনো বাঁচাই অসম্ভব। সে যদি আল্লাহ্কে না মানে, তাহলেও ইলাহ ও প্রভুর হাত থেকে তার নিস্কৃতি নেই। বরং সেক্ষেত্রে তার ঘাড়ের ওপর অসংখ্য ইলাহ ও প্রভু চেপে বসবে। আজও আপনি যেদিকেই তাকান দেখবেন, কোথাও একজাতি অপর জাতির ইলাহ বা খোদা হয়ে বসে আছে। কোথাও এক শ্রেণী অপর শ্রেণী বা গোষ্ঠীর প্রভু হয়ে রয়েছে। কোথাও একটি দল ইলাহ ও রবের পদটি দখল করে বসে আছে। কোথাও জাতীয় রাষ্ট্র খোদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। আবার কোথাও কোনো স্বৈরাচারী হুংকার ছাড়ছে যে, "আমি ছাড়া তোমাদের কোনো খোদা আছে বলেতো জানিনা" [সূরা কাসাস ঃ ৩৮]। দুনিয়ার কোনো একটি স্থানেও মানুষ ইলাহ বা প্রভু ছাড়া জীবন যাপন করেনি।

এরপর মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তার ফল কি দাঁড়ায় তাও ভেবে দেখা দরকার। একজন অযোগ্য লোককে পুলিশ কমিশনার বা একজন মূর্খ লোককে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দিলে যে ফলাফল দেখা দিয়ে থাকে, এখানেও সেটাই দেখা দেবে। একেতো প্রভুত্বের নেশাটাই এমন যে, কোনো মানুষ এই মদ খেয়ে স্থির থাকতেই পারেনা। আর যদি ধরেও নেয়া যায় যে, স্থির থাকতে পারবে, তথাপি প্রভুত্বের দায়িত্ব পালন করতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন এবং যেরূপ নিঃস্বার্থ ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক, তা মানুষ কোথায় পাবে? একারণেই যেখানে যেখানে মানুষের প্রভুত্ব ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে কোনো না কোনো উপায়ে যুল্ম, নিপীড়ন, আগ্রাসন, অবৈধ স্বার্থভোগ, অবিচার ও অসম

আচরণের প্রাদুর্ভাব না ঘটে ছাড়েনি। মানবাত্মা আপন স্বাভাবিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত না হয়ে পারেনি। মানুষের মনমগজের ওপর এবং তার সহজাত ক্ষমতা, যোগ্যতা ও প্রতিভার ওপর এমন কড়াকড়ি আরোপিত না হয়ে পারেনি, যা মানবীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও উন্নয়নকে থামিয়ে দিয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথার্থই বলেছেন ঃ

"আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ আমি আমার বান্দাদেরকে নিখুঁত ও নির্মল স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছিলাম। পরে শয়তান তাদেরকে এসে ঘিরে ধরলো, তাদেরকে তাদের স্বভাবসুলভ নির্ভুল পথ থেকে বিচ্যুত করলো এবং আমি যা কিছু তাদের জন্য হালাল করেছিলাম তা থেকে শয়তানরা তাদের বঞ্চিত করলো।" [হাদীসে কুদ্‌সী]

বস্তুতঃ এই জিনিসটাই মানুষের সকল বিপদ মুসিবত, সকল ধ্বংস ও বিপর্যয় এবং সকল বঞ্চনার মূল কারণ। তার উন্নতির পথে এটাই অন্তরায়। এটাই সেই সর্বনাশা রোগ যা তার নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে, তার জ্ঞান ও চিন্তা শক্তিকে, তার সমাজ ও সভ্যতাকে, তার রাজনীতি ও অর্থনীতিকে, এক কথায় তার সমগ্র মনুষ্যত্বকে যক্ষ্মারোগের মতো খেয়ে ফেলেছে। আদিমতম যুগ থেকে খেয়ে আসছে এবং আজও সমানে খেয়ে চলেছে। এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা হলো, মানুষ সকল রব ও সকল ইলাহকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌কে নিজের প্রভু, ইলাহ ও রব বলে ঘোষণা করবে। এছাড়া তার মুক্তির আর কোনো পথ নেই। কেননা নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী হলেও তো অসংখ্য জাগতিক খোদা ও প্রভুর হাত থেকে তার নিস্কৃতি নেই।

নবীগণের আসল সংস্কারমূলক কাজ

নবীগণ মানুষের জীবনে যে মৌলিক সংস্কারমূলক কাজটি করে গেছেন সেটি ছিলো এই কাজ। আসলে মানুষের ওপর থেকে মানুষের প্রভুত্বের অবসান ঘটাতেই তারা এসেছিলেন। মানুষকে এই যুলুম থেকে, এসব মিথ্যা ও ভূয়া খোদাদের দাসত্ব থেকে এবং এই আগ্রাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি দেয়াই ছিলো তাদের আসল ব্রত ও লক্ষ্য। যে মানুষ মনুষ্যত্বের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তাকে ধাক্কা দিয়ে আবার সীমার মধ্যে ফিরিয়ে আনা এবং যাদেরকে এই সীমার নিচে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো তাদেরকে এই সীমা পর্যন্ত উঠিয়ে আনাই ছিলো তাঁদের লক্ষ্য। সবাইকে তারা এমন একটা সুষম ও সুবিচার ভিত্তিক জীবনব্যবস্থার অনুগত করতে চেয়েছিলেন, যেখানে কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষের দাসও হবেনা, মনিবও হবেনা। উপাস্যও হবেনা, উপাসকও হবেনা। বরং সবাই এক আল্লাহ্‌র গোলামে পরিণত হবে। আদিকাল থেকে এযাবত যতো নবী দুনিয়ায় এসেছেন তাদের সকলের একই বাণী ছিলো যে, "হে জনতা! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র দাসত্ব করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।" হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম, হযরত হুদ আলাইহিস্ সালাম, হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালাম ও হযরত শোয়াইব আলাইহিস্ সালামও একথাই বলেছেন। আর সর্বশেষে আরবের মাটিতে জন্ম নেয়া বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একথাই ঘোষণা করেছেন ঃ

"আমি কেবল একজন সাবধানকারী। সেই আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই যিনি একও সকলের ওপর জয়ী। যিনি আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রভু।" [সূরা সাদ ঃ ৬৫-৬৬]

"নিশ্চয় সে আল্লাহ্ই তোমাদের প্রভু, যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে..... এবং সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রকে সৃষ্টি করেছেন। সবাই তার আদেশের অনুগত। সাবধান, সৃষ্টি তাঁর এবং শাসনও তাঁরই।" [সূরা আরাফ ঃ ৫৪]

"সেই এক আল্লাহ্ই তোমাদের প্রভু। তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনি সকল জিনিসের স্রষ্টা। কাজেই তোমরা তাঁরই আনুগত্য করো, তিনি সকল জিনিসের সংরক্ষক।" [সূরা আনয়াম ঃ ১০২]

"একনিষ্ঠ আনুগত্যও একাগ্রতা সহকারে আল্লাহ্র দাসত্ব করা ছাড়া মানুষকে আর কোনো কাজের আদেশ দেয়া হয়নি।" [সূরা আলবাইয়িনা ঃ ৫]

"যেকথা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন তার দিকে এসো। সেটি হলো, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবোনা, তাঁর খোদায়ীতে আর কাউকে শরীক করবোনা এবং আমাদের মধ্য থেকে কেউ কাউকে আল্লাহ্র বিকল্প প্রভু বানিয়ে নেবোনা।" [সূরা আল ইমরান ঃ ৬৪]

এ আহবানই মানুষের আত্মাকে, তার চিন্তা ও বুদ্ধিকে এবং তার মানসিক ও বস্তুগত শক্তিগুলোকে বিদ্যমান গোলামীর বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলো। এটি ছিলো মানুষের জন্য সত্যিকার স্বাধীনতার সনদ। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কীর্তি সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"মানুষ যে বোঝার নিচে পিষ্ট হচ্ছিলো, এই নবী তাথেকে তাদের উদ্ধার করেন এবং যেসব বন্ধনে তারা আবদ্ধ ছিলো তা তিনি ছিন্ন করেন।" [সূরা আরাফ ঃ ১৫৭]

২. রাজনীতির গোড়ার কথা

নবী আলাইহিস্ সালামগণ মানবজীবনের জন্য যে বিধিব্যবস্থা তৈরী করে দিয়েছেন তার কেন্দ্রবিন্দু ও ভিত্তি, তার মূল প্রাণশক্তি এবং সার নির্যাসই হচ্ছে এই আকিদা ও বিশ্বাস। ইসলামী রাজনীতির গোড়ার কথাই হচ্ছে এই মূলনীতি যে, আদেশ প্রদান ও আইন রচনার ক্ষমতা ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে এবং সামষ্টিকভাবে সকল মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। কারো জন্য এ অধিকার মেনে নেয়া হবেনা যে, সে নির্দেশজারী করবে এবং অন্যেরা তার আনুগত্য করবে। এ অধিকার ও ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র রয়েছে, আর কারো নয়।

"আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো শাসন চলবেনা, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব করোনা, এটাই সঠিক জীবন ব্যবস্থা।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৪০]

"তারা জিজ্ঞাসা করে, ক্ষমতায় আমাদের কিছু অংশ আছে কি? তুমি বলে দাও, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র।" [সূরা আল ইমরান ঃ ১৫৪]

"নিজ নিজ মুখ দিয়ে ভ্রান্তভাবে একথা বলোনা যে, এটা হালাল আর এটা হারাম।" [সূরা আননাহল ঃ ১১৬]

"আল্লাহ্‌র নাযিল করা শরীয়া মোতাবেক যারা ফায়সালা করেনা তারাই কাফের।" [সূরা মায়েদা ঃ ৪৪]

এ মতাদর্শ অনুসারে সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার। আইন রচনাকারী আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নয়। কোনো মানুষ, চাই সে নবীই হোকনা কেন, স্বতন্ত্রভাবে হুকুম দেয়া ও নিষেধ করার অধিকারী নয়। নবী নিজেও আল্লাহ্‌র আদেশেরই অনুগত।

"আমি শুধু ওহীযোগে প্রাপ্ত নির্দেশই মেনে চলি।" [সূরা আনয়াম ঃ ৫০]

সাধারণ মানুষকে নবীর আনুগত্য করার নির্দেশ শুধু এজন্যই দেয়া হয়েছে যে, তিনি নিজের হুকুম নয় বরং আল্লাহ্‌র হুকুম জারী করেন।

"আমি যাকেই রসূল করে পাঠিয়েছি, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর আনুগত্য করা হবে- এজন্যই পাঠিয়েছি।" [সূরা আননিসা ঃ ৬৪]

"এই সকল ব্যক্তিবর্গকেই আমি কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবূয়্যত দান করেছি।" [সূরা আনয়াম ঃ ৮৯]

"কোনো মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবূয়্যত দান করবেন আর সে জনগণকে বলবে, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও। বরং সে শুধু একথাই বলবে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র দাস হ'য়ে যাও।" [সূরা আল ইমরান ঃ ৭৯]

সুতরাং কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের যে কয়টি প্রাথমিক ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ ঃ

১. কোনো ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী বা গোষ্ঠী এমনকি রাষ্ট্রের সমগ্র জনগোষ্ঠী মিলিত হ'য়েও সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয়। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক শুধু আল্লাহ্ তায়ালা। বাদবাকী সবাই নিছক প্রজার মর্যাদা রাখে।

২. আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। সকল মুসলমান মিলিত হয়ে না পারে নিজেদের জন্য কোনো আইন বানাতে, আর না পারে আল্লাহ্‌র প্রণীত কোনো আইন সংশোধন করতে।

৩. আল্লাহ্‌র নবী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে আইন দিয়েছেন, তার ভিত্তিতেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকার শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নকারী সরকার হিসেবেই এবং যতক্ষণ আল্লাহ্‌র আইন প্রয়োগ করতে থাকবে ততক্ষণই আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হবে।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ধরন

যে কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি একটি নজর বুলিয়েই বুঝতে পারে যে, এটা পাশ্চাত্য ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র [Secular Democracy] নয়। কেননা দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রতো বলাই হয় এমন শাসন ব্যবস্থাকে, যাতে দেশের সাধারণ অধিবাসীদের সার্বভৌমত্ব থাকে, তাদের মতেই দেশের আইন তৈরী হয় এবং তাদের মতানুসারেই আইনের সংশোধন ও রদবদল হয়ে থাকে। যে আইন তারা চাইবে তা চালু হবে আর যে আইন তারা চাইবেনা তাকে আইনের বই থেকে খারিজ করে দেয়া হবে। ইসলামে একথা খাটেনা। এখানে একটা সর্বোচ্চ মৌলিক বিধান স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় রসূলের মাধ্যমে দেন, যার আনুগত্য সরকার ও রাষ্ট্রকে করতেই হয়। সুতরাং এ অর্থে তাকে গণতন্ত্র বলা যায়না। এর জন্য অধিকতর নির্ভুল নাম হচ্ছে "খোদায়ী শাসন" যাকে ইংরেজীতে [Theocracy] বলা হয়ে থাকে। তবে ইউরোপ যে থিওক্র্যাসীর সাথে পরিচিত, ইসলামী থিওক্র্যাসী তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউরোপ যে থিওক্র্যাসীর সাথে পরিচিত, তাতে একটা বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী [Priest Class] আল্লাহ্‌র নামে নিজেদের বানানো আইনকানুন চালু করে।[১] এভাবে তারা কার্যত জনসাধারণের ওপর নিজেদের প্রভুত্ব চাপিয়ে দেয়। এধরনের শাসনকে খোদায়ী শাসন বলার চেয়ে শয়তানী শাসন বলাই অধিকতর মানান সই। পক্ষান্তরে ইসলাম যে থিওক্র্যাসী পেশ করে, তা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর হাতে সীমাবদ্ধ থাকেনা, বরং সাধারণ মুসলমানদের হাতে নিবদ্ধ থাকে। আর এই সাধারণ মুসলমানরা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ অনুসারে তা পরিচালনা করে। আমাকে যদি একটা নতুন পরিভাষা উদ্ভাবনের অনুমতি দেয়া হয়, তবে আমি এই শাসন ব্যবস্থাকে "ইসলামী গণশাসন" নামে অভিহিত করবো। কেননা এতে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের অধীন মুসলমানদেরকে একটা সীমিত গণসার্বভৌমত্ব [Limited popular sovereignty] দেয়া হয়েছে। এতে শাসন বিভাগ [Executive] ও আইনসভা [Legislature] মুসলিম জনগণের মতানুসারে গঠিত হবে। মুসলিম জনগণই এই দুটিকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকারী হবে। প্রশাসনিক ও অন্যান্য যেসব বিষয়ে আল্লাহর

১. খৃষ্টান পোপ ও পাদ্রীদের কাছে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের কিছুসংখ্যক নৈতিক শিক্ষা ছাড়া কোনো শরীয়ত তথা আইন বিধান আদৌ ছিলোনা। তাই তারা নিজেদের ইচ্ছামতো আপন প্রবৃত্তির খায়েশ মোতাবেক আইন বানাতো আর তাকে আল্লাহ্‌র আইন আখ্যায়িত করে বাস্তবায়িত করতো। সূরা বাকারার ৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ "যারা নিজ হাতে বই লেখে এবং বলে যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে, তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ পরিণাম।"

শরীয়তে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই, তা মুসলিম জনগণের ঐক্যমতেই নিষ্পন্ন হবে। আল্লাহর আইন যেখানে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হবে, সেখানে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা প্রজন্ম নয়, বরং সাধারণ মুসলমানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেছে, সে তার ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকারী হবে। এদিক থেকে এটা গণতন্ত্র বটে। কিন্তু একটু আগেই যেমন বললাম, যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অকাট্য নির্দেশ বিদ্যমান থাকবে, সেখানে মুসলমানদের কোনো নেতা, কোনো আইনসভা, কোনো মুজতাহিদ, কোনো আলেম, এমনকি সারা দুনিয়ার মুসলমানরাও যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, তথাপি তাদের উক্ত নির্দেশের এক চুল পরিমাণ সংশোধন করারও অধিকার নেই। এদিক থেকে এটা থিওক্র্যাসী বা ধর্মীয় শাসন।

সম্মুখে অগ্রসর হবার আগে আমি এ ব্যাপারে সামান্য ব্যাখ্যা দিতে চাই যে, ইসলামে গণতন্ত্রের ওপর এসব বিধিনিষেধ ও কড়াকড়ি কি জন্য আরোপ করা হয়েছে এবং কি ধরনের বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। যারা আপত্তি তোলে, তারা বলতে পারে, এভাবে তো আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের বিবেক ও আত্মার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছেন। অথচ আপনারা বলে থাকেন, আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি, চিন্তা, দেহ ও প্রাণের স্বাধীনতা দেয়। এর জবাব হলো, আল্লাহ্ তা'য়ালা যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নিজের হাতে রেখেছেন, সেটা মানুষের স্বাভাবিক ও জন্মগত স্বাধীনতা হরণ করার জন্য নয়, বরং তা রক্ষা করার জন্যই রেখেছেন। মানুষকে বিপথগামী হওয়া ও নিজের পায়ে কুড়াল মারা থেকে রেহাই দেয়াই এর উদ্দেশ্য।

পাশ্চাত্যের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র সম্পর্কে দাবী করা হয় যে, তাতে গণ সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা রয়েছে। কিন্তু উক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা করলে এই দাবীর সারবত্তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যে জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটা রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, তারা সবাই স্বয়ং আইন প্রণয়নও করেনা, তা কার্যকরীও করেনা। কতিপয় নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করতে তারা বাধ্য হয়, যাতে ঐ ব্যক্তিবর্গ তাদের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। এ উদ্দেশ্যেই নির্বাচনের একটা ব্যবস্থা ও অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়। যেহেতু সমাজ সামগ্রিকভাবে নৈতিকতা, সততা ও আমানতদারীর মতো অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত এবং এসব ধারণার তেমন কোনো গুরুত্বও স্বীকার করেনা, তাই যারা জনগণকে নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি, ধনসম্পদ, চালাকী-চাতুরী ও মিথ্যা অপপ্রচার দ্বারা বোকা বানাতে পারে, তারাই এই নির্বাচনে অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হয়। শুধু তাই নয়, তারা জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হ'য়ে তাদের ইলাহ বা প্রভু হয়ে বসে। আর নির্বাচিত হয়ে তারা জনগণের উপকারার্থে নয়, বরং নিজেদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থের তাগিদে আইন রচনা করে। অতঃপর জনগণের দেয়া ক্ষমতা বলেই এসব গণবিরোধী আইন জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়। আমেরিকাই বলুন, বৃটেনই বলুন কিংবা অন্য যেসব দেশ নিজেকে গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য বলে মনে করে তাদের কথাই বলুন, সকল দেশেরই এই একই শোচনীয় দশা।

তারপর এদিকটা যদি উপেক্ষা করে মেনেও নিই যে, ওসব দেশে সাধারণ মানুষের ইচ্ছা অনুসারেই আইন প্রণীত হ'য়ে থাকে, তথাপি অভিজ্ঞতা থেকে একথা প্রমাণিত

হয়েছে যে, সাধারণ জনগণ নিজেরা নিজেদের ভালো মন্দ পুরোপুরি বুঝতে পারেনা। মানুষের এটা একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা যে, নিজের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবতার কিছু দিক সে উপলব্ধি করে এবং কিছু উপলব্ধি করতে পারেনা। এজন্য তার সিদ্ধান্ত সাধারণত একপেশে হ'য়ে থাকে। ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনা তার ওপর এতো প্রবল হ'য়ে ওঠে যে, সে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল জ্ঞানগত ও যুক্তিসংগত উপায়ে নির্ভুল ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত ও মতামত খুব কমই গ্রহণ করতে পারে। এমনকি অনেক সময় জ্ঞানগত ও যৌক্তিক দিক দিয়ে যে বিষয়টি তার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়, তাকেও সে ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনার মোকাবিলায় অগ্রাহ্য করে। এর প্রমাণ হিসেবে বহু সংখ্যক উদাহরণ আমি দিতে পারি। তবে দীর্ঘ সূত্রিতা এড়ানোর জন্য আমি আমেরিকার মদ নিষিদ্ধকরণ আইনের উদাহরণটি তুলে ধরবো। যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, তথ্য ও যুক্তির আলোকে এ বিষয়টি সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিলো যে, মদ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিগুলোর ওপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করে এবং মানব সভ্যতায় বিকৃতি ও বিপর্যয় আনয়ন করে। এই তথ্যের ভিত্তিতে মার্কিন জনমত মদ নিষিদ্ধ করণের আইন পাশ করার পক্ষে সম্মতি দেয়। জনগণের সেই রায় অনুসারেই মার্কিন কংগ্রেস ১৯১৮ সালে এই আইন পাশ করে। কিন্তু আইনটি যখন কার্যকর হলো, তখন যে জনতার রায়ে তা পাশ হয়েছিলো তারাই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। তারা অবৈধভাবে আরো খারাপ মদ বানানো এবং পান করলো। আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী মদ ব্যবহৃত হলো, অপরাধ আরো বৃদ্ধি পেলো। অবশেষে যে জনতার ভোটে মদ একদিন হারাম হয়েছিলো, তাদের ভোটেই পুনরায় তাকে হালাল করা হলো। ১৯৩৩ সালে মাত্র ১৫ বছরের ব্যবধানে এই হারাম হওয়ার ফতোয়াটি যে হালাল হওয়ার ফতোয়ায় পরিবর্তিত হ'য়ে গেলো, তার কারণ এ ছিলোনা যে, তাত্ত্বিক ও যৌক্তিকভাবে তখন মদ খাওয়া উপকারী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। বরং এর একমাত্র কারণ এই ছিলো যে, জনগণ তাদের জাহেলী প্রবৃত্তির লালসার গোলামে পরিণত হ'য়ে গিয়েছিলো। তারা তাদের সার্বভৌমত্বকে নিজ নিজ প্রবৃত্তির পরিচালক শয়তানের কাছে সমর্পণ করেছিলো, আপন কামনাবাসনাকে নিজেদের খোদা বানিয়ে নিয়েছিলো এবং এই খোদার গোলামী করতে গিয়ে তারা যে আইনকে একদিন তাত্ত্বিক ও যৌক্তিকভাবে সঠিক মনে করেছিলো, তাকে পরিবর্তন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে গিয়েছিলো। এধরনের আরো বহু নজীর রয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষ তার নিজের জন্য আইন প্রণেতা [Legislature] হবার পুরোপুরি যোগ্যতা রাখেনা। সে অন্যান্য প্রভুর গোলামী থেকে রেহাই পেলেও নিজের অবৈধ খায়েশের গোলাম হয়ে যাবে এবং নিজ প্রবৃত্তির পরিচালক শয়তানকে খোদা বানিয়ে নেবে। সুতরাং তার নিজ স্বার্থেই তার স্বাধীনতার ওপর যুক্তিসংগত সীমারেখা ও বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন।

এ কারণেই আল্লাহ্ তা'য়ালা কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এগুলোকে ইসলামী পরিভাষায় "হুদুদুল্লাহ" তথা "আল্লাহ্র সীমারেখা" [Divine Limits] বলা হয়। জীবনের প্রত্যেক বিভাগে কতিপয় মূলনীতি, বিধি ও অকাট্য নির্দেশাবলীর

সমন্বয়ে রচিত এই বিধিনিষেধ সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারসাম্য ও সুষমতা বজায় রাখার জন্য আরোপ করা হয়েছে। এগুলো দ্বারা মানুষের স্বাধীনতার শেষ সীমা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে এবং বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই সীমারেখার মধ্যে থেকে তোমরা নিজেদের আচরণের জন্য প্রাসংগিক বিধি প্রণয়ন করে নিতে পারো। কিন্তু তোমাদের এই সীমা লংঘন করার অনুমতি নেই। এই সীমা অতিক্রম করলে তোমাদের জীবন বিপর্যয় ও বিকৃতির শিকার হয়ে যাবে।

উদাহরণ স্বরূপ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের কথাই ধরুন। এতে আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যক্তি মালিকানার অধিকার নিশ্চিত করে, যাকাতকে ফরয করে, সূদকে হারাম করে, জুঁয়াকে নিষিদ্ধ করে, উত্তরাধিকারের আইন জারী করে এবং সম্পদ উপার্জন, সঞ্চয় ও ব্যয় করার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে কয়েকটি সীমান্ত রেখা চিহ্নিত করে দিয়েছেন। মানুষ যদি এই সীমান্ত চিহ্নগুলো ঠিক রাখে এবং এগুলোর আওতাধীন থেকে লেনদেন ও কায়কারবার সংগঠিত করে, তাহলে একদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতাও বহাল থাকবে, অপরদিকে শ্রেণী সংগ্রাম [Class War] এবং এক শ্রেণীর ওপর অন্য শ্রেণীর আধিপত্যের সেই পরিবেশও সৃষ্টি হতে পারেনা, যা শোষণ-নিপীড়নমূলক পুঁজিবাদ থেকে শুরু হ'য়ে শ্রমিকদের একনায়কত্বে গিয়ে সমাপ্ত হয়।

অনুরূপভাবে পারিবারিক জীবনে আল্লাহ্ তায়ালা শরীয়ত সম্মত পর্দা, পুরুষের আধিপত্য, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান ও পিতামাতার অধিকার ও কর্তব্য, তালাক ও খুলা'র বিধান, শর্ত সাপেক্ষে একাধিক বিয়ের অনুমতি এবং ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদজনিত শাস্তির বিধান দিয়ে এমন সীমানা চিহ্নিত করে দিয়েছেন যে, মানুষ যদি এই সীমানা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে এবং এর গন্ডীর মধ্যে অবস্থান করে নিজের ঘরোয়া জীবনকে সুশৃংখলভাবে গড়ে তোলে, তাহলে গৃহ যেমন যুলুম নির্যাতনের নিগড়ে পরিণত হবেনা, তেমনি যে লাগামহীন নারী স্বাধীনতার উদ্দাম পৈশাচিক বন্যা সমগ্র মানব সভ্যতাকে ধবংসের হুমকি দিচ্ছে তাও আর সেখান থেকে ফুটে বেরুবেনা।

অনুরূপভাবে মানবীয় সমাজ ও সভ্যতার সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ্ কিসাসের [হত্যার দায়ে প্রাণদন্ড] আইন, চুরির দায়ে হাত কাটা, মদের নিষিদ্ধ হওয়া, শারীরিক সতর ঢাকার সীমা এবং এধরনের কয়েকটি স্থায়ী বিধি নির্ধারণ করার মাধ্যমে বিকৃতির দুয়ার চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্র এসব সীমা নির্ধারণী বিধিসমূহের একটা পূর্ণাংগ তালিকা পেশ করা এবং তার প্রত্যেকটি বিধি যে মানব জীবনে ভারসাম্য ও সুষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য কতো জরুরী তা এখানে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করার অবকাশ নেই। এখানে আমি শুধু এতোটুকু কথা পাঠকের মনে বদ্ধমূল করতে চাই যে, আল্লাহ্ এভাবে এমন একটা স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় সংবিধান [Constitution] মানুষকে দিয়েছেন যা তার স্বাধীনতার প্রাণশক্তিকে এবং তাঁর চিন্তাশক্তি ও বোধশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়না। বরং তার জন্য একটা সুস্পষ্ট ও নির্ভুল সোজা পথ দেখিয়ে দেয়, যাতে সে নিজের অজ্ঞতা ও দুর্বলতা বশত পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত না হয়। তার শক্তি ও প্রতিভাগুলো ভুল পথে অপব্যয় ও অপচয়ের শিকার হয়ে বিনষ্ট না হয়, বরং সে যেনো নিজের সত্যিকার

কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে সোজাসুজিভাবে এগিয়ে যেতে পারে। পাঠক, আপনার যদি কখনো দুর্গম পার্বত্য পথ চলার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়ে থাকে তাহলে আপনি নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন, পেঁচানো পার্বত্য পথের একদিকে গভীর খাদ এবং অপরদিকে উচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর দাঁড়ানো থাকে। আর সেই পথের দুই কিনারকে এমনসব প্রতিবন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয় যাতে পথিক খাদের দিকে চলে যেতে না পারে। এসব প্রতিবন্ধক স্থাপনের উদ্দেশ্য কি পথিকের স্বাধীনতা হরণ করা? না তা নয়। বরং এর উদ্দেশ্য শুধু তাকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করা এবং প্রত্যেক মোড়ে ও প্রত্যেক সম্ভাব্য শংকার সময় তাকে বলে দেয়া যে, তোমার পথ ওদিক নয় এদিক। তোমাকে ওদিকে নয় এদিকে মোড় ঘুরতে হবে, যাতে তুমি নিরাপদে আপন মানযিলে মাকসুদে পৌঁছে যেতে পারো। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর সংবিধানে যে কড়াকড়ি বিধি আরোপ করেছেন, তার উদ্দেশ্যও এটাই। এসব সীমারেখা মানুষের জীবন পথে পরিভ্রমণের সঠিক দিক নির্দেশ করে এবং প্রত্যেক বিপদজ্জনক মোড়ে তাকে জানিয়ে দেয় যে, শান্তি ও নিরাপত্তার পথ এদিকে এবং তোমাকে ওদিকে নয় বরং এদিকে যেতে হবে।

আল্লাহ্‌র রচিত এ সংবিধান অপরিবর্তনীয়। আপনি ইচ্ছা করলে অন্যান্য পাশ্চাত্যভক্ত মুসলিম দেশের ন্যায় এ সংবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেন, কিন্তু তাকে বদলাতে পারবেননা। এটা কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য অটল ও অপরিবর্তনীয় সংবিধান। ইসলামী রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন এ সংবিধানের ভিত্তিতেই হবে। যতদিন কুরআন ও রসূলের সুন্নাহ পৃথিবীতে বহাল থাকবে, ততদিন এ সংবিধানের একটি ধারাকেও স্থানান্তরিত করা যাবেনা। যে মুসলমান থাকতে চাইবে তাকে এর অনুসরণ করতেই হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

এ সংবিধানের আওতায় যে রাষ্ট্র গঠিত হবে, তার জন্য একটা লক্ষ্যও আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং কুরআনের একাধিক স্থানে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন ঃ

> "আমি রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়ে পাঠিয়েছি আর তাদের সাথে কিতাব এবং মানদন্ড দিয়েছি, যাতে লোকেরা সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আমি লোহা নাযিল করেছি, এতে প্রচন্ড শক্তি এবং জনগণের জন্য উপকারিতা রয়েছে।" [সূরা হাদীদ ঃ ২৫]

এ আয়াতে লোহা দ্বারা রাজনৈতিক শক্তি বা প্রয়োগ ক্ষমতাকে [Coercive Power] বুঝানো হয়েছে। আর রসূলের কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে এইযে, আল্লাহ্ তাদেরকে যে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন এবং নিজের কিতাবে যে দাঁড়িপাল্লা অর্থ্যাৎ যে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার প্রতি তাদেরকে আহবান জানিয়েছেন সে অনুসারে সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করবেন। অন্যত্র বলেছেন ঃ

> "তারাই সেইসব লোক, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা দিলে নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজের আদেশ দান করবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।" [সূরা আল হজ্জ ঃ ৪১]

অন্যত্র বলেন ঃ

"মানব জাতির কল্যাণার্থে আবির্ভূত সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি তোমরাই। সৎ কাজের আদেশ দান, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান রাখাই তোমাদের কাজ।" [সূরা আল ইমরান ঃ ১১০]

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

ক. ইতিবাচক ও সর্বাত্মক কর্মকান্ড ঃ উপরোক্ত আয়াত কয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে বুঝা যায়, কুরআন যে রাষ্ট্রের ধারণা ও পরিকল্পনা পেশ করে তার উদ্দেশ্য নেতিবাচক [Negative] নয় বরং তার সামনে একটা ইতিবাচক [Positive] উদ্দেশ্য রয়েছে। তার লক্ষ্য শুধু মানুষের পারস্পরিক বাড়াবাড়ি ও অত্যাচার প্রতিহত করা, তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করা ও দেশকে বিদেশী আক্রমণ থেকে হিফাযত করা নয়; বরং আল্লাহ্‌র কিতাবে সামাজিক সুবিচারের যে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পেশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়িত করাও তার লক্ষ্য। আল্লাহ্ তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীতে অন্যায় অনাচারের যতো রূপ ও ধরনের উল্লেখ করেছেন তার উচ্ছেদ সাধন এবং যতো রকমের ন্যায় ও সৎ কাজের বিবরণ দিয়েছেন তার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন এ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। এ কাজে উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক শক্তিও প্রয়োগ করা হবে। দাওয়াত ও প্রচারণার মাধ্যমেও কাজ চালানো হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপায় উপকরণও কাজে লাগানো হবে এবং দলীয় প্রভাব ও জনমতের চাপও প্রয়োগ করা হবে।

এ ধরনের রাষ্ট্র যে স্বীয় তৎপরতা ও কর্মকান্ডের গন্ডীকে সীমিত করতে পারেনা তা সহজেই বুঝা যায়। এটা একটা বহুমুখী ও সর্বাত্মক রাষ্ট্র। গোটা মানবজীবনই এর কর্মক্ষেত্র। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পৌর ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি বিভাগকে সে নিজের স্বতন্ত্র নৈতিক দৃষ্টিকোণ ও সংস্ককারমূলক কর্মসূচী অনুযায়ী পুনর্গঠন করতে চায়। এখানে কোনো ব্যক্তি নিজের কোনো বিষয়কে ব্যক্তিগত বিষয় বলতে পারেনা। এদিক থেকে এই রাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট ও একনায়ক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে এক ধরনের সাদৃশ্যের দাবীদার বটে। তবে আর একটু অগ্রসর হ'য়ে পাঠক দেখতে পাবেন যে, এহেন সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী কর্তৃত্বের অধিকারী হ'য়েও ইসলামী রাষ্ট্র এযুগের নিরংকুশ আধিপত্যবাদী [Totalitarian] ও সর্বগ্রাসী [Authoritarian] রাষ্ট্র সমূহের মতো ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করেনা, একনায়কত্ব [Dictatorship] চাপিয়ে দেয়না। এক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভারসাম্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং হক ও বাতিলের মাঝে যে নাযুক ও সুক্ষ্ম সীমান্ত প্রাচীর স্থাপন করেছে তা দেখে একজন সত্যিকার অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের বিবেক স্বতস্ফুর্তভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, এমন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা উদ্ভাবন প্রকৃতপক্ষে মহাবিজ্ঞানী ও সুক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

খ. দলীয় ও আদর্শবাদী রাষ্ট্র ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র, উদ্দেশ্য ও সংস্কারমুখী চরিত্র নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে আপনা আপনিই স্পষ্ট হ'য়ে যায় যে, এ রাষ্ট্র শুধু তারাই চালাতে পারে যারা এর শাসনতন্ত্রে বিশ্বাসী, যারা এর উদ্দেশ্যকে নিজেদের জীবনের

উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, যারা এর সংস্কারবাদী কর্মসূচীর সাথে পুরোপুরি একমত, যারা এর প্রতি পুরোপুরি আস্থাশীলই শুধু নয় বরং এর প্রাণশক্তিকে ভালোভাবে হৃদয়ংগমও করে এবং এর খুঁটিনাটিও জানে। ইসলাম এক্ষেত্রে কোনো ভৌগলিক, বর্ণগত ও ভাষাগত বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। সে নিজের শাসনতন্ত্র, উদ্দেশ্য ও সংস্কারমুখী কর্মসূচীকে সকল মানুষের সামনে তুলে ধরে। যে ব্যক্তি তা মেনে নেবে, চাই সে যে কোনো বর্ণ, বংশ, দেশ ও জাতির সাথে সম্পৃক্ত হোক না কেন, সে এই রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত দলে প্রবেশ করতে পারে। আর যে তা গ্রহণ করবেনা তাকে রাষ্ট্রীয় কাজে সম্পৃক্ত করা চলবেনা। তবে সে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাধীন নাগরিক [Protecter Citizen] হিসেবে বসবাস করতে পারে। তার জন্য ইসলামী আইনে সুনির্দিষ্ট অধিকার ও সুযোগ সুবিধা নির্দ্ধারিত রয়েছে। তবে তাকে সরকারে অংশীদারের মর্যাদা দেয়া হবেনা। কেননা এটা একটা আদর্শবাদী রাষ্ট্র যার প্রশাসনিক কাজ শুধু এর আদর্শে বিশ্বাসী লোকেরাই চালাতে পারে। [অত্র গ্রন্থের ১৬শ অধ্যায় আরো বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

এখানেও ইসলামী রাষ্ট্রে ও কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে খানিকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথে যে আচরণ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র করে থাকে, ইসলামী রাষ্ট্রের আচরণের সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই। বিজয় অর্জন ও ক্ষমতা হস্তগত করার সাথে সাথেই আপন সাংস্কৃতিক রীতিনীতিকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়া, বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, হত্যা ও রক্তপাত চালানো এবং হাজার হাজার মানুষকে দুনিয়ার জাহান্নাম সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়ার যে অব্যাহত ধারা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে শুরু হয়, ইসলামে সে সবের কোনো অস্তিত্ব নেই। ইসলাম স্বীয় রাষ্ট্রীয় সীমানায় অমুসলিমদের প্রতি যে উদার আচরণ করে থাকে এবং এ ব্যাপারে যুলুম ও ন্যায়বিচার এবং সত্য ও অসত্যের মাঝে যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা টেনে দেয়, তা দেখে যেকোনো ইনসাফপ্রিয় মানুষ একনজরেই বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে সংস্কারকগণ আসে তারা কিভাবে কাজ করে। আর পৃথিবীতে যেসব নকল ও স্বকথিত সংস্কারকদের আবির্ভাব ঘটে তাদের কর্মপদ্ধতি কিরূপ হয়ে থাকে।

৪. খিলাফত ও তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

এবার আমি ইসলামী রাষ্ট্রের অবকাঠামো ও তার কর্মপদ্ধতির কিছু ব্যাখ্যা দেবো। আমি আগেই বলেছি, ইসলামে আসল সার্বভৌম শাসক হচ্ছেন আল্লাহ্। এই মূলনীতির আলোকে যখন আপনি এ প্রশ্ন নিয়ে ভাববেন যে, পৃথিবীতে যারা আল্লাহ্র আইন চালু করতে উদ্যোগী হবে তাদের মর্যাদা ও অবস্থান কি রকম হওয়া উচিত, তখন আপনার মন আপনা থেকেই বলে উঠবে, তাদের আসল সার্বভৌম শাসকের প্রতিনিধি বলেই আখ্যায়িত হওয়া উচিত। ইসলামেও তাদের ঠিক এই মর্যাদাই দেয়া হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

> "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, তাদের সাথে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি [খলীফা] বানাবেন, ঠিক যেভাবে তাদের পূর্বে অন্যদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছিলেন।" [সূরা নূর ঃ ৫৫]

এ আয়াত ইসলামের রাষ্ট্র তত্ত্বের ওপর অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আলোকপাত করে। এতে দুটো মৌলিক বিষয় আলোচিত হয়েছে ঃ

প্রথমতঃ ইসলাম সার্বভৌম শাসনের পরিবর্তে খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব পরিভাষাটি ব্যবহার করে। যেহেতু তার মতাদর্শ অনুসারে সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্র, তাই ইসলামী শাসনতন্ত্র অনুসারে যে ব্যক্তি পৃথিবীর কোথাও শাসক পদে অধিষ্ঠিত হবে তাকে অবশ্যই সর্বোচ্চ শাসক আল্লাহ্র প্রতিনিধি হতে হবে। সে শুধুমাত্র অর্পিত ক্ষমতা [Delegated power] প্রয়োগের অধিকারী।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে জানা যায় যে, খলীফা বা প্রতিনিধি বানানোর ওয়াদা সকল মুমিনের সাথে করা হয়েছে। একথা বলা হয়নি যে, মুমিনদের মধ্য থেকে কাউকে প্রতিনিধি বানাবো। এথেকে বুঝা যায়, প্রত্যেক মুমিন খিলাফাতের অধিকার প্রাপ্ত। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে খিলাফত মুমিনদেরকে দেয়া হয় তা সার্বজনীন খিলাফত। কোনো ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী বা বর্ণের জন্য তা নির্দিষ্ট নয়। প্রত্যেক মুমিন স্ব স্ব স্থানে আল্লাহ্র খলীফা। খলীফা হিসেবে প্রত্যেকে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য। একটি বিখ্যাত হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

> "তোমাদের প্রত্যেকে এক একজন রাখাল। প্রত্যেকে নিজ নিজ অধীনস্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

আল্লাহ্র এই সার্বজনীন খিলাফতের আওতায় এক খলীফা অপর খলীফার চেয়ে কোনো দিক দিয়েই নিকৃষ্ট নয়।

ইসলামী গণতন্ত্রের মর্যাদা

এই হলো ইসলামে গণতন্ত্রের প্রকৃত ভিত্তি। সার্বজনীন খিলাফতের উল্লিখিত তত্ত্বটি পর্যলোচনা করলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে সমূহে উপনীত হওয়া যায়।

১. যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ্র খলীফা এবং খিলাফতে সমান অংশীদার সে সমাজে শ্রেণীভিত্তিক বিভক্তি ও বৈষম্য এবং জন্মগত বা সামাজিক আভিজাত্য ও বৈষম্যের কোনো অবকাশ নেই। সে সমাজে সকল ব্যক্তি সমান মর্যাদাসম্পন্ন হবে। শ্রেষ্ঠত্ব যেটুকুই হবে ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও সততার ভিত্তিতেই হবে। এ বিষয়টা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিকবার দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরেছেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেন ঃ

"ওহে জনতা! শুনে নাও, তোমাদের প্রতিপালক একজন। কোনো অনারবের ওপর আরবের এবং কোনো আরবের ওপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোনো কালো মানুষের ওপর সাদা মানুষের এবং সাদা মানুষের ওপর কালো মানুষের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব কেবল খোদভীরুতা তথা সততার ভিত্তিতে নির্ণিত হবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে খোদাভীরু, সেই আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে সম্মানের পাত্র।" [তাফসীরে রুহুল মায়ানী, ২৬তম খন্ড, পৃঃ ১৪৮]

মক্কা বিজয়ের পর যখন সমগ্র আরব জগত ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলো তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকেরা আরবে পুরোহিতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলো। তাদের তিনি বললেন ঃ

"আল্লাহ্র শোকর, তিনি তোমাদেরকে জাহেলিয়াতের দোষ ও অহংকার থেকে পবিত্র করেছেন। হে জনমন্ডলী! শোনো, মানুষ দু'রকমের হ'য়ে থাকে ঃ এক, যারা সৎ ও সংযত। তারা আল্লাহ্র কাছে সম্মানিত। দুই, যারা অসৎ ও দুষ্কর্ম পরায়ণ। তারা আল্লাহ্র কাছে নিকৃষ্ট। মূলতঃ সকল মানুষ আদমের সন্তান। আর আদমকে আল্লাহ্ মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ্ বলেন, হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদেরকে একই পুরুষ ও স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি।......"

২. এ ধরনের সমাজে কোনো ব্যক্তি বা কোনো জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের জন্ম, সামাজিক মর্যাদা অথবা পেশার দিক দিয়ে এমন কোনো বাধাবিপত্তি থাকা উচিত নয়, যা তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশে এবং তার ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধনে কোনোভাবে প্রতিবন্ধক হ'য়ে দেখা দিতে পারে। এখানে সমাজের সকল ব্যক্তিবর্গের উন্নতির সমান সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকে। মানুষ নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতার বলে যতদূর সম্মুখে অগ্রসর হতে সক্ষম ততদূর যেনো অগ্রসর হতে পারে, সেজন্য একদিকে যেমন তার নিজের পথ খোলা থাকা চাই অপরদিকে তেমনি অন্য কারো অগ্রসরতা যেনো তার দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয় তারও নিশ্চয়তা থাকা চাই। ইসলামে এ জিনিসটা সর্বাধিক পরিমাণে ও পূর্ণাংগভাবে বিদ্যমান। ইসলামের ইতিহাসে বহু ক্রীতদাস ও তাদের সন্তানরা সেনাপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছে এবং বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের অধীনে কাজ করেছে। বহু চামার জুতো সেলাই করতে করতেই সহসা ইমামের মসনদে আসীন হয়ে গেছেন। বহু জোলা [কাপড়

প্রস্তুতকারী] মুফতী, কাযীও ফকীহ্ হয়েছেন এবং আজ তাদের নাম ইসলামের মহাপুরুষদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"তোমাদের ওপর যদি কোনো হাবশী ক্রীতদাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয় তবু তার আদেশ শোনো এবং মান্য করো।" [বুখারী]

৩. এ ধরনের সমাজে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একনায়ক সুলভ শাসক হ'য়ে জেঁকে বসার কোনো অবকাশ নেই। কেননা এখানে প্রত্যেকেই খলীফা। সাধারণ মুসলমানদের থেকে তাদের খিলাফত কেড়ে নিয়ে স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হওয়ার অধিকার কারো নেই। এখানে যাকে শাসক করা হয় তার প্রকৃত অবস্থা হলো, সকল মুসলমান অথবা পারিভাষিক শব্দে বলতে গেলে সকল খলীফা সেচ্ছায় নিজ নিজ খিলাফতকে প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে তার হাতে কেন্দ্রীভূত করে দেয়। সে একদিকে আল্লাহ্র সামনে অপরদিকে যারা তার কাছে নিজ নিজ খিলাফতকে অর্পণ করেছে সেই সমস্ত খলীফার সামনে জবাবদিহী করতে বাধ্য। এখন সে যদি দায়িত্বহীন একনায়কে রূপান্তরিত হয় তাহলে সে আর খলীফা থাকেনা বরং শোষক ও জবরদখলকারীতে পরিণত হয়। কেননা একনায়কত্ব আসলে জনগণের সার্বজনীন খিলাফতের অস্বীকৃতি। যদিও একথা সত্য যে, ইসলামী রাষ্ট্র একটা সর্বাত্মক রাষ্ট্র এবং জীবনের সকল বিভাগের ওপর তার কর্মকান্ড বিস্তৃত। এই সর্বাত্মক ব্যবস্থার ভিত্তি হলো আসলে আল্লাহ্র যে আইন দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে সেই আইনই সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী। আল্লাহ্ তা'য়ালা জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে যেসব নির্দেশ জারী করেছেন তা অবশ্যই সর্বোতভাবে কার্যকর করা হবে। কিন্তু ঐসব নির্দেশের প্রতিকূলে ইসলামী রাষ্ট্র স্বয়ং জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করতে পারেনা। সে জনগণকে কোনো পেশা গ্রহণে বা বর্জনে, কোনো কারিগরী শিখতে বা না শিখতে, শিশুদেরকে কোনো বিশেষ বিষয় শেখাতে বা না শেখাতে, বিশেষ কোনো ধরনের টুপি পরতে বা না পরতে, ভাষার জন্য বিশেষ ধরনের বর্ণমালা ব্যবহার করতো বা না করতে এবং মেয়েদেরকে কোনো বিশেষ ধরনের পোশাক পরাতে বা না পরাতে বাধ্য করতে পারেনা। রাশিয়া, জার্মানী ও ইটালীর একনায়কগণ এসব সেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন এবং আতাতুর্কও তা তুরস্কে প্রয়োগ করেন। কিন্তু ইসলাম কখনো তার শাসকদেরকে এধরনের ক্ষমতা দেয়নি। তাছাড়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ইসলামে প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্র কাছে দায়ী। এই ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহী এমন একটি ব্যাপার যাতে তার কোনো অংশীদার নেই। সুতরাং আইনের সীমানার মধ্যে তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত, যাতে সে নিজের জন্য যেকোনো পথ অবলম্বন করতে পারে এবং যেদিকেই তার ঝোঁক হয় সেদিকেই নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারে। শাসক যদি তার পথে বাধা দেয় তাহলে সে যুলুমকারী হিসেবে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহীর সম্মুখীন হবে। এ কারণেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে প্রজাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণের নামনিশানাও চোখে পড়েনা।

৪. এধরনের সমাজে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নর-নারীর ভোটাধিকার থাকা চাই। কেননা সে খিলাফাতের অধিকারী। আল্লাহ্ এই খিলাফাতকে কোনো বিশেষ পর্যায়ের যোগ্যতা বা ধনসম্পদের শর্তযুক্ত করেননি। শুধুমাত্র ঈমান ও সৎকর্মশীলতার শর্ত আরোপ করেছেন। সুতরাং রায় বা ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে সকল মুসলমান সমান অধিকার ভোগ করে।

একদিকে ইসলাম এহেন সর্বোচ্চ ও পূর্ণাংগ পর্যায়ের গণতন্ত্র কায়েম করেছে। অপরদিকে সামষ্টিক জীবনের সাথে সংঘর্ষশীল হয় এমন ব্যক্তি স্বাধীনতার [Individualism] বিকাশ রোধ করেছে। এখানে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যাতে কম্যুনিজম ও ফ্যাসিবাদের সামষ্টিক সমাজ কাঠামোর ন্যায় সমাজের মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা হারিয়ে না যায়। আবার পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ন্যায় ব্যক্তিস্বাধীনতা এতো সীমাহীন না হয় যে, সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জীবনের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। সেটি হচ্ছে আল্লাহ্র আইন বাস্তবায়ন ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। উপরন্তু ইসলামে ব্যক্তির অধিকার পুরোপুরি মেনে নেয়ার পর তার জন্য সমাজের প্রতিও কিছু কর্তব্য নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামষ্টিকতার মধ্যে এমন সমন্বয় সৃষ্টি হয়েছে যে, ব্যক্তি স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের পুরো সুযোগও লাভ করে, আবার সে নিজের উৎকর্ষ প্রাপ্ত শক্তিগুলিকে নিয়ে সমাজ কল্যাণের কাজেও সহায়ক হয়। এটা একটা স্বতন্ত্র বিষয়। এটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। ইসলামী গণতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা আমি কিছু আগে করেছি তার ফলে যেসব ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো তার প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যেই এ বিষয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত ইংগিত করলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআনের রাজনৈতিক দর্শন

- ● রাজনীতি বিজ্ঞানের মৌলিক জিজ্ঞাসা
- ১ কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব
- ২ জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি
- ৩ দীন এবং আল্লাহ্‌র আইন
- ৪ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব
- ৫ সার্বভৌমত্ব ও খিলাফতের ধারণা
- ৬ আনুগত্যের মূলনীতি

কুরআনুল করীম আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত সেই সর্বশেষ গ্রন্থ, যাতে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা মানব জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ে তাঁর হিদায়াতের পূর্ণাংগরূপ মানুষকে প্রদান করেছেন। সাথে সাথে এই শাশ্বত মূলনীতিও ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, এ হিদায়াতকে যারা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং এর নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করবে, তারাই হবে সফলকাম ও সৌভাগ্যবান ঃ

"যারা আমার হিদায়াতের অনুসরণ অনুবর্তন করেছে, তাদের কোনো ভয় নেই, দুশ্চিন্তা নেই। আর যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে আর আমার আয়াতকে মিথ্যে বলেছে, তারা আগুনের সাথী হবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে।" [আল বাকারা ঃ ৩৮-৩৯]

কুরআন মানব জীবনের সকল বিভাগ সম্পর্কে মৌলিক হিদায়াত প্রদান করেছে। কুরআনের আসল আলোচ্য বিষয় হলো, মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা। জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্যেও এতে সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা রয়েছে। সুতরাং মৌলিক রাজনৈতিক বিষয়ে আল্লাহ্‌র এই মহান কিতাব নীরব থাকার কোনো কারণ থাকতে পারেনা। কুরআন দীন ও দুনিয়ার বিভক্তিকে বিপর্যয় বলে আখ্যায়িত করেছে। কুরআন তার অনুসারীদের কাছে দাবী করেঃ "উদ্‌খুলূ ফীস্ সিল্‌মি কাফ্‌ফাতান- ইসলামে প্রবেশ করো পরিপূর্ণরূপে" 'কুরআনের রাজনৈতিক দর্শণ' শিরোনামের অধীনে কুরআনের রাজনৈতিক ধারণা তুলে ধরা হয়েছে।

তাফহীমুল কুরআন মাওলানা মওদূদীর খ্যাতনামা তাফসীর গ্রন্থ। এ গ্রন্থে মাওলানা যুগসমস্যা এবং মুসলমানদের আধুনিক মনমানসিকতাকে সামনে রেখে পবিত্র কুরআনের হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। এ গ্রন্থ থেকেই আমরা এখানে রাজনৈতিক নিবন্ধগুলো সন্নিবেশিত করে দিয়েছি। **-সংকলক।**

রাজনীতি বিজ্ঞানের মৌলিক জিজ্ঞাসা

রাজনীতি বিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পারস্পারিক সম্পর্কের সাথে জড়িত। এই বিজ্ঞানের কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন হলো ঃ

১. রাষ্ট্রের প্রয়োজন কি?
২. রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবেন কে?
৩. আনুগত্যের মূলনীতি কি হবে?
৪. রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও মৌলিক কার্যাবলী কি?

সম্মুখের পাতাগুলোতে কুরআনের আলোকে এই প্রশ্নগুলোর জবাব উপস্থাপন করা হলো। কুরআনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগি উপলব্ধি করার জন্যে বিশ্বজগতে মানুষের মর্যাদা ও গোটা জীবন সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভংগি কি, সেকথাটি আগেই বুঝে নেয়া জরুরী। তাই কুরআনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগি উপস্থাপন করার আগে জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি কি? সেবিষয়ে কিছু মৌলিক বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে। এরপরই কুরআনের রাজনৈতিক ধারণা উপস্থাপন করা হবে।

১. কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব

পাঠককে সর্বপ্রথম মূল কুরআনের সাথে পরিচিত হতে হবে। এর প্রতি তার বিশ্বাস থাকা না থাকার প্রশ্ন এখানে নেই। তবে এ কিতাবকে বুঝতে হলে প্রারম্ভিক সূত্র হিসেবে এ কিতাব নিজে এবং এর উপস্থাপক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মূল বিষয় বিবৃত করেছেন তা গ্রহণ করতে হবে। এ মূল বিষয় নিম্নরূপ ঃ

১. সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও একচ্ছত্র শাসক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ এ পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দান করেছেন জানার, বুঝার ও চিন্তা করার ক্ষমতা। ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার, নির্বাচন, ইচ্ছা ও সংকল্প করার এবং নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করার স্বাধীনতা দান করেছেন। এক কথায় মানুষকে এক ধরনের স্বাধীনতা [Autonomy] দান করে তাকে দুনিয়ায় নিজের খলীফা বা প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত করেছেন।

২. মানুষকে এই পদে নিযুক্ত করার সময় বিশ্ব জাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মানুষের মনে একথা দৃঢ় বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন ঃ আমিই তোমাদের এবং সমগ্র বিশ্ব জগতের একমাত্র মালিক, মাবুদ ও প্রভু। আমার এই সাম্রাজ্যে তোমরা স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী নও, কারোর অধীনও নও এবং আমার ছাড়া আর কারোর তোমাদের বন্দেগী, পূজা ও আনুগত্য লাভের অধিকারও নেই। দুনিয়ার এই জীবনে তোমাদেরকে কিছু স্বাধীন ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এটি আসলে তোমাদের জন্য

পরীক্ষাকাল। এই পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে তোমাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তোমাদের কাজগুলো যাঁচাই বাছাই করে আমি সিদ্ধান্ত নেবো তোমাদের মধ্য থেকে কে সফল হলো এবং কে হলো ব্যর্থ। তোমাদের জন্য সঠিক কর্মনীতি একটিই ঃ তোমরা আমাকে মেনে নেবে তোমাদের একমাত্র মাবুদ ও শাসক হিসেবে। আমি তোমাদের জন্য যে বিধান পাঠাবো সেই অনুযায়ী তোমরা দুনিয়ায় কাজ করবে। দুনিয়াকে পরীক্ষাগৃহ মনে করে এই চেতনা সহকারে জীবন যাপন করবে যেনো আমার আদালতে শেষ বিচারে সফলকাম হওয়াই তোমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য। বিপরীত পক্ষে এর থেকে ভিন্নতর প্রত্যেকটি কর্মনীতি তোমাদের জন্য ভুল ও বিভ্রান্তিকর। প্রথম কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে [যেটি গ্রহণ করার স্বাধীন ক্ষমতা তোমাদের দেয়া হয়েছে] তোমরা দুনিয়ায় শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করবে। তারপর আমার কাছে ফিরে আসলে আমি তোমাদের দান করবো চিরন্তন আরাম ও আনন্দের আবাস জান্নাত। আর দ্বিতীয় কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে [যেটি গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তোমাদের দেয়া হয়েছে] তোমাদের দুনিয়ায় বিপর্যয় ও অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হবে এবং দুনিয়ার জীবন শেষ করে আখিরাতে প্রবেশকালে সেখানে জাহান্নাম নামক চিরন্তন মর্মজ্বালা দুঃখ কষ্ট ও বিপদের গভীর গর্ভে তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে।

৩. একথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর বিশ্ব জাহানের মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মানব জাতিকে পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মানব জাতির দুই সদস্য [আদম ও হাওয়া] বিশিষ্ট প্রথম গ্রুপকে তিনি পৃথিবীতে জীবন যাপন করার জন্য বিধান দান করেন। এই বিধান অনুযায়ী তাদের ও তাদের সন্তান সন্ততিদের দুনিয়ার সমস্ত কাজ কারবার চালিয়ে যেতে হবে। মানুষের এই প্রাথমিক বংশধররা মুর্খতা, অজ্ঞতা ও অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্ট হননি। আল্লাহ্ পৃথিবীতে তাঁদের জীবনের সূচনা করেন সম্পূর্ণ আলোর মধ্যে। তারা সত্যকে জানতেন। তাদেরকে জীবনবিধান দেয়া হয়েছিলো। আল্লাহ্‌র আনুগত্য [অর্থাৎ ইসলাম] ছিলো তাদের জীবন পদ্ধতি। তাঁরা তাঁদের সন্তানদেরও আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাহ্ [মুসলিম] হিসেবে জীবন যাপন করার কথা শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শত শত বছরের জীবনাচরণে মানুষ ধীরে ধীরে এই সঠিক জীবন পদ্ধতি [অর্থাৎ দীন] থেকে দূরে সরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করেছে। গাফলতির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে তারা এক সময় এই সঠিক জীবন পদ্ধতি হারিয়ে ফেলেছে। আবার শয়তানী প্ররোচনায় একে বিকৃতও করেছে। তারা পৃথিবী ও আকাশের মানব ও অমানব এবং কাল্পনিক ও বস্তুগত বিভিন্ন সত্তাকে আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর কাজ কারবারে শরীক করেছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত যথার্থ জ্ঞানের [আল ইল্‌ম] মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্পনা, ভাববাদ, মনগড়া মতবাদ ও দর্শনের মিশ্রণ ঘটিয়ে তারা অসংখ্য ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহ্ নির্ধারিত ন্যায়নিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতি [শরীয়ত] পরিহার বা বিকৃত করে নিজেদের প্রবৃত্তি, স্বার্থ ও ঝোঁক প্রবণতা অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য নিজেরাই এমন বিধান তৈরী করেছে যার ফলে আল্লাহ্‌র এই যমীন যুলুম নিপীড়নে ভরে গেছে।

৪. আল্লাহ্ যদি তাঁর স্রষ্টাসুলভ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিপথগামী মানুষদের জোরপূর্বক সঠিক কর্মনীতি ও জীবনধারার দিকে ঘুরিয়ে দিতেন তাহলে তা হতো মানুষকে আল্লাহ্ প্রদত্ত সীমিত স্বাধীনতাদান নীতির পরিপন্থী। আবার এ ধরনের বিদ্রোহ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই তিনি যদি মানুষকে ধ্বংস করে দিতেন তাহলে সেটি হতো সমগ্র মানব জাতিকে পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তিনি যে সময় ও সুযোগ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার সাথে অসামঞ্জস্যশীল। সৃষ্টির প্রথমদিন থেকে তিনি যে দায়িত্বটি গ্রহণ করেছিলেন সেটি ছিলো এই যে, মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে কাজের মাঝখানে যেসব সুযোগ সুবিধে দেয়া হবে তার মধ্যে দিয়েই তিনি তাকে পথ নির্দেশনা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই নিজের ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মানব জাতির মধ্য থেকে এমন একদল লোককে ব্যবহার করতে শুরু করেন যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান রাখতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যেতেন। এদেরকে তিনি করেন নিজের প্রতিনিধি। এদের কাছে পাঠান নিজের অলংঘনীয় বাণী। যথার্থ সত্য জ্ঞান ও জীবন যাপনের সঠিক বিধান এদেরকে দান করে তিনি বনী আদমকে ভুল পথ থেকে এই সহজ সত্য পথের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দেয়ার জন্য এদেরকে নিযুক্ত করেন।

৫. এঁরা ছিলেন আল্লাহ্র নবী। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আল্লাহ্ তাঁর নবী পাঠাতে থাকেন। হাজার হাজার বছর থেকে তাদের আগমনের এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তাঁদের সংখ্যা ছিলো হাজার হাজার। তাঁরা সবাই একই দীনের তথা জীবন পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমদিন থেকেই মানুষকে যে সঠিক কর্মনীতির সাথে পরিচিত করানো হয়েছিলো তাঁরা সবাই ছিলেন তারই অনুসারী। তাঁরা সবাই ছিলেন একই হিদায়াতের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ প্রথম দিন থেকেই মানুষের জন্য নৈতিকতা ও সমাজ সংস্কৃতির যে চিরন্তন নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিলো তাঁরা ছিলেন তারই প্রতি অনুগত। তাঁদের সবার একই মিশন ছিলো। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের বংশধর, গোত্র ও জাতিকে এই দীন ও হিদায়াতের দিকে আহবান জানান। তারপর যারা এ আহবান গ্রহণ করে তাদেরকে সংগঠিত করে এমন একটি উম্মতে পরিণত করেন যাঁরা নিজেরা হন আল্লাহ্র আইনের অনুগত এবং দুনিয়ায় আল্লাহ্র আইনের আনুগত্য কায়েম করার এবং তাঁর আইনের বিরুদ্ধাচরণ প্রবণতা প্রতিরোধ করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকেন। এই নবীগণ প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের যুগে অত্যন্ত সুচারুরূপে এ মিশনের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সবসময় দেখা গেছে মানব গোষ্ঠির একটি বিরাট অংশ তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুতই হয়নি। আর যারা এই দাওয়াত গ্রহণ করে উম্মতে মুসলিমার অংগীভূত হয় তারাও ধীরে ধীরে নিজেরাই বিকৃতির সাগরে তলিয়ে যেতে থাকে। এমনকি তাদের কোনো কোনো উম্মত আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়াতকে একেবারেই হারিয়ে ফেলে। আবার কেউ কেউ আল্লাহ্র বাণীর সাথে নিজেদের কথার মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে তার চেহারাই বিকৃত করে দেয়।

৬. সবশেষে বিশ্বজাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আরব দেশে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠান। ইতিপূর্বে বিভিন্ন নবীকে তিনি যে দায়িত্ব দিয়ে

দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরও সেই একই দায়িত্ব অপর্ণ করেন। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে পূর্বের নবীদের পথভ্রষ্ট উম্মতদেরকেও তিনি আল্লাহ্‌র দীনের দিকে আহবান জানান। সবাইকে সঠিক কর্মনীতি ও সঠিক পথ গ্রহণের দাওয়াত দেন। সবার কাছে নতুন করে আল্লাহ্‌র হিদায়াত পৌঁছিয়ে দেয়া এবং এই দাওয়াত ও হিদায়াত গ্রহণকারীদেরকে এমন একটি উম্মতে পরিণত করাই ছিলো তাঁর কাজ, যারা একদিকে আল্লাহ্‌র হিদায়াতের ওপর নিজেদের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অন্যদিকে সমগ্র দুনিয়ার সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবে। এই দাওয়াত ও হিদায়াতের কিতাব হচ্ছে এই কুরআন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আল্লাহ্‌ এই কিতাবটি অবতীর্ণ করেন।[১]

২. জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি

কুরআন এ বিশ্বে মানুষের সঠিক মর্যাদা ও জীবন সম্পর্কে তার পূর্ণাংগ দৃষ্টিভংগি একটি আয়াতেই বলে দিয়েছে ঃ

> "প্রকৃত ব্যাপার হলো, আল্লাহ্‌ মুমিনদের থেকে তাদের প্রাণ ও ধনসম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে [জান্নাতের ওয়াদা] আল্লাহ্‌র জিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা বিশেষ। আর আল্লাহ্‌র চাইতে বেশী নিজের ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে যে কেনাবেচা করেছো সেজন্য সুসংবাদ গ্রহণ করো। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।" [সূরা আততওবা ঃ ১১১]

আল্লাহ্‌ ও বান্দাহ্‌র মধ্যে ঈমানের যে ব্যাপারটা স্থিরিকৃত হয় তাকে কেনাবেচা বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, ঈমান শুধুমাত্র একটা অতি প্রাকৃত আকীদা বিশ্বাস নয়, বরং এটা একটা চুক্তি। এ চুক্তির প্রেক্ষিতে বান্দাহ্‌ তার নিজের প্রাণ ও নিজের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র হাতে বিক্রি করে দেয়। আর এর বিনিময়ে সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ ওয়াদা কবুল করে নেয় যে, পরবর্তী জীবনে তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম কেনাবেচার তাৎপর্য ও স্বরূপ কি তা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

নিরেট সত্যের আলোকে বিচার করলে বলা যায়, মানুষের ধনপ্রাণের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্‌। কারণ, তিনিই তার এবং তার কাছে যা কিছু আছে সব জিনিসের স্রষ্টা। সে যা কিছু ভোগ ও ব্যবহার করছে তাও তিনিই তাকে দিয়েছেন। কাজেই এদিক দিয়ে তো কেনাবেচার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। মানুষের এমন কিছু নেই, যা সে বিক্রি করবে। আবার কোনো জিনিস আল্লাহ্‌র মালিকানার বাইরেও নেই, যা তিনি কিনবেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন একটি জিনিস আছে, যা আল্লাহ্‌ পুরোপুরি মানুষের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে তার ইখতিয়ার অর্থাৎ নিজের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও

---

১. তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা থেকে গৃহীত।

স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি [Free will and freedom of choice]। এ ইখতিয়ারের কারণে অবশ্যি প্রকৃত সত্যের কোনো পরিবর্তন হয়না। কিন্তু মানুষ এ মর্মে স্বাধীনতা লাভ করে যে, সে চাইলে প্রকৃত সত্যকে মেনে নিতে পারে এবং চাইলে তা অস্বীকার করতে পারে। অন্য কথায়, এ ইখতিয়ারের মানে এ নয় যে, মানুষ প্রকৃতপক্ষে তার নিজের প্রাণের, নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক শক্তির এবং দুনিয়ায় সে যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেছে, তার মালিক হয়ে গেছে। এ সংগে এ জিনিসগুলো সে যেভাবে চাইবে সেভাবে ব্যবহার করার অধিকার লাভ করেছে, একথাও ঠিক নয়। বরং এর অর্থ কেবল এতোটুকুই যে, তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোনো প্রকার জোর জবরদস্তি ছাড়াই সে নিজেই নিজের সত্তার ও নিজের প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর আল্লাহ্‌র মালিকানা ইচ্ছা করলে স্বীকার করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নিজেই নিজের মালিক হয়ে যেতে পারে এবং নিজেই একথা মনে করতে পারে যে, সে আল্লাহ্ থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজের ইখতিয়ার তথা স্বাধীন কর্মক্ষমতার সীমানার মধ্যে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অধিকার রাখে। এখানেই কেনাবেচার প্রশ্নটা দেখা দেয়। আসলে এ কেনাবেচা এ অর্থে নয় যে, মানুষের একটি জিনিস আল্লাহ্ কিনতে চান। বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিসটি আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন, যাকে তিনি আমানত হিসেবে মানুষের হাতে সোপর্দ করেছেন এবং যে ব্যাপারে বিশ্বস্ত থাকার বা অবিশ্বস্ত হবার স্বাধীনতা তিনি মানুষকে দিয়ে রেখেছেন, সে ব্যাপারে তিনি মানুষের কাছে দাবী করেন, আমার জিনিসকে তুমি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে [বাধ্য হয়ে নয়] আমার জিনিস বলে মেনে নাও এবং সারা জীবন স্বাধীন মালিকের মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নয় বরং আমানতদার হিসেবে তা ব্যবহার করার বিষয়টি গ্রহণ করে নাও। এ সংগে খেয়ানত করার যে স্বাধীনতা তোমাকে দিয়েছি তা তুমি নিজেই প্রত্যাহার করো। এভাবে যদি তুমি দুনিয়ার বর্তমান অস্থায়ী জীবনে নিজের স্বাধীনতাকে [যা তোমার অর্জিত নয় বরং আমার দেয়া] আমার হাতে বিক্রি করে দাও তাহলে আমি পরবর্তী চিরন্তন জীবনে এর মূল্য জান্নাতের আকারে তোমাকে দান করবো। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কেনাবেচার এ চুক্তি সম্পাদন করে সে মুমিন। ঈমান আসলে এ কেনাবেচার আর এক নাম। আর যে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে অথবা অঙ্গীকার করার পরও এমন আচরণ করবে যা কেবলমাত্র কেনাবেচা না করার অবস্থায় করা যেতে পারে, সে কাফের। আসলে এ কেনাবেচাকে পাস কাটিয়ে চলার পারিভাষিক নাম কুফরী।

কেনাবেচার এ তাৎপর্য ও স্বরূপটি অনুধাবণ করার পর এবার তার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা যাক ঃ

এক ঃ এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ মানুষকে দু'টি বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। প্রথম পরীক্ষাটি হচ্ছে, তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবার পর সে মালিককে মালিক মনে করার এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের পর্যায়ে নেমে না আসার মতো সৎ আচরণ করে কিনা? দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নিজের প্রভু ও মালিক আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আজ নগদ যে মূল্য পাওয়া যাচ্ছেনা বরং মরার পর পরকালীন জীবনে যে মূল্য আদায় করার ওয়াদা তাঁর পক্ষ থেকে করা হয়েছে, তার বিনিময়ে নিজের আজকের স্বাধীনতা ও তার

যাবতীয় স্বাদ বিক্রি করতে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে রাজী হয়ে যাবার মত আস্থা তাঁর প্রতি আছে কিনা।

দুই ঃ যে ফিকহের আইনের ভিত্তিতে দুনিয়ায় ইসলামী সমাজ গঠিত হয় তার দৃষ্টিতে ঈমান শুধুমাত্র কতিপয় বিশ্বাসের স্বীকৃতির নাম। এ স্বীকৃতির পর নিজের স্বীকৃতি ও অংগীকারের ক্ষেত্রে মিথ্যুক হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত শরীয়াতের কোনো বিচারক কাউকে অমুমিন বা ইসলামী মিল্লাত বহির্ভূত ঘোষণা করতে পারেনা। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য ঈমানের তাৎপর্য ও স্বরূপ হচ্ছে, বান্দাহ্ তার চিন্তা ও কর্ম উভয়ের স্বাধীনতা ও স্বাধীন ক্ষমতা আল্লাহ্‌র হাতে বিক্রি করে দিবে এবং নিজের মালিকানার দাবী পুরোপুরি তাঁর সপক্ষে প্রত্যাহার করবে। কাজেই যদি কোনো ব্যক্তি ইসলামের কালেমার স্বীকৃতি দেয় এবং নামায রোযা ইত্যাদির বিধানও মেনে চলে, কিন্তু নিজেকে নিজের দেহ ও প্রাণের, নিজের মন, মস্তিষ্ক ও শারীরিক শক্তির, নিজের ধনসম্পদ, উপায় উপকরণ ইত্যাদির এবং নিজের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত জিনিসের মালিক মনে করে এবং সেগুলোকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার স্বাধীনতা নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখে, তাহলে হয়তো দুনিয়ায় তাকে মুমিন মনে করা হবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে সে অবশ্যি অমুমিন গণ্য হবে। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে কেনাবেচার ব্যাপারকে ঈমানের আসল তাৎপর্য ও স্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ সে আল্লাহ্‌র সাথে আদতে কোনো কেনাবেচার কাজই করেনি। যেখানে আল্লাহ্ চান সেখানে ধনপ্রাণ নিয়োগ না করা এবং যেখানে তিনি চান না সেখানে ধনপ্রাণ নিয়োগ ও ব্যবহার করা এ দুটি কার্যধারাই চূড়ান্তভাবে ফায়সালা করে দেয় যে, ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি তার ধনপ্রাণ আল্লাহ্‌র হাতে বিক্রি করেইনি অথবা বিক্রির চুক্তি করার পরও সে বিক্রি করা জিনিসকে যথারীতি নিজের জিনিস মনে করছে।

তিন ঃ ঈমানের এ তাৎপর্য ও স্বরূপ ইসলামী জীবনাচরণকে কাফেরী জীবনাচরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে মুসলিম ব্যক্তি সঠিক অর্থে আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান এনেছে সে জীবনের সকল বিভাগে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগত হয়ে কাজ করে। তার আচরণে কোথাও স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভংগির প্রকাশ ঘটতে পারেনা। তবে কোনো সময় সাময়িকভাবে সে গাফলতির শিকার হতে পারে এবং আল্লাহ্‌র সাথে নিজের কেনাবেচার চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা অবলম্বন করাও তার পক্ষে সম্ভব। এটা অবশ্যি ভিন্ন ব্যাপার। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের সমন্বয়ে গঠিত কোনো দল বা সমাজ সমষ্টিগতভাবেও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও তাঁর শরয়ী আইনের বিধিনিষেধ মুক্ত হয়ে কোনো নীতি পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় নীতি, তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি এবং কোনো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক আচরণ অবলম্বন করতে পারেনা। কোনো সাময়িক গাফলতির কারণে যদি সেটা অবলম্বন করেও থাকে তাহলে যখনই সে এ ব্যাপারে সতেচন হবে তখনই স্বাধীন ও স্বৈরাচারী আচরণ ত্যাগ করে পুনরায় বন্দেগীর আচরণ করতে থাকবে। আল্লাহ্‌র আনুগত্য মুক্ত হয়ে কাজ করা এবং নিজের ও নিজের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে নিজে নিজেই কি করবো না করবো, সিদ্ধান্ত নেয়া অবশ্যি একটি কুফরী জীবনাচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাদের জীবন

যাপন পদ্ধতি এরকম তারা "মুসলমান" নামে আখ্যায়িত হোক বা "অমুসলিম" নামে তাতে কিছু যায় আসেনা।

চার ঃ এ কেনাবেচার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র যে ইচ্ছার আনুগত্য মানুষের জন্য অপরিহার্য হয় তা মানুষের নিজের প্রস্তাবিত বা উদ্ভাবিত নয় বরং আল্লাহ্ নিজে যেমন ব্যক্ত করেন তেমন। নিজে নিজেই কোনো জিনিসকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বলে ধরে নেয়া এবং তার আনুগত্য করতে থাকা মূলত আল্লাহ্‌র ইচ্ছার নয় বরং নিজেরই ইচ্ছার আনুগত্য করার শামিল। এটি এ কেনাবেচার চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। যে ব্যক্তি ও দল আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর হিদায়াত থেকে নিজের সমগ্র জীবনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে একমাত্র তাকেই আল্লাহ্‌র সাথে কৃত নিজের কেনাবেচার চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হবে।

এ হচ্ছে এ কেনাবেচার অন্তর্নিহিত বিষয়। এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর এ কেনাবেচার ক্ষেত্রে বর্তমান পার্থিব জীবনের অবসানের পর মূল্য [অর্থাৎ জান্নাত] দেবার কথা বলা হয়েছে কেন তাও আপনা আপনিই বুঝে আসে। "বিক্রেতা নিজের প্রাণ ও ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র হাতে বিক্রি করে দেবে" কেবলমাত্র এ অংগীকারের বিনিময়েই যে জান্নাত পাওয়া যাবে তা নয়। বরং "বিক্রেতা নিজের পার্থিব জীবনে এ বিক্রি করা জিনিসের ওপর নিজের স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রত্যাহার করবে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানতের রক্ষক হয়ে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করবে।" এরূপ বাস্তব ও সক্রিয় তৎপরতার বিনিময়েই জান্নাত প্রাপ্তি নিশ্চিত হতে পারে। সুতরাং বিক্রেতার পার্থিব জীবনকাল শেষ হবার পর যখন প্রমাণিত হবে যে, কেনাবেচার চুক্তি করার পর সে নিজের পার্থিব জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত চুক্তির শর্তসমূহ পুরোপুরি মেনে চলেছে একমাত্র তখনই এ বিক্রি সম্পূর্ণ হবে। এর আগে পর্যন্ত ইনসাফের দৃষ্টিতে সে মূল্য পাওয়ার অধিকারী হতে পারেনা।

৩. দীন এবং আল্লাহ্‌র আইন

> "ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে এক'শ কোড়া মারো। তাদের উপর আল্লাহ্‌র আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে তোমাদের মনে যেনো অনুকম্পা না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখো।" [সূরা নূর ঃ ২]

এ আয়াতে প্রথম উল্লেখযোগ্য জিনিসটি হচ্ছে, এখানে ফৌজদারী আইনকে "আল্লাহ্‌র দীন" বলা হচ্ছে। এথেকে জানা যায়, শুধুমাত্র নামায, রোযা হজ্জ ও যাকাতই দীন নয়, বরং দেশের আইনও দীন। দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামায প্রতিষ্ঠা নয় বরং আল্লাহ্‌র আইন ও শরীয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাও। যেখানে এসব প্রতিষ্ঠিত হয়না সেখানে নামায প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও অসম্পূর্ণ দীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে। যেখানে একে বাদ দিয়ে অন্য কোনো আইন অবলম্বন করা হয় সেখানে অন্য কিছু নয় বরং আল্লাহ্‌র দীনকেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৪. রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

> "আর হে নবী দোয়া করো ঃ আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে যেখানেই তুমি নিয়ে যাও সত্যতার সাথে নিয়ে যাও এবং যেখান থেকেই বের করো সত্যতার

সাথে বের করো। এবং তোমার পক্ষ থেকে একটি কর্তৃত্বশীল পরাক্রান্ত শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।" [সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮০]

অর্থাৎ এ আয়াতে আল্লাহ্ নবীকে এভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে, তুমি বলো, হে আল্লাহ্! তুমি নিজেই আমাকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দান করো অথবা কোনো রাষ্ট্র ক্ষমতাকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও যাতে তার ক্ষমতা ব্যবহার করে আমি দুনিয়ার বিকৃত জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারি, অশ্লীলতা ও পাপের সয়লাব রুখে দাঁড়াতে পারি এবং তোমার ন্যায় বিধান জারি করতে সক্ষম হই। হাসান বস্‌রী ও কাতাদাহ এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীরের ন্যায় মহান তাফসীরকারগণও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস থেকেও এরি সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

"আল্লাহ্ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে এমনসব জিনিসের উচ্ছেদ ঘটান কুরআনের মাধ্যমে যেগুলোর উচ্ছেদ ঘটাননা।"

এথেকে জানা যায়, ইসলাম দুনিয়ায় যে সংশোধন চায় তা শুধুমাত্র ওয়ায নসীহতের মাধ্যমে হতে পারেনা বরং তাকে কার্যকর করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতারও প্রয়োজন হয়। তারপর আল্লাহ্ নিজেই যখন তাঁর নবীকে এ দোয়া শিখিয়েছেন তখন এথেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, দীন প্রতিষ্ঠা ও শরীয়তী আইন প্রবর্তন এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত দন্ডবিধি জারী করার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা হাসিল করার প্রত্যাশা করা এবং এজন্য প্রচেষ্টা চালানো শুধু জায়েযই নয় বরং কাংখিত ও প্রশংসিতও এবং অন্যদিকে যারা এ প্রচেষ্টা ও প্রত্যাশাকে বৈষয়িক স্বার্থ পূজা ও দুনিয়াদারী বলে আখ্যায়িত করে তারা ভুলের মধ্যে অবস্থান করছে। কোনো ব্যক্তি যদি নিজের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করতে চায় তাহলে তাকে বৈষয়িক স্বার্থ পূজা বলা যায়। কিন্তু কেউ আল্লাহ্‌র দীনের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করতে চাইলে এ চাওয়া বৈষয়িক স্বার্থ পূজা নয় বরং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রত্যক্ষ দাবী।

এ জিনিসটাই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জীবনাদর্শে আমরা দেখতে পাই। তিনি যে নৈতিক ও সংস্কার বিপ্লবের আহবায়ক ছিলেন কর্তৃত্ব ছিলো তার জন্য অপরিহার্য। যখন পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল দেখা দিলো তখন তিনি সে সুযোগ গ্রহণ করে ইসলামী রাস্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিষয়টিই কুরআন মজীদে চিত্রিত হয়েছে এভাবেঃ

"বাদশাহ বললো, "তাকে আমার কাছে আনো, আমি তাকে একান্তভাবে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেবো।" ইউসুফ যখন তার সাথে আলাপ করলো, সে বললো, "এখন আপনি আমাদের এখানে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং আপনার আমানতদারীর ওপর পূর্ণ ভরসা আছে।" ইউসুফ বললো, "দেশের অর্থসম্পদ আমার হাতে সোপর্দ করুন। আমি সংরক্ষণকারী এবং জ্ঞানও রাখি।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৫৪-৫৫]

এর আগে যেসব আলোচনা হয়েছে তার আলোকে পর্যালোচনা করলে একথা পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, কোনো পদলোভী ব্যক্তি বাদশাহর ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই

যেমন কোনো পদলাভের জন্য আবেদন করে বসে এটি তেমনি ধরনের কোনো চাকরির আবেদন ছিলোনা। আসলে এটি ছিলো একটি বিপ্লবের দরজা খোলার জন্য সর্বশেষ আঘাত। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের নৈতিক শক্তির বলে বিগত দশ বারো বছরের মধ্যে এ বিপ্লব ক্রমবিকাশ লাভ করে আত্মপ্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো এবং এখন এর দরজা খোলার জন্য শুধুমাত্র একটি হাল্‌কা আঘাতের প্রয়োজন ছিলো। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক পরীক্ষার অংগন অতিক্রম করে আসছিলেন। কোনো অজ্ঞাত স্থানে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং বাদশাহ থেকে শুরু করে মিসরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই এ সম্পর্কে অবগত ছিলো। এসব পীক্ষার মাধ্যমে তিনি একথা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, আমানতদারী, সততা, ধৈর্য, সংযম, উদারতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার ক্ষেত্রে অন্তত সমকালীন লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ব্যক্তিত্বের এ গুণগুলো এমনভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিলো যে, এগুলো অস্বীকার করার সাধ্য কারোর ছিলোনা। দেশবাসী মুখে এগুলোর পক্ষে সাক্ষ দিয়েছিলো। তাদের হৃদয় এগুলোর দ্বারা বিজিত হয়েছিলো। বাদশাহ নিজেই এগুলোর সামনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এখন তাঁর "সংরক্ষণকারী" ও "জ্ঞানী" হওয়া শুধুমাত্র একটি দাবীর পর্যায়ভুক্ত ছিলোনা বরং এটি ছিলো একটি প্রমাণিত ঘটনা। সবাই এটা বিশ্বাস করতো। এখন শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কর্তৃত্ব পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সম্মতিটুকুই বাকি ছিলো। বাদশাহ, তাঁর মন্ত্রীপরিষদ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ একথা ভালোভাবেই জেনেছিলেন যে, তিনি ছাড়া এ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করার মতো আর দ্বিতীয় কোনো যোগ্য ব্যক্তিত্বই নেই। কাজেই নিজের এ উক্তির সাহায্যে তিনি এ সম্মতিটুকুরই প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন মাত্র। তাঁর কণ্ঠে এ দাবীটুকু উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই বাদশাহ ও তাঁর রাজ পরিষদ যেভাবে দুহাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করে নিয়েছেন তা একথাই প্রমাণ করে যে, ফল পুরোপুরি পেকে গিয়েছিলো এবং তা ঝরে পড়ার জন্য শুধুমাত্র একটা ইশারার অপেক্ষায় ছিলো। [তালমূদের বর্ণনামতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করার ফায়সালাটি কেবল বাদশাহ্ একাই করেননি। বরং সমগ্র রাজপরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর পক্ষে রায় দিয়েছিলো।

৫. সার্বভৌমত্ব ও খিলাফতের ধারণা

ইসলামে সার্বভৌমত্বের ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। আল্লাহ্ এই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা এবং তিনি সর্বোচ্চ শাসক। সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব কেবল তারই। মানুষের মর্যাদা হলো, সে সর্বোচ্চ শাসকের প্রতিনিধি এবং তার রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে সর্বোচ্চ শাসকের আইনের অনুগামী। প্রতিনিধির কাজ হলো, সর্বোচ্চ শাসকের আইনকে তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য অনুযায়ী কার্যকর করা এবং তাঁর নির্দেশিত পথে রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করা। কুরআনের ভাষ্য দেখুন ঃ

ক "হে জেলখানার সাথীরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব ভালো, না এক আল্লাহ্, যিনি সবার ওপর বিজয়ী। তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের গোলামী করছো তারা শুধুমাত্র কতকগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যে

নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃ পুরুষরা রেখেছো, আল্লাহ্ এগুলোর পক্ষে কোনো প্রমাণ পাঠাননি। শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোর নেই। তাঁর হুকুম হলো, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারোর দাসত্ব করবেনা। এটিই সরল সঠিক জীবন পদ্ধতি, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানেনা।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৩৯-৪০]

এটি ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাষণের একটি অংশ। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও তাওহীদের ব্যাপারে এটি সর্বোত্তম ভাষণসমূহের একটি। এতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম শ্রোতাদের সামনে দীনের এমন একটি সূচনা বিন্দু তুলে ধরেন যেখান থেকে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের পথ পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। অর্থাৎ তিনি তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। আবার এ পার্থক্যকে এমন যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে সুস্পষ্ট করেছেন, যার ফলে সাধারণ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তিই তা অনুভব না করে পারেননা। বিশেষ করে সে সময় যাদেরকে সম্বোধন করে তিনি একথা বলছিলেন তাদের মন মস্তিষ্কে তীরের মতো একথা গেঁথে গিয়ে থাকবে। কারণ তারা ছিলো কর্মজীবি গোলাম। নিজেদের মনের গভীরে তারা একথা ভালোভাবে অনুভব করতো যে, একজন প্রভুর গোলাম হওয়া ভালো, না একাধিক প্রভুর গোলাম হওয়া? আর সারা দুনিয়ার একক প্রভু যিনি, তার দাসত্ব করা ভালো, না তার দাসদের দাসত্ব করা? তারপর তিনি একথাও বলেননা যে, তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করো এবং আমার দীন গ্রহণ করো। বরং চমৎকার কৌশলে বলছেন, আল্লাহ্র কতোবড় মেহেরবানী, তিনি আমাদের তাঁর ছাড়া আর কারো দাস হিসেবে পয়দা করেননি, অথচ অধিকাংশ লোক তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা বরং অনর্থক নিজেরাই মনগড়া প্রভু তৈরী করে তাদের পূজা ও দাসত্ব করছে। তারপর তিনি শ্রোতাদের অনুসৃত ধর্মের সমালোচনাও করছেন, কিন্তু অত্যন্ত যুক্তিসংগতভাবে এবং কোনো প্রকার মনোকষ্ট না দিয়ে। তিনি এতোটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে, এই যেসব মাবুদ যাদের কাউকে তোমরা অন্নদাতা, কাউকে অনুগ্রহদাতা ও করুণানিধি, কাউকে ভূমির অধিপতি এবং কাউকে ধনসম্পদের মালিক অথবা স্বাস্থ্য ও রোগের একচ্ছত্র অধিপতি ও পরিচালক ইত্যাদি বলে থাকো - এরা নিছক কিছু অন্তসারশূন্য নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নামগুলোর পিছনে কোনো সত্যিকার অন্নদাতা, অনুগ্রহকারী, মালিক ও প্রভুর অস্তিত্ব নেই। আসল মালিক ও প্রভু হচ্ছেন মহান আল্লাহ্, যাকে তোমরাও বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক বলে স্বীকার করে থাকো। তিনি এসব মালিক ও প্রভুদের কাউকে মালিকানা, প্রভুত্ব ও উপাস্য হবার ছাড়পত্র দেননি। তিনি সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের যাবতীয় অধিকার ও ক্ষমতা নিজের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন এবং তাঁরই আদেশ হচ্ছে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবেনা।

খ "আর ফেরাউন বললো, "হে সভাসদবর্গ! আমি তো আমাকে ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ আছে বলে জানিনা।" [সূরা আল কাসাস ঃ ৩৮]

এ উক্তির মাধ্যমে ফেরাউন যে বক্তব্য পেশ করেছে তার অর্থ এ ছিলোনা এবং তা হতেও পারতোনা যে, আমিই তোমাদের এবং পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা। কারণ কেবলমাত্র কোনো পাগলের মুখ দিয়েই এমন কথা বের হতে পারতো। অনুরূপভাবে

এর অর্থ এও ছিলোনা এবং হতে পারতোনা যে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই। কারণ মিসরবাসীরা বহু দেবতার পূজা করতো এবং স্বয়ং ফেরাউনকেই যেভাবে উপাস্যের মর্যাদা দেয়া হয়েছিলো তাও শুধুমাত্র এই ছিলো যে, তাকে সূর্য দেবতার অবতার হিসেবে স্বীকার করা হতো। সবচেয়ে বড় সাক্ষী কুরআন মজীদ নিজেই। কুরআনে বলা হয়েছে ফেরাউন নিজে বহু দেবতার পূজারী ছিলো।

এদিক দিয়ে চিন্তা করলে যেসব রাষ্ট্র আল্লাহ্‌র নবী প্রদত্ত শরীয়তের অধীনতা প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের তথাকথিত রাজনৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্বের দাবীদার, ফেরাউনের অবস্থা তাদের থেকে ভিন্নতর ছিলোনা। তারা আইনের উৎস এবং আদেশ নিষেদের কর্তা হিসেবে অন্য কোনো বাদশাকে মানুক অথবা জাতির ইচ্ছার আনুগত্য করুক, যতক্ষণ তারা এরূপ নীতি অবলম্বন করে চলবে যে, দেশে আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের নয় বরং আমাদের হুকুম চলবে, ততক্ষণ তাদের ও ফেরাউনের নীতি ও ভূমিকার মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য থাকবেনা। এটা ভিন্ন কথা যে, অবুঝ লোকেরা একদিকে ফেরাউনকে অভিসম্পাত করতে থাকে, অন্যদিকে ফেরাউনী রীতিনীতির অনুসারী এসব শাসককে বৈধতার ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যের জ্ঞান রাখে, সে শব্দ ও পরিভাষা নয়, অর্থ ও প্রাণশক্তি দেখবে। ফেরাউন নিজের জন্য "ইলাহ" শব্দ ব্যবহার করেছিলো এবং এরা সেই একই অর্থে "সার্বভৌমত্বের" পরিভাষা ব্যবহার করছে।

গ "তিনি হলেন সেই সত্ত্বা, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের মালিক। তিনি কাউকেও পুত্র বানাননা। তাঁর রাজত্বে কোনো অংশীদার নেই। প্রতিটি জিনিস তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর একটি তাকদীর নির্ধারণ করেছেন।" [সূরা আল ফুরকান ঃ ২]

মূলে 'মুল্‌ক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি বাদশাহী, রাজত্ব, সর্বময় কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের [Sovereignty] অর্থে বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ্‌ই এ বিশ্ব জাহানের সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক এবং তাঁর শাসন ক্ষমতায় কারো সামান্যতমও অংশ নেই। একথার স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য ফল এই যে, তাহলে তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। কারণ, মানুষ যাকেই মা'বুদে পরিণত করে একথা মনে করেই করে যে, তার কাছে কোনো শক্তি আছে, যে কারণে সে আমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে এবং আমাদের ভাগ্যের ওপর ভালো মন্দ প্রভাব ফেলতে পারে। শক্তিহীন ও প্রভাবহীন সত্তাদেরকে আশ্রয়স্থল করতে কোনো একান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও রাজি হতে পারেনা। এখন যদি একথা জানা যায় যে, মহান আল্লাহ্‌ ছাড়া এ বিশ্ব জাহানে আর কারো কোনো শক্তি নেই তাহলে বিনয় নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য কোনো মাথা তাঁর ছাড়া আর কারো সামনে ঝুঁকবেনা, কোনো হাতও তাঁর ছাড়া আর কারো সামনে নজরানা পেশ করার জন্য এগিয়ে যাবেনা, কোনো কণ্ঠও তাঁর ছাড়া আর কারো প্রশংসাগীতি গাইবেনা বা কারো কাছে প্রার্থনা করবেনা ও ভিক্ষা চাইবেনা এবং দুনিয়ার কোনো নিরেট মূর্খ অজ্ঞ ব্যক্তিও কখনো নিজের প্রকৃত ইলাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য ও দাসত্ব করার মতো বোকামী

করবেনা অথবা কারো স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনাধিকার মেনে নেবেনা। "আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য" ওপরের এ বাক্যাংশটি থেকে এ বিষয়বস্তুটি আরো বেশী শক্তি অর্জন করে।

ঘ "আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র। তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা প্রকাশ করো কিংবা গোপন রাখো সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্ সেগুলোর হিসেব নেবেন। অতপর তিনি যাকে চাইবেন মাফ করে দেবেন, আর যাকে চাইবেন শাস্তি দেবেন, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৪]

এটি হচ্ছে দীনের প্রথম বুনিয়াদ। আল্লাহ্ এই পৃথিবীর ও আকাশ সমূহের মালিক এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁর একক মালিকানাধীন, প্রকৃতপক্ষে এই মৌলিক সত্যের ভিত্তিতেই মানুষের জন্য আল্লাহ্র সামনে আনুগত্যের শির নতো করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কর্মপদ্ধতি বৈধ ও সঠিক হতে পারেনা।

এই বাক্যটিতে আরো দুটি কথা বলা হয়েছে। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহ্র কাছে দায়ী হবে এবং এককভাবে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। দুই, পৃথিবী ও আকাশের যে একচ্ছত্র অধিপতির কাছে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞান রাখেন। এমনকি লোকদের গোপন সংকল্প এবং তাদের মনের সংগোপনে যেসব চিন্তা জাগে সেগুলিও তাঁর কাছে গোপন নয়।

এটি আল্লাহ্র নিরংকুশ ক্ষমতারই একটি বর্ণনা। তাঁর ওপর কোনো আইনের বাঁধন নেই। কোনো বিশেষ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি বাধ্য নন। বরং তিনি সর্বময় ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। শাস্তি দেয়ার এবং মাফ করার পূর্ণ ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে।

কুরআনে ঈসা আলাইহিস্ সালামের বক্তব্য উল্লেখ হয়েছে এভাবে ঃ

ঙ "আমি সেই শিক্ষা ও হিদায়াতের সত্যতা ঘোষণা করার জন্য এসেছি, যা বর্তমানে আমার যুগে তাওরাতে আছে। আর তোমাদের জন্য যেসব জিনিস হারাম ছিলো তার কতকগুলি হালাল করার জন্য আমি এসেছি। দেখো, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আমি নিশানী নিয়ে এসেছি। কাজেই আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আল্লাহ্ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। কাজেই তোমরা তাঁর দাসত্ব করো। এটিই সোজাপথ।" [সূরা আল ইমরান ঃ ৫০-৫১]

এথেকে জানা গেলো অন্যান্য সকল নবীর মতো হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের দাওয়াতেরও তিনটি মৌলিক বিষয়বস্তু ছিলো ঃ

এক, সার্বভৌম কর্তৃত্ব, যার দাসত্ব ও বন্দেগী করতে হবে এবং যার প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে নৈতিক ও তামদ্দুনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত বলে স্বীকার করতে হবে।

দুই, ঐ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর প্রতিনিধি হিসেবে নবীর নির্দেশের আনুগত্য করতে হবে।

তিন, মানুষের জীবনকে হালাল ও হারাম এবং বৈধতা ও অবৈধতার বিধিনিষেধে আবদ্ধকারী আইন ও বিধিবিধান একমাত্র আল্লাহ্ দান করবেন। অন্যদের চাপানো সমস্ত আইন ও বিধি নিষেধ বাতিল করতে হবে।

কাজেই হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নবীর মিশনের মধ্যে আসলে সামান্যতম পার্থক্যও নেই। যারা বিভিন্ন নবীর মিশন বিভিন্ন বলে গণ্য করেছেন এবং তাদের মিশনের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন, তারা মারাত্মক ভুল করেছেন। বিশ্বজাহানের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারীর পক্ষ থেকে তাঁর প্রজাদের জন্যে যে ব্যক্তিই নিযুক্ত হয়ে আসবেন তাঁর আসার উদ্দেশ্য এছাড়া আর দ্বিতীয় কিছুই হতে পারেনা যে, তিনি প্রজাদেরকে অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও শির্ক [অর্থাৎ সার্বভৌম প্রভুত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র মালিক ও প্রভু আল্লাহ্র সাথে আর কাউকে অংশীদার করা এবং নিজের বিশ্বস্ততা ও ইবাদাত বন্দেগীকে তাদের মধ্যে বিভক্ত করে দেয়া] থেকে বিরত রাখবেন এবং আসল ও প্রকৃত মালিকের নির্ভেজাল আনুগত্য, দাসত্ব, পূজা, আরাধনা ও ইবাদত করার আহবান জানাবেন।

দুঃখের বিষয়, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের মিশনকে উপরে কুরআনে যেমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, বর্তমান ইনজীলে তেমনটি করা হয়নি। তবুও উপরে যে তিনটি মৌলিক বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে তা বিক্ষিপ্তভাবে ইশারা ইংগিতের আকারে হলেও বর্তমানে ইনজীলে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম একমাত্র আল্লাহ্র বন্দেগীর দাওয়াত দিয়েছিলেন, একথা ইনজীলের নিম্নোক্ত ইংগিত থেকে সুস্পষ্ট হয় ঃ

> তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রনিপাত [সিজদা] করো এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো। [মথি ৪ ঃ ১০]

তিনি যে কেবল এরি দাওয়াত দিয়েছিলেন তা নয়, বরং তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যই ছিলো, আকাশ রাজ্যে যেমন সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন আল্লাহ্র নিরংকুশ আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনুরূপভাবে পৃথিবীতেও একমাত্র তাঁরই শরিয়ার আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

> তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন আকাশে পূর্ণ হয় তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক। [মথি ৬ ঃ ১০]

তাছাড়া হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম নিজেকে নবী ও আসমানী রাজত্বের প্রতিনিধি হিসেবেই পেশ করতেন এবং এ হিসেবেই লোকদেরকে নিজের আনুগত্য করার দাওয়াত দিতেন। তাঁর ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্যগুলো থেকে জানা যায়, তিনি নিজের জন্মভূমি 'নাসেরা' [নাজারাথ]তে নিজের দাওয়াতের সূচনা করলে তাঁর আত্মীয় স্বজন ও শহরবাসীরাই তাঁর বিরোধীতায় নেমে পড়ে। এ সম্পর্কে মথি, মার্ক ও লুক একযোগে বর্ণনা করেছেন যে, "নবী তাঁর স্বদেশে জনপ্রিয় হননা।" তারপর জেরুসালেমে যখন তাঁর হত্যার চক্রান্ত চলতে লাগলো এবং লোকেরা তাঁকে অন্য কোথাও চলে যাবার পরামর্শ দিলো তখন তিনি জবাব দিলেন ঃ "নবী জেরুসালেমের বাইরে মৃত্যুবরণ করবে, এটা সম্ভব নয়" [লুক ১৩ ঃ ৩৩]। শেষবার যখন তিনি জেরুসালেম প্রবেশ করছিলেন তখন তাঁর শিষ্যবর্গ উচ্চস্বরে বলতে লাগলো ঃ "ধন্য সেই রাজা যিনি প্রভুর নামে আসছেন।" একথায় ইহুদি আলেমরা অসন্তুষ্ট হলেন এবং তারা হযরত ঈসা

আলাইহিস সালামকে বললেন, "আপনার শিষ্যদের মুখ বন্ধ করুন।" হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন ঃ "ওরা যদি মুখ বন্ধ করে তাহলে পাথরগুলি চিৎকার করে উঠবে।" [লুক ১৯ ঃ ৩৮-৪০]

আর একবার তিনি বললেন ঃ

হে শ্রমজীবিরা! হে ভারবহনে পিষ্ট লোকেরা! সবাই আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের বিশ্রাম দান করবো। আমার জোয়াল তোমাদের কাঁধে উঠিয়ে নাও। -------আমার জোয়াল সহজে বহনীয় এবং আমার বোঝা হালকা। [মথি ১১ ঃ ২৮-৩০]

এছাড়া হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম মানব রচিত আইনের পরিবর্তে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের আনুগত্য করতে চাইতেন একথাও মথি ও মার্কের বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। তাদের বর্ণনার সার নির্যাস হচ্ছে ঃ ইহুদী আলেমগণ অভিযোগ করলেন, আপনার শিষ্যরা পূর্ববর্তী সম্মানীয় বুযুর্গদের ঐতিহ্যের বিপরীত হাত না ধুয়েই আহার করে কেন? হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম এর জবাবে বললেন ঃ তোমাদের মতো রিয়াকারদের অবস্থা হচ্ছে ঠিক তেমনি যেমন হযরত ইয়াসয়া নবীর কণ্ঠে এ তিরস্কার করা হয়েছে ঃ "এই উম্মত মুখে আমার প্রতি মর্যাদার বাণী উচ্চারণ করে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমার থেকে দূরে। কারণ এরা মানব রচিত আইনের শিক্ষা দেয়।" তোমরা আল্লাহ্র হুকুমকে বাতিল করে থাকো এবং নিজেদের বানোয়াট আইনকে প্রতিষ্ঠিত রাখো। আল্লাহ্ তাওরাতের মাধ্যমে তোমাদের হুকুম দিয়েছিলেন, মা বাপের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং যে ব্যক্তি মা বাপকে সম্মান করবেনা তার প্রাণনাশ করো। কিন্তু তোমরা বলছো যে ব্যক্তি মা বাপকে একথা বলে দেয়, আমার যে খিদমত তোমার কাজে লাগতে পারে তাকে আমি আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি, তার জন্য মা বাপের খিদমত না করা সম্পূর্ণ বৈধ। [মথি ১৫ ঃ ৩-৯, মার্ক ৭ ঃ ৫-১৩]

চ "প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই তোমাদের রব, যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি নিজের কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হয়েছেন। তিনি রাত দিয়ে দিনকে ঢেকে দেন তারপর রাতের পেছনে দিন দৌড়িয়ে আসে। তিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন। সবাই তাঁর নির্দেশের অনুগত। জেনে রাখো, সৃষ্টি তাঁরই এবং নির্দেশও তাঁরই। আল্লাহ্ বড়ই বরকতের অধিকারী। তিনি সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিক ও প্রতিপালক।" [সূরা আ'রাফ ঃ ৫৪]

আল্লাহ্র "কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়া"-র বিস্তারিত স্বরূপ অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে কঠিন। খুব সম্ভবত সমগ্র বিশ্বজাহান সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ্ কোনো একটি স্থানকে তাঁর এ অসীম সাম্রাজ্যের কেন্দ্র নির্ধারণ করেন এবং সেখানে নিজের আলোক রশ্মীর বিচ্ছুরণকে কেন্দ্রীভূত করে দেন আর তারই নাম দেন "আরশ" [কর্তৃত্বের আসন]। সেখান থেকে সমগ্র বিশ্বজাহানে নব নব সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে ও ক্রমাগত শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটছে। সেই সাথে সৃষ্টি জগতের পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনাও অব্যাহত রয়েছে। আবার এও সম্ভব হতে পারে যে, আরশ অর্থ শাসন কর্তৃত্ব এবং আরশের ওপর সমাসীন হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ এ বিশ্বজাহান সৃষ্টি করার পর

এর শাসনদন্ড নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। মোটকথা আরশের ওপর সমাসীন হওয়ার বিস্তারিত অর্থ যাই হোক না কেন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যে এ বিশ্বজগতের নিছক স্রষ্টাই নন বরং এর পরিচালক এবং ব্যবস্থাপকও সেকথা ভালোভাবে হৃদয়ংগম করানোই কুরআনে এর উল্লেখের আসল উদ্দেশ্য। তিনি এ দুনিয়াকে অস্তিত্বশীল করার পর এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে কোথাও বসে যাননি। বরং কার্যত তিনিই সারা বিশ্বজাহানের ছোট বড় প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর কর্তৃত্ব করছেন। পরিচালনা ও শাসন কর্তৃত্বের যাবতীয় ক্ষমতা কার্যত তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। প্রতিটি বস্তু তাঁর নির্দেশের অনুগত। অতি ক্ষুদ্র অনু পরামাণুও তাঁর নির্দেশ মেনে চলে। প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর ভাগ্যই চিরন্তনভাবে তাঁর নির্দেশের সাথে যুক্ত। যে মৌলিক বিভ্রান্তিটির কারণে মানুষ কখনো শিরকের গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে, আবার কখনো নিজেকে স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন ঘোষণা করার মতো ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, কুরআন এভাবে তার মুলোৎপাটন করতে চায়। বিশ্বজাহানের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা থেকে আল্লাহ্কে কার্যত সম্পর্কহীন মনে করার অনিবার্য ফল দাঁড়ায় দুটি। হয় মানুষ নিজের ভাগ্যকে অন্যের হাতে বন্দী মনে করবে এবং তার সামনে মাথা নতো করে দেবে অথবা নিজেকেই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা মনে করবে এবং নিজেকে সর্বময় কর্তৃত্বশালী স্বাধীন সত্তা মনে করে কাজ করে যেতে থাকবে।

এখানে আরো একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক সুস্পষ্ট করার জন্য কুরআন মজীদে মানুষের ভাষা থেকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এমনসব শব্দ, পরিভাষা, উপমা ও বর্ণনাভংগী গ্রহণ করা হয়েছে, যা রাজত্ব ও শাসনের সাথে সম্পর্ক রাখে। এ বর্ণনাভংগী কুরআনে এতো বেশী স্পষ্ট যে, অর্থ বুঝে কুরআন পাঠকারী যেকোনো ব্যক্তিই এ বিষয়টি অনুভব না করে থাকতে পারবেননা। কোনো কোনো অর্বাচীন সমালোচক স্বীয় বিকৃত চিন্তা ও মানসিকতার কারণে এ বাচনভংগী থেকে বুঝেছেন যে, এ কিতাবটি যে যুগের "রচনা" সে যুগে মানুষের মনমস্তিষ্কে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিলো। তাই এ কিতাবের রচয়িতা [এ বিবেকহীন নিন্দুকদের মতে এর রচয়িতা নাকি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহ্কে একজন রাজা ও বাদশাহ হিসেবেই পেশ করেছেন। অথচ কুরআন যে শাশ্বত ও অনাদি অনন্ত সত্য উপস্থাপন করছে তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে সত্যটি হচ্ছে, ভূমন্ডলে ও নভোমন্ডলে একমাত্র আল্লাহ্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌমত্ব [Sovereignty] বলতে যা বুঝায় তা একমাত্র তারই সত্তার একচেটিয়া অধিকার ও বৈশিষ্ট্য। আর বিশ্বজাহানের এ ব্যবস্থাপনা একটি পূর্ণাংগ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বিশেষ, যেখানে ঐ একক সত্তা সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। কাজেই এ ব্যবস্থার মধ্যে যে ব্যক্তি বা দল নিজের বা অন্য কারুর আংশিক বা পূর্ণ কর্তৃত্বের দাবীদার হয়, সে নিজেকে নিছক প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাছাড়া এ ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করে মানুষের পক্ষে ঐ একক সত্তাকে একই সাথে ধর্মীয় অর্থেও একমাত্র মা'বুদ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থেও একমাত্র শাসক [Sovereign] হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সঠিক দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি হতে পারেনা।

"আরশের উপর সমাসীন হলেন" বাক্যটির মাধ্যমে সংক্ষেপে যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে এখানে তারই কিছুটা অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ নিছক স্রষ্টাই নন, তিনি হুকুমকর্তা এবং শাসকও। তিনি সৃষ্টি করার পর নিজের সৃষ্ট বস্তুসমূহকে অন্যের কর্তৃত্বে সোপর্দ করে দেননি অথবা সমগ্র সৃষ্টিকে বা তার অংশ বিশেষকে ইচ্ছামতো চলার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেননি। বরং কার্যত সমগ্র বিশ্বজগতের পরিচালন ব্যবস্থা আল্লাহ্র নিজের হাতেই কেন্দ্রীভূত রয়েছে। দিন রাত্রির আবর্তন আপনা আপনিই হচ্ছেনা। বরং আল্লাহ্র হুকুমে হচ্ছে। তিনি যখনই চাইবেন দিন ও রাতকে থামিয়ে দেবেন আবার যখনই চাইবেন এ ব্যবস্থা বদলে দেবেন। সূর্য, চন্দ্র, তারকা এরা কেউ নিজস্ব কোনো শক্তির অধিকারী নয়। বরং এরা সবাই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র কর্তৃত্বাধীন। এরা একান্ত অনুগত দাসের মতো সেই কাজই করে যাচ্ছে যে কাজে আল্লাহ্ এদেরকে নিযুক্ত করেছেন।

ছ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ যা ইচ্ছা আদেশ করেন।" [সূরা মায়েদা ঃ ১]

অর্থাৎ আল্লাহ্ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী একচ্ছত্র শাসক। তিনি নিজের ইচ্ছেমতো যে কোনো হুকুম দেবার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখেন। তাঁর নির্দেশ ও বিধানের ব্যাপারে কোনো প্রকার উচ্চবাচ্য করার বা আপত্তি জানানোর কোনো অধিকার মানুষের নেই। তাঁর সমস্ত বিধান জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যুক্তি, ন্যায়নীতি ও কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও ঈমানদার মুসলিম যুক্তিসংগত, ন্যায়ানুগ ও কল্যাণকর বলেই তার আনুগত্য করেনা বরং একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহ্র হুকুম বলেই তাঁর আনুগত্য করে। যে জিনিসটি তিনি হারাম করে দিয়েছেন তা কেবল তাঁর হারাম করে দেবার কারণেই হারাম হিসেবে গণ্য। আর ঠিক তেমনি যে জিনিসটি তিনি হালাল করে দিয়েছেন সেটির হালাল হবার পেছনে অন্য কোনো কারণ নেই বরং যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এসব জিনিসের মালিক তিনি নিজের দাসদের জন্য এ জিনিসটি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন বলেই এটি হালাল। তাই কুরআন মজীদ সর্বোচ্চ বলিষ্ঠতা সহকারে এ মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, কোনো বস্তুর হালাল ও হারাম হবার জন্য সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো ভিত্তির আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ যে কাজটিকে বৈধ গণ্য করেছেন সেটি বৈধ এবং যেটিকে অবৈধ গণ্য করেছেন সেটি অবৈধ, এছাড়া মানুষের জন্য কোনো কাজের বৈধ ও অবৈধ হবার দ্বিতীয় কোনো মানদন্ড নেই।

জ "আর তোমাদের কণ্ঠ ভূয়া হুকুম জারী করে বলতে থাকে এটি হালাল এবং ওটি হারাম, এভাবে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করোনা। যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা কখনোই সফলকাম হবেনা। [সূরা আননাহল ঃ ১১৬]

এ আয়াতটি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, হালাল ও হারাম করার অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। অথবা অন্য কথায়, একমাত্র আল্লাহ্ই আইন প্রণেতা। অন্য যে ব্যক্তিই বৈধতা ও অবৈধতার ফায়সালা করার ধৃষ্টতা দেখাবে, সে নিজের সীমালংঘন করবে। তবে যদি সে আল্লাহ্র আইনকে অনুমতিপত্র হিসেবে মেনে নিয়ে তার ফরমানসমূহ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে বলে, অমুক জিনিসটি অথবা কাজটি বৈধ এবং

অমুকটি অবৈধ তাহলে তা হতে পারে। এভাবে নিজের হালাল ও হারাম করার স্বাধীন ক্ষমতাকে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ বলে অভিহিত করার কারণ হলো, যে ব্যক্তি এ ধরনের বিধান তৈরী করে তার এ কাজটি দুটি অবস্থার বাইরে যেতে পারেনা। হয় সে দাবী করছে যে, যে জিনিসকে সে আল্লাহ্র কিতাবের অনুমোদন ছাড়াই বৈধ বা অবৈধ বলছে তাকে আল্লাহ্ বৈধ বা অবৈধ করেছেন। অথবা তার দাবী হচ্ছে, আল্লাহ্ নিজের হালাল ও হারাম করার ক্ষমতা প্রত্যাহার করে মানুষকে স্বাধীনভাবে তার নিজের জীবনের শরীয়া তৈরী করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এ দুটি দাবীর মধ্য থেকে যেটিই সে করবে তা নিশ্চিতভাবেই মিথ্যাচার এবং আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ ছাড়া আর কিছুই হবেনা।

ঝ "হে নবী, তাদের বলো, তোমরা কি কখনো একথা চিন্তা করেছো যে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে রিযিক অবতীর্ণ করেছেন তার মধ্য থেকে তোমরা নিজেরাই কোনোটাকে হারাম ও কোনোটাকে হালাল করে নিয়েছো? তাদের জিজ্ঞেস করো আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন? নাকি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো?" [সূরা ইউনুস ঃ ৫৯]

রিযিক বলতে আমাদের ভাষায় শুধুমাত্র পানাহারের জিনিসপত্র বুঝায়। এ কারণে লোকেরা মনে করে ধর্মীয় সংস্কার ও রসম রেওয়াজের ভিত্তিতে খাদ্য সামগ্রীর ক্ষুদ্রতর পরিসরে লোকেরা যেসব আইন কানুন প্রণয়ন করে রেখেছে এখানে শুধুমাত্র তারই সমালোচনা করা হয়েছে। এ বিভ্রান্তিতে শুধুমাত্র অজ্ঞ অশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষরাই ভুগছেনা, শিক্ষিত সমাজ এবং আলেমরাও এর শিকার হয়েছেন। অথচ আরবী ভাষায় রিযিক শব্দটি নিছক খাদ্যের অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং রকমারি দান, অনুদানও এর আওতাভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ্ দুনিয়ায় মানুষকে যা কিছু দিয়েছেন তা সবই তাঁর রিযিক। এমনকি সন্তান সন্ততিও রিযিক। আসমাউর রিজাল তথা রাবীদের জীবনী গ্রন্থসমূহে রিয্ক, রুযাইক ও রিযকুল্লাহ্ নামে অসংখ্য রাবী পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আল্লাহ্ বখশ, খোদা বখ্শ নামগুলো প্রায় এই একই অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি বহুল প্রচলিত দোয়ার ভাষা হলো ঃ

"হে আল্লাহ্! সত্যকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে দাও এবং আমাদের তার অনুসরণ করার রিযিক দাও।

প্রচলিত আরবী প্রবাদে বলা হয় رُزِقَ عِلْمًا অর্থাৎ অমুক ব্যক্তিকে তাত্ত্বিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ প্রত্যেক গর্ভবতীর পেটে একজন ফেরেশতা পাঠান। তিনি শিশুর রিযিক এবং তার আয়ু ও কর্ম লিখে দেন। এখানে রিযিক মানে শুধু খাদ্য নয়, যা ভূমিষ্ঠ হবার পরে এশিশু লাভ করবে। বরং এ দুনিয়ায় তাকে যা কিছু দেয়া হবে সবই রিযিকের অন্তরভুক্ত।

ঞ "আর যারা আল্লাহ্র নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করেনা তারাই কাফির...... যালিম.......... ফাসিক.......।" [সূরা মায়েদা ঃ ৪৪-৪৭]

যারা আল্লাহ্র নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করেনা তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ এখানে তিনটি বিধান দিয়েছেন। এক, তারা কাফের। দুই, তারা যালিম। তিন, তারা

ফাসিক। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হুকুম ও তাঁর নাযিল করা আইন ত্যাগ করে নিজের বা অন্য মানুষের মনগড়া আইনের ভিত্তিতে ফায়সালা করে সে আসলে বড় ধরনের অপরাধ করে। প্রথমত তার এ কাজটি আল্লাহ্‌র হুকুম অস্বীকার করার শামিল। কাজেই এটি কুফরী। দ্বিতীয়ত তার এ কাজটি সুবিচার ও ভারসাম্যনীতির বিরোধী। কারণ, আল্লাহ্ যথার্থ ইনসাফ ও ভারসাম্যনীতি অনুযায়ীই হুকুম দিয়েছিলেন। কাজেই আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে সরে এসে যখন সে ফায়সালা করলো তখন সে আসলে যুলুম করলো। তৃতীয়ত, দাস হওয়া সত্ত্বেও যখনই সে নিজের প্রভুর আইন অমান্য করে নিজের বা অন্যের মনগড়া আইন প্রবর্তন করলো তখনই সে আসলে দাসত্ব ও আনুগত্যের গণ্ডীর বাইরে পা রাখলো। আর এটি অবাধ্যতা বা ফাসিকী। এ কুফরী, যুলুম ও ফাসিকী তার নিজের ধরন ও প্রকৃতির দিক দিয়ে অনিবার্যভাবেই পুরোপুরি আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্যেরই বাস্তব রূপ। যেখানে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করা হবে সেখানে এ তিনটি বিষয় থাকবেনা, এটা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করার যেমন পর্যায়ভেদ আছে তেমনি এ তিনটি বিষয়েরও পর্যায়ভেদ আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হুকুমকে ভুল এবং নিজের বা অন্য কোনো মানুষের হুকুমকে সঠিক মনে করে আল্লাহ্‌র হুকুম বিরোধী ফায়সালা করে সে পুরোপুরি কাফির, যালিম ও ফাসিক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হুকুমকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু কার্যত তার বিরুদ্ধে ফায়সালা করে, সে ইসলামী মিল্লাত বহির্ভূত না হলেও নিজের ঈমানকে কুফুরী, যুলুম ও ফাসিকীর সাথে মিশিয়ে ফেলছে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে সে সকল ব্যাপারেই কাফির, ফাসিক ও যালিম। আর যে ব্যক্তি কিছু ব্যাপারে অনুগত এবং কিছু ব্যাপারে অবাধ্য তার জীবনে ঈমান ও ইসলাম এবং কুফরী, যুলুম ও ফাসিকীর মিশ্রণ ঠিক তেমনি হারে অবস্থান করছে যে হারে সে আনুগত্য ও অবাধ্যতাকে একসাথে মিশিয়ে রেখেছে। কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতগুলোকে আহ্‌লি কিতাবদের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত বলে গণ্য করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র কালামের শব্দের মধ্যে এ ধরনের ব্যাখ্যা করার কোনো অবকাশ নেই। হযরত হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বক্তব্যই এ ধরনের ব্যাখ্যার সঠিক ও সর্বোত্তম জবাব। তাঁকে একজন বলেছিলো এ আয়াত তিনটিতো বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। সে বুঝাতে চাচ্ছিলো যে, ইহুদীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাযিল করা হুকুমের বিরুদ্ধে ফায়সালা করে সে-ই কাফির, যালিম ও ফাসিক। একথা শুনে হযরত হুযাইফা বলে ওঠেন ঃ

> "এ বনী ইসরাঈল গোষ্ঠী তোমাদের কেমন চমৎকার ভাই, তিতোগুলো সব তাদের জন্য আর মিঠাগুলো সব তোমাদের জন্য। কখ্খনো নয়, আল্লাহ্‌র কসম তাদেরই পথে তোমরা কদম মিলিয়ে চলবে।"

আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের এটাই একেবারে গোড়ার কথা। এ বিষয়ে কুরআনের বিভিন্নস্থানে বক্তব্য এসেছে। আল্লাহ্ ছাড়া যাকেই স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী মানা হবে কুরআনের পরিভাষায় সে হলো তাগুত। আর এটা আল্লাহ্‌র দাসত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ট "এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয়না। আর আল্লাহ্ [যাঁকে

সে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে] সবকিছু শোনেন ও জানেন।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬]

আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে **"তাগুত"** বলা হবে, যে নিজের বৈধ অধিকারের সীমানা লংঘন করেছে। কুরআনের পরিভাষায় তাগুত এমন এক দাসকে বলা হয়, যে দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভু ও খোদা হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে নিজের দাসত্বে নিযুক্ত করে। আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় বান্দার প্রভুত্বের দাবীদার সাজার এবং বিদ্রোহ করার তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায় বান্দা নীতিগতভাবে আল্লাহ্‌র শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয় কিন্তু কার্যত তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করে। একে বলা হয় ফাসেকী। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে আল্লাহ্‌র শাসন কর্তৃত্বকে নীতিগতভাবে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতে থাকে। একে বলা হয় কুফ্‌রী। তৃতীয় পর্যায়ে সে মালিক ও প্রভুর বিরুদ্ধে ঘোষণা করে তার রাজ্যে এবং তার প্রজাদের মধ্যে নিজের হুকুম চালাতে থাকে। এই শেষ পর্যায়ে যে বান্দা পৌঁছে যায় তাকেই বলা হয় "তাগুত।" কোনো ব্যক্তি এই তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কোনো দিন সঠিক অর্থে আল্লাহ্‌র মুমিন বান্দা হতে পারেনা।

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"হে নবী! তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা এই মর্মে দাবী করে চলছে যে, তারা ঈমান এনেছে সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং সেইসব কিতাবের প্রতি যেগুলো তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিলো; কিন্তু তারা নিজেদের বিষয়সমূহের ফায়সালা করার জন্য 'তাগুতে'র দিকে ফিরতে চায়, অথচ তাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছিলো তাগুতকে অস্বীকার করার।" [সূরা আননিসা ঃ ৬০]

এখানে 'তাগুত' বলতে সুস্পষ্টভাবে এমন শাসককে বুঝানো হয়েছে, যে আল্লাহ্‌র আইন বাদ দিয়ে অন্য কোনো আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং এমন বিচার ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতার আনুগত্য করেনা এবং আল্লাহ্‌র কিতাবকে চূড়ান্ত সনদ [Final Authority] হিসেবে স্বীকৃতিও দেয়না। কাজেই যে আদালত তাগুতের ভূমিকা পালন করছে, নিজের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালার জন্য তার কাছে উপস্থিত হওয়া যে একটি ঈমান বিরোধী কাজ, এ ব্যাপারে এ আয়াতটির বক্তব্য একেবারে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। আর আল্লাহ্ ও তাঁর কিতাবের ওপর ঈমান আনার অপরিহার্য দাবী অনুযায়ী এই ধরনের আদালতকে বৈধ আদালত হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানানোই প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য। কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা ও তাগুতকে অস্বীকার করা, এদুটি বিষয় পরস্পরের সাথে অংগাংগীভাবে সংযুক্ত এবং এদের একটি অন্যটির অনিবার্য পরিণতি। আল্লাহ্ ও তাগুত উভয়ের সামনে একই সাথে মাথা নতো করাই হচ্ছে সুস্পষ্ট মুনাফিকী।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে কুরআনের সার্বভৌমত্বের ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায়। এই ধারণা অনুযায়ী সার্বভৌমত্বে মানুষের বিন্দুমাত্র অংশ থাকতে পারেনা। তাই কুরআন

মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেছে। আর প্রতিনিধির প্রকৃত মিশন এই বলে জানিয়েছে যে, সে পৃথিবীতে তার মালিকের নির্দেশ মাফিক কাজ করবে। এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করছে নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

"যখন তোমার প্রভূ ফেরেশতাদের বললেন আমি এ পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করবো।" [সূরা আলবাকারা ঃ ৩০]

যে ব্যক্তি কারো অধিকারের আওতাধীনে তারাই অর্পিত ক্ষমতা ইখতিয়ার ব্যবহার করে, তাকে খলীফা বলে। খলীফা নিজে মালিক নয় বরং আসল মালিকের প্রতিনিধি। সে নিজে ক্ষমতার অধিকারী নয় বরং মালিক তাকে ক্ষমতার অধিকার দান করেছেন, তাই সে ক্ষমতা ব্যবহার করে। সে নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করার অধিকার রাখেনা। বরং মালিকের ইচ্ছে পূরণ করাই হয় তার কাজ। যদি সে নিজেকে মালিক মনে করে বসে এবং তার ওপর অর্পিত ক্ষমতাকে নিজের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে থাকে অথবা আসল মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে নিয়ে তারই ইচ্ছে পূরণ করতে এবং তার নির্দেশ পালন করতে থাকে, তাহলে এগুলো সবই বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে গণ্য হবে।

৬. আনুগত্যের মূলনীতি

উপরে বর্ণিত সার্বভৌমত্ব ও প্রতিনিধিত্বের স্বাভাবিক ও যৌক্তিক দাবী হলো, আনুগত্যও করতে হবে স্রষ্টার এবং স্রষ্টার নির্দেশের। বাকী সমস্ত আনুগত্য হবে এই মূল আনুগত্যের অনুগামী। এ মূলনীতিটি কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"হে ঈমানদারগণ, আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য করো রসূলের আর সেইসব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও ক্ষমতার অধিকারী। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ্ ও পরকালের ওপর ঈমান এনে থাকো। এটিই একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটিই উৎকৃষ্ট।" [সূরা আননিসা ঃ ৫৯]

এ আয়াতটি ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বুনিয়াদ। এটি একটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের পয়লা নম্বর ধারা। এখানে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে ঃ

এক, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আসল আনুগত্য লাভের অধিকারী আল্লাহ্। একজন মুসলমানের সর্বপ্রথম পরিচয় হচ্ছে, সে আল্লাহ্‌র দাস। এরপর সে অন্যকিছু। মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবন এবং মুসলমানদের সমাজ ব্যবস্থা উভয়ের কেন্দ্র ও লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। অন্যান্য আনুগত্য ও অনুসৃতি কেবলমাত্র তখনই গৃহীত হবে যখন তা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও অনুসৃতির বিপরীত হবেনা, বরং তার অধীন ও অনুকূল হবে। অন্যথায় এই আসল ও মৌলিক আনুগত্য বিরোধী প্রতিটি আনুগত্য শৃংখলকে ভেংগে দূরে নিক্ষেপ করা হবে। একথাটিকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্যে পেশ করেছেনঃ

"স্রষ্টার আনুগত্য পরিহার করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবেনা।"

দুই, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে, রসূলের আনুগত্য। এটি কোনো স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুগত্য নয়। বরং আল্লাহ্র আনুগত্যের এটিই একমাত্র বাস্তব ও কার্যকর পদ্ধতি। রসূলের আনুগত্য এজন্য করতে হবে যে, আল্লাহ্র বিধান ও নির্দেশ আমাদের কাছে পৌঁছার তিনিই একমাত্র বিশ্বস্ত ও অকাট্য মাধ্যম। আমরা কেবলমাত্র রসূলের আনুগত্য করার পথেই আল্লাহ্র আনুগত্য করতে পারি। রসূলের সনদ ও প্রমাণপত্র ছাড়া আল্লাহ্র কোনো আনুগত্য গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। আর রসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর। নিম্নোক্ত হাদীসে এই বক্তব্যটিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আসলে আল্লাহ্র আনুগত্য করলো এবং যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করলো সে আসলে আল্লাহ্র নাফরমানি করলো।"

তিন, উপরোল্লিখিত দুটি আনুগত্যের পর তাঁদের অধীনে তৃতীয় আর একটি আনুগত্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আওতাধীনে মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব। সেটি হচ্ছে মুসলমানদের মধ্য থেকে 'উলিল আমর' তথা দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারীদের আনুগত্য। মুসলমানদের সামাজিক ও সামষ্টিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দায়িত্বসম্পন্ন ও নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি মাত্রই 'উলিল আমর' এর অন্তর্ভুক্ত। তারা মুসলমানদের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী উলামায়েকিরাম বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হতে পারেন। আবার দেশের শাসনকার্য পরিচালনাকারী প্রশাসকগণ হতে পারেন, অথবা আদালতে বিচারের রায় প্রদানকারী বিচারপতি বা তামদ্দুনিক ও সামাজিক বিষয়ে গোত্র, মহল্লা ও জনবসতির নেতৃত্বদানকারী শেখ সরদার প্রধানও হতে পারেন। মোটকথা কোনো ব্যক্তি যে কোনো পর্যায়েই মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী হবেন তিনি অবশ্যি আনুগত্য লাভের অধিকারী হবেন। তার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে মুসলমানদের সামাজিক জীবনে বাধাবিপত্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা যাবেনা। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, তাকে মুসলিম দলভুক্ত হতে হবে এবং আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগত হতে হবে। এই আনুগত্যের জন্য এই শর্ত দুটি হচ্ছে অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক। কেবলমাত্র উল্লেখিত আয়াতটির মধ্যভাগেই এ সুস্পষ্ট শর্তটি সংশ্লিষ্ট হয়নি বরং হাদীসেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণ ব্যাপকতার সাথে দ্ব্যর্থহীনভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। যেমন নিম্নোক্ত হাদীসগুলি দেখা যেতে পারে ঃ

"নিজের নেতৃবৃন্দের কথা শোনা ও মেনে চলা মুসলমানের জন্য অপরিহার্য, তা তার পছন্দ হোক বা না হোক, যে পর্যন্ত না তাকে আল্লাহ্র অবাধ্য হবার হুকুম দেয়া হয়। আর যখন তাকে আল্লাহ্র অবাধ্য হবার হুকুম দেয়া হয় তখন তার কিছু শোনা ও আনুগত্য করা উচিত নয়।" [বুখারী ও মুসলিম]

"আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্য হতে হবে এমন কোনো আনুগত্য নেই, আনুগত্য করতে হবে শুধুমাত্র "মারূফ" বা বৈধ ও সৎকাজে।" [বুখারী ও মুসলিম]

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের ওপর এমনসব লোকও শাসন কর্তৃত্ব চালাবে যাদের অনেক কথাকে তোমরা 'মারূফ' [বৈধ] ও অনেক কথাকে 'মুনকার' [অবৈধ] পাবে। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাদের মুনকারের

বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করবে, সেও বেঁচে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট হয় এবং তার অনুসরণ করে সে পাকড়াও হবে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করেন, "তাহলে এ ধরনের শাসকদের শাসনামলে কি আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবোনা?" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দেন ঃ "না, যতদিন তারা নামায পড়তে থাকবে [ততদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবেনা।" [মুসলিম]

অর্থাৎ নামায পরিত্যাগ করা এমন একটি আলামত হিসেবে বিবেচিত হবে, যা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, তারা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে। এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ন্যায়সংগত হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"তোমাদের নিকৃষ্টতম নেতা হচ্ছে তারা যারা তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদেরকে ঘৃণা করো, তোমরা তাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকো এবং তারা তোমাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকে। সাহাবাগণ আরজ করেন, হে আল্লাহ্র রসূল। যখন এ অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন কি আমরা তাদের মোকাবিলা করার জন্য মাথা তুলে দাঁড়াবোনো? জবাব দেন ঃ না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করতে থাকবে! না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করতে থাকবে!" [মুসলিম]

এই হাদীসটি উপরে বর্ণিত শর্তটিকে আরো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। উপরের হাদীসটি থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক ছিলো যে, যতদিন তারা ব্যক্তিগত জীবনে নামায পড়তে থাকবে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবেনা। কিন্তু এই হাদীসটি থেকে একথা জানা যায় যে, নামায পড়া মানে আসলে মুসলমানদের সমাজ জীবনে নামাযের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ কেবলমাত্র তাদের নিজেদের নিয়মিতভাবে নামায পড়াটাই যথেষ্ট হবেনা বরং সেই সংগে তাদের আওতাধীনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে সেখানেও কমপক্ষে 'ইকামতে সালাত' তথা নামায প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনা থাকা জরুরী বিবেচিত হবে। তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা তার আসল প্রকৃতির দিক দিয়ে যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এটি হবে তারই একটি আলামত। অন্যথায় যদি এতোটুকুও না হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, তারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের শাসন ব্যবস্থাকে উল্‌টে ফেলার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো মুসলমানদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে। এ কথাটিকেই অন্য একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে অন্যান্য আরো বিভিন্ন বিষয়ের সাথে এ ব্যাপারেও অংগীকার নিয়েছেন ঃ

"আমরা আমাদের সরদার ও শাসকদের সাথে ঝগড়া করবোনা, তবে যখন আমারা তাদের কাজে প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাবো যার উপস্থিতিতে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র কাছে পেশ করার জন্য আমাদের কাছে প্রমাণ থাকবে।" [বুখারী ও মুসলিম]

চার, চতুর্থ যে মূলনীতিটি এ আয়াতটি থেকে স্থায়ী ও চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে সেটি হলো, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহ্‌র হুকুম ও রসূলের সুন্নাহ্‌ হচ্ছে মৌলিক আইন ও চূড়ান্ত সনদ [Final Authority]। মুসলমানদের মধ্যে অথবা মুসলিম সরকার ও প্রজাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে আসতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ এ ব্যাপারে যে ফায়সালা দেবে তার সামনে মাথা নতো করে দিতে হবে। এভাবে জীবনের সকল ব্যাপারে কুরআন ও রসূলের সুন্নাহকে সনদ, চূড়ান্ত ফায়সালা ও শেষ কথা হিসেবে মেনে নেয়ার বিষয়টি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা তাকে কুফরী জীবন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে ব্যবস্থায় এ জিনিসটি অনুপস্থিত থাকে সেটি আসলে একটি অনৈসলামী ব্যবস্থা।

এ প্রসংগে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করে বলে থাকেন যে, জীবনের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে? কারণ মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে, ডাকঘর ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় সম্পর্কিত কোনো নিয়ম কানুনের উল্লেখই সেখানে নেই। কিন্তু এ সংশয়টি আসলে দীনের মূলনীতি সঠিকভাবে অনুধাবন না করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। একজন মুসলমানকে একজন কাফির থেকে যে বিষয়টি আলাদা ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে সেটি হচ্ছে, কাফির অবাধ স্বাধীনতার দাবীদার। আর মুসলমান মূলত আল্লাহ্‌র বান্দাহ ও দাস হবার পর তার রব মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তাকে যতোটুকু স্বাধীনতা দান করেছেন, সে শুধুমাত্র ততোটুকু স্বাধীনতাই ভোগ করে। কাফির তার নিজের তৈরী মূলনীতি ও আইন বিধানের মাধ্যমে তার যাবতীয় বিষয়ের মীমাংসা করে। এইসব মূলনীতি ও বিধানের ক্ষেত্রে কোনো ঐশী সমর্থন ও স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করেনা এবং নিজেকে সে এর মুখাপেক্ষীও ভাবেনা। বিপরীত পক্ষে মুসলমান তার প্রতিটি ব্যাপারে সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরে যায়। সেখান থেকে কোনো নির্দেশ পেলে সে তার অনুসরণ করে। আর কোনো নির্দেশ না পেলে কেবলমাত্র এই অবস্থায়ই সে স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। এক্ষেত্রে তার এই কর্মের স্বাধীনতার মূল ভিত্তি একথার ওপরই স্থাপিত হয় যে, এই ব্যাপারে শরীয়া রচয়িতার পক্ষ থেকে কোনো বিধান না দেয়াই একথা প্রমাণ করে যে, তিনি এক্ষেত্রে কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন।

কুরআন মজীদ যেহেতু নিছক একটি আইনের কিতাব মাত্র নয় বরং একই সংগে এটি একটি শিক্ষা ও উপদেশমূলক গ্রন্থও, তাই প্রথম বাক্যে যে আইনগত মূলনীতির বিবরণ দেয়া হয়েছিলো এই দ্বিতীয় বাক্যে তার অন্তর্নিহিত কারণ ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দুটি কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, উপরোল্লিখিত চারটি মূলনীতি মেনে চলা ঈমানের অপরিহার্য দাবী। একদিকে মুসলমান হবার দাবী করা এবং অন্যদিকে এই মূলনীতিগুলি উপেক্ষা করা, এ দুটি পরস্পর বিরোধী জিনিসের কখনো একত্র সমাবেশ হতে পারেনা। দ্বিতীয়ত, এই মূলনীতিগুলির ভিত্তিতে নিজেদের জীবন বিধান নির্মাণ করার মধ্যেই মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত। কেবলমাত্র এই একটি

জিনিসই তাদেরকে দুনিয়ায় সত্য সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে এবং এর মাধ্যমেই তারা পরকালেও সফলকাম হতে পারে। যে ভাষণে ইহুদিদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার ওপর মন্তব্য করা হচ্ছিলো এই উপদেশ বাণীটি ঠিক তার শেষে উক্ত হয়েছে। এভাবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মত দীনের এই মূলনীতিগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে যেভাবে অধপতনের গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। যখন কোনো জনগোষ্ঠী আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রসূলের হিদায়াত পেছনে ফেলে দিয়ে এমনসব নেতা ও সরদারের আনুগত্য করতে থাকে, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম মেনে চলেনা এবং নিজেদের ধর্মীয় নেতা ও রাষ্ট্রীয় শাসকদের কাছে কুরআন ও সুন্নাহর সনদ ও প্রমাণপত্র জিজ্ঞেস না করেই তাদের আনুগত্য করতে থাকে তখন তারা এই বনী ইসরাঈলদের মতোই অসৎ ও অনিষ্টকর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে এমনসব দোষক্রটি সৃষ্টি হয়ে যায়, যার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

খিলাফতের তাৎপর্য

এটা কেবল ইসলামের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগিই নয়, বরঞ্চ গোটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হবার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিগত অধ্যায়গুলোতে ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনের উপর যেসব কথা বলা হয়েছে, তাতেও এই ধারণা কেন্দ্রীয় গুরুত্বের মর্যাদা লাভ করেছে। এ নিবন্ধে খিলাফত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। এখানে নিবন্ধটির শেষাংশ উদ্ধৃত করা হলো। মাওলানার এ নিবন্ধটি তরজমানুল কুরআন ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

-সংকলক

খিলাফতের তাৎপর্য

কুরআনের দিক নির্দেশনা

এবার আমি কুরআনের কতিপয় দিক নির্দেশনার দিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করবো। এ থেকে জানা যাবে, মানুষকে যে খিলাফত দান করা হয়েছে তা আসলে আল্লাহ্‌রই খিলাফত।

কুরআন বলছে, আল্লাহ্ মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ঃ

তাকে তিনি নিজই তৈরী করেছেন। [সূরা ত্বীন ঃ ৪]

তিনি নিজের পক্ষ থেকে তার মধ্যে রূহ সঞ্চারিত করেছেন। [সূরা সোয়াদ ঃ ৭৫]

তাকে জ্ঞানের মত সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন। [সূরা আস্ সিজদা ঃ ৯]

আকাশ ও পৃথিবীর সকল জিনিসকে তার অনুগত ও অধীনস্থ করে দিয়েছেন। [সূরা আলবাকারা ঃ ৩১]

এই সমস্ত গুণ বৈশিষ্ট্য সহকারে মানুষকে যখন সৃষ্টি করা হলো, তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে তার সামনে সিজদা করার নির্দেশ দিলেন। [সূরা জাসিয়া ঃ ১৩]

এ নির্দেশটা সূরা সোয়াদের শেষাংশে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা বিশেষভাবে বিবেচনার দাবী রাখে ঃ

"যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। সেটা যখন সম্পূর্ণরূপে বানানো হয়ে যাবে এবং তাতে আমি নিজের হাতে আত্মা সঞ্চারিত করবো, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পতিত হয়ো। অতপর সকল ফেরেশতা সিজদা করলো। কিন্তু ইবলীস সিজদা করলোনা। সে দাম্ভিকতায় লিপ্ত হলো এবং আদেশ লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। আল্লাহ্ বললেন, হে ইবলীস, আমি যাকে নিজ হাতে গড়লাম, তাকে সিজদা করতে তোমাকে বাধা দিলো কিসে? তুমি কি নিজেকে খুব বড় মনে করে বসেছো, না সত্যই বড় কিছু হয়ে গেছো? সে বললো, আমি ওর চেয়ে ভালো। তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো আর ওকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে। তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ "তুই এখান থেকে বেরিয়ে যা। কেননা তুই ধিকৃত।" [সূরা সোয়াদ ঃ ৭১-৭৭]

এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায়, মানুষকে সিজদা করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তার কারণ এই ছিলো যে, আল্লাহ্ তাকে স্বহস্তে নির্মাণ করেছিলেন, অর্থাৎ

সে ছিলো আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা ও শিল্প নৈপুণ্যের চূড়ান্ত প্রতীক। আর তার ভেতরে তিনি নিজের পক্ষ থেকে একটা অসাধারণ রূহ সঞ্চারিত করেছিলেন এবং যে গুণাবলী সর্বোচ্চ মাত্রায় স্বয়ং আল্লাহ্‌র মধ্যেই পাওয়া যায়, সেই গুণাবলীই সীমিত মাত্রায় তার মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এরূপ মর্যাদা ও গুণবৈশিষ্ট্য সহকারে মানুষকে সৃষ্টি করার পর ঘোষণা করা হলো, আমি তাকে পৃথিবীতে খলীফা নিয়োগ করতে যাচ্ছি। সূরা বাকারার চতুর্থ রুকুতে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। ফেরেশতারা এ ব্যাপারে নিজেদের কিছু সন্দেহ সংশয় প্রকাশ করলে আল্লাহ্ তাদের সামনে মানুষের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য জ্ঞানের প্রদর্শনী করলেন। এভাবে খিলাফতের জন্য মানুষের যোগ্যতা প্রমাণিত করার পর ফেরেশতাদের হুকুম দেয়া হলো, তার খিলাফত মেনে নাও এবং মেনে নেয়ার আলামত হিসেবে তাকে সিজদা করো। সকল ফেরেশতা মেনে নিলেন এবং সিজদা করলেন। কিন্তু শয়তান তার খিলাফত প্রত্যাখ্যান করলো এবং দরবার থেকে বিতাড়িত হলো।

এথেকে কি বুঝা গেলো? এ দ্বারা সকল সৃষ্টির ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হলো। আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হলো। বলা হলো, মানুষ আমার গুণাবলীর পূর্ণতম ও উৎকৃষ্টতম বাহক এবং তার মধ্যে আমি নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ রূহ সঞ্চারিত করেছি। তাকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হলো, তাও আর কাউকে নয় ফেরেশতাদেরকে। এসব করার সাথে সাথে তাকে খলীফা বানানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলো। এতো প্রস্তুতি ও আড়ম্বর সহকারে যে খলীফার খিলাফত ঘোষিত হলো, সে কি কেবল পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদেরই খলীফা ছিলো? ব্যাপার যদি কেবল এতোটুকুই হয়ে থাকে যে, প্রাচীন অধিবাসীর জায়গায় অন্য এক অধিবাসীকে অধিষ্ঠিত করা হচ্ছে, তাহলে ফেরেশতাদের সামনে তার খিলাফতের ঘোষণা দেয়া এবং এভাবে তার শ্রেষ্ঠত্ব যাহির করার কি দরকার ছিলো? আর ফেরেশতাদেরকে এ নির্দেশই বা দেয়া হলো কেন যে, ভূমন্ডলের এই নতুন অধিবাসীকে যে কি না কেবল অন্যদের পরিত্যক্ত জায়গায় বসতি স্থাপন করতে যাচ্ছিলো সিজদা করো?

আল্লাহ্‌র খিলাফতের মর্ম কি?

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র অন্য যে উক্তিটি করা হয়েছে, তা আল্লাহ্‌র খিলাফতের মর্ম কি সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট আলোকপাত করে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

> "আমি আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতের কাছে এ আমানত পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা কেউ এর ভার গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি এবং তারা ভয় পেয়ে যায়। এর ভার মানুষ গ্রহণ করলো। বস্তুত সে যালেম ও অপরিণামদর্শী সাব্যস্ত হয়েছে।" [সূরা আহযাব ঃ ৭৩]

এ আয়াতে আমানতের অর্থ নির্বাচনের স্বাধীনতা [Freedom of choice] এবং দায়িত্ব ও জবাবদিহী [Responsibility]। আল্লাহ্‌র এ উক্তির মর্মার্থ হলো, আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতের এ দায়িত্বের গুরুভার গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিলোনা। মানুষের পূর্বে এ দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো সৃষ্টিরই অস্তিত্ব ছিলোনা।

অবশেষে মানুষের আবির্ভাব ঘটলো এবং সে এ দায়িত্ব গ্রহণ করলো। এ বক্তব্য থেকে কয়েকটি তথ্য জানা যায় ঃ

১. মানুষের পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীতে কোনো সৃষ্টি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। মানুষই এ দায়িত্ব গ্রহণকারী প্রথম সৃষ্টি। সুতরাং আমানত গ্রহণের ক্ষেত্রে সে কারো স্থলাভিষিক্ত [Successor] নয়।

২. সূরা বাকারায় যে জিনিসকে খিলাফত বলা হয়েছে এখানে 'আমানত' শব্দ দ্বারা সেটাই বুঝানো হয়েছে। কেননা সেখানে ফেরেশতাদের সামনে প্রমাণ করে দেয়া হয়েছিলো যে, তারা খিলাফতের উপযুক্ত নয়, মানুষই তার উপযুক্ত। আর এখানে বলা হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর কোনো সৃষ্টি আমার আমানতের ভার কাঁধে নেয়ার যোগ্য ছিলোনা, শুধু মানুষই তা বহন করতে পেরেছে।

৩. খিলাফতের তাৎপর্য আমানত শব্দ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এই দু'টো শব্দ একত্রে বিশ্ব প্রকৃতির অবকাঠামোতে মানুষের প্রকৃত অবস্থান নির্দেশ করে। মানুষ হলো পৃথিবীর শাসক ও পরিচালক। তবে তার এই শাসনকর্তৃত্ব মৌলিক নয়, বরং অর্পিত [Delegated]। সুতরাং আল্লাহ্ তার ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বকে [Delegated Power] আমানত বলে অভিহিত করেছেন। মানুষ এই অর্পিত ক্ষমতাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই ব্যবহার করে বলে তাকে খলীফা [Vicegerent] বলা হয়েছে। এ হিসেবে খলীফা বলতে সে ব্যক্তিকে বুঝায়, যে কারো অর্পিত বা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে। [Person exercising delegated power]। [তরজমানুল কুরআন, জ্বিলকদ ১৩৫৩ হিঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫।]

পঞ্চম অধ্যায়

১ ইসলামী জাতীয়তার ধারণা

২ ইসলামী জাতীয়তার প্রকৃত তাৎপর্য

দেশ বিভাগের পূর্বে উপমহাদেশের রাজনৈতিক বাকবিতন্ডার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো জাতীয়তা। মুস-লমানরা সবসময় নিজেদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার ধারণা পোষণ করে এসেছে। তারা অমুসলিমেদের সাথে মিলিত হয়ে এক জাতিতে পরিণত হওয়ার ধারণাকে কখনো মেনে নেয়নি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের প্রভাব ও হিন্দু রাজনীতির যোগসাজশে সম্মিলিত জাতীয়তার বিভ্রান্তিকর আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠির ওপর এ আন্দোলন সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। আল্লামা ইকবাল, মাওলানা মওদুদী ও অন্যান্য চিন্তানায়কগণ এ চ্যালেঞ্জের জবাব দেন এবং সম্মিলিত জাতীয়তার ধারণার কঠোর সমালোচনা করেন। এই সময়োচিত সমালোচনার সুফল হলো এই যে, মুসলমানরা সম্মিলিত জাতীয়তার বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পেলো এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলন গড়ে উঠলো। মাওলানা মওদুদীর রচনাবলী এই জাগরণ সৃষ্টিতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। আমাদের বর্তমান সংকলনটিতে বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানার দুটো প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করা হচ্ছে। এ প্রবন্ধ দুটো মাসিক তরজমানুল কুরআন নভেম্বর ডিসেম্বর ১৯৩৩ সংখ্যা এবং জুন ১৯৩৯ সংখ্যা থেকে নেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বেও এ প্রবন্ধ দুটি অন্যান্য সংকলনে সন্নিবেশিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং বহু পাঠকের চিন্তায় তা আলোড়ন তুলেছে।

-সংকলক

১. ইসলামী জাতীয়তার ধারণা

আদিম বন্য জীবন থেকে সভ্য জীবন অভিমুখে মানব জাতির অভিযাত্রার প্রথম পদক্ষেপেই এটা অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, বিশাল মানব সমাজের মধ্য থেকে একটি স্বতন্ত্র ঐক্যের ধারা গড়ে ওঠবে এবং সম্মিলিত উদ্দেশ্যে ও স্বার্থে কতিপয় ব্যক্তি মিলিত হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথ তৎপরতার কর্মসূচী গ্রহণ করবে। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে এই সামষ্ঠিক ঐক্যের পরিধিও সম্প্রসারিত হতে থাকবে। অবশেষে এক সময় এর আওতায় চলে আসবে বিপুল সংখ্যক মানুষ। এই সম্মিলিত মানবসমষ্টির নামই "জাতি"। "জাতি" ও "জাতীয়তা" এ দুটি শব্দ যদিও এদের বিশিষ্ট পারিভাষিক অর্থে আধুনিক কালের সৃষ্টি। কিন্তু এ শব্দ দুটি উচ্চারণ করা মাত্রই যে জিনিসটি বুঝে আসে, তা ঠিক সভ্যতার মতোই প্রাচীন। 'জাতি' ও 'জাতীয়তা' যে কাঠামোর নাম, তা আজকের ফ্রান্স, বৃটেন, জার্মানী ও ইটালিতে যেমন আছে, প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, রোম ও গ্রীসেও তেমনিই ছিলো।

জাতীয়তার অবিচ্ছেদ্য উপাদান সমূহ

একথা সন্দেহাতীত যে, জাতীয়তার সূচনা একটি নিস্প্রাণ আবেগ থেকেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য এটাই হয়ে থাকে যে, একটি বিশেষ গোষ্ঠির লোকেরা নিজেদের সম্মিলিত স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য কাজ করবে এবং নিজেদের সামগ্রিক প্রয়োজনে একটি "জাতি" হিসেবে বসবাস করবে। কিন্তু তাদের ভেতরে যখন "জাতীয়তার" উদ্ভব ঘটে, তখন অনিবার্যভাবে তাতে "গোষ্ঠীপ্রীতি"র বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। "জাতীয়তাবাদের" আবেগ যতোই তীব্রতর হয় "গোষ্ঠীপ্রীতি" ততোই প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে। যখনই কোনো জাতি স্বীয় স্বার্থের সেবা ও কল্যাণের সংরক্ষণের জন্য নিজেকে একটি ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করবে অথবা অন্য কথায় বলা যায়, নিজের চারপাশে "জাতীয়তার" দেয়াল গড়ে তুলবে, তখন সে অনিবার্যভাবে ঐ দেয়ালের বাইরের লোক ও ভেতরের লোকদের মধ্যে আপন ও পরের বাছবিচার করবেই। আপন লোকদেরকে সকল ব্যাপারে পরের ওপর অগ্রাধিকার দেবেই। পরের মোকাবিলায় সে আপনদেরকে সমর্থন না দিয়ে পারবেনা। দুই গোষ্ঠীর স্বার্থ ও কল্যাণের বিষয়ে যখন বিরোধ দেখা দেবে, তখন সে নিজের স্বার্থের হিফাজত করবে এবং অপরের স্বার্থকে বিসর্জন দেবে। এসব কারণে তাদের মধ্যে যুদ্ধও হবে, সন্ধিও হবে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দান হোক, কিংবা আলোচনার বৈঠক হোক সর্বত্র তাদের উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তার সীমারেখা বহাল থাকবেই। এ জিনিসটার নামই গোষ্ঠীপ্রীতি ও জাতিগত বৈষম্য। এটা জাতীয়তার অপরিহার্য ও সহজাত বৈশিষ্ট্য।

জাতীয়তার উপাদান সমূহ

ঐক্য ও অংশীদারিত্বের যেকোনো একটি উপাদান থেকে জাতীয়তার পত্তন হতে পারে। তবে শর্ত হলো, যে উপাদান থেকে জাতীয়তার পত্তন হবে, তাতে সংযোগ ও নিয়ন্ত্রণের এমন দুরন্ত শক্তি থাকা চাই যে, মানুষের বিপুল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও তা যেনো সকলকে একই বাণী, একই চিন্তা, একই লক্ষ্য ও একই কর্মসূচীতে ঐক্যবদ্ধ করে দেয় এবং জাতির বিপুল সংখ্যক বিচিত্র জনমন্ডলীকে জাতীয়তার বন্ধনে এমন মজবুতভাবে আবদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে দেয় যে, তারা একটা জমাট পাথরে পরিণত হয়। ঐক্য ও অংশীদারিত্বের যে উপাদানটি এই জাতীয়তার ভিত রচনা করবে, তার সমগ্র জনমন্ডলীর মন ও মগজের ওপর এতো বেশী আধিপত্য, প্রতাপ ও নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হওয়া চাই যে, জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং তা অর্জনে যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে।

ঐক্য ও অংশীদারিত্বের উপাদানতো অনেক থাকতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যতোগুলো জাতীয়তার উদ্ভব ঘটেছে, তন্মধ্যে একমাত্র ইসলামী জাতীয়তা ছাড়া আর সবগুলোই নিম্নলিখিত ঐক্যসমূহের কোনো একটির ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। ঐক্যের এই উপাদানের সাথে আনুসংগিকভাবে অন্যান্য উপাদানও শামিল হয়ে গেছে ঃ

ক. বংশীয় ঐক্য। একে প্রজাতিক ঐক্যও বলা হয়।

খ. জন্মভূমির ঐক্য। একে দেশীয় বা ভূমিগত ঐক্যও বলে।

গ. ভাষাগত ঐক্য। চিন্তার ঐক্য সৃষ্টির একটা প্রভাবশালী মাধ্যম হওয়ার কারণে এটি জাতীয়তা গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ঘ. বর্ণগত ঐক্য। এটি একই বর্ণের লোকদের মধ্যে স্বজাত্যবোধ গড়ে তোলে। অতঃপর এই স্বজাত্যবোধ আরো অগ্রসর হয়ে তাদেরকে ভিন্ন বর্ণের লোকদেরকে এড়িয়ে চলতেও অবজ্ঞা করতে প্ররোচিত করে।

ঙ. অর্থনৈতিক স্বার্থগত ঐক্য। এ উপাদানটি এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বলিত সমাজের লোকদেরকে ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাধারী সমাজ থেকে পৃথক করে। এর ভিত্তিতে উভয় সমাজের মানুষ পরস্পরের মোকাবিলায় নিজ নিজ অর্থনৈতিক অধিকার ও কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা সাধনা করে।

চ. শাসন ব্যবস্থার ঐক্য। এ উপাদানটি একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে একটি সম্মিলিত শাসন ব্যবস্থার যোগসূত্রে আবদ্ধ করে এবং ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে তাদের ব্যবধানের সীমা চিহ্নিত করে।

প্রাচীনতম যুগ থেকে শুরু করে আজকের বিংশ শতাব্দীর আলোকোজ্জ্বল যুগ পর্যন্ত যতো ধরনের জাতীয়তার উপাদান অনুসন্ধান করা হোক না কেন, সবগুলোর ভেতরে এই কয়টি উপাদানই পাওয়া যাবে।

আজ থেকে দুই তিন হাজার বছর পূর্বে গ্রীক, রোমক, ইসরাইলী, ইরানী, প্রভৃতি জাতীয়তা এই ভিত্তিগুলোর ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আর আজকের জার্মান, ইটালীয়,

ফরাসী, ইংরেজ, মার্কিন, রুশ ও জাপানী প্রভৃতি জাতীয়তাও এসব ভিত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে।

একথা ষোল আনা সত্য যে, বিশ্বের বহু সংখ্যক জাতীয়তা নির্মাণের এই ভিত্তিগুলো খুবই বলিষ্ঠভাবে জাতিগুলোকে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ করেছে। তবে সেই সাথে এই সত্যও অস্বীকার করা যায়না যে, এ ধরনের জাতীয়তা মানবজাতির জন্য এক ভয়াবহ বিপদ ডেকে এনেছে। এসব জাতীয়তা মানব জগতকে শত শত হাজার হাজার অংশে বিভক্ত করে দিয়েছে। আর এই বিভক্তিও এমন চরম যে, একটি অংশেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যায় বটে, কিন্তু অন্য অংশে পরিবর্তিত করা যায়না। একটি বংশধর অপর বংশধরে পরিণত হতে পারেনা, একটি ভূমি বা দেশ অন্য ভূমি ও দেশে পরিণত হতে পারেনা, একটি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী অন্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীতে পরিবর্তিত হতে পারেনা। এক বর্ণের মানুষ অন্য বর্ণের মানুষে রূপান্তরিত হতে পারেনা, একটি জাতির অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অবিকল অন্য জাতির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আশা আকাংখায় পরিণত হতে পারেনা এবং একটি রাষ্ট্র কখনো অন্য রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারেনা। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, এসব ভিত্তির ওপর যেসব জাতীয়তা নির্মিত হয়, তাদের ভেতরে পারস্পরিক সমঝোতা ও আপোষরফার কোনো পথই খুঁজে পাওয়া যায়না। জাতীয় আভিজাত্যবোধ ও জাত্যাভিমানের কারণে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দিতা ও পরস্পরকে প্রতিরোধের এক চিরস্থায়ী দ্বন্দসংঘাতে লিপ্ত হয় এবং একে অপরকে পদপিষ্ট করার চেষ্টা চালায়। তারা পরস্পরে লড়াই করতে করতে ধবংস হয়ে যায়। তারপর পুনরায় একই উপাদানে নতুন জাতীয়তা গড়ে ওঠে এবং একই ধরনের দ্বন্দসংঘাতে জড়িয়ে পড়াই হয় তার শেষ পরিণতি। এই জাতীয়তা পৃথিবীতে ফেৎনাফাসাদ, অরাজকতা, অশান্তি ও পাপাচারের উৎস, আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় অভিশাপ এবং মানুষকে ধ্বংস করার কাজে শয়তানের সবচেয়ে অব্যর্থ হাতিয়ার।

জাহেলী বিদ্বেষ ও আভিজাত্যবোধ

এ ধরনের জাতীয়তার স্বাভাবিক দাবী হলো, তা মানুষের ভেতরে জাহেলী বিদ্বেষ ও আভিজাত্যবোধ সৃষ্টি করে। এক জাতিকে অপর জাতির সাথে বিরোধ ও শত্রুতা পোষণে এটি শুধু এজন্য প্ররোচিত করে যে, তারা ভিন্ন জাতি। সত্য, সততা ও ন্যায়ের সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকেনা। এক ব্যক্তির চামড়া কালো শুধু এ কারণেই সে সাদা চামড়াওয়ালার চোখে তুচ্ছ বিবেচিত হয়। এক ব্যক্তি এশিয়ার অধিবাসী- শুধুমাত্র এজন্যই সে ফিরিংগীদের তাচ্ছিল্য, অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়। আইনষ্টাইনের ন্যায় বিজ্ঞানী শুধুমাত্র ইহুদী হওয়ার কারণে জার্মানদের বিদ্বেষ ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হন। শুধুমাত্র কৃষ্ণকায় নিগ্রো হওয়ার কারণে একজন ইউরোপীয়কে শাস্তি দেয়ার অপরাধে তাশকেদীর রাজ্য ছিনিয়ে নেয়াকে সম্পূর্ণ বৈধ সাব্যস্ত করা হয়।[১]

---

১. তাশকেদী বসুয়ানা ল্যান্ডের বামিংভাটু গোত্রের গোত্রপতি। একজন ইউরোপীয় অপরাধীকে বেত্রদন্ড প্রদান তার এতো গুরুতর অপরাধ বিবেচিত হয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য তাকে তার রাজত্ব থেকে বঞ্চিত

আমেরিকার সুসভ্য নাগরিকদের জন্য নিগ্রোদেরকে ধরে ধরে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ বৈধ হয়ে যায় শুধু এজন্য যে, তারা নিগ্রো। নিগ্রোদেরকে শ্বেতাংগদের বাড়ীঘরে থাকতে না দেয়া, সড়কের ওপর দিয়ে চলতে না দেয়া এমনকি তাদেরকে ভোটাধিকার থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত করা মার্কিনীদের জন্য বৈধ হয়ে যায়। একজন ফরাসী নাগরিক ও একজন জার্মান নাগরিকের পরস্পরকে ঘৃণা করার জন্য এটাই যথেষ্ট বিবেচিত হয় যে, তাদের একজন ফরাসী আর অপরজন জার্মান। তারা এজন্য পরস্পরকে শুধু ঘৃণা করেই ক্ষান্ত হয়না বরং একজনের যাবতীয় সদগুণ অপরজনের চোখে শুধুই দোষ মনে হয়। সীমান্ত প্রদেশের স্বাধীনচেতা আফগানরা আফগান বলেই ইংরেজরা তাদের ওপর বোমাবর্ষন করা আর দামেস্কের অধিবাসীরা আরব বলেই ফরাসীরা তাদেরকে পাইকারী হত্যা করা সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত মনে করে। মোট কথা, এই জাতিগত বৈষম্য এমন এক বস্তু যা মানুষকে ন্যায়নীতি ও ইনসাফের ব্যাপারে একেবারেই অন্ধ বানিয়ে দেয়। এর কারণে বিশ্বখ্যাত নৈতিকতা ও সৌজন্যের মূলনীতিগুলিও জাতীয়তার রূপ ধারণ করে কোথাও যুলুম, কোথাও সুবিচার, কোথও সত্য, কোথাও মিথ্যা, কোথাও সৌজন্যে এবং কোথাও অসৌজন্যে পরিণত হয়।

মানুষের জন্য এর চেয়ে অযৌক্তিক মানসিকতা আর কি হতে পারে যে, সে একজন অযোগ্য ও অসৎ লোককে শুধু এজন্য একজন যোগ্য ও সৎ লোকের চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করবে যে, প্রথমজন এক বংশে এবং দ্বিতীয়জন ভিন্ন বংশে জন্মেছে? প্রথমজন সাদা এবং দ্বিতীয়জন কালো? প্রথমজন একটি পাহাড়ের পশ্চিমে জন্মেছে এবং দ্বিতীয়জন তার পূর্বে? প্রথমজন এক ভাষায় কথা বলে এবং দ্বিতীয়জন অন্য ভাষায়? প্রথমজন এক সাম্রাজ্যের অধিকারী এবং দ্বিতীয়জন অপর সাম্রাজ্যের? চামড়ার রং কি আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও নোংরামিকে পাল্টে দিতে পারে? বিবেক কি একথা বিশ্বাস করে যে, পাহাড় ও সমুদ্রের সাথে চরিত্র ও মানবিক গুণাবলীর কোনো সম্পর্ক আছে? প্রাচ্যে যা সত্য, পাশ্চাত্যে গিয়ে তা মিথ্যা হয়ে যাবে এটা কি কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ মেনে নিতে পারে? সততা, ন্যায়নীতি, ভদ্রতা, ও মানসিক সদগুণাবলীকে ধমনীতে প্রবহমান রক্ত, মুখের উচ্চারিত ভাষা ও জন্মস্থানের মাটির মানদন্ডে যাচাই করা উচিত, এমন ধারণা কি কোনো সুস্থ মনে স্থান পেতে পারে? নিশ্চয়ই বিবেক এসব প্রশ্নের নেতিবাচক জবাবই দেবে। কিন্তু বর্ণ, বংশ, জন্মস্থান ও অন্যান্য বৈষম্যের প্রবক্তারা অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে জবাব দিয়ে থাকে যে, হাঁ, ব্যাপারটা এ রকমই।

জাতীয়তার উপাদান সমূহের পর্যালোচনা

কিছুক্ষণের জন্য উপরোক্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা স্থগিত রাখুন। একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর সকল সদস্যের মধ্যে সমভাবে বিরাজমান যতগুলো বৈশিষ্ট্য

করে দেয়। অথচ স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে এই ফিরিংগী লোকটির দুঃখজনক আচরণের কথা স্বয়ং হাই কমিশনারও স্বীকার করতেন। পরে বেচারা তাশকেদীকে শুধুমাত্র এই বলে অঙ্গীকার করার পর রাজত্ব ফিরিয়ে দেয়া হয় যে, কোনো ইউরোপীয় ব্যক্তি জড়িত এমন কোনো মামলার নিষ্পত্তি তিনি করবেননা। অথচ সে অংগীকারনামায় ইউরোপীয়দেরকে স্থানীয় লোকদের জানমাল ও সম্ভ্রমে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রাখতে পারে এমন কোনো ধারা ছিলোনা।

জাতীয়তার ভিত্তি রচনা করে, আগে সেগুলোর নিজস্ব সত্তা নিয়ে চিন্তা করুন এবং ভাবুন, স্বতন্ত্রভাবে এসব বৈশিষ্ট্যের কোনো যৌক্তিক ভিত্তি আছে কি, না এগুলো নিছক কাল্পনিক মরিচিকার মতো?

প্রথমে ধরা যাক, প্রজাতিক বা বংশীয় অংশীদারিত্ব ও সমতার কথা। এটাতো নিছক রক্তের ঐক্য। মাতা ও পিতার বীর্য হলো এর সূচনাবিন্দু। এ দ্বারা রক্তের সম্পর্ক গড়ে ওঠে কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে। তারপর এর বৃত্ত আরো সম্প্রসারিত হয়ে সৃষ্টি হয় পরিবার গোত্র ও বংশধরের। এই সর্বশেষ সীমা অর্থাৎ বংশধর পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে মানুষ তার বংশধরের প্রতিষ্ঠাতা পিতা থেকে অনেক দূরে সরে যায়। এতো দূরে সরে যায় যে, ঐ পিতার উত্তর পুরুষ হিসেবে তার নাম নিতান্তই গৌণ ও তাৎপর্যহীন হয়ে যায়। তথাকথিত বংশধরের এই বিশাল নদীতে বহিরাগত রক্তের অনেক উপনদীও শাখানদী এসে মিলিত হয়। ফলে কোনো জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একথা দাবী করতে পারেনা যে, এই নদী যে উৎস থেকে বেরিয়েছিলো, তার সেই আসল পানিই এতে প্রবাহিত। এতো ভেজালের মিশ্রন সত্ত্বেও যদি রক্তের সম অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মানুষ একটি "বংশধর"কে নিজের জন্য ঐক্যের বন্ধন হিসেবে মেনে নিতে পারে, তাহলে যে রক্তের বন্ধন সমগ্র মানবজাতিকে তাদের আদিপিতা ও আদিমাতার সাথে সংযুক্ত করে তাকেই ঐক্যের বন্ধন হিসেবে মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? সকল মানুষকে একই বংশধর এবং একই মূলসুত্রের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করলে ক্ষতি কি? যেসকল ব্যক্তিকে আজকাল বিভিন্ন বংশধর ও বিভিন্ন প্রজন্মের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়, তাদের সকলেরই বংশপরম্পরা উপরে গিয়ে কোথাও না কোথাও একই ধারায় মিলিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত একথা না মেনে উপায় থাকেনা যে, তারা সবাই একই উৎস থেকে উদ্ভূত। তাহলে আর্য অনার্য নামে এই বিভক্তির যৌক্তিকতা কোথায়?

ভৌগলিক তথা জন্মভূমিভিত্তিক ঐক্যের ব্যাপারটা এর চেয়েও বেশী কাল্পনিক। মানুষের প্রকৃত জন্মস্থান তো কিছুতেই এক বর্গ গজের চেয়ে বেশী নয়। এতো ক্ষুদ্র আয়তনের ভূমিকে যদি সে নিজের জন্মভূমি বলে স্থির করে, তাহলে সে হয়তো কোনো দেশকেই নিজের জন্মভূমি বলতে পারবেনা। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ভূখন্ডের চারপাশে সে শত শত বা হাজার মাইল পর্যন্ত সীমারেখা এঁকে নেয় এবং বলে যে, ঐ পর্যন্ত আমার মাতৃভূমি, ঐ সীমারেখার বাইরে যা কিছু আছে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, এটা শুধু তার দৃষ্টির সংকীর্ণতা। নচেত সমগ্র পৃথিবীকে নিজের মাতৃভূমি বলে দাবী করতে তাকে কেউ বাধা দিতে পারেনা। যে যুক্তির ভিত্তিতে এক বর্গগজ জায়গার মাতৃভূমি হাজার হাজার বর্গগজ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে। সেই একই যুক্তির বলে তা গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। মানুষ যদি নিজের দৃষ্টিভংগীকে সংকুচিত না করে তাহলে সে বুঝতে পারে যে, এই সমুদ্র, পাহাড়, নদী ইত্যাদি যাকে সে নিছক নিজের খেয়ালের বশে সীমান্তরেখা সাব্যস্ত করতঃ তার ভিত্তিতে এক ভূখন্ড ও অপর ভূখন্ডের মধ্যে পার্থক্য করে তা সবই একই পৃথিবীর অংশ। তাহলে কিসের ভিত্তিতে সে পাহাড় নদী ও সমুদ্রকে এই অধিকার দিলো যে, তারা তাকে একটা নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বন্দী করে রেখে দিক? সে কেন বলেনা যে, আমি পৃথিবীর অধিবাসী, গোটা পৃথিবী আমার

মাতৃভূমি ও স্বদেশ এবং সারা বিশ্বে যতো মানুষ বাস করে সবাই আমার স্বদেশবাসী? কেন সে দাবী করেনা যে গোটা পৃথিবীতে আমার সেই জন্মগত অধিকার রয়েছে, যা রয়েছে আমার এই এক বর্গগজ জন্মভূমিতে?

ভাষাগত অংশীদারিত্বের ফায়দা শুধু এতোটুকু যে, যারা একই ভাষায় কথা বলে তাদের পারস্পরিক সমঝোতা ও ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ বেশী। এতে পরস্পরের মধ্যে অজানা অচেনার ভাবটা অনেকাংশে কেটে যায় এবং সমভাষীরা নিজেদের মাঝে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা অনুভব করে। কিন্তু একাধিক ব্যক্তির মনোভাব ব্যক্ত করার মাধ্যম এক রকম হলেই যে খোদ্ মনোভাবটাও একই রকম হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। একই মনোভাব দশটা বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত হতে পারে, আর সেই দশটা ভাষায় মনোভাব ব্যক্তকারীদের একই মনোভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে দশটা রকমারি মনোভাব একই ভাষায় প্রকাশ করা যায় এবং এটাও বিচিত্র নয় যে, একই ভাষাভাষীরা সেইসব রকমারি ধ্যান ধারণায় বিশ্বাস স্থাপন করে পরস্পরের বিরোধী হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যে মতামতের ঐক্য জাতীয়তার প্রাণ তা ভাষাগত ঐক্যের মুখাপেক্ষী নয়। অনুরূপভাবে একই ভাষাভাষীদের একই মতামত ও চিন্তাধারার অধিকারী হওয়া জরুরী নয়। এরপর আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তা এই যে, মানুষের মনুষ্যত্ব এবং তার ব্যক্তিগত ভালো বা মন্দে তার ভাষার অবদান বা প্রভাব কতোটুকু? এক জার্মানকে শুধু জার্মান ভাষাভাষী হওয়ার কারণেই কি একজন ফরাসী ভাষাভাষীর ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে? না, তা কখনো নয়। দেখতে হবে তার ব্যক্তিসত্তা কি ধরনের দোষ বা গুণে ভূষিত? শুধু ভাষা দেখলে চলবেনা। বড় জোর এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, একটা দেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং সাধারণ কায়কারবার চালাতে সেই দেশের ভাষা জানা আছে এমন লোকই বেশী উপকারী ও সফল প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু মানবতার বিভাজন ও জাতীয় বৈষম্যের জন্য এটা কোনো সঠিক ভিত্তি নয়।

এরপর আসে বর্ণের প্রসংগ। মানব সমাজে বর্ণভিত্তিক ব্যবধান ও বৈষম্য সবচেয়ে অর্থহীন ও বাজে জিনিস। বর্ণতো নেহায়েত শরীরের একটা গুণ বা অবস্থার নাম। কিন্তু মানুষ শুধু তার শরীরের কারণে সম্মানের পাত্র নয় বরং তার আত্মা ও বিবেকের বদৌলতে। এই আত্মা ও বিবেকের কোনো রং নেই। সুতরাং মানুষে মানুষে সাদা, কালো, লাল ও হলুদের বৈষম্যের অর্থ কি? আমরাতো কালো ও সাদা গাভীর দুধে পার্থক্য করিনা। কেননা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুধ, গাভীর রং নয়। কিন্তু আমাদের বিবেকবুদ্ধি এতোই বিকারগ্রস্ত ও মতিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, আমরা মানুষের চারিত্রিক ও মানসিক গুণাগুণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তার বর্ণের দিকে বেশী মনোযোগী হয়ে পড়েছি।

অর্থনৈতিক স্বার্থের অংশীদারিত্ব আসলে মানুষের স্বার্থপরতার এক অবৈধ সন্তান। এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি করা জিনিস নয়। মানবশিশু মায়ের পেট থেকেই কর্মক্ষমতা ও কর্মস্পৃহা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। পৃথিবীতে এসে সে চেষ্টা সাধনার এক বিস্তৃত ময়দান লাভ করে এবং জীবনের অসংখ্য উপায় উপকরণ তাকে স্বাগত জানায়। কিন্তু সে

নিজের জীবিকার দুয়ার উম্মুক্ত হওয়াতেই শুধু খুশী থাকতে চায়না বরং সেই সাথে অন্যের দুয়ার রুদ্ধ হোক তাও কামনা করে। এই স্বার্থপরতায় কোনো বৃহৎ মানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্তির ফলে যে ঐক্য গড়ে ওঠে তা তাদেরকে একজাতিতে পরিণত হতে সাহায্য করে। আপাতঃ দৃষ্টিতে তারা মনে করে যে, তারা অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার একটা বৃত্ত বানিয়ে নিজেদের অধিকার ও স্বার্থকে নিরাপদ করেছে। কিন্তু যখন এ ধরনের অনেকগুলো গোষ্ঠী নিজেদের চারপাশে অনুরূপ বৃত্ত বানিয়ে নেয়, তখন মানুষ নিজ হাতেই নিজের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। তার নিজের স্বার্থপরতা তার পায়ে বেড়ি এবং হাতে কড়া পরিয়ে দেয়। অন্যদের জন্য জীবিকার দুয়ার রুদ্ধ করার চেষ্টা করতে গিয়ে সে নিজেই নিজের জীবিকার চাবিকাঠি হারিয়ে বসে। আজ আমাদের চোখের সামনে এ দৃশ্য বিদ্যমান যে, ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানের সাম্রাজ্যগুলো কিভাবে তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে। তারা এখন বুঝতেই পারছেনা যে, যেসব অর্থনৈতিক দুর্গ তারা নিজেদের নিরাপত্তার সর্বোত্তম উপায় মনে করে নির্মান করেছিলো তা কিভাবে ভেংগে চুরমার করা যায়। এরপরও কি আমরা বুঝতে পারবোনা যে, জীবিকা উপার্জনের জন্য বৃত্ত গড়ে তোলা এবং তার ভিত্তিতে জাতীয় বৈষম্য সৃষ্টি করা একটা নির্বোধসুলভ কাজ? আল্লাহ্‌র বিশাল পৃথিবীতে মানুষকে আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহ অন্বেষণ করার স্বাধীনতা দেয়ায় দোষের কি আছে?

শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত মতৈক্য মূলত একটা দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী জিনিস। এর ভিত্তিতে কোনো স্থায়ী জাতীয়তার পত্তন কখনো সম্ভব নয়। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে তার চিরস্থায়ী আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে একটি জাতিতে পরিণত করার চিন্তা কখনো সাফল্যের মুখ দেখেনি। রাষ্ট্র যতোক্ষণ পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী থাকে ততোক্ষণ নাগরিকরা তার আইনের বাঁধনে বাঁধা থাকে। এই বাঁধন যখনই ঢিলা হবে অমনি তা খন্ডবিখন্ড হয়ে যাবে। মোগল সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে নিজস্ব পৃথক পৃথক জাতিসত্তা গড়ে তুলতে কোনো কিছুই আর বাধা দিতে পারেনি। ওসমানী সাম্রাজ্যেরও একই পরিণতি ঘটেছিলো। শেষ যুগে তুর্কী যুবকদের সংগঠন "ইয়ং তুর্ক" উসমানী জাতীয়তার প্রাসাদ নির্মাণে অনেক চেষ্টা চালিয়েছিলো। কিন্তু একটা ঠেলা লাগতেই গোটা প্রাসাদ হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়লো। অষ্ট্রিয়া ও হাংগেরীর ঘটনা সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। এছাড়াও ইতিহাস থেকে আরো অনেক উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। সেসব উদাহরণ দেখার পরও যারা রাজনৈতিক জাতীয়তা গড়া সম্ভব মনে করে তারা শুধু তাদের কল্পনার নৈপুণ্যের জন্য অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য।

উপরোক্ত পর্যলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মানব সমাজে এভাবে যতো বিভাজন করা হয়েছে, তার কোনো যুক্তিসংগত ভিত্তি নেই। এগুলো কেবল বস্তুগত ও আবেগ নির্ভর বিভাজন। দৃষ্টিভংগীকে কিছুমাত্র প্রসারিত করলেই এসব বিভাজনের প্রতিটি বৃত্ত ভেংগে যায়। অজ্ঞতা ও মুর্খতার অন্ধকার, দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা ও অন্তরের সংকীর্ণতার ওপর এসব বিভাজনের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। জ্ঞানের আলো যতো ছড়াতে থাকে, অন্তর্দৃষ্টি যতো লক্ষ্যভেদী হয়, হৃদয়ে যতো বেশী উদারতা ও প্রশস্ততার উদ্ভব

হয় ততোই এসব বস্তুগত ও আবেগ নির্ভর পর্দা সরে যেতে থাকে। অবশেষে বর্ণবাদ ও প্রজন্মবাদকে মানবতার জন্য এবং স্বাদেশিকতাবাদকে আন্তর্জাতিকতার জন্য স্থান খালি করে দিতে হয়। বর্ণ ও ভাষার বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে মানবতার ঐক্য নামক মূল সত্যটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। আল্লাহ্র পৃথিবীতে আল্লাহ্র সকল বান্দার অর্থনৈতিক কামনা বাসনা একই হয়ে থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলী কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নামক সূর্যের ছায়া মাত্র, যা ঐ সূর্যের গতিবিধি অনুসারে চলাফেরা করে এবং বাড়ে কমে।

ইসলামের প্রশস্ত দৃষ্টি ভংগী

উপরে আমি যেসব কথা বলেছি, অবিকল ওটাই ইসলামের বক্তব্য। ইসলাম মানুষে মানুষে কোনো বস্তুগত ও আবেগ নির্ভর ভেদাভেদ ও বৈষম্য স্বীকার করেনা। সে বলে, সকল মানুষ একই উৎস থেকে উদগত ঃ

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় থেকে অসংখ্য নারী ও পুরুষ [বিশ্বময়] ছড়িয়ে দিয়েছেন।" [সূরা আননিসা ঃ ১]

ইসলাম বলে, তোমাদের মধ্যে জন্মস্থান, মৃত্যুস্থান ও মাতৃভূমির পার্থক্য কোনো মৌলিক বিষয় নয়। আসলে তোমরা সবাই একই স্থানের অধিবাসী।

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর প্রত্যেকেরই একটা অবস্থান স্থল ও সমাধিস্থল হবে।" [সূরা আল আনয়াম ঃ ৯৮]

এরপর সে বংশ ও গোত্রের পার্থক্যের তাৎপর্যও এভাবে ব্যাখ্যা করেছে ঃ

"ওহে মানবমন্ডলী ঃ আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ও গোত্রে গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পারো। কিন্তু আসলে তোমাদের মধ্যে অধিকতর সম্মানিত ব্যক্তি তো সেই-ই, যে অধিকতর পরহেজগার।" [সূরা আল হুজরাত ঃ ১৩]

অর্থাৎ এতো যে জাতি ও গোত্রের বিভিন্নতা, তা পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ, গর্ব ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের জন্য নয়, বরং পারস্পরিক পরিচয়ের সুবিধার জন্য। এই বিভিন্নতায় তোমরা মানবজাতির উৎপত্তির উৎস যে এক ও অভিন্ন সে কথা ভুলে যেওনা। তোমাদের মধ্যে যদি সত্যি সত্যি কোনো পার্থক্য ও ভেদাভেদ থেকে থাকে, তবে তা চরিত্র ও কর্মের সততা ও অসততার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

এরপর বলা হয়েছে, এইসব রকমারি দল ও গোষ্ঠীগত বিভেদ আল্লাহ্র আযাব স্বরূপ। এ দ্বারা তোমাদেরকে পারস্পরিক শত্রুতার যন্ত্রণা উপভোগ করানো হয় ঃ

"নয়তো তিনি তোমাদেরকে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পরস্পরের শক্তি ও প্রতিপত্তির স্বাদ উপভোগ করাবেন।" [সূরা আল আনয়াম ঃ ৬৫]

এই দলাদলিকে ইসলাম একটা অপরাধ বলে আখ্যায়িত করেছে এবং বলেছে যে, ফেরাউন এই অপরাধের কারণেই অভিশপ্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলো ঃ

"ফেরাউন পৃথিবীতে অহংকার করলো এবং দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করলো।"[১] [সূরা ক্বাসাস ঃ ৪১]

ইসলাম আরো বলেছে যে, পৃথিবী আল্লাহ্‌র। তিনি মানবজাতিকে এখানে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন, এখানকার সকল জিনিসকে মানুষের অনুগত ও বশীভূত করে দিয়েছেন। মানুষ কোনো একটা ভূখন্ডের গোলাম হয়ে থাকতে বাধ্য নয়। এই বিশাল পৃথিবী তার জন্য উম্মুক্ত। এক জায়াগা তার জন্য সংকীর্ণ ও অনাবাসযোগ্য হলে অন্যত্র চলে যেতে পারে। সে যেখানেই যাবে, আল্লাহ্‌র প্রদত্ত সম্পদরাজি বিদ্যমান দেখতে পাবে ঃ

"[আদম সৃষ্টির সময় আল্লাহ্ বললেন] আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।" [সূরা আলবাকারা ঃ ৩০]

"তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, পৃথিবীতে বিরাজমান সকল জিনিসকে আল্লাহ্ তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন?" [সূরা হাজ্জ ঃ ৬৫]

"আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলোনা, যে তোমরা তার অভ্যন্তরে হিজরত করতে?" [সূরা আননিসা ঃ ৯৭]

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে প্রচুর জায়গা ও প্রশস্ততা পাবে।" [সূরা আননিসা ঃ ১০০]

আপনি সমগ্র কুরআন পড়ে যান। এতে একটি শব্দও আপনি বর্ণ, বংশ ও ভৌগলিক আঞ্চলিকতা বা স্বাদেশিকতার সমর্থনে পাবেন না। তার দাওয়াত গোটা মানবজাতিকে সম্বোধন করে উচ্চারিত হয়েছে। সারা পৃথিবীর মানব জাতিকে সে সততা ও কল্যাণের দিকে ডাকে। এক্ষেত্রে কোনো জাতি ও ভূখন্ডের ভেদাভেদ নেই। সে কোনো ভূখন্ডের সাথে যদি বিশেষ সম্পর্ক গড়ে থাকে তবে শুধু মক্কার সাথে গড়েছে। কিন্তু তার সম্পর্কেও সে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে ঃ

"মক্কার স্থায়ী অধিবাসী এবং বহিরাগত মুসলমান সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী।"[১] [সূরা হাজ্জ ঃ ২৫]

আর যে মোশরেকরা সেখানকার আসল অধিবাসী তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ওরা নাপাক ওদেরকে বহিস্কার করো।

---

১. ফেরাউন মিশরের অধিবাসীদেরকে কিবতী ও অকিবতী গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে এবং উভয় গোষ্ঠীর সাথে বৈষম্যপূর্ণ আচরণ করে যে ঐতিহাসিক অপরাধ সংঘটিত করে তার প্রতি ইংগিত।

১. এ কারণেই মুসলিম ফিকাহবিদদের একটা দল মক্কার মাটিতে কারো মালিকানা অধিকার স্বীকার করেননি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মক্কাবাসীকে ঘরের দরজা পর্যন্ত বন্ধ করতে নিষেধ করতেন, যাতে হাজীরা যে ঘরে ইচ্ছা উঠতে পারে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয মক্কায় ঘরবাড়ী ভাড়া করতে নিষেধ করতেন এবং মক্কার শাসনকর্তাকে চিঠি লিখেছিলেন, তিনি যেনো লোকদেরকে একাজ থেকে নিষেধ করেন। কোনো কোনো ফকীহর মতে নিজ খরচে ঘর বানালে তার ভাড়া নেয়া যায়, কিন্তু উঠোন, মাঠ ও অনাবাদ জায়গার ওপর সবার অধিকার রয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মক্কা পবিত্র, এর খালি জায়গা বিক্রি করা ও ঘর ভাড়া দেয়া জায়েয নয়। অন্য হাদীসে বলেন, মক্কায় যেখানে যে ব্যক্তি প্রথম পৌঁছবে, সেখানে তারই অধিকার। ইসলাম যে জায়গাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে, এ হচ্ছে তার অবস্থা।

"মোশরেকরা অপবিত্র। কাজেই এ বছরের পর তারা যেনো মসজিদুল হারামের ধারে কাছেও ঘেষতে না পারে।" [সূরা আততাওবা ঃ ২৮]

এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পর ইসলামে দেশ ও অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়ে যায়। একজন মুসলমান অনায়াসে ঘোষণা করতে পারে যে "প্রতিটি দেশ আমাদের দেশ, কেননা তা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র দেশ।"

বিদ্বেষ ও ইসলামের সাথে শত্রুতা

ইসলামের অভ্যুদয়কালে এই বর্ণ, বংশ ও মাতৃভূমি সংক্রান্ত বিভেদ, বিদ্বেষ ও আভিজাত্যবোধই ছিলো তার পথের সবচেয়ে বড় বাঁধা।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজ গোত্র এই আভিজাত্য ও কৌলিন্য ফলানোর প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলো। গোত্রসমূহের গৌরব গাথা এবং ব্যক্তিগত ও বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা তাদের ইসলাম গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা হ'য়ে দাঁড়ায়। তারা বলতো, এই কুরআন যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এসে থাকে তবে তা মক্কা বা তায়েফের কোনো মান্যগণ্য ব্যক্তির কাছেই আসতো ঃ

"তারা বলে ঃ এই কুরআন দুই জনপদের কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কাছেই নাযিল হলো না কেন? [সূরা যুখরুফ ঃ ৩১]

আবু জাহেল মনে করতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবূয়্যতের দাবী করে নিজের গোত্রের জন্য আরো একটি গৌরব বৃদ্ধি করতে চান। সে বলতো ঃ

"আমাদের আর বনু আবদে মানাফের সাথে সবকিছুতেই প্রতিযোগিতা হতো। ঘোড় দৌড়ে, গণভোজনের আয়োজনে ও দান দক্ষিণায় তাদের সাথে আমরা সমানে সমান ছিলাম। এখন তারা বলছে, আমাদের এক ব্যক্তির কাছে ওহি আসা শুরু হয়েছে। খোদার কছম, আমরাতো মুহাম্মদকে কখনো নবী মানবোনা।"

এটা আবু জাহেলেরই বক্তব্য ছিলোনা; বরং কোরেশ বংশীয় সকল মোশরেকদের দৃষ্টিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দীনে এই একটাই 'খুঁত' ছিলো যে ঃ

"মুহাম্মদের ধর্ম কোরেশ বংশকে তার বংশীয় আভিজাত্য ও দেশীয় গৌরব থেকে বঞ্চিত করবে এবং তার আরবীয় আভিজাত্য বিনষ্ট করবে। তার দৃষ্টিতে ছোট বড় সব সমান এবং সে নিজের ভৃত্যের সাথে একসাথে বসে আহার করে। সে আরবের সম্ভ্রান্ত লোকদের মর্যাদা বোঝেনা, হাবশীদের সাথেও সে মিলে মিশে চলে। সাদা কালো সবাইকে সে একাকার করে ফেলেছে এবং সম্মানিত লোকদের সম্মান হানি করেছে।"

এ কারণে কোরেশ বংশের সকল গোত্র বনু হাশেম গোত্রের ওপর ক্ষুব্ধ হয়। আর বনু হাশেমও এই গোত্রীয় আভিজাত্যবোধের ভিত্তিতেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সমর্থন জানায় অথচ তাদের অধিকাংশই মুসলমান ছিলোনা। 'শিয়াবে আবু তালেব' নামক গীরিবর্তে বনু হাশেমকে এ কারণেই অবরুদ্ধ করে রাখা হয় এবং সমগ্র কোরেশ বংশ তাদেরকে বয়কট করে। যেসব মুসলমানের গোত্র দুর্বল ছিলো, তারা ভয়াবহ নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে বাধ্য

হয়। আর যাদের গোত্র শক্তিশালী ছিলো, তারা ইসলামের পক্ষাবলম্বনের জন্য নয় বরং গোত্রীয় শক্তির কারণে কোরেশ বংশের অত্যাচার থেকে কিছুটা নিরাপদ থাকে।

আরবের ইয়াহুদীরা বনী ঈসরাইলী নবীদের ভবিষ্যদ্বানীর আলোকে বহুদিন যাবত একজন নবীর অপেক্ষায় ছিলো। তাদেরই প্রচারিত ভবিষ্যদ্বানীর ফল ছিলো এইযে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত প্রকাশ পাওয়ার পর মদীনার বহুসংখ্যক অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। অথচ খোদ্ ইয়াহুদীরা যে কারণে তাঁর প্রতি ঈমান আনা থেকে বিরত থাকে সেটি ছিলো এই বংশীয় আভিজাত্যবোধ। তাদের আপত্তি ছিলো এইযে, নবী যখন এলেনই, তখন তিনি ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে না এসে ইসমাইলের বংশধরের মধ্য থেকে এলেন কেন? এই বিদ্বেষ তাদেরকে এতো বেসামাল করে দেয় যে, তারা একত্ববাদীদের ছেড়ে মোশরেকদের সহযোগী হয়ে গেলো।

খৃষ্টানদের অবস্থাও ছিলো তদ্রূপ। তারাও একজন নবীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলো। কিন্তু তাদের ধারণা ছিলো, তিনি সিরিয়ার খৃষ্টানদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন। আরবের কোনো নবীকে মেনে নিতে তারা প্রস্তুত ছিলোনা। হিরাক্লিয়াসের কাছে যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তা পৌঁছালো, তখন সে কোরেশ বণিকদের বললো ঃ

> "আমি জানতাম যে একজন নবীর আবির্ভাব আসন্ন হয়ে উঠেছে, কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন এমনটি আশা করিনি।"

মিশরের মুফাওকিসের কাছে যখন ইসলামের দাওয়াত গেলো, তখন সে বললো ঃ

> "এখনো একজন নবী আসতে বাকী আছে, তাতো আমি জানি, তবে আমার আশা ছিলো যে, তিনি সিরিয়ায় আসবেন।"

অনারব বিশ্বেও এই জাত্যাভিমান তীব্রভাবে বিদ্যমান ছিলো। ইরানের শাহ খসরু পারভেজের কাছে যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান দাওয়াতী চিঠি পৌঁছলো, তখন কোন্ কারণে সে আক্রোশে ফেটে পড়লো? সে কারণ ছিলো এটাই যে, "একটি গোলাম জাতির এক ব্যক্তির কিনা এতো স্পর্ধা যে, সে আযমের বাদশাকে এভাবে সম্বোধন করলো।" সে আরব জাতিকে নিকৃষ্ট জাতি মনে করতো। তাদেরকে সে নিজের অধীন মনে করাতো। এমন একটি জাতির মধ্যে সত্যের দিকে আহবানাকরী কোনো মানুষ জন্ম নিতে পারে তা সে ভাবতেও পারতোনা।

ইসলামের চরম শত্রু ইয়াহুদীদের কাছে ইসলামের প্রসার ঠেকানোর সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার ছিলো মুসলমানদের মধ্যে গোত্রীয় বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার অপকৌশল। এ কারণেই মদীনার মোনাফেক তথা ভন্ড ও কপট মুসলমানদের সাথে তাদের গোপন যোগসাজশ ছিলো। একবার তারা বুগাস যুদ্ধের প্রসংগ তুলে দুটো আনসার গোত্র আওস ও খাজরাজের মধ্যে বিদ্বেষের এমন আগুন জ্বালালো যে, উভয় পক্ষের তরবারী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো। এই ঘটনা উপলক্ষে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

"হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবের একটি গোষ্ঠির কথামত চলো, তাহলে তারা তোমাদেরকে ঈমান থেকে কুফরির দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।" [সূরা আল ইমরান ঃ ১০০]

এই একই বংশগত ও ভূখন্ডগত বিদ্বেষের কারণে মদীনায় কোরেশী নবীর শাসন চলতে দেখে এবং আনসারদের খেজুরের বাগানে ও ফলের বাগানে মোহাজিরদের বিচরণ করতে দেখে মদীনার মোনাফিকরা তেলে বেগুনে জ্বলতে থাকতো। মোনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বলতো, "এই দরিদ্র কোরেশীরা আমাদের এখানে এসে আংগুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে। এদের উপমা হলো কুকুরকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা তাজা বানানোর মতো যাতে কুকুর তার মালিককেই ছিড়ে ভুঁড়ে খেতে পারে।"

সে আনসারদের বলতো ঃ "তোমরা ওদেরকে মাথায় চড়িয়েছো। নিজেদের দেশে আশ্রয় দিয়েছো, নিজেদের সম্পদের ভাগ দিয়েছো। আল্লাহ্র কছম, আজ যদি তোমরা তাদের সাথে সহযোগিতা করা বন্ধ করো, তাহলে দেখবে ওরা ঘুরে বেড়াবে।" তার এসব উক্তির জবাব কুরআনে এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

"এরাইতো সেইসব লোক যারা বলে, রসূলুল্লাহর সংগীদের জন্যে অর্থ ব্যয় করোনা, যাতে তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। অথচ আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের একমাত্র মালিক আল্লাহ্। কিন্তু মোনাফেকরা তা বোঝেনা। তারা বলে, আমরা যদি [রণাংগন থেকে] মদীনায় ফিরে যাই, তাহলে প্রতাপশালীরা দুর্বলদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করবে। অথচ প্রতাপ ও প্রতিপত্তি মূলতঃ আল্লাহ্র, তার রসূলের এবং মুমিনদের। কিন্তু মোনাফেকরা তা জানেনা।" [সূরা মুনাফিকূন ঃ ৭-৮]

এই স্বজাত্যবোধের অন্ধ আবেগই আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ওপর অপবাদ আরোপ প্ররোচিত করে এবং এই আবেগের বশেই খাজরাজ গোত্রের সমর্থনে আল্লাহ্ ও রসূলের এই কট্টর দুশমন নিজের কৃতকর্মের শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যায়।

গোষ্ঠীবাদ ও জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে ইসলামের জিহাদ

উপরোক্ত বিবরণ থেকে একথা ভালোভাবেই জানা গেছে যে, কুফরী ও শিরকের জাহেলিয়তের পর ইসলামী দাওয়াত বিস্তারের সবচেয়ে বড় বাধা ও সবচেয়ে কট্টর দুশমন যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা এই বংশ পূজা ও স্বাদেশিকতার শয়তান। আর এ কারণেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুফরী ও শিরকের পরে যে জিনিসটির উচ্ছেদের জন্য সর্বাধিক চেষ্টা সাধনা করেছেন তা ছিলো জাহেলিয়াত থেকে তৈরী এই জাত্যাভিমান। আপনি হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলী পড়ে দেখলে বুঝতে পারবেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে রক্ত, মাটি, বর্ণ ও ভাষা এবং ইতর ও কুলীণের ভেদাভেদ নির্মূল করেছিলেন। কিভাবে মানুষে মানুষে বিরাজমান অস্বাভাবিক বৈষম্যের প্রাচীরগুলো ভেংগে চুরমার করেছিলেন এবং মানুষ হিসেবে সকল আদম সন্তানকে সমানাধিকার প্রদান করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা ছিলো ঃ

"যে ব্যক্তি জাত্যাভিমান ও গোষ্ঠীবাদের জন্য প্রাণ দিলো, সে আমার দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি জাত্যাভিমানের প্রতি আহবান জানালো সে আমার দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি জাত্যাভিমান নিয়ে লড়াই করলো সে আমার দলভুক্ত নয়।"

"ধর্মপরায়ণতা ও খোদাভীতি ছাড়া আর কোনো জিনিসের ভিত্তিতে একজন অপর জনের ওপর অগ্রাধিকারের যোগ্য নয়। সকল মানুষ আদম আলাইহিস্ সালামের সন্তান এবং আদম আলাইহিস্ সালাম ছিলেন মাটির তৈরী।"

প্রজন্মবাদ, স্বাদেশিকতাবাদ, ভাষা ও বর্ণের বৈষম্য তিনি এই বলে নিশ্চিহ্ন করেন ঃ

"অনারবের ওপর আরবের এবং আরবের ওপর অনারবের কোনো অগ্রাধিকার বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা সবাই আদম আলাইহিস্ সালামের সন্তান।"

"কোনো অনারবের ওপর আরবের, আরবের ওপর অনারবের, কালোর ওপর সাদার এবং সাদার ওপর কালোর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তবে শুধুমাত্র সততা ও খোদভীতির ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব থাকতে পারে।"

"শোনো ও আনুগত্য করো, এমনকি যদি তোমাদের আমীর এমন একজন নিগ্রো দাসকেও নিয়োগ করা হয়, যার মাথাটা কিশমিশের মতো কদাকার, তবুও।"[১]

মক্কা বিজয়ের পর যখন তরবারির শক্তির সামনে কোরেশী সরদারদের গর্বিত মস্তক অবনমিত হলো, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

"শুনে রাখো, কৌলীন্য ও আভিজাত্যের যেকোনো পুঁজি এবং রক্ত ও সম্পদের যেকোনো দাবী আমার পায়ের নিচে দাবিয়ে দিলাম।"

"হে কোরেশ ঃ আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জাহেলিয়তের জাত্যাভিমান এবং বাপ দাদার গৌবর গাথা নির্মূল করে দিয়েছেন।"

"ওহে মানব মন্ডলী! তোমরা সকলে আদম থেকে এসেছো আর আদমের জন্ম হয়েছে মাটি থেকে। বংশ নিয়ে গৌরবের কোনো অবকাশ নেই। কোনো অনারবের ওপর আরবের এবং আরবের ওপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যেব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সৎ ও খোদাভীরু, সেই সবচেয়ে বেশী সম্মানের পাত্র।"

আল্লাহ্র ইবাদতের পর তিনি আল্লাহ্র সামনে তিনটে জিনিসের সাক্ষ্য দিতেন। প্রথমতঃ "আল্লাহ্র কোনো শরীক নেই," অতঃপর এই মর্মে সাক্ষ্য দিতেন যে, "মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও রসূল।" অতঃপর তৃতীয় যে বিষয়টির সাক্ষ্য দিতেন তাহলো এই যে, "আল্লাহ্র বান্দারা সবাই ভাই ভাই।"

ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি

---

১. উল্লেখ্য যে, এই নির্দেশ আরবের অভিজাত সরদার ও নেতাদের উদ্দেশ্যে জারী করা হয়েছিলো যে, তোমাদের আমীর কোনো নিগ্রো মুসলমান হলেও তাকে মেনে চলো। কোনো জাতীয়তাবাদী কি একথা কল্পনাও করতে পারে?

জাহেলিয়াতের যে কয়টি সংকীর্ণ বস্তুগত, আবেগ প্রসূত ও কাল্পনিক ভিত্তির ওপর দুনিয়ার বিভিন্ন জাতীয়তার প্রাসাদ গড়ে উঠেছিলো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সেগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। মানুষ নিজের চরম অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে বর্ণ, বংশ, জন্মভূমি, ভাষা, অর্থনীতি ও রাজনীতির যেসব অযৌক্তিক ভেদাভেদ ও বৈষম্যের ভিত্তিতে মানব সমাজকে বিভক্ত করে রেখেছিলো ইসলাম সেগুলোর মূলোৎপাটিত করে এবং মানবতার ক্ষেত্রে সকল মানুষকে পরস্পরের সমমর্যাদা সম্পন্ন বলে ঘোষণা করে।

এই ভাংগার পাশাপাশি সে সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত ভিত্তিতে একটি নতুন জাতীয়তা গড়ার কাজও সম্পন্ন করে। এ জাতীয়তার ভিত্তিও এক ধরনের বৈষম্যের ওপর স্থাপিত হয়েছিলো। তবে সেটা বস্তুগত ও ভৌতিক বৈষম্য নয় বরং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভেদাভেদ। সে মানুষের সামনে একটি স্বভাবসিদ্ধ সত্য পেশ করে যার নাম "ইসলাম।" সে আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্য, মনের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা এবং আমলের সততা ও পরহেজগারীর প্রতি সকলকে দাওয়াত দেয়। তারপর জানিয়ে দেয় যে, এই দাওয়াতকে যে ব্যক্তি গ্রহণ করবে সে একটা জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে আর যে ব্যক্তি প্রত্যাখ্যান করবে, সে একটা ভিন্ন জাতির সদস্যরূপে পরিগণিত হবে। এ দুই জাতির একটি ইসলামী জাতি এবং এর সকল ব্যক্তি মিলে একটা উম্মাহ্ গঠিত হয়। পবিত্র কুরআনে এই উম্মাহ্‌কে মধ্যমপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ উম্মাহ্ বলা হয়েছে।

"আমি এইভাবে তোমাদের সকলকে মধ্যপন্থী উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত বানিয়ে দিয়েছি।" আর একটি জাতি কুফরি ও ভ্রষ্টতার জাতি হিসেবে পরিচিত এবং এর অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে তীব্র মতভেদ থাকা সত্ত্বেও একই গোষ্ঠী।

"আল্লাহ্ সত্য অস্বীকারকারীদের সুপথে পরিচালিত করেননা।"

উপরোক্ত দুটি জাতির মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি বর্ণ ও বংশ নয় বরং বিশ্বাস ও কাজ। এমনকি একই পিতার দুই ছেলে ইসলাম ও কুফরীর বিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং সম্পূর্ণ অচেনা দুই ব্যক্তি ইসলামে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে।

উক্ত জাতি দুটির মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি জন্মভূমির বিভিন্নতা নয়। এখানে পার্থক্য ও বিভেদ-বৈষম্যের ভিত্তি হলো হক ও বাতিল, যার কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা জন্মভূমি নেই। একই শহর, একই মহল্লা, এমনকি একই ঘরের দুই ব্যক্তির জাতীয়তা ইসলাম ও কুফরীর বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন হয়ে যেতে পারে। একজন নিগ্রো ইসলামের বন্ধনে আবদ্ধ হবার কারণে একজন মক্কাবাসীর স্বজাতিভুক্ত হয়ে যেতে পারে।

বর্ণের বিভিন্নতাও এখানে জাতিগত বিভেদের কারণ নয়। এখানে চেহারার বর্ণ কেমন তার কোনো গুরুত্ব ও মূল্য নেই। বরং প্রকৃত গুরুত্ব হলো আত্মার রংয়ের এবং সেটাই শ্রেষ্ঠ রং ঃ

"আল্লাহ্‌র রং ধারণ করো। তার রংয়ের চেয়ে ভালো আর কার রং হবে?"

ইসলামের কারণে একজন শ্বেতাংগ ও একজন কালো মানুষ একই জাতিভুক্ত হয়ে যেতে পারে এবং কুফরীর কারণে দু'জন সাদা মানুষেরও পৃথক পৃথক জাতীয়তা হওয়া সম্ভব।

ভাষার পার্থক্যও ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে বিরোধের কারণ ঘটায়না। এক্ষেত্রে মুখের ভাষা নয়, মনের ভাষাই বিবেচ্য বিষয়। মনের ভাষা সারা পৃথিবীতেই প্রচলিত এবং সকলেই তা বোঝে। এ হিসেবে একজন আরব ও একজন আফ্রিকানের ভাষা একই হতে পারে। পক্ষান্তরে দু'জন আরবের ভাষা দু'রকম হতে পারে।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্নতাও ইসলাম ও কুফরীর বিরোধে কোনো গুরুত্ব রাখেনা। এখানে বিতর্কের বিষয় টাকা নয়, ঈমানী সম্পদ। বিতর্কের বিষয় মানুষের রাজত্ব নয়, আল্লাহ্‌র সাম্রাজ্য। যারা আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের অনুগত এবং তাঁর কাছে নিজেদের জীবন বিক্রি করে দিয়েছে, তারা সবাই এক জাতিভুক্ত, চাই তারা ভারতের অধিবাসী হোক কিংবা তুর্কিস্তানের। আর যারা আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা ওড়ায় এবং শয়তানের সাথে জান ও মালের ব্যাপারে আপোষ রফা করে তারা ভিন্ন জাতির লোক। তারা কোন্ রাষ্ট্রের নাগরিক এবং কোন্ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীন, তা এখানে কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়।

এভাবে ইসলাম জাতীয়তার যে বৃত্ত এঁকেছে, তা কোনো বস্তুগত বা ইন্দ্রিয় গোচর বৃত্ত নয়, বরং সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক বৃত্ত। একই পরিবারের দুই ব্যক্তি এই বৃত্তে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে আবার পাশ্চাত্যের একজন ও প্রাচ্যের একজনের ভেতরে মিলিত হতে পারে। কবির ভাষায় ঃ

এখানে ভালোবাসার সাথে রক্তের নেই কোনো সম্পর্ক
রোম, সিরিয়া বা সেমিটিকের নেই কোনো ভেদাভেদ
এ নক্ষত্র প্রাচ্যেরও নয়, নয় পাশ্চাত্যের
এর না আছে অস্তাচল না সীমানায় উত্তর না দক্ষিণ।

এ বৃত্তকে যে জিনিস ঘিরে রেখেছে তা হচ্ছে কলেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।" এই কলেমাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে শত্রুতা ও বন্ধুতা। এই কলেমার স্বীকৃতি মিলনের পথ উন্মুক্ত করে আর অস্বীকৃতি নিয়ে যায় বিচ্ছেদের পথে। এ কলেমা যাদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে, তাদেরকে রক্তের সম্পর্কও একত্রিত করতে পারেনা, মাটির সম্পর্কও নয় এবং ভাষা, বর্ণ, খাদ্য কিংবা সরকারের অংশীদারিত্বও নয়। আর এই কলেমা যাদেরকে একত্রিত করেছে, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা কারো নেই। কোনো নদনদী,পাহাড় পর্বত, সমুদ্র, ভাষা, বংশ, বর্ণ এবং সম্পদ ও ভূমির বিরোধ ও বিভিন্নতার এ অধিকার ও ক্ষমতা নেই যে, ইসলামের অভ্যন্তরে বিভেদের রেখা এঁকে দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ বৈষম্য বা পার্থক্যের সৃষ্টি করে। প্রত্যেক মুসলমান, চাই সে চীনের অধিবাসী হোক কিংবা মরক্কোর, সাদা হোক কিংবা কালো, হিন্দী বলুক বা আরবী, সেমিটিক হোক কিংবা আর্য, এক রাষ্ট্রের নাগরিক হোক কিংবা অন্য রাষ্ট্রের, সর্বাবস্থায় সে মুসলিম উম্মাহর সদস্য, ইসলামী সমাজের সদস্য, ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক, ইসলামী সেনাবাহিনীর সৈনিক এবং ইসলামী আইনের সংরক্ষণ সুবিধার অধিকারী। ইসলামী শরীয়তে একটি বিধিও এমন নেই, যা ইবাদত, পারস্পরিক লেনদেন, সামাজিক আচার আচরণ, অর্থনীতি, রাজনীতি মোটকথা জীবনের

কোনো একটি দিকেও জাতীয়তা, ভাষা বা জন্মভূমির ভিত্তিতে এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের চেয়ে কম বা বেশী অধিকার দেয়।

ইসলামের মিলন ও বিচ্ছেদের নীতি

এরূপ ভুল ধারণা যেনো কারো মনে না জন্মে যে, ইসলাম যাবতীয় বৈষয়িক, সামাজিক ও মানবিক সম্পর্কগুলোকে ছিন্ন করে দিয়েছে। কখ্খনো নয়। বরঞ্চ সে মুসলমানদেরকে আত্মীয়তার বন্ধন অব্যাহত রাখা ও মজবুত করার নির্দেশ দিয়েছে। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করতে নিষেধ করেছে। মাতাপিতার আনুগত্য ও ফরমাঁবরদারীর তাগিদ দিয়েছে। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে সম্পত্তির উত্তরাধিকার চালু করেছে। দান সদকা ও বদান্যতায় আত্মীয় স্বজনকে অনাত্মীয়দের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছে। নিজের পরিবার পরিজন, ঘরদোর ও ধনসম্পদকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে। যালেমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলেছে এবং এধরনের লড়াইতে নিহত ব্যক্তিকে শহীদের মর্যাদা দিয়েছে। জীবনের সকল ব্যাপারে জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের প্রতি সমবেদনা, সদাচার ও স্নেহমমতা প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়েছে। তার কোনো বিধি বিধানের এমন ব্যাখ্যা দেয়ার অবকাশ নেই যে, ইসলাম স্বদেশ, স্বজাতির সেবা ও প্রতিরক্ষায় অবদান রাখতে নিষেধ করে, কিংবা অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথে আপোষ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে বাধা দেয়।[১]

এগুলো হলো এসব বস্তুগত ও পার্থিব সম্পর্কের বৈধ ও স্বাভাবিক সুবিধা। কিন্তু যে জিনিসটি জাতীয়তার ব্যাপারে ইসলাম ও কুফরীর নীতিকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়েছে তা হলো, অন্যরা এসব সম্পর্কের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা জাতীয়তা তৈরী করে নিয়েছে, কিন্তু ইসলাম এগুলিকে জাতীয়তার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেনি। সে ঈমানের বন্ধনকে এ সকল সম্পর্কের ঊর্ধ্বে স্থান দেয় এবং প্রয়োজন হলে এসব সম্পর্কের প্রত্যেকটিকে ঈমানী সম্পর্কের জন্য বিসর্জন দেয়ার দাবী জানায়। তার কথা হলো ঃ

> "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে অনুকরণীয় আদর্শ ছিলো। তারা তাদের জাতিকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলো, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য যাদের পূজা করো তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক

---

১. উল্লেখযোগ্য যে, অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের দুটো দিক রয়েছে। একটি দিক হলো, মানুষ হিসেবে আমরা ও তারা সমান। দ্বিতীয় দিক এইযে, ইসলাম ও কুফরীর বিভিন্নতা আমাদেরকে তাদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। প্রথম বিষয়টির বিচারে আমরা তাদের সাথে সহানুভূতি, উদারতা, বদান্যতা ও সৌজন্যমূলক যাবতীয় সদাচার অব্যাহত রাখবো। কেননা এটা মানবতার দাবী। আর যদি তারা ইসলামের ও মুসলমানদের সক্রিয় দুশমন না হয়, তবে আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব, আপোষ ও সহাবস্থানও করবো। যৌথ কল্যাণমূলক কাজে আমরা তাদের সাথে সহযোগিতাও করতে দ্বিধা করবোনা। কিন্তু কোনো বস্তুগত বা দুনিয়াবী, সামাজিক ও মানবিক যৌথ ও সম্মিলিত কর্মকান্ড আমাদেরকে তাদের সাথে এমনভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলতে পারবেনা যে, আমরাও তারা এক জাতিতে পরিণত হবো এবং ইসলামী জাতীয়তা পরিত্যাগ করে কোনো সম্মিলিত ভারতীয়, চৈনিক বা মিশরীয় জাতীয়তা গ্রহণ করবো। কেননা আমাদের সম্পর্কের দ্বিতীয় দিকটি এধরনের একত্রীকরণের বাধা দেয়। বস্তুতঃ কাফের ও মুসলমানদের মিলিত হয়ে এক জাতিতে পরিণত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

নেই। আমরা তোমাদেরকে বর্জন করেছি এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতার সৃষ্টি হয়ে গেছে- যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনো।" [সূরা আল মুমতাহিনা ঃ ৪]

সে আরো বলে।-

"তোমাদের বাপ ও ভাইয়েরা যদি ঈমানের চেয়ে কুফরীকে বেশী ভালোবাসে তবে তাদেরকেও প্রিয়জন হিসেবে গ্রহণ করোনা। যারা তাদেরকে প্রিয়জন হিসেবে গ্রহণ করবে, তারা যালেম হিসেবে গণ্য হবে।" [সূরা আততাওবা ঃ ২৩]

ইসলাম আরো বলেছে ঃ

"তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততীর মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু আছে [ইসলামের দৃষ্টিতে] কাজেই তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকো।" [সূরা আত্তাগাবুন ঃ ১৪]

সে বলে, যদি তোমাদের ধর্ম ও মাতৃভূমির মধ্যে বিরোধ বেঁধে যায়, তবে ধর্মের খাতিরে মাতৃভূমি ত্যাগ করে চলে যাও। যে ব্যক্তি দেশপ্রেমকে ধর্মপ্রেমের খাতিরে বিসর্জন দিয়ে হিজরত করেনা, সে মোনাফেক। তার সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

"যতক্ষণ তারা হিজরত না করে ততক্ষণ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা।" [সূরা আননিসা ঃ ৮৯]

এভাবে ইসলাম ও কুফরীর বিভেদের কারণে ঘনিষ্ঠতম রক্ত সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়। শুধুমাত্র ইসলামের বিরোধী হওয়ার কারণে মাতা পিতা ভাইবোন ছেলে মেয়ে সবাই পর হয়ে যায়। আল্লাহ্র দুশমন হওয়ার কারণে একই বংশোদ্ভূত গোত্রকেও পরিত্যাগ করা হয়। ইসলাম ও কুফরীর সংঘাত চালু থাকার কারণে নিজের জন্মভূমিকেও পরিত্যাগ করা হয়। মোটকথা, দুনিয়ার সকল জিনিসের ওপর ইসলামের অগ্রাধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব। ইসলামের জন্য সবকিছুকে ত্যাগ করা যায়। কিন্তু ইসলামকে কোনো কিছুর জন্যে বিসর্জন দেয়া যায়না। অপর দিকটিও লক্ষ করুন। যাদের ভেতরে রক্তের সম্পর্কও নেই, যাদের জন্মভূমিও এক নয়, ভাষাও এক নয় এবং যাদের সাথে বর্ণেরও মিল নেই, তাদেরকেও ইসলাম ভাই ভাই বানিয়ে দেয়। সকল মুসলমানকে সম্বোধন করে কুরআন বলে ঃ

"তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে আকঁড়ে ধরে রাখো। পরস্পরে বিভেদ বিচ্ছেদে ও কোন্দলে লিপ্ত হয়োনা। তোমাদের ওপর আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ করো যে, তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্র ও সম্প্রীতির সৃষ্টি করে দিলেন এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহে [ইসলামের বদৌলতে] পরস্পরের ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা [পারস্পরিক বিদ্বেষের দরুন] আগুন ভর্তি গহবরের কিনারে দাঁড়িয়েছিলে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা থেকে উদ্ধার করেছেন।" [সূরা আল ইমরান ঃ ১০৩]

সকল অমুসলিম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"তারা যদি কুফরী থেকে তওবা করে, নামায পড়ে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দীনি ভাই।"

আর মুসলমানদের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

"মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল। আর যারা তার সাথী তারা কাফিরদের সামনে অবিচল এবং পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্র।" [সূরা আল ফাতাহ ঃ ২৯]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"লোকেরা যতক্ষণ এই মর্মে সাক্ষ্য না দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল, যতক্ষণ তারা আমাদের কিবলার দিকে মুখ না ফেরাবে, আমাদের যবাই করা জন্তু না খাবে এবং আমাদের মতো নামায না পড়বে, ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যখনই তারা এসব কাজ করবে, আমাদের ওপর তাদের রক্ত ও ধনসম্পদ নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, তবে হক ও ইনসাফের খাতিরে যদি তা হালাল করা হয় তাহলে ভিন্ন কথা। এরপর তাদের অধিকার ও কর্তব্য অন্যসকল মুসলমানদের অধিকার ও কর্তব্যের মতোই।" [আবুদাউদ]

শুধু যে অধিকার ও কর্তব্যে সকল মুসলমান সমান তাই নয়, বরং তাতে কোনো পার্থক্য ও ভেদাভেদেরও অবকাশ নেই। বরঞ্চ সেই সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন ঃ

"মুসলমানের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক একটা প্রাচীরের বিভিন্ন অংশের মতো। প্রতিটি অংশ অপর অংশ থেকে শক্তি অর্জন করে।" [মিশকাত]

তিনি আরো বলেছেন ঃ

"পারস্পরিক মমত্ব, সহানুভূতি ও দয়া দাক্ষিণ্যের দিক দিয়ে মুসলমানদের অবস্থা একটি একক দেহের মতো। দেহের একটি অংগ ব্যথা পেলে যেমন সমস্ত শরীরটারই নিদ্রা ও সুখশান্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাদের অবস্থাও ঠিক তেমনি।" [মিশকাত]

মুসলিম জাতির এই দেহকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "জামায়াত" নামে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই জামায়াত সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

"জামায়াতের ওপর আল্লাহ্‌র হাত রয়েছে। যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হবে সে আগুনে যাবে।"

"যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও জামায়াত থেকে দূরে সরে গেলো সে নিজের গলা থেকে ইসলামের রজ্জু যেন খুলে ফেললো।"

শুধু এখানেই শেষ নয়। তিনি এ কথাও বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি তোমাদের জামায়াতকে খন্ড বিখন্ড করতে চেষ্টা করবে তাকে হত্যা করো।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি এই উম্মতের বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করতে উদ্যত হয়, তরবারী দিয়ে তাকে আঘাত করো তা সে যেই হোক না কেন।"

ইসলামী জাতীয়তা কিভাবে তৈরী হলো?

শুধুমাত্র ইসলামের ভিত্তিতে সংগঠিত এই জামায়াত বা দলের ভেতরে রক্ত, মাটি, ভাষা ও বর্ণের কোনো ভেদাভেদ ছিলোনা। এখানে ইরানের সালমান ছিলেন। তাঁকে কেউ পিতৃ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন আমি ইসলামের ছেলে সালমান। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর সম্পর্কে বলতেন, "সালমান আমাদের তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোক।" এখানে বাযান বিন সাসান এবং তাঁর ছেলে শাহর বিন বাযানও ছিলেন, যার অন্যতম পূর্বপুরুষ ছিলেন বাহরাম গোর। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বাযানকে ইয়ামানের এবং তাঁর ছেলেকে সানার শাসক নিয়োগ করেছিলেন। এই জামায়াতে আবিসিনিয়ার অধিবাসী বিলালও ছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর সম্পর্কে বলতেন ঃ "বিলাল আমাদের মনিবের ভৃত্য এবং আমাদের মনিব।" রোমের অধিবাসী সোহায়েবও ছিলেন এই জামায়াতের সদস্য। হযরত ওমর রাদিল্লাহু তায়ালা আনহু তাকে নিজের জায়গায় নামাযের ইমামতিতে দাঁড় করিয়েছিলেন । হযরত আবু হুযায়ফার গোলাম সালেমও এই সংগঠনে ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজের ইন্তিকালের সময় বলেছিলেন যে, সালেম জীবিত থাকলে আমি তৃতীয় খলিফা হিসেবে তাকেই মনোনীত করতাম। এই জামায়াতে যায়েদ বিন হারেসা নামক এক গোলামও ছিলেন, যাঁর সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ফুফাতো বোন যয়নব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত যায়েদের ছেলে উসামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ছিলেন এই জামায়াতের আর এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উসামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে যে সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন, তাতে সৈনিক হিসেবে শরীক হয়েছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহের মতো মর্যাদাবান সাহাবীগণ। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একবার নিজের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বলেছিলেন, "উসামার পিতা তোমার পিতার চেয়ে উত্তম এবং উসামা স্বয়ং তোমার চেয়ে উত্তম।"

মুহাজেরদের আদর্শ চরিত্র

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত এই মহান সংগঠন বংশ, জন্মভূমি, ভাষা ও বর্ণ ইত্যাদি নামে যেসব মূর্তির পূজা আদিম জাহেলিয়াত থেকে শুরু হয়ে আধুনিক জাহেলিয়াতের যুগেও অব্যাহত রয়েছে, সেগুলিকে ইসলামের কুড়াল দিয়ে ভেংগে গুড়িয়ে দেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজের জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে নিজের সংগী সাথীদের নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন। এর দ্বারা একথা বুঝায়না যে, নিজ মাতৃভূমির প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক ভালোবাসা থাকে, তা তাঁর ও মুহাজেরদের ছিলোনা। মক্কা থেকে বিদায় হওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন! "হে মক্কা, পৃথিবীতে তুমি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান। কিন্তু উপায় কি, তোমার অধিবাসীরা

আমাকে এখানে থাকতে দিলোনা।" হযরত বিলাল যখন মদীনায় গিয়ে অসুস্থ হলেন, তখন মক্কার প্রতিটি জিনিসের কথা স্বরণ করেন। তাঁর আবৃত্তি করা কবিতার নিম্ন লিখিত লাইন কয়টি আজও প্রসিদ্ধ ঃ

> "হায়, যদি জানতে পারতাম, আর কোনোদিন ফাখ্ নামক জায়গায় রাত কাটাতে পারবো কিনা, যেখানে আমার পার্শে সুগন্ধীযুক্ত আযখার ঘাষ এবং বাবুনার চারাগাছগুলো শোভা পাবে। আর আমি কোনোদিন মাজাতার [জায়গার নাম] ঘাটেও উপস্থিত হতে পারবো কিনা, যেখান থেকে শামা নামক পাহাড় ও তোফায়েল নামক জায়গা দেখা যাবে।"

কিন্তু তথাপি তাঁদের দেশপ্রেম তাদেরকে ইসলামের খাতিরে দেশত্যাগে বিরত রাখতে পারেনি।১

আনসারদের দৃষ্টান্ত

অপরদিকে মদীনার অধিবাসীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং মুহাজেরদেরকে সাদরে গ্রহণ করলো। তাঁরা তাঁদের জানমাল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পেশ করে দিলো। এ কারণেই হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, "মদীনা কুরআন দ্বারা বিজিত হয়েছে।" রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজেরগণকে পরস্পরের ভাই বলে ঘোষণা করলে তাঁরা এমন ভাই ভাই হলেন যে, দীর্ঘদিন যাবত তারা একে অপরের উত্তরাধিকার পেতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করলেন ঃ

> "রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা উত্তরাধিকার লাভের ব্যাপারে পরস্পরের অধিকতর হকদার।"

এই আয়াত নাযিল করে এই উত্তরাধিকার বন্ধ করে দেন। আনসারগণ নিজেদের ক্ষেত ও বাগান পর্যন্ত অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে আপন আপন মুহাজের ভাইদেরকে প্রদান করেন। এমনকি যখন ইহুদী গোত্র দ্বারা বনুনাযীরের ভূসম্পত্তিসমূহ হস্তগত হলো, তখন তাঁরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, "এসব জমিও আমাদের মুহাজের ভাইদেরকে দিয়ে দিন।" এই ত্যাগ ও কুরবানীর প্রশংসা করেই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

> "তারা স্বয়ং অভাবী হওয়া সত্তেও অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হযরত সা'দ বিন রবীয়া আনসারীর মধ্যে যখন দীনী ভ্রাতৃত্বের চুক্তি সম্পাদন করা হলো, তখন হযরত সা'দ তার দীনী ভাইয়ের জন্য সম্পত্তির অর্ধেক দিলেন এবং নিজের স্ত্রীদের মধ্য থেকে একজনকে তালাক দিয়ে তার সাথে বিয়ে দিতেও প্রস্তুত হয়ে গেলেন। রিসালাত যুগের পর যখন মুহাজিরগণ একের পর এক খিলাফতের পদ অলংকৃত করতে লাগলেন, তখন

---

১. "দেশপ্রেম ঈমানের অংগ" এইমর্মে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বানোয়াট হাদীস বর্ণিত আছে। আসলে এধরনের কোনো বিশুদ্ধ হাদীস রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নেই।

কোনো মদীনাবাসী একথা বলেনি যে, তোমরা বহিরাগতরা কোন্ অধিকারে আমাদের দেশ শাসন করছো? এমনকি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং দ্বিতীয় খলীফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন মদীনার আশপাশে মুহাজেরদেরকে ভূসম্পত্তি বরাদ্দ করেন। তখনও কোনো আনসারী টু শব্দটিও করেনি।

ইসলামী সম্পর্কের জন্য পার্থিব সম্পর্কের কুরবানী

বদর যুদ্ধে ও ওহদ যুদ্ধে মক্কা থেকে আগত মুহাজিরগণ ইসলামের জন্য আপন আত্মীয় স্বজনের সাথে যুদ্ধ করেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু নিজের ছেলে আব্দুর রহমানের ওপর তরবারী উত্তোলন করেন। হুযায়ফা নিজের পিতা আবু হুযায়ফাকে আক্রমণ করেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজের মামাকে হত্যা করেন। স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস, চাচাতো ভাই আকীল ও জামাতা আবুল আ'স বদরে যুদ্ধবন্দী হন এবং তাদেরকে সাধারণ কয়েদীদের মতো রাখা হয়। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুতো সকল বন্দীকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রত্যেক মুসলমান নিজ নিজ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে নিজ হাতে হত্যা করুক-এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

মক্কা বিজয়ের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিন্ন গোত্র ও ভিন্ন এলাকার লোকদেরকে নিয়ে নিজ মাতৃভূমির ওপর হামলা চালান এবং বহিরাগতদের হাতে কতিপয় মক্কাবাসীকে হত্যা করান। কোনো ব্যক্তি নিজ গোত্র ও নিজ মাতৃভূমির ওপর অপর গোত্রের লোকজন দিয়ে আক্রমণ করাবে, আর তাও কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা প্রাপ্য ভূমি বা সহায় সম্পদ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নয় বরং নিছক একটি সত্যের কলেমা ও আদর্শের খাতিরে। এটা তৎকালীন আরব জনগণের কাছে একেবারেই অভাবনীয় ব্যাপার ছিলো। যখন কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের গুন্ডাপান্ডারা মারা যেতে লাগলো, তখন আবু সুফিয়ান মিনতি জানালো যে, "হে রসূল! কুরাইশ বংশের তরুণ প্রজন্ম নিহত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আজকের পর আর কুরাইশ বংশের নাম নিশানা থাকবেনা।" এ কথা শুনে দয়ালু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাত মক্কাবাসীকে নিরাপত্তা দান করলেন। আনসারগণ ভাবলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের গোত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়ছেন। তাদের কেউ কেউ বললো! "রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মানুষই। নিজের গোষ্ঠী গোত্রের প্রতি মায়ামমতা তো দেখাবেনই।" এসব কথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে গেলো। তিনি আনসারদেরকে সমবেত করে বললেন! "নিজ গোত্রের ভালাবাসা আমাকে কখনো আকৃষ্ট করেনি। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল। আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হিজরত করে তোমাদের কাছে চলে এসেছি। এখন আমার বাঁচা মরা সবই তোমাদের সাথে হবে।" রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বলা এই কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্য করে দেখালেন। যে কারণে তিনি হিজরত করেছিলেন, মক্কা বিজয়ের পর সে কারণ আর অবশিষ্ট ছিলোনা। কিন্তু তবুও তিনি মক্কায় থেকে যাননি, এ দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রতিশোধমূলক মনোভাব বা মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারের আবেগ নিয়ে মক্কার ওপর আক্রমণ

চালাননি, বরং তাঁর উদ্দেশ্যে ছিলো শুধুমাত্র আল্লাহ্র কলেমাকে তথা তাঁর দীনকে বিজয়ী করা।

এরপর যখন হাওয়াযেন ও সাকীফ গোত্রদ্বয়ের জমি ও সহায়সম্পদ মুসলমানদের দখলে এলো, তখন পুনরায় সেই একই ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমত হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদের বেশীর ভাগ কুরাইশ বংশের নওমুসলিমদেরকে দিলেন। আনসারদের কতক তরুণ মনে করলেন, এসব কিছু নিজ গোত্রের লোকদেরকে খুশী করার জন্য করা হচ্ছে। তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে বললেন! "আল্লাহ্ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাফ করুন। তিনি কুরাইশদেরকে দান করেন আর আমাদেরকে বঞ্চিত করেন। অথচ এখনো আমাদের তরবারী থেকে তাদের রক্ত ঝরছে।" একথা জানতে পেরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার তাদেরকে ডেকে একত্রিত করলেন এবং বললেন ঃ

"আমি তাদেরকে এজন্য বেশী দিচ্ছি যে, তারা নতুন নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে। শুধু তাদের মনকে প্রীত করাই আমার উদ্দেশ্য। তোমরা কি এতে খুশী নও যে, এরা দুনিয়ার সম্পদ নিয়ে যাক, আর তোমরা আল্লাহ্র রসূলকে নিয়ে যাও?"

বনুল মোস্তালিক যুদ্ধে গিফারী গোত্রের জনৈক মুসলিম এবং আওফী গোত্রের অপর এক মুসলিম যুবকের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ে গেলো। উত্তেজনার এক পর্যায়ে গিফারী আওফীকে থাপ্পড় মেরে বসলো। এতে আওফী আনসারদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকলো, আর গিফারী ডাকলো মোহাজেরদেরকে। দু'পক্ষের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের আশংকা দেখা দিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে উভয়পক্ষকে ডেকে বললেন, "তোমরা এ কি ধরনের জাহেলী ধাঁচের ডাকাডাকিতে লিপ্ত হ'য়ে গেলে?" সাহাবীরা বললেন, "জনৈক মোহাজের জনৈক আনসারীকে প্রহার করেছে।" রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাই বলে জাহেলিয়াতের রীতি অনুসারে গোষ্ঠী গোত্রের নাম ধরে ডাকাডাকি করোনা। এটা বড়ই ঘৃণ্য রীতি।"

এই যুদ্ধে মদীনার নামকরা জাতীয়তাবাদী নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও অংশ গ্রহণ করেছিলো। সে যখন শুনলো, মুহাজের পক্ষের লোক আনসার পক্ষের লোককে মেরেছে, তখন সে আনসার পক্ষকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য বললো! "এই মোহাজেররা আমাদের দেশে এসে আংগুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। এখন আমাদের সামনেই মাথা তুলছে। ওরা প্রবাদবাক্যের সেই কুকুরের মতো, যাকে খাইয়ে দাইয়ে মোটাতাজা বানানো হয়েছিলো যাতে সে তার মনিবকেই ছিড়েভুড়ে খেতে পারে। খোদার কছম, মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর আমাদের মধ্যে যারা প্রভাবশালী, তারা দুর্বলদেরকে ওখান থেকে বের করে দেবে।" তারপর সে আনসারদেরকে বললো ঃ "তোমাদের কি এমন ঠেকা পড়েছিলো যে ওদেরকে নিজেদের দেশে আশ্রয় দিলে এবং নিজেদের ধনসম্পদ তাদেরকে বন্টন করে দিলে? আল্লাহ্র কছম, তোমরা যদি আজ ওদের সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ করে দাও, তবে ওরা শুধু বাতাস খেয়ে বেড়াবে।" এসব কথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে গেলে তিনি তার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহকে জানালেন, তোমার বাবা এসব কথা বলে বেড়াচ্ছে। হযরত আব্দুল্লাহ তাঁর পিতাকে

এতোই ভালোবাসতেন, তিনি গর্ব করে বলতেন, খাজরাজ গোত্রে কোনো ছেলে তার বাবাকে তাঁর মতো ভালোবাসেনা। কিন্তু এই ঘটনা শুনে তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আদেশ দেনতো এক্ষুনি ওর মাথা কেটে আনি।" রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না। তথাপি যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে এসে হযরত আব্দুল্লাহ নিজের পিতার সামনে খোলা তলোয়ার নিয়ে দাড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, "রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমাকে মদীনায় ঢুকতে দেবোনা। তুমি বলেছো, প্রভাবশালীরা দুর্বলদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেবে। এখন তুমি জানতে পারবে, যাবতীয় প্রতাপ ও মানসম্মান শুধু আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের।" এই পরিস্থিতিতে ইবনে উবাই এই বলে চেচাঁমেচি শুরু করে দিলো যে, "ওহে খাজরাজ গোত্র! দেখো, আমার ছেলে আমাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিচ্ছেনা।" সাধারণ মুসলমানরা এসে হযরত আব্দুল্লাহকে অনেক বুঝালেন। কিন্তু তিনি বললেন ঃ "রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ছাড়া সে মদীনার ছায়ার নিচেও আশ্রয় নিতে পারবেনা।" অবশেষে লোকেরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির হয়ে ঘটনার কথা জানালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তোমরা আব্দুল্লাহকে বলো সে যেনো তার বাবাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেয়।" আব্দুল্লাহ এ আদেশ শুনে তরবারী রেখে দিয়ে বললেন,! "রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আদেশ দিয়েছেন তখন সে যেতে পারে।"[১]

বনু কাইনুকা নামক ইহুদী গোত্রের ওপর যখন হামলা করা হলো, তখন হযরত উবাদা ইবনুস্‌ সামিতকে তাদের ব্যাপারে শালিশ মানা হলো। তিনি সমগ্র ইহুদী গোত্রটিকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিলেন। বনু কাইনুকা গোত্র হযরত উবাদার গোত্র খাজরাজের মিত্র ছিলো। কিন্তু তিনি এই সম্পর্কের কোনো তোয়াক্কা করলেননা। অনুরূপভাবে বনু কুরাইযার ব্যাপারে হযরত সা'দ বিন মায়া'যকে শালিশ মানা হয়। আওস গোত্রের সরদার সা'দ বিন মায়া'য আদেশ দিলেন, বনু কুরায়যার সকল পুরুষকে হত্যা, সকল নারী ও শিশুকে যুদ্ধবন্দী এবং তাদের সমস্ত ধনসম্পদ গনীমত হিসেবে বাজেয়াপ্ত করা হোক। এক্ষেত্রে বনু কুরায়যা ও আওস গোত্রের মধ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী মৈত্রীর সম্পর্ক ছিলো, তার প্রতি তিনি কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করলেননা। অথচ তৎকালীন আরব সমাজে মৈত্রীর গুরুত্ব কিরূপ ছিলো তা সবার জানা। তাছাড়া ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যা মদীনায় শত শত বছর যাবত আনসারদের প্রতিবেশীও ছিলো।

ইসলামী জাতীয়তার আসল প্রাণশক্তি

উল্লিখিত উদাহরণসমূহ থেকে একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে জানা যাচ্ছে যে, ইসলামী জাতীয়তা বিনির্মাণে বংশ, বর্ণ, ভাষা ও বাসভূমির আদৌ কোনো অবদান নেই। যে নির্মাতা এই প্রাসাদের নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেছেন, তার চিন্তা ও পরিকল্পনা সারা দুনিয়ার চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন ও অভিনব। তিনি সমগ্র মনুষ্যজগতের কাঁচা মালের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং যেখানে যেখানে উত্তম ও মজবুত মালমশলা পেয়েছেন সেখান

---

১. এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাফসীরে ইবনে জারীরে [২৮শ খন্ড, ৬৬-৭০পৃঃ] দেখুন।

থেকে তা বাছাই করে নিয়েছেন। এসব বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে যে জিনিস দ্বারা পরস্পরের সাথে গেঁথে পাকাপোক্ত করেছেন তা হচ্ছে আমলে সালেহ তথা সৎকর্ম ও নির্মল চরিত্ররূপী মজবুত চুন। এভাবে তিনি এমন এক বিশ্বজোড়া জাতীয়তার প্রাসাদ তৈরী করলেন, যা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত। এই সুবিশাল প্রাসাদকে স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখতে হলে বর্ণ, বংশ, উৎপত্তির উৎস ও বাসস্থান নির্বিশেষে এর সকল অংশকে নিজ নিজ পৃথক উৎপত্তির উৎসগুলোকে ভুলে গিয়ে একটি মাত্র উৎসকে মনে রাখতে হবে। নিজেদের পৃথক পৃথক বর্ণকে ভুলে গিয়ে একটি মাত্র রং-এ রঞ্জিত হতে হবে এবং নিজেদের আলাদা আলাদা আবাসভূমিকে ভুলে গিয়ে একটি মাত্র সত্যের আবাসে প্রবেশ করতে হবে। এই আদর্শিক ঐক্যই এই শীষা ঢালা গাঁথুনির প্রাণ। এই ঐক্য যদি ভেংগে যায়, ইসালামী আদর্শিক জাতির অংশগুলোর মধ্যে যদি নিজেদের উৎপত্তি স্থলগুলোর বিভিন্নতা, প্রজাতিক ও বংশীয় ধারার বিভিন্নতা, নিজ নিজ আবাস ও জন্মস্থানের বিভিন্নতা, নিজেদের দেহের বর্ণ ও আকৃতির বিভিন্নতা এবং নিজেদের পার্থিব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি জাগে, তাহলে এই প্রাসাদের দেয়ালে ফাটল ধরবে, এর ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যাবে এবং এর সকল অংশ ছিন্ন ভিন্ন ও খান খান হয়ে ধ্বসে পড়বে। একটি সাম্রাজ্যে যেমন একাধিক সাম্রাজ্য বা একটি রাষ্ট্রে একাধিক রাষ্ট্র হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি একটি জাতীয়তার মধ্যে কয়েকটি জাতীয়তার সৃষ্টি সম্ভব নয়। ইসলামী জাতীয়তার অভ্যন্তরে বর্ণ, বংশ, ভাষা ও অঞ্চলভিত্তিক আলাদা আলাদা জাতীয়তার সমাবেশ একেবারেই অসম্ভব। এই দুই ধরনের জাতীয়তার যে কোনো একটিই টিকে থাকতে সক্ষম। আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

"বর্ণ, বংশ, ভাষা ও বাসভূমি ইত্যাদি ভিত্তিক জাতীয়তার পোশাক ইসলামী জাতীয়তার জন্য কাফন স্বরূপ।" সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলমান আছে এবং মুসলমান থাকতে চায়, তাকে ইসলামী জাতীয়তা ছাড়া অন্যসব জাতীয়তার চেতনা প্রত্যাখ্যান এবং মাটি ও রক্তের সম্পর্কগুলোকে ছিন্ন করতেই হবে। এসব সম্পর্ককে যে বহাল রাখতে চায়, তার সম্পর্কে আমরা এটাই বুঝবো যে, তার হৃদয়ে ও অন্তরাত্মায় ইসলাম প্রবেশ করেনি। তার মনমগজে এখনো জাহেলিয়ত আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। আজ হোক কাল হোক, ইসলামকে সে বর্জন করবে এবং ইসলামও তাকে বর্জন করবে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তিম উপদেশ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন জীবনের শেষভাগে যে জিনিসটি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী আশংকায় ভুগতেন, তা ছিলো, মুসলমানদের ভেতরে জাহেলিয়াতসুলভ গোষ্ঠীপ্রীতি তথা ভাষা, বর্ণ, বংশ ও ভূমিভিত্তিক বিভেদ বৈষম্য ও আভিজাত্যবোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে কিনা এবং তার কারণে ইসলামী জাতীয়তার বিশ্বজোড়া প্রাসাদ ভেংগে খান খান হয়ে যায় কিনা? এ আশংকাবোধ করেই তিনি বারবার বলতেন ঃ

> "আমার পরে তোমরা আবার যেনো কুফরীতে লিপ্ত হ'য়ে পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি শুরু না করে দাও।" [বুখারী]

জীবনের শেষ হজ্জ্ব বিদায়ী হজ্জ্বে গিয়ে স্বীয় আরাফাতের ভাষণে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে তিনি বলেন ঃ

"শুনে নাও, জাহেলিয়াতের সকল জিনিস আজ আমার দুই পায়ের তলায় দলিত। অনারবের ওপর আরবের এবং আরবের ওপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তোমরা সবাই আদম সন্তান এবং আদম ছিলেন মাটির তৈরী। মুসলমান মুসলমানের ভাই এবং সকল মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই। জাহেলিয়াতের সকল দাবী রহিত করা হলো। এখন তোমাদের জান মাল ও সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের জন্য ঠিক তেমনি হারাম, যেমন আজকের দিন এই মাস এবং তোমাদের এই শহর হারাম।"

এর পর তিনি মীনাতে গিয়ে আরো জোর দিয়ে এই ভাষণের পুনরাবৃত্তি করেন এবং এই কথাটা সংযোজন করেন!

"দেখো, আমার পরে তোমরা গোমরাহীতে প্রত্যাবর্তন করে পরস্পরকে হত্যা করতে লেগে যেওনা। অচিরেই তোমরা আপন প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে এবং তোমাদের কাছে তোমাদের কাজের হিসাব চাওয়া হবে। শোনো কোনো নাককাটা হাবশীকেও যদি তোমাদের আমীর বানিয়ে দেয়া হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করে, তবে তার কথা শুনো এবং আনুগত্য করো।"

একথা বলার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহ্র বিধান পৌঁছে দিয়েছি?" সমবেত জনতা বললো ঃ হাঁ, হে রসূলুল্লাহ! তখন তিনি বললেন! "হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাকো।" জনতাকে বললেন, "যারা উপস্থিত হয়েছে, তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার এ বাণী পৌঁছে দিও।" [বুখারী, মুসলিম, সীরাতে ইবনে হিশাম]

হজ্জ্ব থেকে ফিরে ওহুদের শহীদদের গোরস্তানে গেলেন এবং সমবেত মুসলমানদেরকে বললেন ঃ

আমি এ আশংকা করিনা যে, আমার পরে তোমরা পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হবে, কেবল এই ভয় পাই যে, তোমরা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যাও কিনা এবং পরস্পরে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হও কিনা। এরূপ করলে তোমরা ধবংস হ'য়ে যাবে যেমন পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধবংস হয়ে গেছে।

ইসলামের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ

যে মারাত্মক বিপদটি সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশংকা বোধ করেছিলেন, তা বাস্তবিক পক্ষেই দেখা দিয়েছিলো এবং তা যেমন ধবংসাত্মক হবে বলে তিনি পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন, তেমনি ধবংসাত্মকও প্রমাণিত হয়েছিলো। প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর যে বিপর্যয়ই এসেছে, এর কারণেই এসেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের মাত্র কয়েক বছর পরই হাশেমী ও উমাভী গোষ্ঠীবাদের ভয়াবহ সংঘাতময় পুনরুত্থান ঘটলো এবং তা ইসলামের আসল রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অবকাঠামোকে চিরদিনের জন্য বিধবস্ত করে

দিলো। তারপর পুনরায় আরবীয়, অনারবীয় এবং তুর্কী আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আকারে আবির্ভূত হলো এবং তা ইসলামের রাজনৈতিক ঐক্যকে ধবংস করে দিলো। এরপর বিভিন্ন দেশে যেসব মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলোর ধবংসের মূলেও এই একই বিভ্রান্তিকর মতবাদ সক্রিয় ছিলো। সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে বড় দুটো মুসলিম সাম্রাজ্য ছিলো ভারতে ও তুরস্কে। এই দুটো সাম্রাজ্যকে ধবংস করেছিলো ভৌগলিক, বংশীয়, বর্ণগত ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। ভারতে মোগল ও ভারতীয়দের পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং তুরস্কে তুর্কী, আরব ও কুর্দী কোন্দল সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়।

ইসলামের সমগ্র ইতিহাস পড়ে দেখুন। যেখানেই কোনো শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্য আপনি দেখবেন, তার ভিত্তি বর্ণ বংশ নির্বিশেষে বিভিন্ন জাতির রক্তের ওপর গড়ে উঠেছে। সেসব সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা, সেনাপতি, লেখক, সৈনিক, সবই ছিলো বিবিধ অঞ্চল ও বিবিধ ভাষা, বংশ ও বর্ণের মানুষ। আপনি দেখতে পাবেন ইরাকের মানুষ আফ্রিকায়, সিরিয়ার মানুষ ইরানে এবং আফগানিস্তানের মানুষ ভারতে অবিকল সেই ধরনের সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা নিয়ে মুসলিম সরকার সমূহের প্রাণপন সেবায় নিয়োজিত, যা নিয়ে তারা নিজ দেশের সরকারের সেবা করতো। মুসলিম সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রসমূহ কখনো নিজের জনশক্তি সংগ্রহে কোনো একটি দেশ বা একটি প্রজাতির ওপর নির্ভরশীল থাকতোনা। সকল জায়গা থেকে দক্ষ হাত ও প্রতিভাধর মস্তিষ্ক মুসলিম শাসকদের কাছে সমবেত হতো। তারা প্রত্যেক মুসলিম দেশকে নিজেদের দেশ মনে করতো। কিন্তু যখন স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বজাতিপ্রীতি ও গোষ্ঠীবিদ্বেষের ন্যায় বিপজ্জনক প্রবণতা ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের উদার ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবর্তে বর্ণ বংশ ও ভূমিকেন্দ্রিক বৈষম্য ও সংকীর্ণতার উদ্ভব ঘটলো তখন পরস্পরকে ঘৃণা ও হিংসা করা শুরু হলো। দলাদলি, কোন্দল ও ষড়যন্ত্রের প্রসার ঘটলো এবং যে শক্তি ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে ব্যয়িত হতো তা পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যয়িত হতে লাগলো। এক পর্যায়ে মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের বিস্তার ঘটলো এবং মুসলিম শক্তিগুলো পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলো।

পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ

পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে সকল দেশের মুসলমানরা আজ বংশীয়, ভৌগলিক, ভাষাভিত্তিক ও বর্ণভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আওয়ায তুলছে। আরবরা তাদের আরবীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করছে। মিশরীয়দের মনে পড়ছে তাদের ফেরাউনদের কথা। তুর্কীরা তাদের তুর্কী ঐতিহ্য নিয়ে এতো মেতে উঠেছে যে, চেংগীজ ও হালাকু খানের সাথে নিজেদের যোগসূত্র স্থাপন করছে। ইরানীরা ইরানী হওয়ার আবেগে বলে বেড়াচ্ছে যে, আমাদের আসল জাতীয় হিরো তো ছিলো রুস্তম ও ইসফেন্দিয়ার। কিন্তু আরব সাম্রাজ্যবাদ জোর করে হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে আমাদের হিরো বানিয়ে দিয়েছে। ভারতেও এমন মুসলমান জন্ম নিচ্ছে, যারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাথে নিজেদের সংযোগ ঘটাতে তৎপর। এখানে এমন মুসলমানও আছে যারা যমযমের পানির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে

গংগার পানির ভক্ত হতে চায়। এমন লোকও রয়েছে, যারা ভীম ও অর্জুনকে নিজেদের জাতীয় হিরো বানাতে ইচ্ছুক। এখানে এমন মুসলমানও রয়েছে যারা ভুলেও মক্কা মদীনাকে মনে করেনা, কিন্তু তক্ষশীলা, মহেনজোদারো ও হরপ্পার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে রাত দিন ব্যাকুল থাকে। কিন্তু এসব কিছু শুধু এজন্য হচ্ছে যে, এইসব মূর্খ লোকেরা নিজেদের সভ্যতাকেও চেনেনি। পাশ্চাত্য সভ্যতাকেও চেনেনি। উভয় সভ্যতার নিগুঢ় তত্ত্ব ও তথ্য তাদের চোখের আড়ালে রয়েছে। তারা নিছক বাহ্যদর্শী। বহিরাচরণে যে রেখাগুলো তাদের চোখে অধিকতর দর্শনীয় ও চমকপ্রদ মনে হয়, তার ওপরই তারা লুটিয়ে পড়তে থাকে। তারা একেবারেই জানেনা যে, পাশ্চাত্য জাতীয়তার জন্য যা অমৃত, ইসলামী জাতীয়তার জন্য তা বিষতুল্য। পাশ্চত্য জগতে বংশ, বর্ণ, ভাষা ও জন্মভূমিভিত্তিক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত। তাই ভিন্ন গোত্র, ভিন্ন বংশ ও ভিন্ন ভাষার মানুষকে এড়িয়ে চলতে প্রত্যেকেই বাধ্য, চাই সে মানুষটি তার সীমান্ত থেকে মাত্র একমাইল দূরত্বেই অবস্থান করুক না কেনো। সেখানে এক জাতির মানুষ অন্য জাতির নিষ্ঠাবান সদস্য হতে পারেনা। এক দেশের অধিবাসী ভিন্ন দেশের একনিষ্ঠ সেবক হতে পারেনা। কোনো জাতি কোনো ভিন্ন জাতির লোকের ওপর আস্থা রাখতে পারেনা যে, সে নিজ জাতির স্বার্থের চেয়ে তাদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবে। কিন্তু ইসলামী জাতীয়তার ব্যাপার ঠিক এর বিপরীত। এখানে জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে জন্মভূমি ও বংশের পরিবর্তে বিশ্বাস ও কাজের তথা চরিত্রের ওপর। সারা দুনিয়ার মুসলমানরা পরস্পরের সহযোগী ও সুখ দুঃখের অংশীদার- তার জাতিগত পরিচয় যাই হোক না কেন। একজন ভারতীয় মুসলমান ভারতের যেমন বিশ্বস্ত নাগরিক, তেমনি মিশরেরও বিশ্বস্ত নাগরিক হতে পারে। একজন আফগান খোদ্ আফগাস্তিানের জন্য যেরূপ জীবনপণ যুদ্ধ করতে পারে, সিরিয়ার প্রতিরক্ষার জন্যও তদ্রূপ যুদ্ধ করতে পারে। তাই এক দেশের মুসলমানের সাথে আরেক দেশের মুসলমানের কোনো ভৌগলিক ও প্রজাতিক ভেদ বৈষম্যের কোনো কারণ নেই। এ ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি পাশ্চাত্যের মূলনীতির একেবারেই বিপরীত। ওখানে যা সবলতার উপকরণ, এখানে তা দুর্বলতার উপকরণ। এখানে যা জীবনী শক্তির উজ্জীবক, ওখানে তা প্রাণবিনাশী হলাহল। আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

> "পাশ্চাত্য জাতিগুলোর সাথে নিজের জাতির তুলনা করোনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে গড়া এ জাতির গঠন প্রণালীটাই ভিন্ন রকমের। বংশ ও দেশের ওপর পাশ্চত্যের জাতীয়তা নির্ভরশীল, কিন্তু তোমার জাতীয়তা ধর্মের শক্তিতেই শক্তিমান।"

অনেকে এরূপ ভুল ধারণায় লিপ্ত আছে যে, ভৌগলিক বা বংশীয় জাতীয়তার চেতনা জাগ্রত হওয়ার পরও ইসলামী জাতীয়তার বন্ধন মুসলমানদের মধ্যে অটুট থাকতে পারে। এজন্য এই উভয় প্রকারের জাতীয়তা পাশাপাশি চলবে বলে তারা আত্ম প্রতারণায় লিপ্ত। তাদের ধারণা, দুটো একসাথে চলতে থাকলে একটি অন্যটি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা, অধিকন্ত আমরা উভয়টির সুফল লাভ করবো। কিন্তু এ ধারণা নিছক অজ্ঞতা ও অপ্রতুল চিন্তার ফসল। আল্লাহ্ যেমন এক বুকে দুটো হৃদয় স্থাপন করেননি।

তদ্রূপ তিনি একই হৃদয়ে এক সাথে দুটো জাতীয়তার পরস্পর বিরোধী ও পরস্পর সংঘর্ষমুখর আবেগকে একত্রিত করার অবকাশও রাখেননি। জাতীয়তার অনুভূতির অনিবার্য ফল আপন পরের বিভেদ ও বৈষম্য। ইসলামী জাতীয়তার চেতনার স্বতস্ফূর্ত দাবী এইযে, মুসলমানকে আপন ও অমুসলিমকে পর মনে করা হবে। আর দেশভিত্তিক বা বংশভিত্তিক জাতীয়তার অনুভূতির স্বাভাবিক দাবী হলো, আপনি স্বদেশী ও স্বগোত্রীয়কে আপন এবং বিদেশী ও ভিন্ন গোত্রের বা বংশের লোককে পর মনে করবেন। এমতাবস্থায় এই দুটো অনুভূতি বা চেতনা কিভাবে একই জায়গায় এক সাথে সমবেত হতে পারে, তা কোনো বুদ্ধিমান ব্যাখ্যা করুক তো দেখি। এটা কিভাবে সম্ভব যে আপনি আপনার অমুসলিম স্বদেশীকে আপনও ভাববেন, পরও ভাববেন আর বিদেশী মুসলমানকে এড়িয়েও চলবেন আবার তার ঘনিষ্ঠও হবেন? এই দুটো কি আদৌ একত্রিত হতে পারে? এরূপ বিপরীতমুখী চিন্তার অধিকারীদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, আপনাদের মধ্যে একজনও কি সুস্থমনা লোক নেই?

সুতরাং একথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, মুসলমানদের মধ্যে ভারতীয়, তুর্কী, আফগান, আরব, ইরানী ইত্যাদি হওয়ার অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার অর্থই হবে অনিবার্যভাবে ইসলামী জাতীয়তার অনুভূতি ধ্বংস হওয়া এবং ইসলামী ঐক্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া। এটা শুধু যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নয় বরং বহুবার এর বাস্তব দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে যখনই ভূমি বা দেশভিত্তিক কিংবা বংশভিত্তিক বৈষম্য ও বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তখনই মুসলমানের হাতে মুসলমানের গলাকাটা অবধারিত হয়ে উঠেছে এবং "আমার পরে তোমরা কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন করে একে অপরের হত্যাকান্ডে লিপ্ত হয়োনা" রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই শংকা সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। কাজেই জন্মভূমি বা দেশমাতৃকা কেন্দ্রিক জাতীয়তার প্রবক্তারা যদি এ জিনিসটির প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতেই চান, তাহলে তাদের জন্য এটাই উত্তম হবে যে, তারা যেনো নিজেদেরকে ও বিশ্ববাসীকে ধোকা না দেন। বরং যাই করেন একথা জেনে শুনেই যেনো করেন যে, জন্মভূমি কেন্দ্রিক জাতীয়তার দাওয়াত আর যাই হোক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত নয়, বরং তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

২. ইসলামী জাতীয়তার প্রকৃত তাৎপর্য

সাম্প্রতিককালে মুসলমানদের সমাজের জন্য 'কওম' বা জাতি শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমাদের সামষ্টিক অবস্থাকে প্রকাশ করার জন্য সাধারণভাবে এই পরিভাষাটি কার্যত চালু হয়ে গেছে। কিন্তু এটা একটা বাস্তবতা যে, কুরআন ও হাদীসে মুসলমানদের জন্য 'কওম' শব্দটিকে [অথবা জাতি বা নেশন বুঝাবার মতো আর কোনো শব্দকে] পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি। তবে এ কথাও সত্য যে, কোনো মহল এ পরিস্থিতি থেকে নিজেদের অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করেছে। যাই হোক, এই পরিভাষাটিতে এমন কি অসুবিধা রয়েছে, যার জন্য ইসলামে এটিকে গ্রহণ করা হয়নি এবং কুরআন ও হাদীসে এর বিকল্প কোন্ কোন্ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করবো। এটা নিছক কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, বরং এর দ্বারা আমাদের জীবনটাকে যে মৌলিকভাবে ভ্রান্ত পথে চালিত করেছি, এমন কিছু ধ্যানধারণা স্পষ্ট হবে।

"কওম" শব্দটি এবং তার সমার্থক ইংরেজী শব্দ "নেশন" [Nation] বা জাতি মূলতঃ জাহেলিয়াতের ধ্যানধারণা থেকে উৎপন্ন অনৈসলামি পরিভাষা। জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার ধারক বাহক ও প্রতিষ্ঠাতাগণ "কওমিয়াত" বা [Nationality] বা জাতীয়তাকে কখনো খাঁটি সাংস্কৃতিক ভিত্তির [Cultural Basis] ওপর দাঁড় করায়নি। প্রাচীন জাহেলিয়াতের যুগেও নয়, আধুনিক জাহেলিয়াতের যুগেও নয়। তাদের মনমগজে বংশীয় ও ঐতিহ্যগত বন্ধনপ্রীতি এমনভাবে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিলো যে, তারা জাতীয়তার ধারণাকে কখনো প্রজাতিক যোগসূত্র ও প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে মুক্ত করতে পারেনি। প্রাচীন আরবে যেমন 'কওম' শব্দটি দ্বারা সাধারণত একটি বংশধর বা একটি গোত্রকে বুঝানো হতো, তেমনি আজও "নেশন" Nation শব্দটি দ্বারা যে মনোভাব প্রকাশ করা হয় তাতে একক প্রজন্ম বা Common Descent এর ধারণা অনিবার্যভাবেই অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর এ জিনিসটা যেহেতু মৌলিকভাবে ইসলামী জাতীয়তার ধারণার পরিপন্থী, তাই কুরআনে "কওম" এবং তার সমার্থক অন্যান্য আরবী শব্দকে মুসলমানদের ক্ষেত্রে পরিভাষা হিসেবে প্রয়োগ করা হয়নি। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, যে মানবগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মূলে বর্ণ, বংশ, দেশ এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিসের আদৌ কোনো হাত ছিলোনা, যে দলকে শুধুমাত্র একটি আদর্শ ও জীবনবিধানের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করা হয়েছিলো এবং যার সূচনাই হয়েছিলো

হিজরত, বংশীয় বন্ধন ও অন্যান্য পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে, তার জন্য এমন শব্দ কিভাবেই বা ব্যবহৃত হবে?

কুরআনে যে শব্দ মুসলমানদের সামষ্টিক সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তাহলো "হিযব" বা দল। 'কওম' বা জাতির উৎপত্তি হয় জন্মসূত্রে ও বংশধর থেকে। কিন্তু দল গঠিত হয় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে। এদিক দিয়ে মুসলমানরা আসলে জাতি নয় বরং একটি দল। কেননা তাদেরকে শুধু এ কারণে সারা পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্রভাবে পরস্পরের সাথে সংঘবদ্ধ করা হয়েছে যে, তারা একটা নির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী ও অনুসারী। আর এই নীতি ও আদর্শে যারা বিশ্বাসী ও অনুসারী নয়, তারা তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতম পার্থিব আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হলেও তারা তাদের আপনজন নয় এবং তাদের সাথে তাদের কোনো মিল নেই। কুরআনের দৃষ্টিতে পৃথিবীর গোটা মানব বসতিতে মাত্র দুটো দলই বিরাজ করে! একটি আল্লাহ্র দল হিযবুল্লাহ, অপরটি শয়তানের দল হিযবুশ্ শয়তান। শয়তানের দলে নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে যতোই পারস্পরিক বিরোধ থাকুক না কেন, কুরআন তাদের সকলকে একই দলভুক্ত মনে করে। কেননা তাদের চিন্তা ও কাজের ধরন আর যাই হোক ইসলাম নয় এবং খুঁটিনাটি মতভেদ সত্ত্বেও তারা সকলেই শয়তানের আনুগত্যের ব্যাপারে একমত। কুরআন বলেঃ

> "শয়তান তাদের ওপর বিজয়ী হয়ে গেছে। তাই সে তাদেরকে আল্লাহ্র সম্পর্কে গাফেল ও উদাসীন করে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। জেনে রেখো, শয়তানের দল শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবেই।" [সূরা আল মুজাদালা ঃ ১৯]

পক্ষান্তরে আল্লাহ্র দলের লোকেরা যখন আল্লাহ্র শেখানো চিন্তা ও কর্মের বিধান মেনে নিতে সম্মত ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী রজ্জুতে পরস্পরের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র দলভুক্ত হয়েছে এবং এই নয়া দলে প্রবেশ করা মাত্রই শয়তানের সাথে তাদের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, চাই তারা জন্মগতভাবে যেকোনো বংশোদ্ভূত, যেকোনো দেশের অধিবাসী, যেকোনো ভাষাভাষী এবং যেকোনো ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক হোক না কেন, এসব ব্যাপারে তাদের পরস্পরে যতো বিভেদ পার্থক্য থাকুক না কেন, এমনকি তাদের বাপ দাদাদের মধ্যে চরম শত্রুতা থেকে থাকুক না কেন।

একজনের আল্লাহ্র দলভুক্ত হওয়া আর অপর জনের শয়তানের দলভুক্ত হওয়ায় যে দলগত ও আদর্শগত বিভেদ ঘটে, তা পিতা পুত্রের সম্পর্ক পর্যন্ত ছিন্ন করে দেয়। এমনকি পিতার উত্তরাধিকার থেকেও পুত্র বঞ্চিত হয়। হাদীসে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

> "দুই ধর্মের অনুসারী পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয়না।"

দলের তথা আদর্শের এই বিভিন্নতা স্ত্রীকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এমনকি মতভেদ হওয়া মাত্রই উভয়ের মেলামেশা হারাম হয়ে যায়। এর কারণ শুধু এই যে, উভয়ের জীবন যাপনের পথ আলাদা হয়ে গেছে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

> "স্ত্রীরাও স্বামীদের জন্য হালাল নয়, স্বামীরাও স্ত্রীদের জন্য হালাল নয়।" [সূরা মুমতাহিনা ঃ ১০]

দলের এই বিভিন্নতা একই পরিবারের এবং একই বংশের বা গোত্রের লোকদের মধ্যে পুরোপুরি সামাজিক বয়কটের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেয়। এমনকি আল্লাহ্‌র দলভুক্ত লোকের পক্ষে নিজের গোত্র ও বংশের মধ্যে যারা শয়তানের দলভুক্ত তাদের সাথে বিয়েশাদী করাও হারাম হয়ে যায়। কুরআন বলেছে ঃ

"মুশরিক মহিলারা যতক্ষণ ঈমান না আনে তাদেরকে বিয়ে করোনা। মুমিন দাসী মুশরিক স্বাধীন মহিলার চেয়ে ভালো, চাই সে তোমাদের কাছে যতোই ভালো লাগুক না কেন। আর তোমাদের মেয়েদেরকে মুশরিক পুরুষের সাথে বিয়ে দিওনা যতক্ষণ তারা ঈমান না আনে। মুমিন গোলাম মুশরিক স্বাধীন পুরুষের চেয়ে ভালো, সে তোমাদের কাছে যতোই পছন্দনীয় হোক না কেন।" [সূরা আল বাকারা ঃ ২২১]

দলের এই বিভিন্নতা ভৌগলিক ও বংশীয় সম্পর্ক শুধু ছিন্নই করেনা বরং উভয়ের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী দ্বন্দ ও বিতর্কের সৃষ্টি করে দেয় এবং এই দ্বন্দ আল্লাহ্‌র দল বহির্ভূতরা এই দলের আদর্শ ও নীতি মেনে না নেয়া পর্যন্ত বহাল থাকে। কুরআন বলে ঃ

"ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের [জন্মসুত্রীয়] জাতিকে বলেছিলো, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যেসব উপাস্যকে পূজা করে থাকো তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরদিনের জন্য শত্রুতা বিরাজ করছে যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনবে। তবে ইবরাহীম যে তার কাফের পিতাকে বলেছিলো 'আমি তোমার ক্ষমার জন্য দোয়া করবো', এতে কোনো আদর্শ নেই।" [সূরা মুহতাহিনা ঃ ৪]

"ইবরাহীম যে নিজের পিতার গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করেছিলো তা ছিলো পিতাকে ইতিপূর্বে দেয়া একটি প্রতিশ্রুতি পুরণের জন্য। কিন্তু যখনই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে তার পিতা আল্লাহ্‌র দুশমন, তখন সে ঐ দোয়া থেকে ফিরে এলো।" [সূরা আততাওবা ঃ ১১৪]

দলের এই বিভিন্নতা একই পরিবারের লোকদের মধ্যে এবং ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়দের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে দেয়। এমন কি বাপ, ভাই কিংবা ছেলেও যদি শয়তানের দলভুক্ত হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র দলভুক্তরা তার সাথে প্রীতি ভালোবাসা রাখলে আপন দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে বলে বিবেচনা করা হবে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"তুমি এমন কখনো পাবেনা যে, কোনো দল আল্লাহ্ ও আখেরাতের ওপর ঈমানও পোষণ করে আবার আল্লাহ্ ও তার রসূলের দুশমনদের সাথে বন্ধুত্বও রাখে, চাই তারা তাদের বাপ, ছেলে, ভাই কিংবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনই হোক না কেন। ...এরাই আল্লাহ্‌র দলের লোক এবং জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র দলই শেষ পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করবে।" [সূরা মুজাদালা ঃ ২২]

আল কুরআন মুসলমানদের জন্য অন্য যে শব্দটি ব্যবহার করেছে তা হলো 'উম্মাহ্' এবং এটিও 'দল' বা 'হিযব' এরই সমার্থক। হাদীসেও এ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে। উম্মাহ্ সেই দল বা সংঘকে বলে যা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়েছে। যারা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সমভাবে অংশীদার তাদেরকেও উম্মাহ্ বলা হয়ে থাকে। যেমন কোনো বিশেষ যুগের লোকদের 'উম্মাহ্' বলা হয়। কোনো বিশেষ দেশের অধিবাসী এবং কোনো একটি প্রজন্মকেও উম্মাহ্ বলা হয়ে থাকে। মুসলমানদেরকে যে বিষয়ে সম অংশীদারিত্বের জন্য উম্মাহ্ বলা হয়, তা কোনো প্রজন্ম, মাতৃভূমি বা অর্থনৈতিক লক্ষ্য নয় বরং তাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং তাদের দলের নীতি ও আদর্শ। কুরআন বলছে ঃ

"তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম উম্মাহ্, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য তৈরী করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান রাখবে।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০]

"এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মাহ্ বানিয়েছি, যেনো তোমরা মানবজাতির তত্ত্বাবধায়ক হও এবং রসূল তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক হয়।" [সূরা আলবাকারা ঃ ১৪৩]

উপরোক্ত আয়াতগুলো নিয়ে ভাবুন। "মধ্যপন্থী উম্মাহ্" দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, "মুসলমান" একটা আন্তর্জাতিক দলের [International party] নাম। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্য থেকে সেই লোকগুলোকে বেছে বের করে এই দল গঠন করা হয়েছে, যারা একটা বিশেষ আদর্শ ও নীতিমালা মেনে চলতে, একটা বিশেষ কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে এবং একটা নির্দিষ্ট মিশন বা ব্রত সম্পন্ন করতে প্রস্তুত। যেহেতু এই লোকগুলো সকল জাতির মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছে এবং একটা দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর অন্য কোনো জাতির সাথে তাদের সম্পর্ক নেই, তাই তারা মাঝখানের উম্মাহ্। কিন্তু প্রত্যেক জাতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সকল জাতির সাথে তাদের অন্য একটা সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং সেটি হলো, তাদেরকে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র আইন চালু করতে হবে। "তোমরা মানবজাতির তত্ত্বাবধায়ক" কথাটা দ্বারা বুঝা হচ্ছে যে, মুসলমানরা আল্লাহ্‌র দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র নিযুক্ত রক্ষী বা পাহারাদার। "মানব জাতির কল্যাণের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে" কথাটার স্পষ্ট বক্তব্য হলো, মুসলমানদের মিশন সারা পৃথিবী জোড়া মিশন। এই মিশনের সংক্ষিপ্ত সার হলো, আল্লাহ্‌র দলের নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তায়ালা চিন্তা ও কর্মের যে বিধান দিয়েছিলেন, তাকে সকল মানসিক, নৈতিক ও বস্তুগত শক্তি প্রয়োগ করে দুনিয়াতে বাস্তবায়িত করতে হবে এবং তার মোকাবিলায় অন্যসকল নীতি, আদর্শ ও বিধানকে পর্যুদস্থ ও পরাভূত করতে হবে। এই হলো সেই কাজ যা সম্পাদনের জন্য মুসলমানদের একটি উম্মাহ্ হিসেবে গঠন করা হয়েছে।

তৃতীয় যে পরিভাষাটি মুসলমানদের সামষ্টিক অবস্থা ও পদমর্যাদাকে বুঝানোর জন্য প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছে, তাহলো "জামায়াত"। এটি 'হিয্‌ব' শব্দটির মতো দল বা পার্টির সমার্থক। বহু হাদীস পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছাকৃত ভাবেই 'কওম' বা শা'য়াব [জাতি] বা অনুরূপ অর্থবোধক শব্দগুলো প্রয়োগ করা থেকে বিরত থেকেছেন এবং তার পরিবর্তে 'জামায়াত' শব্দটাই পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি কখনো বলেননি যে, "সর্বদা 'কওমের' সাথে থাকো" বা "আল্লাহ্‌র হাত কওমের ওপর থাকে।" বরং এধরনের প্রতিটি কথায় তিনি 'জামায়াত' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। এর একমাত্র কারণ হলো, মুসলমানদের সংঘবদ্ধতা বা সমাজবদ্ধতার ধরনটি বুঝাতে "কওম" [বা জাতির] তুলনায় 'জামায়াত' 'হিয্‌ব' এবং 'উম্মাহ্‌' [তথা পার্টি বা দলই] অধিকতর উপযোগী। 'কওম' শব্দটা সাধারণভাবে যেসব অর্থে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে, সে অনুসারে কোনো ব্যক্তি যেকোনো আদর্শ, বা নীতির অনুসারী হোক না কেন, সর্বাবস্থায় একটা কওম বা জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যদি সে সেই কওমে বা জাতিতে জন্ম নিয়ে থাকে এবং নিজের নাম, জীবন যাপন প্রণালী ও সামাজিক সম্পর্কের দিক দিয়ে সেই কওম বা জাতির সাথে সংযুক্ত থাকে। কিন্তু জামায়াত, হিয্‌ব বা পার্টি এই শব্দগুলোর অর্থ পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, শুধুমাত্র নীতি বা আদর্শই পার্টিতে বা দলে শামিল থাকা না থাকার আসল মাপকাঠি। আপনি একটা দলের নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর কখনো সেই দলে থাকতে পারেননা। ঐ দলের নামও ব্যবহার করতে পারেননা। তার প্রতিনিধিও হতে পারেননা, তার স্বার্থের তদারককারী হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতে পারেননা। সে দলের লোকদের সাথে আপনার কোনো সহযোগিতার সম্পর্কও থাকতে পারেনা। আপনি যদি বলেন, দলের নীতি ও আদর্শের সাথে আমি তো একমত নই, তবে আমার মাতাপিতা এ দলের সদস্য ছিলেন এবং আমার নামের সাথে এই দলের সদস্যদের নামের মিল আছে। তাই আমার ও দলের সদসদের সমান অধিকার থাকা উচিত। তাহলে আপনার এই যুক্তি এতটা হাস্যকর হবে যে, শ্রোতারা হয়তো আপনার মাথা ঠিক আছে নাকি খারাপ হয়ে গেছে, তা নিয়েই সংশয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু দলের অর্থকে জাতির অর্থ দ্বারা পাল্টে ফেলুন। এরপর এসব কথা আর আবোল তাবোল মনে হবেনা। এসব কথা বলার অবকাশ সৃষ্টি হবে।

ইসলাম তার আন্তর্জাতিক দলের সদস্যদের মধ্যে সংহতি ও একাত্মতা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণে সমতা ও সামঞ্জস্য সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে একক সমাজে পরিণত করার জন্য আদেশ দিয়েছিলো যে, নিজেদের মধ্যেই বিয়েশাদী করো। সেই সাথে তাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষাদীক্ষার এমন ব্যবস্থা নির্দেশ করেছিলো যে, তারা আপনা আপনি দলের নীতি ও আদর্শের অনুসারী হয়ে গড়ে উঠবে। প্রচারের পাশাপাশি বংশধর বৃদ্ধির মাধ্যমেও দলের শক্তি বাড়তে থাকবে। এখান থেকেই এই দলের জাতিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে এক সাথে সমাজবদ্ধ জীবন যাপন, প্রজাতিক সম্পর্ক ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও ঐতিহ্য এই জাতীয়তাকে আরো শক্তিশালী করেছে।

এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে ঠিকই হয়েছে। [একটি আদর্শবাদী দল স্বাভাবিক সামাজিক প্রক্রিয়ায় বিকশিত হয়ে জাতিতেও রূপান্তরিত হয়েছে এতে দোষের কিছু ছিলোনা।] কিন্তু ক্রমে ক্রমে মুসলমানরা এই সত্যটিই ভুলে যেতে থাকলো যে তারা

আসলে একটা আদর্শবাদী দল এবং দল হিসেবেই তাদের জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই ভ্রান্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে এতোদূর গড়ালো যে, দলীয় ভাবধারা জাতীয়তার ভাবধারায় একেবারেই বিলীন হয়ে গেলো। এ পর্যায়ে এসে মুসলমান শুধুই একটা জাতিতে পর্যবসিত হলো, অবিকল তদ্রূপ একটি জাতি, যেমন জার্মানরা, জাপানীরা ও ইংরেজরা এক একটা জাতি। তারা ভুলে গেছে যে, যে নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে ইসলাম তাদেরকে একটা উম্মাহ্ বানিয়েছিলো, সেই নীতি ও আদর্শই আসল জিনিস। যে দায়িত্ব বা মিশন সম্পাদনের জন্য ইসলাম তার অনুসারীদেরকে একটা দল বা পার্টি হিসেবে সংগঠিত করেছিলো, সেই দায়িত্ব ও মিশনই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এই সত্যকে ভুলে গিয়ে তারা অমুসলিম জাতিগুলোর কাছ থেকে জাতীয়তার জাহেলী ধারণা গ্রহণ করেছে। এটি এমন মৌলিক ভ্রান্তি এবং এর কুফল এতো ব্যাপক বিস্তৃত যে, এ ভ্রান্তি দূর না করা পর্যন্ত ইসলামের পুনরুজ্জীবনে এক কদমও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

একটি দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, সাহায্য ও সহযোগিতা যাই হয়, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে হয়না বরং শুধুমাত্র একই নীতি ও আদর্শে বিশ্বাস ও আনুগত্যের কারণে হয়ে থাকে। দলের কোনো সদস্য যদি দলীয় আদর্শ ও মূলনীতি লংঘন করে, তাহলে দলের অন্যদের ওপর তাকে সাহায্য করাতো কর্তব্য থাকেইনা, উপরন্ত দলের এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকসুলভ ও বিদ্রোহাত্মক কর্মকান্ড থেকে তাকে নিষেধ করাই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। নিষেধ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে দলীয় কার্যবিধি অনুসারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এরপরও যদি না মানে তবে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা উচিত। দুনিয়ায় এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে যে, যেব্যক্তি দলীয় নীতি ও আদর্শের মারাত্মক বিরুদ্ধাচরণ করে তাকে হত্যাও করা হয়।[১] কিন্তু মুসলমানদের অবস্থাটা একটু দেখুন যে, নিজেদেরকে আদর্শবাদী দলের পরিবর্তে জাতি অর্থাৎ জন্মসূত্রে সংঘঠিত মানবগোষ্ঠী মনে করে কি সাংঘাতিক বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হ'য়ে গেছে। তাদের কোনো ব্যক্তি যখন নিজের স্বার্থে অনৈসলামিক রীতিনীতি অনুসারে কাজ করে তখন অন্য মুসলমানরা তাকে সাহায্য করবে বলে আশা করে। আর সাহায্য না করলে ক্ষোভ প্রকাশ করে যে, দেখো মুসলমান মুসলমানের কাজে আসেনা। যারা সুপারিশ করে তারা এরূপ ভাষায় করে যে, একজন মুসলমান ভাই এর কল্যাণ হবে, তোমরা তার সাহায্য করো। যারা সাহায্য করে তারা তাদের এই কাজকে ইসলামী সমমর্মিতা নামে অভিহিত করে। প্রত্যেকের মুখে ইসলামী সহমর্মিতা, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, ইসলামের ধর্মীয় সম্পর্ক ইত্যাদি শব্দ মুহুর্মুহু উচ্চারিত হয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে ইসলাম বিরোধী কাজ করার জন্য ইসলামেরই বরাত দেয়া এবং তার নামে সহানুভূতি চাওয়া ও সহানুভূতি করা এক নিদারুণ বেহুদা ব্যাপার। যে ইসলামের নাম নিয়ে এ ধরনের কর্মকান্ড চলে, তা যদি যথার্থই মুসলমানদের মধ্যে জীবিত থাকতো, তাহলে ইসলামী

---

১. একারণেই ইসলামে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়ে থাকে। রুশ সমাজতন্ত্রীরাও সমাজতন্ত্র ত্যাগীদেরকে এই শাস্তিই দিতো। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুনঃ "ইসলামে মুরতাদের শাস্তি" রচনা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী। -সম্পাদক

উম্মাহর কোনো ব্যক্তি ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করছে, একথা জানা মাত্রই তারা তার বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতো এবং তাকে তওবা করিয়ে তবে ছাড়তো। কারো সাহায্য চাওয়া তো দূরের কথা, একটি জীবন্ত ইসলামী সমাজে তো কোনো ব্যক্তি ইসলাম বিরোধী কোনো তৎপরতার নামও মুখে আনতে পারেনা। কিন্তু আমাদের সমাজে রাতদিন এসব হচ্ছে। এর একমাত্র কারণ হলো, আমাদের মধ্যে জাহেলী জাতীয়তার ধারণা জন্মে গেছে। যে জিনিসকে আপনারা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বলছেন, তা আসলে অমুসলিমদের কাছ থেকে ধার করা জাহেলী জাতীয়তার বন্ধন।

এই জাহেলিয়াতের একটা কৃতিত্ব এইযে, তা মুসলিম জনগণের মধ্যে "জাতীয় স্বার্থ" সংক্রান্ত এক আজব ধারণার জন্ম দিয়েছে। এ জিনিসটাকে তারা নিঃসংকোচে "ইসলামী স্বার্থ"ও বলে থাকে। এই তথাকথিত জাতীয় স্বার্থ বা ইসলামী স্বার্থ কি জিনিস? সেটি শুধু এইযে, যারা "মুসলমান" নামে পরিচিত, তাদের কল্যাণ হোক, তাদের হাতে বিপুল ধনসম্পদ আসুক, তাদের মান ইজ্জত ও প্রভাবপ্রতিপত্তি বাড়ুক, তাদের হাতে ক্ষমতা আসুক, এক কথায়, কোনো না কোনোভাবে তাদের জাগতিক সমৃদ্ধি লাভ হোক। এইসব স্বার্থ ও কল্যাণ ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী মূলনীতির আনুগত্যের পথে না বিরোধিতার মধ্য দিয়ে অর্জিত হলো সেটা তাদের কাছে কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। জন্মসুত্রের মুসলমান বা বংশগত মুসলমানদের আমরা সর্বাবস্থায় মুসলমান বলি, চাই তাদের চিন্তাচেতনা ও কাজকর্মে কোথাও ইসলামী গুণাবলী খুজেঁও না পাওয়া যাক। এর অর্থ হলো, আমাদের কাছে মুসলমান আত্মার নাম নয়, শুধু দেহের নাম। ইসলামের গুণ ও ভাবধারা আছে কিনা, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করেও কাউকে মুসলমান বলা যায়। এই ভ্রান্তধারণার বদৌলতে যে দেহগুলোকে আমরা মুসলমান নাম দিয়ে রেখেছি, তাদের সরকারকে ইসলামী সরকার, তাদের উন্নতিকে ইসলামী উন্নতি বা প্রগতি এবং তাদের স্বার্থকে ইসলামী স্বার্থ নামে আখ্যায়িত করে চলেছি, চাই সেই সরকার এবং সেই উন্নতি প্রগতি ও স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে ইসলামের পরিপন্থি হোক না কেন। জার্মান জাতীয়তা যেমন কোনো নীতি বা আদর্শের নাম নয়, নিছক একটি জাতীয়তার নাম এবং একজন জার্মান জাতীয়তাবাদী যেমন জার্মানদের উত্থান ও শ্রেষ্ঠত্ব চায়, চাই তা যে পন্থায়ই হোক না কেন, তেমনিভাবে আমরা "মুসলমানত্ব"কেও নিরেট একটা জাতীয়তা বানিয়ে নিয়েছি এবং আমাদের মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা নিছক আপন জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি চায়, তা সে উন্নতি ও সমৃদ্ধি নীতিগতভাবে বা কার্যত ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা অনুসরণের মাধ্যমেই হোক না কেন। এটা কি জাহেলিয়াত নয়? আসলে মুসলমান যে পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণার্থে একটা বিশেষ মতবাদ ও বাস্তব কর্মসূচী নিয়ে কর্মরত একটি আন্তর্জাতিক দলের নাম, তা কি আমরা একেবারেই ভুলে যাইনি? সেই আদর্শ ও কর্মসূচীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার পর কেবল নিজের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক মর্যাদায় যারা অন্য কোনো আদর্শ ও কর্মসূচী অনুসারে কাজ করে, তাদের কাজকে কিভাবে "ইসলামী" বলা যায়? একথা কে কবে শুনেছে যে, যে ব্যক্তি পুঁজিবাদী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে কাজ করে, তাকে সমাজতন্ত্রী বলা হয়? কেউ কি পুঁজিবাদী সরকারকে সমাজতন্ত্রী সরকার বলে? ফ্যাসিবাদী

প্রশাসনকে কি কেউ গণতান্ত্রিক প্রশাসন বলে? কেউ যদি এধরনের পরিভাষাগুলোর অপপ্রয়োগ করে, তবে আপনি হয়তো তাকে বেকুফ বা মুর্খ বলতে কিছুমাত্র সংকোচবোধ করবেননা। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই, ইসলাম ও মুসলমান পরিভাষা দুটির শোচনীয় অপপ্রয়োগ হচ্ছে। অথচ এতে কেউ মুর্খতা বা জাহেলিয়াতের গন্ধও অনুভব করেনা।

মুসলিম শব্দটা আপনা থেকেই প্রকাশ করছে যে, এটা কোনো জাতিবাচক নাম নয় বরং গুণবাচক নাম। এর অর্থ ইসলামের অনুসারী ছাড়া আর কিছু হতেই পারেনা। মানুষের যে বিশেষ মানসিক, নৈতিক ও বাস্তব গুণকে "ইসলাম" বলা হয়, মুসলমান শব্দটি সেই গুণকেই প্রকাশ করে। সুতরাং হিন্দু, জাপানী বা চৈনিক শব্দ যেমন একজন হিন্দু, জাপানী ও চৈনিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, মুসলমান শব্দটাকে ঠিক সেভাবে কোনো মুসলমান ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়না। মুসলমান নামধারী কোনো ব্যক্তি যখনই ইসলামী নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, অমনি তার কাছ থেকে মুসলমানত্ব আপনা আপনি চলে যায়। এরপর সে যাই করুক, নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদায় করে। ইসলামের নাম ব্যবহার করার কোনো অধিকার তার থাকেনা। অনুরূপভাবে "মুসলমানের স্বার্থ", "মুসলমানের উন্নতি ও সমৃদ্ধি," "মুসলিম সরকার ও রাষ্ট্র" "মুসলিম মন্ত্রীসভা" "মুসলিম সংগঠন" এবং এ ধরনের শব্দগুলো শুধু সেই ক্ষেত্রেই বলা যায়, যেখানে এই জিনিসগুলো অর্থাৎ স্বার্থ, উন্নতি, সরকার, রাষ্ট্র ইত্যাদি ইসলামী নীতি ও আদর্শের অনুসারী হবে এবং ইসলাম যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে এসেছে তার সফলতার অনুকূল হবে। তা না হলে এর কোনো একটির সাথেও মুসলমান বা মুসলিম শব্দ ব্যবহার করা সংগত নয়।[১] সেক্ষেত্রে এসব জিনিসের আর যে নাম খুশী রাখা যেতে পারে, কিন্তু মুসলমান বা মুসলিম নাম কখনো রাখা যেতে পারেনা। কেননা ইসলামের গুণ বা বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে মুসলিম বা ইসলাম আদৌ কোনো জিনিসই নয়। সমাজতন্ত্রকে বাদ দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা জাতি যখন সমাজতন্ত্রী হতে পারেনা, সমাজতন্ত্র ছাড়া কোনো স্বার্থকে যখন সমাজতান্ত্রিক স্বার্থ, কোনো সরকার বা সংগঠনকে সমাজতান্ত্রিক সরকার ও সংগঠন এবং কোনো উন্নতিকে সমাজতন্ত্রীদের উন্নতি বলা চলেনা, তখন একমাত্র মুসলমানদের সম্পর্কে এমন ধারণা কেন পোষণ করা হয় যে, ইসলামী গুণবৈশিষ্ট থাক বা না থাক, মুসলমান কোনো ব্যক্তি বা জাতির জাতিগত নাম হতে পারে এবং যে কোনো জিনিসকে ইসলাম বলা যেতে পারে?

বস্তুতঃ এই ভ্রান্ত ধারণা আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের ধ্যানধারণা ও আচরণকে মৌলিকভাবে ভ্রান্ত বানিয়ে দিয়েছে। যেসব রাজ্য ও রাষ্ট্র অনৈসলামিক নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিলো, তাদেরকে আমরা "ইসলামী রাষ্ট্র" বলি শুধু এজন্য যে, তার শাসক মুসলমান ছিলো। কর্ডোভা, বাগদাদ, দিল্লী ও

---

১. মুসলমানদের স্বার্থ ও কল্যাণ মূলতঃ কোনো অন্যায় ব্যাপার নয়। কিন্তু যে জিনিস ইসলামের পরিপন্থী তাতে মুসলমানদের কোনো স্বার্থ ও কল্যাণ থাকতেই পারেনা। এজন্য সবকিছুকে ইসলামের কষ্টিপাথরে পরখ করেই জেনে নিতে হবে কোন্‌টি মুসলমানদের জন্য হিতকর কোন্‌টি ক্ষতিকর। [সংকলক]

কায়রোর বিলাসবহুল দরবারে যে লাস্যময় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিলো, আমরা তাকে "ইসলামী সংস্কৃতি" নামে আখ্যায়িত করে থাকি। অথচ ইসলামের সাথে তার দূরতম সম্পর্কও নেই। আপনাকে যখন ইসলামী সভ্যতার কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি চট্‌করে আগ্রার তাজমহলের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দেন, যেনো ওটিই ইসলামী সভ্যতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। অথচ একটি মৃতদেহ সমাহিত করার জন্য বহু একর জমি স্থায়ীভাবে বরাদ্দ করে তার ওপর কোটি কোটি টাকার সৌধ নির্মাণ করা আদৌ কোনো ইসলামী সভ্যতাই নয়। ইসলামী ইতিহাসের গৌরবময় স্মৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে আপনি আব্বাসী, সালজুকী ও মোগলদের কীর্তিগাথা তুলে ধরেন। অথচ সত্যিকার ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এসব কীর্তির বেশীর ভাগ সোনালী অক্ষরে নয় বরং কালো কালি দিয়ে অপরাধের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার যোগ্য। আমরা মুসলমান রাজা মহারাজাদের ইতিহাসের নাম দিয়ে রেখেছি "ইসলামের ইতিহাস।" ভাবখানা এইযে, ঐ রাজাদের নামই যেনো ইসলাম। কোথায় ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তার নীতি ও আদর্শের আলোকে আমরা আমাদের অতীত ইতিহাসের সমালোচনা ও পর্যালোচনা করবো এবং পূর্ণ ইনসাফের সাথে ও সততার সাথে ইসলামী আন্দোলনগুলোকে অনৈসলামিক আন্দোলন থেকে আলাদা করে দেখবো এবং দেখাবো, তার পরিবর্তে অতীতের মুসলিম শাসকদের চরিত্র ও শাসন পদ্ধতির সমর্থন করাকেই আমরা ইসলামী ইতিহাসের সেবা বলে মনে করছি। আমাদের দৃষ্টিভংগীতে বক্রতা ও বিকৃতির সৃষ্টি হয়েছে শুধু এজন্য যে, আমরা মুসলমানদের সবকিছুকেই "ইসলামী" বিবেচনা করি, আর আমাদের ধারণা হলো, একজন মুসলিম নামধারী ব্যক্তি যদি অনৈসলামিক পন্থায়ও কাজ করে, তবে তার কাজকে মুসলমানের কাজ বলা যেতে পারে।

এই বক্র দৃষ্টিভংগীই আমরা আমাদের জাতীয় রাজনীতিতেও অবলম্বন করে রেখেছি। ইসলামের নীতি ও আদর্শ এবং তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আমরা একটি জাতিকে "মুসলিম জাতি" বলে বিবেচনা করি এবং সেই জাতির নামে, তার পক্ষ হতে বা তার জন্য যে কোনো ব্যক্তি এবং যে কোনো গোষ্ঠীকে যা ইচ্ছে তাই করতে অনুমতি দিয়ে থাকি। "মুসলিম জাতি"র সাথে সম্পর্ক রাখে এমন যে কোনো ব্যক্তিকে আমরা মুসলমানদের প্রতিনিধি বা নেতা মেনে নিয়ে থাকি, চাই সে বেচারার ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই না থাক। একটা দলের অনুসারী হলে কিছুমাত্র উপকার পাবো বলে আমাদের ধারণা হলেই ব্যাস, আর কথা নেই, দলটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যতোই বিপরীত হোক না কেন, আমরা সে দলটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই। মুসলমানদের জন্য কোনো মতে একবেলা খাবারের সংস্থান হয়ে গেলেই আমরা খুশী হয়ে যাই, চাই ইসলামের দৃষ্টিতে তা হারাম উপায়ে সংগৃহীত খাবারই হোক না কেন। কোনো অঞ্চলে কোনো মুসলমান ব্যক্তি ক্ষমতাসীন হয়েছে শুনলে আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই, চাই সে একজন অমুসলিমের মতোই অনৈসলামিক উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে থাকুক না কেন। আমরা এমন বহু জিনিসকে প্রায়ই ইসলামী স্বার্থ বলে থাকি, যা আসলেই ইসলাম বিরোধী। ইসলামী

আদর্শ ও মূলনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে আমরা সর্বস্ব শক্তি ব্যয় করে থাকি এবং ইসলামের সাথে আদৌ সংগতিপূর্ণ নয় এমনসব কাজে আমাদের অর্থ ও জাতীয় সম্পদের অপচয় করে থাকি। এসব কিছুই আমাদের একটিমাত্র মৌলিক ভুলের কুফল। সে ভুলটি হলো, আমরা নিজেদেরকে নিছক "জন্মসুত্রে গড়ে ওঠা একটা জাতি" ভেবে নিয়েছি আর এই সত্যটি ভুলে বসে আছি যে, আমরা আসলে একটা "আন্তর্জাতিক আদর্শবাদী দল" যার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং একমাত্র লক্ষ্য হলো এই দলের নীতি ও আদর্শকে পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন বানানো। আমরা যতক্ষণ নিজেদেরকে জন্মসুত্রে গঠিত একটি জাতির পরিবর্তে একটি আদর্শবাদী দল ভাবতে না পারবো এবং এ ধারণাকে একটি জীবন্ত ধারণায় পরিণত না করবো, ততদিন কোনো ব্যাপারেই আমাদের ভূমিকা সঠিক ও নির্ভুল হবেনা।

সংযোজন

উপরোক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকে এই মর্মে সংশয় প্রকাশ করেন যে, "ইসলামী দলকে" "জাতি"র পরিবর্তে "পার্টি" বা "দল" বলার কারণে এমন আশংকা দেখা দিয়েছে যে, তা কোনো দেশ ও জাতীয়তার অংশে পরিণত হয়ে যেতে পারে। একটি জাতির মধ্যে যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে এবং প্রত্যেক দলের স্বতন্ত্র নীতি ও আদর্শ থাকলেও সবকয়টি দল তাদের সেই বৃহত্তর সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত থাকে, যাকে "জাতি" বলা হয়। অনুরূপভাবে, মুসলমানরা যদি একটা দল বা পার্টি হয়ে থাকে, তবে তাও স্বীয় মাতৃভূমি তথা দেশে বসবাসরত জাতির একটা অংশ হয়ে যেতে পারে।

যেহেতু দল বা পার্টি শব্দটাকে সাধারণভাবে মানুষ রাজনৈতিক দল অর্থে গ্রহণ করে থাকে, এজন্য উপরোক্ত ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এটা এর প্রকৃত অর্থ নয়, বরং একটা বিশেষ অর্থে প্রায়শঃ ব্যবহৃত হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো, একটা বিশেষ আকীদা, আদর্শ, মতবাদ ও উদ্দেশ্যের ওপর ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টির নামই হলো জামায়াত তথা দল বা পার্টি। এই অর্থেই কুরআন "হিয্‌ব" এবং "উম্মাহ্" শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছে। এই অর্থেই হাদীসে "জামায়াত" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং "পার্টি" বলতেও এটাই বুঝায়।

এই জামায়াত বা দল আবার দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো, যার সামনে একটা জাতি বা দেশের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক কর্মকৌশলের একটা বিশেষ মতবাদ ও কর্মসূচী থাকে। এ ধরনের জামায়াত নিরেট রাজনৈতিক দল হয়ে থাকে। এ ধরনের দল যে জাতির অভ্যন্তরে গঠিত হয়, সে জাতিরই অংশ হয়ে কাজ করতে পারে এবং করেও থাকে।

দ্বিতীয় ধরনের দল হলো, যা একটা সামগ্রিক মতবাদ এবং একটা বিশ্বআদর্শ [World Idea] নিয়ে আবির্ভূত হয়। এধরনের দলের কাছে জাতি বা দেশ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির জন্য একটা বিশ্বজোড়া নীতি থাকে। এদল গোটা জীবনকে এক নতুন ধাঁচে গড়ে তুলতে চায়। এদল স্বীয় মতাদর্শ ও মূলনীতি, আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারা এবং নৈতিকতার নীতিমালা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত আচরণ ও সামাজিক

ব্যবস্থার খুঁটিনাটি পর্যন্ত প্রতিটি জিনিসকে নিজস্ব ধাঁচে তৈরী করতে চায়। এদল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক সংস্কৃতি ও বিশিষ্ট এক সভ্যতা [Civilization] গড়ে তুলতে উৎসুক। এ দলও মূলতঃ একটি দল বা জামায়াতই বটে। তবে এটি এমন দল হয়না যা কোনো জাতির অংশ হ'য়ে কাজ করতে পারে। এ দলের অবস্থান সীমিত বলয়ের জাতীয়তার উর্দ্ধে। এ দলের লক্ষ্যই হ'য়ে থাকে এইযে, যেসকল বংশীয় ও ঐতিহ্যগত আভিজাত্যবোধের ওপর পৃথিবীতে নানা রকমের জাতীয়তা গড়ে ওঠে, তার বিলোপ সাধন করতে হবে। সুতরাং সে কেমন করে এ ধরনের জাতীয়তার অঙ্গীভূত হতে পারে? এদল বর্ণ, বংশ ও ইতিহাসভিত্তিক জাতীয়তার পরিবর্তে একটা বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শবাদী জাতীয়তা [Rational Nationality] গড়ে তোলে, স্থবির জাতীয়তার পরিবর্তে বর্ধিষ্ণু ও সম্প্রসারণশীল জাতীয়তা [Expanding Naionality] গড়ে তোলে। এদল নিজে এমন একটি জাতীয়তার রূপ ধারণ করে, যা বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তিতে পৃথিবীর গোটা মানব গোষ্ঠীকে আপন বলয়ে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু একটি জাতীয়তায় পরিণত হওয়ার পরও প্রকৃত পক্ষে তা একটা জামায়াত বা দলই থেকে যায়। কেননা তাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া জন্মগত সদস্য হওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয় বরং যে মতবাদ ও আদর্শের ভিত্তিতে দলটি গঠিত হয়েছে, তার অনুসারী হওয়ার ওপর নির্ভরশীল।

মুসলমান আসলে এই দ্বিতীয় প্রকারের দলের নাম। এটি সেই ধরনের দল নয়, যা কোনো জাতির অভ্যন্তরে হয়ে থাকে। এটি এমন দল যার আবির্ভাব ঘটে একটা আলাদা সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য এবং ছোট ছোট জাতীয়তাগুলোর সংকীর্ণ বৃত্ত ভেংগে দিয়ে একটি বিরাট ও বিশাল বিশ্বজোড়া জাতীয়তা [World Nationality] গঠন করতে চায়। এই দল বা জামায়াতকে "জাতি" বলা নিঃসন্দেহে শুদ্ধ হবে। কেননা সে নিজেকে পৃথিবীর বর্ণ, বংশ ও ইতিহাসভিত্তিক জাতীয়তাগুলোর কোনো একটিরও সাথে সংযুক্ত করতে প্রস্তুত হয়না বরং নিজস্ব জীবন দর্শন ও সমাজ দর্শন [Social Philosophy] অনুসারে নিজের সভ্যতা ও কৃষ্টিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে তৈরী করে। কিন্তু আরেক হিসেবে সে "জাতি" হওয়া সত্তেও বাস্তবিকপক্ষে তা "দলই" থেকে যায়। কেননা নিছক কাকতালীয় জন্মসূত্র [Mere accident of birth] কোনো ব্যক্তিকে তার সদস্য বানাতে সক্ষম নয় যতক্ষণ সে তার আদর্শে বিশ্বাসী ও অনুসারী না হয়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তির অন্য কোনো জাতিতে জন্মগ্রহণ তার নিজ জাতি থেকে বেরিয়ে এই জাতিতে প্রবেশ করার অন্তরায় নয়। যদি সে এই জাতির আদর্শকে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে। সুতরাং আমি যা বলেছি, তার মর্মার্থ হলো, মুসলিম জাতির জাতীয়তা তার একটি দল বা জামায়াত হওয়ার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। জামায়াত বা দলগত সত্তাই তার মূল, আর জাতিগত সত্তা ডালপালা স্বরূপ। তার দলগত সত্তাকে যদি তার থেকে আলাদা করা হয় এবং সে নিছক একটা জাতি হিসেবে অবশিষ্ট থাকে তাহলে সেটা হবে পতন ও বিলুপ্তি।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, মানবীয় সমাজ ও সংগঠনের ইতিহাসে ইসলামী জামায়াত একটা বিরল ও অভিনব সংগঠন। ইসলামের পূর্বে বৌদ্ধ ধর্ম ও খৃষ্টধর্ম জাতীয়তাসমূহের

সীমান্ত অতিক্রম করে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করেছে এবং একটা মতবাদ ও আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্বজোড়া ভ্রাতৃত্ব গড়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই উভয় মতাদর্শের কাছে কয়েকটা নৈতিক মূলনীতি ছাড়া এমন কোনো সামাজিক ও সামষ্টিক দর্শন ছিলোনা, যার ভিত্তিতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনো সামগ্রিক অবকাঠামো গড়া যেতো। তাই এই দুটি মতাদর্শ কোনো বিশ্বজোড়া জাতীয়তা গড়তে পারেনি, কেবল একধরনের ভ্রাতৃত্ব [Brotherhood] বানিয়েই ক্ষান্ত থেকেছে। ইসলামের পর পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার উদ্ভব ঘটে, যা নিজের আহবানকে আন্তর্জাতিক আহবানে পরিণত করতে চেয়েছিলো। কিন্তু জন্মের প্রথম দিন থেকেই তার ঘাড়ে জাতীয়তাবাদের ভূত চড়াও হলো। তাই সেও বিশ্বজোড়া জাতীয়তা গড়তে সক্ষম হলোনা। এবার মার্কসীয় সমাজতন্ত্র এগিয়ে এসেছে। সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয়তার বৃত্ত ভেংগে দিয়ে এক বিশ্বজোড়া সভ্যতা গড়তে ইচ্ছুক। কিন্তু যেহেতু এখনো তার পরিকল্পিত নয়া সভ্যতা পুরোপুরি আবির্ভূত হয়নি, তাই মার্কসবাদও এখনো বিশ্বজোড়া জাতীয়তায় রূপান্তরিত হতে পারেনি।[১] এখন পর্যন্ত ময়দানে শুধু ইসলামই একমাত্র নীতি ও আদর্শ, যা বংশীয় ও ঐতিহাসিক জাতীয়তাসমূহের বৃত্ত ভেংগে সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে একটা বিশ্বজোড়া জাতীয়তা গঠন করে। কাজেই যারা ইসলামের প্রাণশক্তি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত নয় তাদের জন্য এটা বুঝা দুরূহ হয়ে পড়ে যে, একই সামষ্টিক কাঠামো কেমন করে একই সময়ে জাতি এবং দল দুটোই হতে পারে? দুনিয়ার যতোগুলো জাতি তাদের পরিচিত, তাদের মধ্যে কোনোটাই এমন নয়, যার সদস্যরা জন্মসূত্রে সদস্য হয়না বরং তাদেরকে সেচ্ছায় সদস্য হতে হয়। তারা দেখতে পায় যে, যেব্যক্তি জন্মসূত্রে ইটালীয়, সে ইটালীয় জাতীয়তার সদস্য। আর যেব্যক্তি জন্মসূত্রে ইটালীয় নয়, সে কোনোভাবেই ইটালীয় হতে পারেনা। তারা এমন কোনো জাতীয়তাকে চেনেনা, যার ভেতরে মানুষ আদর্শ ও আকিদার ভিত্তিতে প্রবেশ করে এবং আদর্শ ও আকিদা বদলে গেলে তা থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের মতে, এ বৈশিষ্ট্য কোনো জাতির নয়, দলের হতে পারে। কিন্তু তারা যখন দেখে যে, এই অভিনব দল নিজস্ব আলাদা সভ্যতা ও সংস্কৃতি তৈরী করে, নিজের স্বতন্ত্র জাতীয়তার দাবী করে এবং কোথাও স্থানীয় জাতীয়তার সাথে নিজেকে সংযুক্ত করতে রাজী হয়না, তখন ব্যাপারটা তাদের কাছে এক দুর্বোধ্য রহস্যে পরিণত হয়।

অমুসলিমদের মতো মুসলমানরাও একই দুর্বোধ্যতার সম্মুখীন হচ্ছে। যুগ যুগ কাল ধরে অনৈসলামিক শিক্ষালাভ ও অনৈসলামিক পরিবেশে জীবন যাপন করতে থাকায় তাদের মধ্যে "ঐতিহাসিক জাতীয়তা" তথা জন্মগত ও বংশগত জাতীয়তার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। তারা ভুলে গেছে যে, মুসলমানরা প্রকৃতপক্ষে এমন একটি দল, যা

---

১. সত্যি বলতে কি, মার্কসবাদের ভেতরেও জাতীয়তাবাদের বীজ ঢুকে গেছে। ষ্ট্যালিন ও তার দলের কর্মকান্ডে রুশ জাতীয়তাবাদের ভাবধারা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রুশ সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে, এমনকি ১৯৩৬ সালের নতুন সংবিধানেও জায়গায় জায়গায় "ফাদার ল্যান্ড" [পিতৃভূমি] এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ইসলামের দিকে লক্ষ্য করুন এর সর্বত্র "দারুল ইসলাম" শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফাদারল্যান্ড বা মাদারল্যান্ডের নয়।

পৃথিবীতে একটা বিশ্বজোড়া বিপ্লব সংঘটনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলো। যার জীবনের উদ্দেশ্য ছিলো নিজের আদর্শকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া। এবং যার সংকল্প ছিলো পৃথিবীর তাবত ভ্রান্ত সামষ্টিক ব্যবস্থাকে ভেংগে দিয়ে নিজস্ব সমাজ দর্শনের ভিত্তিতে একটা সামষ্টিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এসব কথা ভুলে গিয়ে তারা নিজেদেরকে কেবল অন্যান্য জাতিসমূহের মতো একটা জাতি মনে করে নিয়েছে। এখন তাদের সভাসমিতি ও বৈঠকাদিতে এবং তাদের পত্রপত্রিকা ও বইপুস্তকে কোথাও তাদের সামষ্টিক জীবনের এই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো আলোচনা হয়না, যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাদেরকে সারা দুনিয়ার জাতিগুলোর মধ্য থেকে বাছাই করে একটা উম্মাহ্ বা আন্তর্জাতিক জাতিতে পরিণত করেছিলো। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিবর্তে যে জিনিস এখন তাদের মনোযোগের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু, তাহচ্ছে "মুসলমানদের স্বার্থ।" মুসলমান বলতে মুসলিম মাতাপিতার ঔরসজাত সন্তান এবং স্বার্থ বলতে এইসব বংশানুক্রমিক মুসলমানের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থ বুঝানো হয়। এই স্বার্থের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৈতৃক উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া সংস্কৃতির সংরক্ষণও অন্তর্ভুক্ত। এই স্বার্থের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য যে কৌশলই লাভজনক ও কার্যকর মনে হয়, সেদিকেই তারা দিকবিদিক জ্ঞানশুন্য হ'য়ে ছুটে, ঠিক যেমন মুসোলিনী ইটালীয়দের স্বার্থের অনুকূল যেকোনো কর্মপন্থা অবলম্বনে প্রস্তুত হয়ে যেতো। কোনো আদর্শ ও নৈতিকতার তোয়াক্কা এরাও করেনা, মুসোলিনীও করতোনা। সে বলতো, ইটালীয়দের জন্য যেটাই কল্যাণকর সেটাই ভালো ও ন্যায়সংগত। এই মনোভাবকেই আমি মুসলমানদের অধোপতন বলে থাকি। আর এই অধোপতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যই আমি মুসলমানদেরকে একথা স্বরণ করিয়ে দেয়া জরুরী মনে করছি যে, আপনারা বংশানুক্রমিক ও ঐতিহাসিক জাতিগুলোর মতো একটা জাতি নন, বরং প্রকৃতপক্ষে একটি জামায়াত এবং নিজেদের মধ্যে জামায়াতী চেতনা [Party sense] জাগিয়ে তোলার মধ্যেই আপনাদের মুক্তি।

এই জামায়াতী চেতনা হারানো তথা আত্মভোলা হওয়ার কুফল এতো বেশী যে, তা গুণে শেষ করা কঠিন। আজকের মুসলমানরা প্রত্যেক পথপ্রদর্শকের পেছনে ছুটতে এবং প্রত্যেক মতবাদ ও আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়। অথচ এটা ভেবেও দেখেনা যে, ঐ নেতা ও আদর্শ ইসলামী বিধান ও ইসলামী আদর্শের কতো বিপরীত। এটা শুধু জামায়াতী চেতনাহীনতা ও আত্মবিস্মৃতির কারণেই সম্ভব হচ্ছে। মুসলমান জাতীয়তাবাদী হতেও কুণ্ঠিত হয়না, ফ্যাসিবাদী হতেও সংকোচবোধ করেনা এবং কমিউনিষ্ট হতেও কিছুমাত্র ইতস্তত করেনা। পাশ্চাত্যের রকমারি সামাজিক দর্শন এবং ইন্দ্রিয়াতীত চিন্তাধারা ও তাত্ত্বিক মতবাদসমূহের মধ্য থেকে প্রায় প্রত্যেকটিরই অনুসারী মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যাবে। পৃথিবীতে এমন কোনো রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পাওয়া যাবেনা, যার সাথে কোনো না কোনো মুসলমান শরীক হয়নি। মজার ব্যাপার হলো, তারা সবাই নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে, মুসলমান মনে করে এবং অন্যদের কাছ থেকেও মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এইসব রকমারি পথে উদভ্রান্তের মতো

বিচরণকারীদের কারো একথা মনে পড়েনা যে, "মুসলমান" জন্মসূত্রে পাওয়া কোনো খেতাব বা উপাধি নয়, বরং ইসলামের বাস্তব অনুসারী হওয়ার গুণবাচক নাম। যে ব্যক্তি ইসলামের পরিবর্তে অন্য কোনো মতবাদের অনুসারী হয় তাকে মুসলমান বলা এই শব্দটির একেবারেই অপপ্রয়োগের শামিল। মুসলিম কমিউনিষ্ট, মুসলিম জাতীয়তাবাদী এবং এই ধরনের অন্যান্য পরিভাষা "কমিউনিষ্ট মহাজন" ও "বৌদ্ধ কসাই" প্রভৃতি পরিভাষার মতোই স্ববিরোধী পরিভাষা।

দ্বিতীয় খন্ড

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঃ মূলনীতি ও কর্মপন্থা

- ইসলামে সাংবিধানিক আইনের উৎস
- ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিসমূহ
- ইসলামী সংবিধানের ভিত্তিসমূহ
- ইসলামী রাষ্ট্রের দৃষ্টান্তমূলক যুগ
- ইসলামে আইন প্রণয়ন ও ইজতিহাদ
- কতিপয় সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয়

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামে সাংবিধানিক আইনের উৎস

১ কুরআন মজীদ

২ রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ

৩ খিলাফতে রাশেদার কার্যক্রম এবং উম্মতের মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্ত

৪ সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

গ্রন্থের এই দ্বিতীয় ভাগে আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি ও তার কর্মপন্থার রূপরেখা পেশ করবো। ফলে আমাদের সামনে ইসলামী সংবিধানের একটি সুস্পষ্ট খসড়াও এসে যাবে। পুস্তকের এই অংশে আমরা সর্বপ্রথম ইসলামের সাংবিধানিক আইনের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা যুক্তিসংগত মনে করি, যাতে করে পরের সমস্ত আলোচনার ভিত্তিমূল আমাদের সামনে এসে যেতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে যদি প্রথম পদক্ষেপেই একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তার মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ্, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা নয়, তাহলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারবেনা। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বর্তমান শাসক গোষ্ঠী এবং তথাকথিত আধুনিকতাবাদীদের মূল চিন্তাগত বিভ্রান্তি এই যে, তারা কথা তো বলে ইসলামী রাষ্ট্রের, কিন্তু উৎস হিসেবে রুজু হয় পাশ্চাত্য জাতিসমূহের প্রতি। আমরা নিশ্চয়ই অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে পারি, তবে তা আমাদের নিজেদের ব্যবস্থার সীমার মধ্যে অবস্থান করে এবং তার প্রাণসত্তাকে অটুট রেখে। এ কারণেই আমরা সর্বপ্রথম সাংবিধানিক আইনের উৎস এবং তাকে কাজে লাগানোর পথের অসুবিধাগুলো তুলে ধরব।

আরও একটি কারণে এই আলোচনার প্রয়োজন হয়েছে এবং তা হচ্ছে হাদীস অস্বীকার করার ফেতনা। একটি দল হাদীস সম্পর্কে বুদ্ধিবৃত্তিকে সন্দিহান করে তোলার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে। তারা হাদীসকে আইনের উৎস ও প্রামাণ্য দলীল [হুজ্জত] হওয়ার বিষয়ে আপত্তি তোলে। এই দৃষ্টিভংগির সমালোচনার এবং সঠিক ও বাস্তব অবস্থার ব্যাখ্যা প্রদানের সীমাহীন প্রয়োজন রয়েছে। সত্য কথা হলো, হাদীস ব্যতীত ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রণীত হতেই পারেনা।

আলোচ্য অধ্যায়ে গ্রন্থকারের বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় অংশ সংকলিত করা হয়েছে এবং টীকায় সেসব নির্দেশ করা হয়েছে। (আমরা এসব গ্রন্থের বাংলা সংস্কারণ উল্লেখের চেষ্টা করবো -অনুবাদক)।

-সংকলক।

ইসলামে সাংবিধানিক আইনের উৎস

যে রাষ্ট্র আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব এবং খিলাফাত আলা মিনহাজিন নবূয়্যত [নবূয়্যতের পদ্ধতিতে শাসনকার্য পরিচালনা]-এর ব্যবস্থাকে তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ প্রতিষ্ঠিত করে, তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে। আজ পৃথিবীর যেখানেই এরূপ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এবং তার ধরন ও কর্মপন্থা নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালানো হবে সেখানেই কয়েকটি বিশেষ উৎসের দিকে রুজু হতে হবে। সেগুলো হচ্ছে কুরআন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ, খিলাফতে রাশিদার কার্যক্রম এবং উম্মাতের মুজতাহিদ আলেমগণের সিদ্ধান্ত। ইসলামের অলিখিত রাষ্ট্রীয় সংবিধানের উৎস এই চারটি এবং এগুলো অধ্যয়ন করলে ইসলামী রাষ্ট্রের ধরন ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যাবে এবং ইসলামী সংবিধানের আনুষঙ্গিক নীতিমালা ও ধারাসমূহ তা থেকে বের করা যাবে।

১. কুরআন মজীদ

ইসলামী সংবিধানের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস হচ্ছে কুরআন মজীদ। ইসলামের পরিভাষায় “কিতাব” বলতে সেই গ্রন্থকে বুঝায় যা মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর রসূলগণের উপর নাযিল করা হয়। এ অর্থের প্রেক্ষিতে “কিতাব” হচ্ছে সেই পয়গামের সরকারী বিবৃতি [Official Version] অথবা ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী ‘খোদায়ী কালাম’ যা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে, যার ব্যাখা বিশ্লেষণ করতে এবং যাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে দুনিয়ায় পয়গাম্বর প্রেরিত হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র স্থায়ী নিয়ম এইযে, পয়গাম্বরের মাধ্যমে মানুষকে যে শিক্ষাদান করা আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্য, তার মূলনীতি ও মৌল বিষয়াদি তাঁর তরফ থেকে পয়গাম্বরের হৃদয়ে প্রত্যাদিষ্ট হয়। তার ভাষা এবং অর্থ কোনোটাতেই পয়গাম্বরের নিজস্ব বুদ্ধি ও চিন্তা, তাঁর ইচ্ছা ও আকাঙ্খার বিন্দু পরিমাণ দখল থাকেনা। এ কারণেই তা শব্দ এবং অর্থ উভয়দিক থেকেই আল্লাহ্‌র কালাম, পয়গাম্বরের নিজস্ব রচনা নয়। পয়গাম্বর একজন বিশ্বস্ত দূত হিসেবে এ কালাম আল্লাহ্‌র বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকেন। তদুপরি তিনি আল্লাহ্‌র দেয়া দূরদৃষ্টির সাহায্যে কিতাবের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখা করেন। এসব খোদায়ী মূলনীতির ভিত্তিতে পয়গাম্বর নৈতিকতা, সামাজিকতা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক পূর্ণাংগ কাঠামো গড়ে তোলেন। তিনি শিক্ষা প্রচার, সদুপদেশ এবং নিজের পূত চরিত্রের মাধ্যমে লোকদের ধ্যানধারণা, ঝোঁক প্রবণতা ও চিন্তাধারায় এক মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে তাকওয়া, পবিত্রতা, নির্মলতা ও সদাচারণের ভাবধারা সঞ্চারিত করেন। শিক্ষাদীক্ষা ও বাস্তব পথ নির্দেশের

দ্বারা তাদেরকে এমনভাবে সুসংহত করেন যে, নতুন মানসিকতা, নতুন চিন্তা ও ধ্যান ধারণা, নতুন রীতি নীতি এবং নতুন আইন কানুনের সংগে এক নতুন সমাজের অভ্যুদয় ঘটে। পরন্তু তিনি তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং সেই সংগে নিজের শিক্ষা দীক্ষা ও পূত চরিত্রের এমন নিদর্শন রেখে যান, যা হামেশা সমাজ এবং এর পরবর্তী বংশধরদের জন্যে হিদায়াতের আলোক বর্তিকার কাজ করে।

আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন মজীদ সর্বশেষ ও পূর্ণাংগ আসমানী কিতাব। মুসলমানগণ তো সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর ঈমান রাখে, কিন্তু তাদের জন্য হিদায়াতের বিধান ও জীবন যাপনের আইন কানুন প্রদানের মর্যাদা কেবল কুরআন মজীদের জন্য সংরক্ষিত। আমাদেরকে উত্তমরূপে বুঝে নিতে হবে যে, যেখান থেকে কার্যত আনুগত্য ও অনুসরণের সীমারেখা শুরু হয় সেখান থেকে অন্যান্য আসমানী কিতাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এই কিতাব আমাদের জন্য হিদায়াত লাভের মূল ও হুজ্জাত [Authority] হবার বিভিন্ন কারণ রয়েছে।

১. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব শব্দসম্ভারে কুরআন মজীদ পেশ করেছেন তা অবিকল সেসব শব্দ সহকারে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রথম দিন থেকে হাজারো লাখো ও কোটি কোটি মানুষ প্রত্যেক যুগে তা অক্ষরে অক্ষরে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, লাখো কোটি মানুষ তা দৈনন্দিন তিলাওয়াত করছে, সর্বদা তা পুস্তকাকারে লিখিত ও মুদ্রিত হচ্ছে এবং কখনও তার মূল পাঠে ক্ষুদ্রতম মতভেদ পাওয়া যায়নি। অতএব এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানিতে যে কুরআন শ্রুত হয়েছিলো তা আজও অবিকল দুনিয়াতে বিদ্যমান এবং চিরকাল বিদ্যমান থাকবে, তাঁর একটি শব্দেরও পরিবর্তন হয়নি এবং হতেও পারেনা।

২. কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, যা আজও একটি জীবন্ত ভাষা। আজ দুনিয়ায় কোটি কোটি আরবী ভাষাভাষী লোক বর্তমান। কুরআন অবতরণকালে যেসব পুস্তক এ ভাষার শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ সাহিত্য ছিলো, আজ পর্যন্ত তাই রয়েছে। মৃত ভাষাগুলোর পুস্তকাদি বুঝতে আজ যেসব অসুবিধা দেখা দেয়, এর অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করতে সেরকম কোনো অসুবিধাই নেই।

৩. কুরআন পুরোপুরি সত্য ও অভ্রান্ত এবং আদ্যপান্ত খোদায়ী শিক্ষায় পরিপূর্ণ। এতে কোথাও মানবীয় আবেগ, প্রবৃত্তির লালসা, জাতীয় বা গোত্রীয় স্বার্থপরতা এবং মূর্খতাজাত গোমরাহীর চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায়না। এর ভেতর খোদায়ী কালামের সংগে মানবীয় কালাম অনু পরিমাণ ও মিশ্রিত হতে পারেনি।

৪. এতে গোটা মানবজাতিকেই আহবান জানানো হয়েছে এবং এমন আকীদা বিশ্বাস, চরিত্রনীতি ও আচরণবিধি পেশ করা হয়েছে যা কোনো দেশ, জাতি এবং যুগ বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নয়। এর প্রতিটি শিক্ষা যেমন বিশ্বজনীন তেমনি চিরস্থায়ীও।

৫. পূববর্তী আসমানী গ্রন্থাবলীতে যেসব সত্যতা, মৌলিকতা এবং কল্যাণ ও সৎকাজের কথা বিধৃত হয়েছিলো, এতে তার সবই সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। কোনো ধর্মগ্রন্থ থেকে এমন কোনো সত্য ও সৎকাজের কথা উদ্ধৃত করা যাবেনা, কুরআনে যার

উল্লেখ নেই। এমন পূর্ণাংগ গ্রন্থের বর্তমানে মানুষ স্বভাবতই অন্য সমস্ত গ্রন্থ থেকে মুখাপেক্ষাহীন হয়ে যায়।

৬. কুরআন হচ্ছে আসমানী হিদায়াত ও খোদায়ী শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বশেষ [Latest Edition] গ্রন্থ। অতীতের গ্রন্থাবলীতে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে যেসব বিধি ব্যবস্থা দেয়া হয়েছিলো, এতে তা বাদ দেয়া হয়েছে এবং অতীতের গ্রন্থাবলীতে অনুপস্থিত এমন অনেক নতুন শিক্ষাও এতে সংযোজিত করা হয়েছে ঃ

> "আমরা কোনো আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত হতে দিলে তা থেকে উত্তম বা তার সমতুল্য কোনো আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জানোনা যে, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" [সূরা আলবাকারা ঃ ১০৬]

কাজেই যে ব্যক্তি পূর্ব পুরুষদের নয়, বরং খোদায়ী হিদায়াতের অনুসারী তার পক্ষে এই সর্বশেষ আসমানী কিতাবের অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক, পুরনো গ্রন্থাবলীর নয়। এখন কুরআন মজীদই হচ্ছে হুজ্জাত [Authority], তার পূর্বেকার কিতাবসমূহ নয়। এসব কারণে ইসলাম অন্য সমস্ত আসমানী কিতাবের সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধুমাত্র কুরআনের সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং গোটা মানবজাতিকে আহবান জানাচ্ছে, তারা যেনো এই কিতাবকে তাদের জীবন যাপনের পথনির্দেশিকা বানায় এবং মুসলমানদের জন্য এই কিতাবকে হিদায়াতের প্রথম উৎস সাব্যস্ত করে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

> "আমি এ কিতাব তোমার প্রতি সত্যসহ নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের মধ্যে আল্লাহ্‌র দেয়া সত্য জ্ঞানসহ বিচার ফায়সালা করতে পারো।" [সূরা আননিসা ঃ ১০৫]
>
> "অতএব যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং যারা তাঁর সাহায্য ও সহায়তা করেছে, এবং তাঁর সংগে অবতীর্ণ নূরের অনুসরণ করে চলেছে, তারাই কল্যাণপ্রাপ্ত।" [সূরা আরাফ ঃ ১৫৭]
>
> "আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা ফায়সালা করেনা তারাই কাফের.... তারাই যালেম... তারাই সত্য ত্যাগকারী।" [সূরা আলমায়েদা ঃ ৪৪-৪৭]

"[১]যেসব লোক আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করেনা আল্লাহ্ তায়ালা তাদের জন্য এখানে তিনটি উক্তি করেছেন। [এক] তারা কাফের [দুই] তারা যালেম [তিন] তারা ফাসেক। এর সুস্পষ্ট অর্থ হলো, যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং তাঁর নাযিলকৃত বিধান ত্যাগ করে নিজেদের বা অন্যদের রচিত আইনের ভিত্তিতে বিচার ফায়সালা করে তারা মূলত তিনটি মারাত্মক অপরাধ করে। [এক] তাদের এই কাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি স্বরূপ, তা কুফর, [দুই] তাদের এই কাজ সুবিচারের পরিপন্থী। কেননা পুরোপুরি সুবিচার অনুযায়ী যা কিছু নির্দেশ বা হুকুম হতে পারে তাতো আল্লাহ্ই নাযিল করেছেন। অতএব আল্লাহ্‌র বিধান হতে বিচ্যুত হয়ে অন্য কোনো ফায়সালা করলে তারা পরিষ্কার যুলুম করে, [তিন] বান্দাহ হওয়া সত্ত্বেও যখন

---

১. তাফহীমুল কুরআন, সূরা মায়েদা ৭৭ নং টীকার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

তারা নিজ মালিক ও প্রভুর আইন অমান্য করে এবং নিজস্ব বা অপর কারো আইন জারী করে, তখন সে কার্যত বন্দেগী ও আনুগত্য স্বীকারের ক্ষেত্রেও সীমালংঘন করে। এটাই হচ্ছে ফিসক বা ফাসেকী [সত্য ত্যাগ]। এই কুফর, যুলুম ও সত্য ত্যাগ মূলত ঃ আল্লাহ্‌র বিধান আমন্য করারই বাস্তব রূপ। যেখানেই আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করা হবে সেখানেই এই তিনটি বিষয় অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান থাকবে। অবশ্য আল্লাহ্‌র বিধান লংঘনের মাত্রা ও পর্যায়ে যেমন পার্থক্য হতে পারে, এই তিনটি বিষয়েও অনুরূপ পার্থক্য হয়ে থাকে।"

[১]মুসলমানদের জন্য আসল সনদ ও প্রমাণ হচ্ছে কুরআন মজীদ। যা কুরআনের পরিপন্থী তা কখনও অনুসরণীয় ও অনুবর্তনযোগ্য নয় ঃ

> "হে মুহাম্মদ! বলে দাওঃ আমি এ কিতাবকে নিজের তরফ থেকে বদলাবার অধিকারী নই। আমি তো কেবল সেই ওহীরই আনুগত্য করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়। আমি যদি আমার প্রভুর অবাধ্য হই তাহলে আমার কঠিন দিন সম্পর্কে ভয় হয়।" [সূরা ইউনুসঃ ১৫]
>
> "যা কিছু তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করো এবং তাকে ছেড়ে অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের মাত্রই অনুসরণ করোনা।" [সূরা আলআরাফ ঃ ৩]

[২]কুরআন মজীদ ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সর্বপ্রথম উৎস। তার মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার বিধান ও ফরমানসমূহ বিদ্যমান। এসব বিধান ও ফরমান গোটা মানব জীবনের যাবতীয় বিষয়ের উপর পরিব্যাপ্ত। কুরআন মজীদে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত চরিত্র, নৈতিকতা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দান করা হয়নি বরং সামাজিক ও সামগ্রিক জীবনের [Social Life] প্রতিটি দিক ও বিভাগের সংস্কার, সংশোধন ও সংগঠনের জন্যও কিছু নীতিমালা ও কিছু বিধান প্রদান করা হয়েছে এবং এই প্রসংগে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কোন্‌সব নীতিমালার ভিত্তিতে কি উদ্দেশ্যে তাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

২. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্[১]

ইসলামী সংবিধানের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। সুন্নাহ্‌র সাহায্যে জানা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মজীদের নির্দেশ ও হিদায়াত এবং কুরআন প্রদত্ত মূলনীতিসমূহ আরব ভূমিতে কিভাবে কার্যকর করেছেন, কিভাবে ইসলামের চিন্তাকে বাস্তবে রূপদান করেছেন, কিভাবে সেই চিন্তার ভিত্তিতে একটি সমাজ কাঠামো গঠন করেছেন, অতপর কিভাবে এই সমাজকে সুসংগঠিত করে একটি রাষ্ট্রের কাঠামোয় দাঁড় করেছেন এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগকে কিভাবে পরিচালনা করেছেন। এসব কিছু আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১. 'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' থেকে উদ্ধৃত।
২. 'ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন' থেকে উদ্ধৃত।
১. বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য পাঠ করুন- এই গ্রন্থকারের পুস্তক "সুন্নাতে রসূলের আইনগত মর্যাদা" এবং "নির্বাচিত রচনাবলী" ১ম ও ২য় খন্ড।

ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকেই জানতে পারি এবং তার সাহায্যে আরও জানতে পারি যে, কুরআনের সঠিক ও যথার্থ লক্ষ ও উদ্দেশ্য কি। সুন্নাহ মূলত কুরআন মজীদ প্রদত্ত নীতিমালার বাস্তব ও প্রয়োগিক রূপ যা থেকে আমরা ইসলামী সংবিধানের জন্য অতীব মূল্যবান নজীর [Precedents] লাভ করতে পারি এবং সাংবিধানিক ঐতিহ্যের [Conventions of Constitution] খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংগ্রহ করতে পারি।

সুন্নাহ আমাদের সাংবিধানিক আইনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছুকাল ধরে একটি সম্প্রদায় তার গুরুত্বকে খাটো করে এবং তার আইনের উৎস হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। তাই আমরা এখানে সুন্নাহ্‌র আইনের উৎস হওয়ার উপর কিছু আলোকপাত করবো।

এটা[১] এমন এক ঐতিহাসিক সত্য যা কোনো ক্রমেই অস্বীকার করা যায়না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবূয়্যতের পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর আল্লাহ্‌ তায়ালার পক্ষ থেকে শুধু কুরআন পৌঁছে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি বরং একটি ব্যাপক আন্দোলনের নেতৃত্বও দিয়েছেন। এর ফলস্বরূপ একটি মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন হয়, সভ্যতা সংস্কৃতির এক নতুন ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে এবং একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম হয়। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, কুরআন পৌঁছে দেয়া ছাড়াও এসব কাজ যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন তা শেষ পর্যন্ত কি হিসেবে করেছেন? এসব কাজ কি নবীর কাজ হিসেবে সম্পাদিত হয়েছিলো যার মধ্যে তিনি আল্লাহ্‌র মর্জীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন? নাকি তাঁর নবূয়্যতী মর্যাদা কুরআন শুনিয়ে দেয়ার পর শেষ হয়ে যেতো এবং এরপর তিনি সাধারণ মুসলমানদের মতো শুধু একজন মুসলমান হিসেবে থেকে যেতেন, যাঁর কথা ও কাজ নিজের মধ্যে কোনো আইনের সনদ ও দলীলের মর্যাদা রাখতোনা? যদি প্রথম কথাটি মেনে নেয়া হয় তাহলে সুন্নাতকে কুরআনের সাথে আইনের সনদ ও দলীল হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য দ্বিতীয় অবস্থায় সুন্নাতকে আইনের মর্যাদা দেয়ার কোনো কারণ থাকতে পারেনা।

কুরআনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল পত্রবাহক ছিলেননা বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিযুক্ত পথপদর্শক, আইন প্রণেতা এবং শিক্ষকও ছিলেন যাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিলো এবং যাঁর জীবনকে সমগ্র ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নমুনা হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। বুদ্ধিবিবেক সম্পর্কে যতোদূর বলা যায়, তা একথা মেনে নিতে অস্বীকার করে যে, একজন নবী কেবল খোদার কালাম পড়ে শুনিয়ে দেয়া পর্যন্ত তো নবী থাকবেন, কিন্তু এরপর তিনি একজন সাধারণ ব্যক্তিমাত্র রয়ে যাবেন। মুসলমানদের সম্পর্কে যতোদূর বলা যায়, তারা ইসলামের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিটি যুগে

১. ১৯৫৮ সালের ৩রা জানুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সেমিনারে এই গ্রন্থকারের একটি নিবন্ধ পাঠের পর জনৈক মুনকিরে হাদীস [হাদীস অস্বীকারকারী] উঠে দাড়িয়ে উক্ত প্রবন্ধের উপর কতিপয় অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। উক্ত সেমিনারেই নিবন্ধকার এই জবাব দেন।

এবং গোটা দুনিয়ায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ, তাঁর অনুসরণ অপরিহার্য এবং তাঁর আদেশ নিষেধের আনুগত্যকে বাধ্যতামূলক বলে স্বীকার করে আসছে। এমনকি কোনো অমুসলিম পন্ডিতও এই বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার করতে পারেনা যে, মুসলমানরা সবসময় তাঁর এই মর্যাদা স্বীকার করে আসছে এবং এরই ভিত্তিতে ইসলামের আইন ব্যবস্থায় সুন্নাহ্‌কে কুরআনের সাথে আইনের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে।

আমি জানিনা, কোনো ব্যক্তি সুন্নাতের এই আইনগত মর্যাদা কিভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত সে পরিষ্কারভাবে না বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু কুরআন পড়ে শুনিয়ে দেয়া পর্যন্ত নবী ছিলেন এবং একাজ সম্পন্ন করার সাথে সাথে তাঁর নবুয়্যতী মর্যাদা শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া সে যদি এরূপ দাবি করেও তাহলে তাকে বলতে হবে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ধরনের মর্যাদা সে নিজেই দিচ্ছে, নাকি কুরআন তাঁকে এই ধরনের মর্যাদা দিয়েছেন? প্রথম ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে তার কথার কোনো সম্পর্ক নেই এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাকে কুরআন থেকে তার দাবির সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে।

এব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখা হয়নি যে, কুরআন মজীদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি মর্যাদা নির্ধারণ করেছে এবং রিসালাতের পদের কোন্ কোন্ কাজ তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন।

ক. রসূলুল্লাহ (স) শিক্ষক ও মুরুব্বী হিসেবে[১]

আলকুরআনে চার স্থানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের পদমর্যাদা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য রয়েছে ঃ

> "স্মরণ করো, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এই [কা'বা] ঘরের প্রাচীর নির্মাণ করছিলো [তখন এই বলে তারা দোয়া করেছিলো ঃ] ... হে আল্লাহ! এদের নিকট এদের জাতির মধ্য থেকেই এমন একজন রসূল প্রেরণ করো, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞানের শিক্ষাদান করবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ করবেন।" [সূরা আলবাকারা ঃ ১২৭-২৯]
>
> "যেমন আমি তোমাদের নিকট স্বয়ং তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের আয়াত পাঠ করে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে, তোমাদের কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান দান করে এবং তোমরা যে জ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানতেনা তা তোমাদের শিক্ষা দেয়।" [সূরা আলবাকারা ঃ ১৫১]
>
> "প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহ্ এই বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে, স্বয়ং তাদের মধ্য থেকে এমন একজন নবী বানিয়েছেন যিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত পড়ে শুনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদের কিতাব ও জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা দেয়।" [আলে ইমরান ঃ ১৬৪]

---

১. সুন্নাতে রসূলের আইনগত মর্যাদা গ্রন্থ থেকে সংযোজিত।

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে [এমন] একজন রসূল স্বয়ং তাদেরই মধ্য থেকে প্রেরণ করেছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ শুনায়, তাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয়।" [সূরা জুময়া ঃ ২]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে বার বার যে কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পূনর্ব্যক্ত হয়েছে তা হলো, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রসূলকে শুধুমাত্র কুরআনের আয়াতসমূহ শুনিয়ে দেয়ার জন্য পাঠাননি বরং তার সাথে নবী হিসেবে প্রেরণের আরও তিনটি উদ্দেশ্য ছিলো ঃ

১. তিনি লোকদের কিতাবের শিক্ষাদান করবেন।
২. এই কিতাবের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করার কৌশল [হিকমাহ্] শিক্ষা দিবেন।
৩. তিনি ব্যক্তি ও তাদের সমাজের পরিশুদ্ধি করবেন। অর্থাৎ নিজের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দোষক্রুটি দূর করবেন এবং তাদের মধ্যে উত্তম গুণাবলী ও উন্নত সমাজব্যবস্থার বিকাশ সাধন করবেন।

প্রকাশ থাকে যে, কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষা দান অবশ্যি কুরআনের শব্দ শুনিয়ে দেয়ার অতিরিক্ত কোনো কাজই ছিলো, অন্যথায় পৃথকভাবে তার উল্লেখ অর্থহীন। অনুরূপভাবে ব্যক্তি ও সমাজের প্রশিক্ষণের জন্য তিনি যেসব উপায় ও পদ্ধতি গ্রহণ করতেন, তাও কুরআনের শব্দ পাঠ করে শুনিয়ে দেয়ার অতিরিক্ত কিছু ছিলো, অন্যথায় প্রশিক্ষণের এই পৃথক কার্যক্রমের উল্লেখের কোনো অর্থ ছিলোনা। এখন বলুন, কুরআন মজীদ পৌঁছে দেয়া ছাড়াও এই শিক্ষক ও মুরব্বীর পদ যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ন্যস্ত ছিলো, তা কি তিনি শক্তিবলে দখল করেছিলেন, না আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে এ পদে নিয়োগ করেছেন। কুরআন মজীদের এই সুস্পষ্ট ও পুনরুক্তির পরও এই কিতাবের উপর ঈমান পোষণকারী কোনো ব্যক্তি কি একথা বলার দুঃসাহস করতে পারে যে, এই দুটি পদ রিসালাতের অংশ ছিলোনা এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব পদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম রসূল হিসেবে নয় বরং ব্যক্তিগতভাবে আঞ্জাম দিতেন? সে যদি তা বলতে না পারে তবে আপনি বলুন, কুরআন মজীদের পাঠ শুনিয়ে দেয়ার অতিরিক্ত যেসব কথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিতাবের শিক্ষা ও হিকমাত [কৌশল] প্রসংগে বলেছেন এবং নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের যে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বলে স্বীকার করতে এবং তাকে সনদ [দলীল প্রমাণ] হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করলে তা স্বয়ং রিসালাত অস্বীকার করা নয় কি?

খ. রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্র কিতাবের ভাষ্যকার হিসেবে

সূরা আননাহল-এ আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

"এবং [হে নবী!] এই যিকির তোমার উপর নাযিল করেছি যেনো তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষা ধারার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে থাকো, যা তাদের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে।" [আননাহল ঃ ৪৪]

উপরোক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো যে, কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তায়ালা যে হুকুম আহ্কাম ও পথনির্দেশ দিয়েছেন, তিনি তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দান

করবেন। স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও অন্তত এতোটুকু কথা বুঝতে সম্ভব যে, কোনো কিতাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুধুমাত্র সেই কিতাবের মূলপাঠ পড়ে শুনিয়ে দিলেই হয়ে যায়না বরং ব্যাখ্যাদানকারী তার মূলপাঠের অধিক কিছু বলে থাকেন, যাতে শ্রবণকারী কিতাবের অর্থ পূর্ণরূপে বুঝতে পারে। আর কিতাবের কোনো বক্তব্য যদি কোনো ব্যবহারিক [Practical] বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে ভাষ্যকার ব্যবহারিক প্রদর্শনী [Practical Demonstration] করে বলে দেন যে, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এভাবে কাজ করা, তা না হলে কিতাবের বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ও দাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারীকে কিতাবের মূলপাঠ শুনিয়ে দেয়াটা মকতবের কোনো শিশুর নিকটও ব্যাখ্যা বা ভাষ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারেনা। এখন আপনি বলুন, এই আয়াতের আলোকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ভাষ্যকার কি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন, নাকি আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ভাষ্যকার হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন? এখানে তো আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রসূলের উপর কিতাব নাযিল করার উদ্দেশ্যই বর্ণনা করেছেন যে, রসূল নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে কিতাবের তাৎপর্য তুলে ধরবেন। অতপর কিভাবে এটা সম্ভব যে কুরআনের ভাষ্যকার হিসেবে তাঁর পদমর্যাদাকে রিসালাতের পদমর্যাদা থেকে পৃথক সাব্যস্ত করা হবে এবং তাঁর পৌঁছে দেয়া কুরআনকে গ্রহণ করে তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো হবে? এই অস্বীকৃতি কি সরাসরি রিসালাতের অস্বীকৃতির নামান্তর নয়?

গ. রসূলুল্লাহ (স) নেতা ও অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে

সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

"[হে নবী] বলো, তোমরা যদি আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা পোষণ করো তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন.....বলো, আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগত্য করো। অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে কাফেরদের আল্লাহ্ পছন্দ করেননা।" [ইমরান ঃ ৩১-৩২]

সূরা আহযাবে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রসূলের মধ্যে অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ ও আখিরাতের আকাংখী।" [আহযাব ঃ ২১]

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নেতা সাব্যস্ত করেছেন, তাঁর আনুগত্য করার নিদের্শ দিচ্ছেন, তাঁর জীবন চরিত্রকে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন এবং পরিষ্কার বলছেন যে, তাঁর নীতি অবলম্বন না করলে আমার নিকট কোনো আশা রেখোনা। এছাড়া আমার ভালোবাসা লাভ করা যায়না। তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কুফরী। এখন আপনি বলুন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি স্বয়ং নেতা ও পথপদর্শক হয়ে গিয়েছিলেন? নাকি মুসলমানগণ তাঁকে নির্বাচন করেছিলো? আর নাকি আল্লাহ্ তায়ালাই তাঁকে এই পদে সমাসীন করেছেন? কুরআনুল করীমের এ আয়াত দ্ব্যর্থহীনভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে নিযুক্ত পথপ্রদর্শক ও নেতা সাব্যস্ত করার পরও তাঁর আনুগত্য ও তাঁর জীবন চরিত্র

অনুসরণ করার ব্যাপারটি কিভাবে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে? এই প্রশ্নের জবাবে একথা বলা সম্পূর্ণ অর্থহীন যে, এর দ্বারা কুরআন মজীদের অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে, যদি তাই অর্থ হতো তবে "[কুরআনের অনুসরণ করো]" বলা হতো, "[আমার অনুসরণ করো] বলা হতোনা।" এ অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত্রকে উত্তম আদর্শ বলার তো কোনো অর্থই ছিলোনা।

ঘ. শরীয়াত প্রণেতা হিসেবে রসূলুল্লাহ (স)

সূরা আরাফে মহান আল্লাহ্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখপূর্বক ইরশাদ করেন ঃ

> "সে তাদেরকে ন্যায়ানুগ কাজের আদেশ করে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, তাদের জন্য পাক জিনিসসমূহ হালাল এবং নাপাক জিনিসসমূহ হারাম করে, আর তাদের উপর থেকে সেই বোঝা সরিয়ে দেয় যা তাদের উপর চাপানো ছিলো এবং সেই বন্ধনসমূহ খুলে দেয় যাতে তারা বন্দী ছিলো।" [আরাফ ঃ ১৫৭]

উল্লেখিত আয়াতের শব্দসমূহ একটি বিষয় সম্পূর্ণ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা [Legislative Powers] প্রদান করেছেন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদেশ নিষেধ, হালাল হারাম শুধু কুরআন মজীদে বর্ণিতগুলোই নয় বরং এর সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু হালাল অথবা হারাম ঘোষণা করেছেন, অথবা যেসব জিনিসের হুকুম দিয়েছেন বা নিষেধ করেছেন তাও আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য তাও আল্লাহ্র বিধানের একটি অংশ। এ কথাই সূরা হাশরে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

> "রসূল তোমাদের যা কিছু দেয় তা গ্রহণ করো, আর যে জিনিস থেকে বিরত রাখে [নিষেধ করে] তা থেকে বিরত থাকো, আল্লাহ্কে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা।" [হাশর ঃ ৭]

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের কোনোটিরই এই ব্যাখ্যা করা যায়না যে, তার মধ্যে কুরআনের আদেশ নিষেধ ও কুরআনের হালাল হারামের কথা বলা হয়েছে, এটা ব্যাখ্যা নয় বরং আল্লাহ্র কালামের পরিবর্তনই হবে। আল্লাহ্ তায়ালা তো এখানে আদেশ নিষেধ ও হালাল হারামকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রম সাব্যস্ত করেছেন, কুরআনের কার্যক্রম নয়। এরপরও কি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্ বেচারাকে বলতে চায় যে, আপনার বক্তব্যে ভুল হয়ে গেছে। আপনি ভুল করে কুরআনের পরিবর্তে রসূলের নাম উল্লেখ করেছেন [নাউযুবিল্লাহ]!

ঙ. বিচারক হিসেবে রসূলুল্লাহ (স)

কুরআন মজীদের এক স্থানে নয় বরং অসংখ্য স্থানে আল্লাহ্ তায়ালা এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন যে, তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক নিয়োগ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

"[হে নবী!] আমরা এই কিতাব পূর্ণ সত্যতাসহকারে তোমার উপর নাযিল করেছি, যেনো আল্লাহ্ তোমাকে যে সত্যপথ দেখিয়েছেন, তদনুসারে লোকদের মধ্যে মীমাংসা করতে পারো।" [নিসা ঃ ১০৫]

"আর [হে নবী] বলো! আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেনো তোমাদের মাঝে সুবিচার করি।" [শূরা ঃ ১৫]

"ঈমানদার লোকদের কাজ তো এইযে, তাদেরকে যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হবে, যেনো রসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তখন তারা বলবে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।" [নূরঃ ৫১]

"তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সেদিকে এবং তাঁর রসূলের দিকে আসো, তখন এই মুনাফিকদের তুমি দেখতে পাবে যে, তারা তোমার নিকট আসতে ইতস্তত করছে এবং পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।" [নিসা ঃ ৬১]

"অতএব [হে নবী] তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনও ঈমানদার হতে পারেনা, যতক্ষণ তারা নিজেদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে না নিবে।" [নিসা ঃ ৬৫]

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হচ্ছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ংসিদ্ধভাবে অথবা মুসলমানদের নিযুক্ত বিচারক ছিলেননা, বরং আল্লাহ্ তায়ালার নিয়োগকৃত বিচারক ছিলেন। তৃতীয় আয়াতটি বলে দিচ্ছে, তাঁর বিচারক হওয়ার মর্যাদা বা পদ রিসালাতের পদ থেকে স্বতন্ত্র ছিলোনা বরং রসূল হিসেবে তিনি বিচারকও ছিলেন এবং একজন মুমিনের রিসালাতের প্রতি ঈমান তখন পর্যন্ত সঠিক ও যথার্থ হতে পারেনা যতক্ষণ না সে তাঁর এই মর্যাদার সামনেও শ্রবণ ও আনুগত্যের ভাবধারা গ্রহণ করবে। চতুর্থ আয়াতে "[আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন]" অর্থাৎ কুরআন এবং রসূল উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয় যে, মীমাংসা লাভের জন্য দুটি স্বতন্ত্র প্রত্যাবর্তন স্থল রয়েছে। [এক] কুরআন, আইন বিধান হিসেবে এবং [দুই] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচারক হিসেবে। আর এই দুই জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া মুনাফিকের কাজ, মুমিনের কাজ নয়। পঞ্চম আয়াতে সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে ব্যক্তি বিচারক হিসেবে না মানে সে মুমিনই নয়, এমনকি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত ফায়সালা সম্পর্কে যদি কোনো ব্যক্তি নিজের অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব করে তবে তার ঈমান বরবাদ হয়ে যায়। কুরআন মজীদের এই সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরও কি আপনি বলতে পারেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসূল হিসেবে বিচারক ছিলেননা বরং দুনিয়ার সাধারণ জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের ন্যায় তিনিও একজন বিচারক ছিলেন মাত্র? তাই তাদের ফায়সালাসমূহের ন্যায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালা ও আইনের উৎস হতে পারেনা? দুনিয়ার কোনো বিচারকের কি এরূপ মর্যাদা হতে পারে যে, তার ফায়সালা যদি কেউ

না মানে, অথবা তার সমালোচনা করে অথবা অন্তরে তাকে ভ্রান্ত মনে করে তবে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়?

চ. রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রসূলুল্লাহ (স)

কুরআন মজীদ একইভাবে বিস্তারিত আকারে এবং পুনরুক্তি সহকারে অসংখ্য স্থানে একথা বলেছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিযুক্ত রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন এবং তাঁকে রসূল হিসেবেই এই পদ প্রদান করা হয় ঃ

> "আমরা যে রসূলই পাঠিয়েছি তাকে এজন্যই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র অনুমোদন [Sanction] অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে।" [নিসাঃ ৬৪]

> "যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করলো, সে মূলত আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করলো।" [নিসা ঃ ৮০]

> "[হে নবী] যেসব লোক তোমার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে তারা মূলত আল্লাহ্‌র নিকটই বাইয়াত গ্রহণ করে।" [আল ফাতাহ ঃ ১০]

> "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো এবং রসূলেরও আনুগত্য করো, নিজেদের আমল বিনষ্ট করোনা।"' [মুহাম্মদ ঃ ৩৩]

> "কোনো মুমিন পুরুষ ও কোনো মুমিন স্ত্রীলোকের এই অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন তখন সে নিজের সেই ব্যাপারে নিজে কোনো ফায়সালা করার এখতিয়ার রাখবে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণ করবে, সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হলো।" [আহ্‌যাব ঃ ৩৬]

> "হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র, আনুগত্য করো রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন তাদেরও। অতপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয় তবে তা আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো।" [নিসা ঃ ৫৯]

এসব আয়াত পরিষ্কার বলছে যে, রসূল এমন কোনো রাষ্ট্রনায়ক নন যিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের স্বয়ং কর্ণধার হয়ে গেছেন, অথবা লোকেরা তাঁকে নির্বাচন করে রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়েছে। বরং তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত রাষ্ট্রপ্রধান। তাঁর রাষ্ট্রনায়কসুলভ কাজ তাঁর রিসালাতের পদমর্যাদা থেকে ভিন্নতর কোনো জিনিস নয়। বরং তাঁর রসূল হওয়াটাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর অনুগত রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার নামান্তর। তাঁর আনুগত্য করা হলে তা মূলত আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করা হলো। তাঁর নিকট বাইয়াত হওয়াটা মূলত আল্লাহ্‌র নিকট বাইয়াত হওয়ার শামিল। তাঁর আনুগত্য না করার অর্থ আল্লাহ্‌র অবাধ্যাচরণ এবং এর পরিণতি হলো ব্যক্তির কোনো কার্যক্রমই আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়া। পক্ষান্তরে ঈমানদার সম্প্রদায়ের [যার মধ্যে বাহ্যত সমগ্র উম্মাহ্, তাদের শাসকগোষ্ঠী ও তাদের "জাতির কেন্দ্রবিন্দু" সব অন্তর্ভুক্ত]

সর্বোতভাবেই এ অধিকার নেই যে, কোনো বিষয়ে আল্লাহ্‌র রসূলের সিদ্ধান্ত দেয়ার পর তারা ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

এসব সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থেকে আরও অগ্রসর হয়ে সর্বশেষ আয়াত চূড়ান্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে যার মধ্যে পরপর তিনটি আনুগত্যের হুকুম দেয়া হয়েছে ঃ

১. সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র আনুগত্য।

২. অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য।

৩. অতপর তৃতীয় পর্যায়ে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আনুগত্য।

এর পূর্বেকার কথা থেকে জানা গেলো যে, রসূল উলিল আমর [সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ] এর অন্তর্ভুক্ত নন বরং তার থেকে পৃথক ও উর্ধ্বে এবং তাঁর স্থান আল্লাহ্‌র পরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এ আয়াত থেকে দ্বিতীয় যে কথা জানা যায় তাহলো, উলিল আম্‌রের সাথে বিতর্ক ও মতপার্থক্য হতে পারে, কিন্তু রসূলের সাথে বিতর্ক বা মতপার্থক্য হতে পারেনা। তৃতীয়ত, জানা গেলো যে, বিতর্ক ও মতবিরোধের ক্ষেত্রে মীমাংসার জন্য দুটি প্রত্যাবর্তনস্থল রয়েছেঃ [এক] আল্লাহ্‌ [দুই] অতপর আল্লাহ্‌র রসূল। প্রকাশ থাকে যে, যদি প্রত্যাবর্তনস্থল শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ হতেন, তবে সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ সম্পূর্ণ অর্থহীন হতো। তাছাড়া আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থ যখন আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি প্রত্যাবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থও আর কিছুই হতে পারেনা যে, রিসালাতের যুগে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রত্যাবর্তন এবং এই যুগের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[১]

সুন্নাহ্‌ আইনের উৎস হওয়ার বিষয়ে উম্মতের ইজমা

এখন আপনি যদি বাস্তবিকই কুরআন মজীদকে মানেন এবং এই পবিত্র গ্রন্থের নাম নিয়ে আপনার নিজের মনগড়া মতবাদের অনুসারী না হয়ে থাকেন তবে দেখে নিন যে, কুরআন মজীদ পরিষ্কার, সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন বাক্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্‌ তায়ালার পক্ষ থেকে নিযুক্ত শিক্ষক, অভিভাবক, নেতা, পথ প্রদর্শক, আল্লাহ্‌র কালামের ভাষ্যকার, আইন প্রণেতা [Law Giver] বিচারক, প্রশাসক ও রাষ্ট্রনায়ক সাব্যস্ত করছে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসমস্ত পদ এই পাক কিতাবের আলোকে রিসালাতের পদের অবিচ্ছেদ্য অংগ। কালামে পাকের এই ভাষণের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত

---

১. বরং যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখা হয় তবে জানা যায় যে স্বয়ং রিসালাতের যুগেও ব্যাপক অর্থে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের সুন্নাতই ছিলো প্রত্যাবর্তন স্থল। কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ যুগে ইসলামী রাষ্ট্র গোটা আরব উপদ্বীপে বিস্তার লাভ করেছিলো। দশ বারো লাখ বর্গমাইললের এই দীর্ঘ ও প্রশস্ত দেশে প্রতিটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত সরাসরি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে গ্রহণ করা কোনোক্রমেই সম্ভব ছিলোনা। অধিকন্তু এই যুগেও ইসলামী রাষ্ট্রের গভর্ণরগণ, বিচারকগণ এবং প্রশাসকগণকে বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কুরআন মজীদের পরে আইনের দ্বিতীয় যে উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হতো, তা ছিলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই সুন্নাত।

সমস্ত মুসলমান একমত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বীকার করেন যে, উপরোক্ত সমস্ত পদের অধিকারী হিসেবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করেছেন তা কুরআন মজীদের পরে আইনের দ্বিতীয় উৎস [Source of Law]

সুন্নাহ্কে সরাসরি আইনের একটি উৎস হিসেবে মেনে নেয়ার পর এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তা জানার উপায় কি? আমি এর জবাবে বলতে চাই, আজ চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে যাবার পর এই প্রথমবারের মতো আমরা এ প্রশ্নের সম্মুখীন হই যে, দেড় হাজার বছর পূর্বে যে নবূয়্যতের আবির্ভাব হয়েছিলো তা কি সুন্নাত রেখে গেছে? দুটি ঐতিহাসিক সত্য কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায়না।

১. কুরআন মজীদের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর যে সমাজ ইসলামের প্রথম দিন থেকে কায়েম হয়েছিলো, তা সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে জীবন্ত রয়েছে, তার জীবনে একটি দিনেরও বিচ্ছিন্নতা ঘটেনি এবং তার সমস্ত বিভাগ ও সংস্থা এই পুরো সময়ে উপর্যুপরি কাজ করে আসছে। আজ সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে আকীদা বিশ্বাস, চিন্তাপদ্ধতি, চরিত্র, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ইবাদত ও পারস্পরিক সামাজিক লেনদেন, জীবনপদ্ধতি ও জীবনপন্থার দিক থেকে যে গভীর সামঞ্জস্য বিরাজ করছে, যার মধ্যে মতভেদের উপাদানের চাইতে ঐক্যের উপাদান বেশী পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে, যা তাদেরকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও একটি উম্মতের অন্তর্ভুক্ত রাখার সবচেয়ে বড় বুনিয়াদী কারণ- এগুলোই একথার পরিষ্কার প্রমাণ যে, এই সমাজকে সুন্নতের উপরই কায়েম করা হয়েছিলো এবং সেই সুন্নাত শতাব্দীর পর শতাব্দীর দীর্ঘতায় অব্যাহতভাবে জারী রয়েছে। এটা কোনো হারানো বা বিলুপ্ত জিনিস নয় যা অনুসন্ধান করার জন্য আমাদেরকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়াতে হবে।

যেমন আমি বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করে এসেছি যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবূয়্যতকালে মুসলমানদের জন্য শুধু একজন পীর, মুরশীদ ও বক্তাই ছিলেন বরং কার্যত তাদের দলের নেতা, পথপ্রদর্শক, শাসক, বিচারক, আইনপ্রণেতা, অভিভাবক, মুরব্বী, শিক্ষক সবকিছুই ছিলেন এবং আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁরই দেখানো, শিখানো ও নির্ধারিত পন্থায় মুসলিম সমাজ কাঠামো পরিপূর্ণরূপে গঠিত হয়েছিলো। তাই এরূপ কখনো ঘটতে পারেনি যে, তিনি নামায, রোযা, হজ্জের নিয়মাবলীর যে শিক্ষাদান করেছেন কেবল সেগুলো মুসলমানদের মধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে এবং তাঁর অবশিষ্ট শিক্ষা ওয়াজ নসীহত হিসেবে শ্রবণ করে মুসলমানরা ঐ পর্যন্তই ক্ষ্যান্ত হয়ে গেছে। কখনোও নয় বরং বাস্তবিকপক্ষে যা কিছু হয়েছে তা এই যে, তাঁর শিখানো নামায যেভাবে মসজিদে চালু হয়েছে এবং ঐ সময় নামাযের জামায়াত কায়েম হতে থাকে অনুরূপভাবে বিবাহ শাদী, তালাক ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে যেসব বিধান তিনি নির্ধারণ করেন তা মুসলমানদের পরিবারে বলবৎ হতে থাকে। পারস্পরিক লেনদেনের যে নীতিমালা তিনি নির্ধারণ করেন তা বাজারে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চালু হয়ে যায়। মামলা মোকাদ্দমার যেসব রায় তিনি প্রদান করেন তাই দেশের আইনে পরিণত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি শত্রুপক্ষের

সাথে এবং বিজয়ের পর বিজিত এলাকার অধিবাসীদের যে ব্যবহার করেন তাই মুসলিম রাষ্ট্রের সংবিধানে পরিণত হয়। স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব নীতিমালার প্রচলন করেন অথবা পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতিনীতির মধ্যে যেগুলো তিনি বহাল রেখে ইসলামী নীতিমালার অংশে পরিণত করেন সামগ্রিকভাবে ইসলামী সমাজ ও জীবন ব্যবস্থা তার সমস্ত দিক ও বিভাগসহ সেই নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ছিলো জ্ঞাত ও সুপরিচিত সুন্নাহ্, যার ভিত্তিতে মসজিদ থেকে নিয়ে পরিবার, বংশ, হাট বাজার, ব্যবসা বাণিজ্য, বিচার ব্যবস্থা, সরকারী প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি পর্যন্ত মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনের যাবতীয় সংস্থা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই কার্য পরিচালনা করতে থাকে। পরবর্তীকালে খিলাফতে রাশিদার যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আমাদের সামগ্রিক সংস্থার কাঠামো তার উপর ভিত্তিশীল রয়েছে। গত শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতায় এক দিনের জন্যও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়নি। এরপর যদি কোনো বিচ্ছিন্নতা এসে থাকে তাহলে সেটা কেবল সরকার ও বিচার ব্যবস্থা এবং গণ আইনের সংস্থাসমূহের কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কারণেই হয়েছে।...... এসবের [সুন্নাতের] ব্যাপারে একদিকে হাদীসের নির্ভরযোগ্য রিওয়াতের এবং অপরদিকে উম্মাতের অব্যাহত ও ধারাবাহিক আমল উভয়টি পরস্পরের সাথে সংগতিপূর্ণ রয়েছে।

২. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর থেকে প্রতিটি যুগের মুসলমানগণ প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত সুন্নাহ অর্থাৎ সহীহ হাদীসসমূহ অবগত হওয়ার অবিরাম চেষ্টায় রত থাকেন। একদিকে ছিলো সুপ্রসিদ্ধ হাদীসসমূহ যে সম্পর্কে আমি উপরে আলোচনা করেছি এবং অপরদিকে ঐসব হাদীস ব্যতীত অপর এক প্রকারের হাদীস ছিলো যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় প্রসিদ্ধি এবং সাধারণ প্রচলন লাভ করতে পারেনি এবং যেগুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত, বক্তব্য, আদেশ নিষেধ, অনুমোদন [তাকরীর][১] ও অনুমতি অথবা কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে বা শ্রবণ করে ব্যক্তি বিশেষের গোচরে বা জ্ঞানে এসেছে এবং সর্বসাধারণ এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেনি..... এসব সুন্নাতের জ্ঞান যা বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো, মুসলিম উম্মাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরপরই তা সংগ্রহের কাজ ধারাবাহিকভাবে শুরু করে দেন। কেননা ফকীহগণ, প্রশাসকগণ, বিচারকগণ, মুফতীগণ ও জনসাধারণ সবাই নিজ নিজ কর্মসীমার মধ্যে উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে নিজস্ব রায় বা ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত বা কর্মপন্থা গ্রহণ করার পূর্বে ঐ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো পথনির্দেশ বর্তমান আছে কিনা তা অবগত হওয়া জরুরী মনে করতেন। এই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এমন প্রতিটি লোকের অনুসন্ধান শুরু হয়ে গেলো যার কাছে সুন্নতের কোনো জ্ঞান

---

১. পরিভাষায় অনুমোদন [তাকরীর]-এর অর্থ এইযে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপস্থিতিতে কোনো কাজ হতে দেখেছেন, অথবা কোনো প্রথার প্রচলন হয়েছে এবং তিনি তা নিষেধ করেননি। ভিন্ন শব্দে তাকরীর বলতে বুঝায় কোনো জিনিসকে বা কোনো বিষয়কে বহাল রাখা।

বর্তমান আছে এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার কাছে এধরনের জ্ঞান বর্তমান ছিলো তা অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া নিজের জন্য ফরয মনে করতো। হাদীসের রিওয়াতের এটাই সূচনাবিন্দু এবং ১১ হিজরী থেকে তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত এই বিক্ষিপ্ত সুন্নতগুলো একত্র করার কাজ অব্যাহত থাকে। জাল হাদীস [মুওদুয়াত] রচনাকারীরা এর মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটানোর যতোই চেষ্টা করেছে তা প্রায় সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে। কেননা যে সুন্নতের সাহায্যে কোনো অধিকার [হক] প্রতিষ্ঠা অথবা প্রত্যাখ্যাত হতো, যার ভিত্তিতে কোনো জিনিস হালাল অথবা হারাম সাব্যস্ত হতো, যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য প্রমাণিত হতো অথবা কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি খালাস পেতে পারতো, মোটকথা যেসব সুন্নাত আইন কানুনের উৎস ছিলো সে সম্পর্কে কোনো রাষ্ট্র সরকার, বিচার বিভাগ এবং ফতুয়া বিভাগ এতোটা বেপরোয়া হতে পারতোনা যে, কোনো ব্যক্তি এমনি উঠে দাঁড়িয়েই বলে দেবে যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন" এবং কোনো প্রশাসক, অথবা বিচারক অথবা মুফতী তা মেনে নিয়ে এর ভিত্তিতে কোনো নির্দেশ জারী করবে। এজন্য আইন কানুনের সাথে যেসব সুন্নতের সম্পর্ক ছিলো সে সম্পর্কে পূর্ণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সমালোচনার ধারালো ছুরি দিয়ে তাতে অস্ত্রপচার করা হয়েছে, রিওয়াতের মূলনীতির ভিত্তিতে তা পরখ করা হয়েছে এবং দিরায়াতের [বুদ্ধি বিবেক] মূলনীতির ভিত্তিতেও। এবং যেসব তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে কোনো রিওয়ায়াতকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে সেসবও জমা করে রেখে দেয়া হয়েছে যাতে পরবর্তীকালেও যেকোনো ব্যক্তি তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে নিজের অনুসন্ধানী রায় কায়েম করতে পারে। তাদের জন্য যেহেতু সুন্নাহ আইন হওয়ার মর্যাদায় সমাসীন ছিলো, তার ভিত্তিতে তাদের আদালতগুলোকে বিচার মীমাংসা করতে হতো এবং তাদের ঘর থেকে নিয়ে রাষ্ট্র পর্যন্ত বিষয়াবলী তার ভিত্তিতে পরিচালিত হতো, তাই এগুলোর আলোচনা পর্যালোচনা ও তত্ত্বানুসন্ধানের ক্ষেত্রে বেপেরোয়া হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলোনা। এই তত্ত্বানুসন্ধানের উপায় উপকরণও এবং তার ফলাফলও ইসলামের প্রথম খিলাফতের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রজন্ম পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি এবং প্রত্যেক যুগের লোকদের কাজ কোনো বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই সংরক্ষিত রয়েছে।

এই দুটি সত্যকে যদি কোনো ব্যক্তি উত্তমরূপে হৃদয়ংগম করে নেয় এবং সুন্নাহ্ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার উপায় উপকরণ সম্পর্কে যথারীতি পান্ডিত্যপূর্ণ অধ্যয়ন করে তবে সে কখনও এই সন্দেহের শিকার হতে পারেনা যে, এটা কোনো অসমাধানযোগ্য গোলক ধাঁধাঁ যার মধ্যে সে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।

৩. খিলাফাতে রাশিদার কার্যকম এবং উম্মাহ্র মুজতাহিদ আলেমগণের সিদ্ধান্ত

ইসলামী সংবিধানের তৃতীয় উৎস হচ্ছে খিলাফতে রাশিদার কার্যক্রম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খোলাফায়ে রাশেদীন যেভাবে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, তার নজীর ও ঐতিহ্যের বিস্তারিত বিবরণে হাদীস, ইতিহাস ও জীবন চরিতের বিরাট গ্রন্থসমূহ পরিপূর্ণ এবং এসব জিনিসই আমাদের জন্য নমুনা হিসেবে অনুসরণযোগ্য। ধর্মীয় বিধান ও নির্দেশনার যে ব্যাখ্যা সাহাবায়ে কিরাম

সর্বসম্মতিক্রমে করেছেন (ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলে ইজ্মা) এবং সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয়সমূহে খোলাফায়ে রাশেদীন সাহাবাদের সাথে পরামর্শক্রমে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা আমাদের জন্য অকাট্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য এবং তাকে যথাযথভাবেই মেনে নিতে হবে। কারণ কোনো ব্যাপারে সাহাবাদের মতৈক্য হওয়ার অর্থ এই যে, তা ইসলামী আইনের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা এবং বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কর্মপদ্ধতি। যে বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে সে বিষয়ে যে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে তা পরিষ্কার বুঝা যায়। এসব বিষয়ে যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে একটি মতকে অপর মতের উপর অগ্রাধিকার দেয়া যায়। কিন্তু যেখানে তাঁদের পরিপূর্ণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে তাঁদের সিদ্ধান্ত অনিবার্যরূপে একই ব্যাখ্যা এবং একইরূপ কর্মনীতিকে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ করে। কারণ তাঁরা সরাসরি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাত্র এবং তাঁর নিকট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। কাজেই তাঁদের সকলের সমবেতভাবে দীনের ব্যাপারে ভুল করা কিংবা দীন ইসলামকে বুঝার ও হৃদয়ংগম করার ব্যাপারে সঠিকপথ হতে বিচ্যুত হওয়া কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

চতুর্থ উৎস হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্‌র মুজতাহিদগণের সেসব ফায়সালা যা তারা (কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে) নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির আলোকে বিভিন্ন সাংবিধানিক সমস্যার সমাধানে পেশ করেছেন। মুজতাহিদদের সেসব সিদ্ধান্ত ইসলামী শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ না হলেও ইসলামী সংবিধানের প্রাণসত্তা এবং এর নীতিমালাসমূহ অনুধাবন করার জন্য আমাদেরকে নির্ভুল ও সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দান করে।

এই চারটি হচ্ছে আমাদের ইসলামী সংবিধানের উৎস। ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন করতে হলে উল্লিখিত চারটি উৎস থেকেই এর যাবতীয় নীতিমালা একত্র করে তা প্রণয়ন করতে হবে। ঠিক যেমন ইংরেজদেরকে তাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে তাদের প্রণীত আইন [State Law, Common Law] এবং তাদের সাংবিধানিক প্রথা ও ঐতিহ্য [Conventions of the Constitution] হতে এক একটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত গ্রহণ করে কাগজে লিখতে হয় এবং অনেক শাসনতান্ত্রিক বিধান ও নীতিমালা তাদেরকে তাদের আদালতসমূহের 'রায়' হতে বেছে বেছে গ্রহণ করতে হয়।[১]

৪. সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

ইসলামী সংবিধানের উল্লিখিত চারটি উৎসই লিখিতভাবে আমাদের কাছে বর্তমান আছে। কুরআন মজীদ তো লিখিতভাবে মুসলমানদের ঘরে ঘরে রয়েছে। "সুন্নতে রসূল" এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের কার্যক্রম সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। অতীতকালের মুজতাহিদদের সিদ্ধান্ত ও মতামতসমূহও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীতে

---

১. ইসলামী আইন প্রসংগে অন্যান্য আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য এই লেখকের "ইসলামী আইন" শীর্ষক গ্রন্থ [সংকলক]।

লিপিবদ্ধ আছে। এগুলোর মধ্যে একটি জিনিসও দুর্বল নয় এবং দুষ্প্রাপ্যও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব উৎস হতে এই অলিখিত সংবিধানের নীতিমালা উদ্ধার করে তাকে লিখিত রূপদান করার ব্যাপারে কয়েকটি সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আমি চাই যে, সম্মুখে অগ্রসর হবার পূর্বে এই কথাগুলো আপনারা গভীরভাবে হৃদয়ংগম করে নিন।

ক. পরিভাষার অসুবিধা

এই প্রসংগে সর্বপ্রথম হচ্ছে ভাষার অসুবিধা। কুরআন, হাদীস এবং ফিক্‌হ গ্রন্থাবলীতে সাংবিধানিক আইনের বর্ণনা দেয়ার জন্য যেসব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, বর্তমানে তা জনগণের নিকট প্রায় দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। কারণ দীর্ঘকাল ধরে আমাদের এখানে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এসব পরিভাষার ব্যবহার বর্জিত হয়েছে। কুরআন মজীদে এমন অসংখ্য শব্দ রয়েছে যা আমরা দৈনন্দিন তিলাওয়াত করি, কিন্তু একথা জানিনা যে, এগুলো সাংবিধানিক পরিভাষা। যথা, সুলতান, মালিক, হুকুম, আমর, বিলায়েত ইত্যাদি। এমনকি এই শব্দগুলোর সাংবিধানিক অর্থ ও ভাব আরবীতেও খুব কম লোকই বুঝতে পারে। অন্য কোনো ভাষায় তার অনুবাদ করলে তো তার সম্পূর্ণ অর্থই বিকৃত হওয়ার আশংকা রয়েছে। ঠিক এজন্যই অনেক বড় বড় লেখাপড়া জানা পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের সাংবিধানিক আইনের আলোচনা শুনে বিস্মিত হন এবং "কুরআনের কোন্ আয়াত হতে সংবিধান সম্পর্কে তথ্য জানা যায়" বলে বিস্ময়সূচক প্রশ্ন করে বসেন। বস্তুতপক্ষে এ লোকদের বিস্ময় এবং প্রশ্নের মূলীভূত কারণ এই যে, যেহেতু 'সংবিধান' [The Constitution] নামে কোনো সূরা কুরআন মজীদে বিদ্যমান নাই এবং বিংশ শতকের পরিভাষা অনুসারে কোনো আয়াতও নাযিল হয়নি।

খ. প্রাচীন ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহের হতাশাজনক সংকলন

আরেকটি অসুবিধা হলো আমাদের প্রাচীন ফিক্‌হশাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে সংবিধান সম্পর্কীয় বিষয়সমূহকে আলাদাভাবে কোথাও পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়ক্রমে সংকলিত করা হয়নি, বরং সংবিধান ও আইন তাতে পরস্পরের সাথে মিশ্রিতভাবে লিখিত হয়েছে। আপনারা জানেন, সংবিধান ও আইন সম্পর্কে আলাদা আলাদা ধারণা বহু পরবর্তী যুগের উদ্ভূত ব্যাপার বরং সংবিধান শব্দটিকে তার নতুন অর্থে ব্যবহারও সম্প্রতি শুরু হয়েছে। অবশ্য একথা সত্য যে, যেসব ব্যাপারকে আমরা এখন সংবিধান সংক্রান্ত ব্যাপার বলে মনে করি, সে সকল বিষয়ে প্রাচীন ফিক্‌হবিদগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু মুশকিল হলো, তাদের এসব আলোচনা বড় বড় ফিক্‌হের কিতাবের বিভিন্ন অধ্যায়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। একটি বিষয়ে 'কাযা' [বিচার] অধ্যায়ে আলোচনা হলে অন্যটি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে 'ইমারত' [সরকার] অধ্যায়ে। একটি বিষয় 'সিয়ার' [যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত] অধ্যায়ে লিখিত হলে অন্যটি আলোচিত হয়েছে "হুদূদ" [ফৌজদারী আইন] অধ্যায়ে। আবার অন্য বিষয়ের আলোচনা হয়েছে ফাই [পাবলিক ফিনান্স] অধ্যায়ে। এতদ্ব্যতীত এগুলোর ভাষা ও পরিভাষা অধুনা প্রচলিত ভাষা ও

পরিভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। আইনের বিভিন্ন বিভাগ এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর পান্ডিত্ব যার নেই এবং আরবী ভাষার উপরও যার ব্যুৎপত্তি যথেষ্ট নয়, সে তা থেকে কোনো তথ্যই খুঁজে বের করতে পারবেনা। কোনোখানে দেশীয় আইনের আলোচনা ব্যাপদেশে আন্তর্জাতিক আইনের কোনো বিষয়ের প্রসংগ এসে গেলে কোথায় ব্যক্তিগত [Private] আইনের আলোচনা প্রসংগে হলে তা উপলব্ধি করা তার পক্ষে খুবই কঠিন। বিগত শতাব্দীসমূহে আমাদের সমাজের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞগণ অতিমূল্যবান সম্পদ রেখে গিয়েছেন, কিন্তু আজ তাদের পরিত্যাক্ত এসব মূল্যবান সম্পদ যাচাই বাছাই করে প্রত্যেক বিভাগের আইন সম্পর্কীয় তথ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সন্নিবেশিত করা এবং স্বচ্ছ ও সুপরিস্ফুট করে জনসমক্ষে পেশ করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এরূপ সাধনালব্ধ সম্পদ আহরণ করার জন্য আমাদের যুবসমাজ মোটেই আগ্রহান্বিত ও অগ্রসর হচ্ছেনা। যুগ যুগ ধরে তারা অপরের উচ্ছিষ্টাংশ পেয়ে যথেষ্ট তুষ্ট। শুধু তাই নয়, তাদের পূর্বপুরুষদের রক্ষিত এই মূল্যবান সম্পদকে তারা অজ্ঞাতসারে উপেক্ষা করছে, এর প্রতি ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে।

গ. শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রটি

তৃতীয় সমস্যা হলো, আমাদের এখানে শিক্ষা ব্যবস্থা সুদীর্ঘ কাল ধরে দোষ ক্রটিতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। আমাদের এখানে যারা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন তারা বর্তমান কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাজনৈতিক বিষয়াবলী এবং সাংবিধানিক আইন ও তার সাথে সংশিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাই তারা কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং বুঝাতে ও বুঝাতে যদিও জীবন অতিবাহিত করে দেন, কিন্তু বর্তমান যুগের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিষয়সমূহ আধুনিক কালের ভাষা ও পরিভাষায় অনুধাবন করা এবং সে সম্পর্কে ইসলামের নীতি ও বিধান সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা তাদের পক্ষে বড়ই মুশকিল ব্যাপার। তারা যে ভাষা ও পরিভাষা বুঝেন সে ভাষা ও পরিভাষায় এসব বিষয় তাদের সামনে তুলে ধরলে কেবল তখনই তারা তা বুঝতে সক্ষম হতে পারেন। তারপরই তারা বলতে পারেন যে, এসব সম্পর্কে ইসলামের নীতি এবং বিধান কি এবং তা কোথায় কোথায় আলোচিত হয়েছে।

অন্যদিকে আমাদের আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা কার্যত আমাদের রাজনীতি ও তমদ্দুন এবং আইন ও আদালতের সমগ্র বিভাগের উপর ঝেঁকে বসে আছেন। এরা জীবনের আধুনিক সমস্যা সম্পর্কে তো ওয়াকিফহাল, কিন্তু দীন ইসলাম সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তাদের কি পথ নির্দেশ দিয়েছে সে ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সংবিধান, রাজনীতি ও আইন সম্পর্কে তারা যা কিছু জানে তা সবই পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও পাশ্চাত্যের বাস্তব নমুনার সাহায্যেই জ্ঞাত। কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। কাজেই তাদের মধ্যে যারা বাস্তবিকই সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা চান, তাদেরকেও এসব বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ ও বিধি বিধান যে ভাষা ও পরিভাষা তারা বুঝতে পারে সে ভাষা ও পরিভাষায় বুঝিয়ে দিলেই তখন তারা তা হৃদয়ংগম করতে পারেন। কাজেই ইসলামী সংবিধান প্রণয়নের পথে বর্তমানে এটা অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে রেখেছে।

ঘ. অজ্ঞদের ইজতিহাদ করার দাবী

চতুর্থ আর একটি সমস্যা রয়েছে যা বাড়তে বাড়তে বর্তমানে একটি কৌতুকে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে একটি অদ্ভূত চিন্তারধারার উন্মেষ ঘটেছে যে, ইসলামে পৌরহিত্যবাদের কোনো অবকাশ নেই, কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়াতের উপর মোল্লার একচ্ছত্র আধিপত্য নেই যে, তারাই এর ব্যাখ্যা করবে। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ইজতিহাদ করতে মোল্লাদের যেরূপ অধিকার আছে, আমাদেরও তদ্রূপ অধিকার আছে। দীন ইসলাম সম্পর্কে মোল্লাদের কোনো কথা আমাদের কথার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হওয়ারও কোনোই কারণ নেই।

বস্তুত এসব কথা এমন লোকেরা বলে বেড়ায় যারা না কুরআন ও সুন্নাতের ভাষা জানে, না ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের কিছুমাত্র ধারণা আছে, আর না তারা জীবনের কয়েকটি দিনও ইসলামের তথ্যানুসন্ধানে ব্যয় করেছে। তাদের জ্ঞানের এই ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা অনুভব করা এবং তা দূর করার পরিবর্তে তারা কুরআন হাদীস তথা ইসলাম সম্পর্কে ইজতিহাদ করার ব্যাপারে জ্ঞান থাকার আবশ্যকতাকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে। তারা জেদ ধরেছে যে, ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী হওয়া ব্যতিরেকেই তাদের মনগড়া ব্যাখ্যার দ্বারা ইসলামের অবয়বকে বিকৃত করার অধিকার তাদের দিতে হবে।

কিন্তু [ইসলাম সম্পর্কে] অজ্ঞতা ও মূর্খতার এই প্লাবনকে বাধা না দিয়ে যদি অগ্রসর হতে দেয়া হয় তবে এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। কালই হয়তো কেউ বলে উঠবে, ইসলামে "উকিলবাদের" স্থান নেই। অতএব আইন সম্পর্কে প্রত্যেকেরই কথা বলার অধিকার আছে। আইন সম্পর্কে সে যদি একটি অক্ষরও না পড়ে থাকে তবুও তাকে সে অধিকার দিতে হবে। তারপর আর একদিন হয়তো কেউ বলবেঃ ইসলামে "প্রকৌশলবাদ" নেই, কাজেই ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে সকলেই কথা বলতে পারবে যদিও এই শাস্ত্রের কিছুই তার জানা নেই। এরপর আবার আর একজন দাঁড়িয়ে বলতে পারে যে, ইসলামে চিকিৎসা বিদ্যাও কেবল ডাক্তারদের একচেটিয়া উপজীবিকা নয়, রোগীদের চিকিৎসা করার অধিকার তাদেরও আছে যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাতাসও তাদের স্পর্শ করেনি। আমি অত্যন্ত স্তম্ভিত যে, আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ও মহাসম্মানিত ব্যক্তিগণ কিভাবে উক্তরূপ হাস্যকর ও বালকোচিত কথা বলতে এগিয়ে এসেছেন। এবং কেন তারা নিজেদের গোটা জাতিকে এরূপ "অপদার্থ" মনে করে নিয়েছেন যে, তাদের এসব অন্তঃসারশূণ্য হাস্যকর কথা শুনে তারা তা শিরধার্য করে নিবে। নিঃসন্দেহে ইসলামে পৌরহিত্যবাদ নেই। কিন্তু এই পৌরহিত্যবাদ না থাকার অর্থ কি, তা কি তারা জানে? এর অর্থ কেবল এই যে, ইসলামে বনী ইসরাঈলের ন্যায় দীন ইসলামের জ্ঞান এবং দীন ইসলামের খিদমতের কাজ কোনো বংশ বা গোত্রের একচেটিয়া পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। ইসলামে খৃষ্টধর্মের ন্যায় দীন ও দুনিয়াকে পরস্পর বিচ্ছিন্নও করা হয়নি যে, "দুনিয়া কায়জারের নিকট সোপর্দ করা হয়েছে এবং দীন পাদ্রীদের নিকট ইজারা দেয়া হয়েছে। ইসলামে কুরআন, সুন্নাহ্ এবং শরীয়তের উপর কারো ব্যক্তিগত ইজারাদারী নেই এবং "মোল্লা" কোনো বংশ বা গোত্রের নাম নয় যে, দীন ইসলামের

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার তার পৈত্রিক অধিকার। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন আইন পড়ে উকিল ও জজ হতে পারে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিই ইঞ্জিনিয়ার ও চিকিৎসা বিজ্ঞান শিখে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিই ডাক্তার হতে পারে, তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞান শিক্ষালাভ করার জন্য সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করে শরীয়তের ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে কথা বলার অধিকার অর্জন করতে পারে। ইসলামে 'পৌরহিত্যবাদ' নেই- এই কথাটির কোনো বুদ্ধিসম্মত অর্থ থেকে থাকলে তা এটাই, ইসলামে পৌরহিত্যবাদ না থাকার অর্থ এই নয় যে, ইসলামকে ছেলেখেলা ব্যাপারে পরিণত করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, এখন যার ইচ্ছা উঠে দাড়িয়ে তার বিধান ও শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ সূলভ ফায়সালা প্রদান করতে শুরু করে দিবে, চাই সে কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা নাইবা করতে থাকুক। জ্ঞান ব্যতীত রায় দান করার অধিকারী হওয়ার দাবি দুনিয়ার কোনো ব্যাপারেই যদি গ্রহণযোগ্য না হয়ে থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত ইসলামের ব্যাপারে উক্তরূপ দাবী গ্রহণযোগ্য হবার মূলে কি যুক্তি থাকতে পারে?

ইসলামী সংবিধান প্রণয়ন ও ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণাকে অন্তর্হিত করার ক্ষেত্রে এই চতুর্থ বাধাটিও কমজটিলতার সৃষ্টি করেনি। আর সত্য কথা বলতে গেলে বর্তমানে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা। প্রথমে উল্লেখিত তিনটি বাধা চেষ্টা সাধনার দ্বারা দূর করা যেতে পারে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তা এক পর্যায় পর্যন্ত দূর করাও হয়েছে। কিন্তু এই নতুন জটিলতর চিকিৎসা বড়ই কঠিন, বিশেষত এই জটিলতা বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে তা আরও অধিক দূরুহ হয়ে পড়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিসমূহ

১ সার্বভৌমত্ব কার?

২ রাষ্ট্রের কর্মসীমা (অধিক্ষেত্র)

৩ রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কর্মসীমা বা অধিক্ষেত্র এবং এগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক

৪ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

৫ সরকার কিভাবে গঠিত হবে?

৬ শাসকের গুণাবলী ও যোগ্যতা

৭ নাগরিকত্ব ও তার ভিত্তিসমূহ

৮ নাগরিকদের অধিকার

৯ নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের অধিকার

১৯৫২ সালের ২৪ নভেম্বর করাচী বার এসোসিয়েশনের সভাপতি মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)কে ইসলামী সংবিধান বিষয়ে একটি আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন। এই আলোচনা সভার উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামী সংবিধান সম্পর্কে দেশের শিক্ষিত মহল, বিশেষত আইনজীবীদের মনে যে সংশয় ও জটিলতা রয়েছে তা দূর করার চেষ্টা করা। এই সময়টি দেশের ইতিহাসে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো এবং গোটা দেশে ইসলামী সংবিধান প্রণয়নের জোর দাবি চলছিলো। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে নাজিমুদ্দীন রিপোর্ট পেশ করার কথা ছিলো। কিন্তু গণদাবির প্রেক্ষিতে রিপোর্ট প্রকাশ এক মাসের জন্য মুলতবি করা হয়েছিলো। স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের মনে অনেক প্রশ্ন উত্থিত হয়েছিলো যার সদুত্তর প্রদান প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো। মাওলানা মওদূদী উক্ত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে কয়েক ঘন্টার আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে এই প্রয়োজন পূরণ করেন। মাওলানা মওদূদীর একটি ভাষণের মাধ্যমে আলোচনা সভার উদ্বোধন হয় এবং এই ভাষণে তিনি ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্টভাবে তোলে ধরেন। বক্তৃতা শেষে কয়েক ঘন্টা ধরে প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে মাওলানার সেই ভাষণের বাংলা তরজমা পেশ করা হচ্ছে। - সংকলক

ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিসমূহ

আমি সর্ব প্রথম সংবিধান ও ইসলামী রাষ্ট্রের কয়েকটি বড় বড় ও মৌলিক বিষয়ের উল্লেখ করে সংক্ষেপে বলবো যে, সে সম্পর্কে ইসলামের আসল উৎসে কি মুলনীতিগত নির্দেশ পাওয়া যায়? ইসলাম সাংবিধানিক ব্যাপারে কোনো পথনির্দেশ দান করে কিনা, করলে তা নিছক সুপারিশের পর্যায়ভুক্ত নাকি মুসলমানদের পক্ষে অপরিহার্য ও অবশ্য পালনীয় পথ নির্দেশ, এই সবই আমার পরবর্তী আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আমি বিস্তারিত আলোচনার দিকে না গিয়ে মোটামুটিভাবে সংবিধানের ৯টি মৌলিক ধারা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. প্রথম প্রশ্ন হলো, সার্বভৌমত্ব কার? কোনো বাদশাহর? নাকি কোনো শ্রেণীর? অথবা গোটা জাতির? নাকি আল্লাহ্ তায়ালার?

২. দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, রাষ্ট্রের কর্মসীমা [Jurisdiction] কি? রাষ্ট্র কতোদূর পর্যন্ত আনুগত্য পেতে পারে? এবং কোন্ সীমায় পৌঁছে তার আনুগত্য পাওয়ার অধিকার খতম হয়ে যায়?

৩. সংবিধান প্রসংগে তৃতীয় মৌলিক প্রশ্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কর্মসীমা সম্পর্কে। অর্থাৎ শাসনবিভাগ [Executive] বিচার বিভাগ [Judiciary] এবং আইনপরিষদ [Legislature] প্রভৃতির আলাদা আলাদা কর্মসীমা [Jurisdiction] কি হবে? এদের প্রত্যেকটি বিভাগ কি কর্তব্য এবং কি দায়িত্ব পালন করবে? কোন্ সীমার মধ্যে অবস্থান করবে এবং তারপর এদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের ধরন কি হবে?

৪. চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি? রাষ্ট্র কোন্ উদ্দেশ্যে কাজ করবে এবং এর শাসনপ্রণালীর মৌলিক নীতি কি হবে?

৫. পঞ্চম প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সরকার কিভাবে গঠন করা হবে?

৬. ষষ্ঠ প্রশ্ন হলো শাসকদের গুণাবলী ও যোগ্যতা [Qualifications] কি হবে? কোন্ ধরনের লোক প্রশাসন চালাবার যোগ্য বিবেচিত হবে?

৭. সপ্তম প্রশ্ন হলো, সংবিধানে নাগরিকত্বের ভিত্তি কি হবে? কিভাবে এক ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক পরিগণিত হবে এবং কিভাবে নয়?

৮. অষ্টম প্রশ্ন হলো, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কি?

৯. নবম প্রশ্ন, নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের কি কি অধিকার আছে?

যে কোনো দেশের সংবিধানে এই প্রশ্নগুলো সম্পূর্ণরূপে মৌলিক। ইসলাম এই প্রশ্নগুলোর কি জবাব দেয় তাই আমরা লক্ষ্য করে দেখবো।

১. সার্বভৌমত্ব কার?

সর্বপ্রথম আমরা দেখবো ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান সার্বভৌমত্বের [Sovereignty] স্থান কাকে দান করে?

এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট ও অকাট্য জবাব কুরআন মজীদ থেকেই আমরা জানতে পারি। তাহলো, সার্বভৌমত্ব যে কোনো অর্থে একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার জন্যই সংরক্ষিত। কারণ বস্তুতপক্ষে তিনিই প্রকৃত শাসক। অতএব এটা তাঁর অধিকার যে, কেবল তাঁকেই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী স্বীকার করতে হবে। এই বিষয়টি কেউ আরো গভীর ও ব্যাপকভাবে হৃদয়ংগম করতে চাইলে আমি তাকে পরামর্শ দেবো , প্রথমে তিনি যেনো সার্বভৌমত্বের অর্থ এবং ধারণাকে খুব ভালো ও পরিষ্কারভাবে বুঝে নেন।

সার্বভৌমত্বের অর্থ

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই শব্দটি উচ্চতর ক্ষমতা এবং নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তির বা ব্যক্তিসমষ্টির কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বভৌমত্বের অধিকারী হওয়ার অর্থ এই যে, তার নির্দেশই আইন। এই আইন রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর জারি করার সর্বময় কর্তৃত্ব তারই। নাগরিকরা তার শর্তহীন আনুগত্য করতে বাধ্য। তা ইচ্ছায় ও সাগ্রহে হোক কিংবা বাধ্য হয়ে। তার নিজের ইচ্ছা ব্যতীত বাইরের কোনো শক্তি তার শাসন ক্ষমতাকে বিন্দুমাত্র সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত করতে পারেনা। তার বিপরীতে নাগরিকদের কোনো অধিকার নেই। যার যা কিছু অধিকার আছে তা সবই একমাত্র তাঁরই দান। কাজেই যে অধিকার তিনি হরণ করবেন তা আপনা আপনিই লুপ্ত হয়ে যায়। আইনদাতা [Low Giver] যখন কারো অধিকার স্বীকার করেন তখনি তা আইনগত অধিকার বলে স্বীকৃত হয়। কাজেই 'আইনদাতা'ই যখন সেই অধিকার হরণ করে নিবেন, তখন মূলতঃই তার দাবি করার মতো কোনো অধিকার বাকী থাকবেনা। সার্বভৌমত্বের অধিকারীর ইচ্ছায়ই আইন অস্তিত্ব লাভ করে এবং তা নাগরিকদেরকে আনুগত্যের রজ্জুতে বেঁধে নেয়। কিন্তু স্বয়ং সার্বভৌমত্বের অধিকারীকে বাধ্য করার মতো কোনো আইন কোথাও নাই। সার্বভৌমত্বের অীধকারী তার নিজসত্তায় নিরংকুশ ও সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক। তার বিধান সম্পর্কে ভালো বা মন্দ, বিশুদ্ধ বা ভ্রান্ত- এই ধরনের কোনো প্রশ্নই উত্থাপিত হতে পারেনা। তিনি যা কিছুই করবেন তাই ভালো ও কল্যাণকর। তার অধীন কোনো ব্যক্তির পক্ষে তাকে 'মন্দ' বা "ভালো নয়" বলে বাতিল করে দেয়ার কোনো অধিকার নেই। তিনি যা কিছু করবেন তাই সঠিক, তার অধীনস্থ কেউ এটাকে 'ভ্রান্ত' আখ্যায়িত করতে পারেনা। সার্বভৌমত্বের অধিকারীকে "মহান পবিত্র, দোষত্রুটিমুক্ত এবং সকল প্রকার ভুলের উর্ধে" মেনে নিতে হবে, চাই তিনি এইসব গুণের অধিকারী হোন বা না হোন।

এই হলো আইনগত সার্বভৌমত্বের [Legal sovereignty] ধারণা। যা একজন আইনবিদ [ফকীহ বা Jurist] পেশ করেন এবং যার কম কোনো জিনিসের নাম "সার্বভৌমত্ব" নয়। কিন্তু এই সার্বভৌমত্ব একেবারে একটি কল্পিত বিষয় হিসেবে থেকে যায় যতক্ষণ না তার পশ্চাতে কোনো বাস্তব সার্বভৌমত্ব কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় "রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব" [Political sovereignty] বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ কার্যত সেই কর্তৃত্বের মালিক তিনি, যিনি এই আইনগত সার্বভৌমত্বকে প্রয়োগ করবেন।

প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্ব কার?

এখন প্রথমেই এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, উক্তরূপ কোনো সার্বভৌমত্ব বাস্তবিক পক্ষে মানবীয় পরিমন্ডলে বিদ্যমান আছে কি? যদি থেকে থাকে তবে তা কোথায়? এই সার্বভৌমত্বের মালিক কাকে বলা যেতে পারে?

কোনো রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাস্তবিকই কোনো বাদশাহ্ কি এরূপ সার্বভৌমত্বের মালিক হয়েছে বা কখনো পাওয়া গিয়েছে বা পাওয়া যেতে পারে? নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী যে কোনো বাদশাহ্র বা শাসন কর্তার কথাই চিন্তা করুন। তার ক্ষমতা ও এখতিয়ারের মূল্যায়ন করলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে, কতো দিক দিয়েই না সে বাঁধাগ্রস্ত এবং কতোভাবেই না অসংখ্য বহিঃশক্তি তার ইচ্ছা ও মর্জির বিরুদ্ধে তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখছে, তাকে অক্ষম করে দিচ্ছে।

তারপর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনোও স্থানে অংগুলি নির্দেশ করে তথায় "বাস্তব সার্বভৌমত্ব" আছে বলে দাবী করা যায় কি? যাকেই এই সার্বভৌমত্বের মালিক মনে করা হবে, পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, তার বাহ্যিক নিরংকুশ কর্তৃত্বের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে আরো কতকগুলো শক্তি বিদ্যমান আছে যাদের হাতে তার কর্তৃত্বের চাবিকাঠি নিহিত।

ঠিক এই কারণেই রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পন্ডিতগণ যখন সার্বভৌমত্বের সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে মানবসমাজে তার "প্রকৃত ধারকের" সন্ধান করেন, তখন তারা চরমভাবে দিশেহারা হয়ে পড়েন। সার্বভৌমত্বের যোগ্য কোনো ক্ষমতাধর সত্ত্বা খুঁজে পাওয়া যায়না। কারণ মানবতার পরিসীমায় বরং সত্য কথা এই যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের কোথাও সার্বভৌমত্বের প্রকৃত ধারক মোটেই বিদ্যমান নেই। তাই কুরআন মজীদ এই সত্যকে বার বার তুলে ধরেছে যে, বাস্তবিকপক্ষে সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক আল্লাহ, তিনি নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক [فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ]।[১] তিনি কারো নিকট দায়ী নন। কারো সম্মুখে তাকে জবাবদিহি করতে হয়না। لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ [২] তিনি সর্বময় ক্ষমতা, এখতিয়ার ও কর্তৃত্বের অধিপতি [بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ]।[৩] তিনি এমন এক সত্ত্বা, যার

---

১. "যা কিছু করতে চান তা সম্পূর্ণরূপে করতে পারেন।" [সূরা হূদ ঃ ১০৭]
২. "তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদকারী কেউ নেই। [সূরা আম্বিয়া ঃ ২৩]
৩. সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব তাঁর হাতে। [সূরা মুমিনুন ঃ ৮৮]

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সীমাবদ্ধ করতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই [وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ]।[4] তার সত্ত্বা সকল প্রকার দোষত্রুটি থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। [الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ][5]

সার্বভৌমত্ব কার অধিকার?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই উত্থাপিত হয় যে, প্রকৃত ব্যাপার যাই হোক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে যদি এই সার্বভৌত্বের অধিকার প্রদান করাও হয় তবে বাস্তবেও কি তার হুকুম 'আইন' বলে বিবেচিত হবে? তার উপর কারো কোনো অধিকার থাকবেনা? তার শর্তহীন আনুগত্য করতে হবে। এমনকি তার নির্দেশ সম্পর্কে ভালো মন্দ, ভুল ও নির্ভুল হওয়ার প্রশ্ন আদৌ উত্থাপন করা যাবেনা?

আল্লাহ্কে ছাড়া এই অধিকার চাই কোনো ব্যক্তিকে, কোনো প্রতিষ্ঠানকে, কিংবা দেশবাসীর সংখ্যাগুরু দলকেই দেয়া হোক, সেই সম্পর্কে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করা যাবে যে, শেষ পর্যন্ত কিসের ভিত্তিতে সে এই অধিকার লাভ করলো? কোন্ সনদের ভিত্তিতে সে জনগণের উপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব করার অধিকার লাভ করলো? এই প্রশ্নের উত্তরে খুব বেশী বললে শুধু এতোটুকুই বলা যেতে পারে যে, জনগণের সমর্থনই তার এই কর্তৃত্বের সনদ। কিন্তু আপনি কি একথা মেনে নিতে প্রস্তুত যে, কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে তবে বিক্রেতার উপর ক্রেতার সংগত মালিকানা অধিকার সত্যিই কি স্থাপিত হবে? এরূপ ইচ্ছাকৃত আত্মবিক্রয় যদি ক্রেতাকে সংগত মালিকানা না দেয়, তাহলে জনগণের নিছক ইচ্ছা ও সম্মতি প্রকাশ কারো সার্বভৌমত্বকে কিরূপে সংগত প্রমাণ করতে পারে? কুরআন মজীদ এই গ্রন্থির জট এভাবে খুলে দিয়েছে যে, আল্লাহ্র সৃষ্টির উপর অন্য কোনো সৃষ্টির প্রভুত্ব কায়েম করার এবং হুকুম চালাবার কোনো অধিকার নেই। এই অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র এবং তার এই অধিকারের ভিত্তি এই যে, তিনিই নিখিল সৃষ্টির স্রষ্টা। "সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই, এর উপর প্রভুত্ব চালাবার, একে 'শাসন' করার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।" [সূরা আরাফ ঃ ৫৪] এটা এমন যুক্তিপূর্ণ কথা যাকে অন্তত জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধিসম্মত লোকেরা যারা আল্লাহ্কে সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করে, কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারেনা।

সার্বভৌমত্ব কার হওয়া উচিত?

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, হক ও বাতিলের কথা না তুলেও সার্বভৌমত্বের এই অধিকার যদি কোনো মানবশক্তিকে দেয়া হয়, তবে তাতে মানুষের কি প্রকৃত কল্যাণ হতে পারে? মানুষ- সে ব্যক্তি হোক, শ্রেণী হোক কিংবা কোনো জাতি বা সমষ্টিই হোক সার্বভৌমত্বের এতো বিরাট ক্ষমতা সামলানোই তার পক্ষে অসম্ভব। জনগণের উপর হুকুম চালাবার সীমাহীন অধিকার তার থাকবে, তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অন্য কারো থাকবেনা এবং তার সকল সিদ্ধান্তই নির্ভুল মনে করে শিরধার্য করে নেয়া হবে, এরূপ অধিকার ও কর্তৃত্ব যদি কোনো মানবীয় শক্তি লাভ করতে পারে, তবে সেখানে যুলুম, নিপীড়ন ও নির্যাতন হওয়া একেবারে অনিবার্য ব্যাপার। তখন সমাজের মধ্যেও

---

৪. "তিনি আশ্রয় দান করেন এবং তাঁর বিপরীতে কেউ আশ্রয় দিতে পারেনা।" [সূরা মুমিনুন ঃঃ ৮৮]

৫. "তিনিই প্রকৃত অধিপতি, পবিত্র সত্ত্বা ও নিরাপত্তা বিধায়ক।" [সূরা হাশর ঃ ২৩]

যুলুম হবে, 'সমাজের বাইরে অন্যান্য প্রতিবেশী সমাজের উপরও যুলুম হবে। এরূপ ব্যবস্থার মূল প্রকৃতিতেই বিপর্যয়ের বীজ নিহিত রয়েছে। মানুষ যখনই জীবনের এই পথ অবলম্বন করেছে, তখনি ভাঙ্গন, বিপর্যয় ও অশান্তি সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ যার বাস্তবিকপক্ষে সার্বভৌমত্ব নেই এবং যাকে সার্বভৌমত্বের অধিকারও প্রদান করা হয়নি, তাকেই যদি কৃত্রিমভাবে সার্বভৌমত্বের অধিকার ও কর্তৃত্ব দান করা হয়, তবে সে কিছুতেই এই পদের যাবতীয় ক্ষমতা এখতিয়ার সঠিক পন্থায় ব্যবহার করতে সক্ষম হবেনা। কুরআন মজীদ এই কথাই নিম্নোক্ত ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

"যারা আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেনা, তারা যালিম।" [সূরা মায়েদা ঃ ৪৫]

আল্লাহ্‌র আইনগত সার্বভৌমত্ব

এসব কারণে ইসলাম চূড়ান্তভাবে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে যে, আইনগত সার্বভৌমত্ব তাঁরই স্বীকার করতে হবে যার বাস্তব সার্বভৌমত্ব স্থাপিত হয়েছে নিখিল বিশ্বের উপর এবং গোটা মানবজাতির উপরও যার সার্বভৌমত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। একথাটি কুরআন মজীদে বার বার বলা হয়েছে এবং তা এতো বলিষ্ঠভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে, কোনো কথা বলার জন্য তা অপেক্ষা জোরালো ভাষা আর হতে পারেনা। উদাহরণস্বরূপ দেখুন কুরআন একস্থানে বলেছে ঃ

"হুকুম দিবার ও প্রভুত্ব ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার আল্লাহ্‌র ছাড়া আর কারো নেই। তিনি আদেশ করেছেন, একমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও আনুগত্য করো, এটাই সঠিকপন্থা।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৪০]

অনত্র বলেছেন ঃ

একমাত্র সেই বিধানই অনুসরণ করো যা তোমাদের জন্য তোমাদের 'প্রভুর' নিকট থেকে নাযিল করা হয়েছে এবং তাকে ত্যাগ করে অন্য পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ করোনা। [সূরা আরাফ ঃ ৩]

তৃতীয় একস্থান আল্লাহর এই আইনগত সার্বভৌমত্ব অমান্য করাকে পরিষ্কার কুফরী বলে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

"আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে যারা ফায়সালা করেনা তারা কাফির।" [সূরা মায়েদা ঃ ৪৪]

এই আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, আল্লাহ্‌ তায়ালার আইনগত সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার নাম ঈমান ও ইসলাম এবং তা অস্বীকার করার নামই নিরেট কুফর।

রসূল (স) এর পদমর্যাদা

দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র এই আইনগত সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি হচ্ছেন আল্লাহ্‌ প্রেরিত নবীগণ। অন্য কথায় আমাদের আইন রচয়িতা ও সংবিধান দাতা [Low Giver] আমাদের জন্য কি আইন এবং কি নির্দেশ দিয়েছেন তা জানবার একমাত্র উপায় হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কিরাম। এ কারণে ইসলামে আল্লাহ্‌র হুকুমের অধীন নির্দ্বিধায় তাদের অনুসরণ করার স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন শরীফে পরিষ্কার দেখতে পাবেন যে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত প্রত্যেক নবীই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ

"আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।" [সূরা শূয়ারা ঃ ১০৮, ১১০, ১২৬, ১৪৪, ১৫০, ১৬৩, ১৭৯]

আর কুরআন মজীদ একথা সুনির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত নীতি হিসেবে বর্ণনা করেছে ঃ

"আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবিক তাঁর অনুসরণ করার জন্যই তাকে পাঠিয়েছি।" [সূরা নিসা ঃ ৬৪]

"যে ব্যক্তি রসূলের অনুসরণ করবে, সে মূলত আল্লাহ্‌রই অনুসরণ করলো।" [সূরা নিসা ঃ ৮০]

এমনকি বিতর্কপূর্ণ ও মতবিরোধ সংকুল বিষয়ে রসূলকে যারা "সর্বশেষ মীমাংসাকারী" বলে মানতে অস্বীকার করে কুরআন মজীদ তাদেরকে 'মুসলমান' গণ্য করতেই সুস্পষ্টরূপে অস্বীকার করেছে ঃ

"অতএব না, তোমার রবের শপথ, তারা কখনো ঈমানদার হতে পারেনা, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিতর্ক ও বিরোধমূলক বিষয়সমূহে-হে নবী তোমাকেই সর্বশেষ বিচারক মানবে এবং তুমি যা মীমাংসা দিবে তা পরিপূর্ণরূপে মেনে নিবে এবং তা শিরধার্য করে নিতে হৃদয়ে কোনোরূপ দ্বিধা সংকোচ বোধ করবেনা।" [সূরা নিসা ঃ ৬৫]

কুরআন আবার বলছে ঃ

"আল্লাহ্‌র রসূল যখন কোনো ব্যাপারে কোনো ফায়সালা করেন, তখন মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীর পক্ষে সেই সম্পর্কে নতুন করে ফায়সালা করার বিন্দুমাত্র এখতিয়ার নেই। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, সে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।" [সূরা আহ্‌যাব ঃ ৬৩]

ইসলামে আইনগত সার্বভৌমত্ব একান্ত ও নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের জন্য নির্দিষ্ট। অতপর এই সম্পর্কে সন্দেহ করার আর কোনো অবকাশ থাকেনা।

রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সাংবিধানিক ব্যাপারের ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পর আর একটি প্রশ্ন বাকি থেকে যায় যে, অতপর রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব [Political sovereignty] কার? নিশ্চিতভাবে এর উত্তর এই এবং এই-ই হতে পারে যে, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বও একমাত্র আল্লাহ্‌র। কারণ আল্লাহ্‌ তায়ালার আইনগত সার্বভৌমত্ব মানব সমাজে যে প্রতিষ্ঠানই রাজনৈতিক শক্তিবলে কার্যকর [Force] করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে, আইন ও রাজনীতির পরিভাষায় তাকে কখনো সার্বভৌমত্বের মালিক বলা যায়না। যে শক্তির আইনগত সার্বভৌমত্ব নেই এবং যার ক্ষমতা ও এখতিয়ার এক উচ্চতর আইন আগে থেকেই সীমিত ও অনুগত বানিয়ে দিয়েছে এবং যার পরিবর্তন করার কোনো ক্ষমতা তার নেই, সে সার্বভৌমত্বের ধারক হতে পারেনা, এটা তো সুস্পষ্ট কথা। এখন এর প্রকৃত অবস্থা বা মর্যাদা কোন্‌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা যেতে পারে? কুরআন মজীদই এই প্রশ্নের সমাধান দিয়েছে। কুরআন মজীদ এই প্রতিষ্ঠানকে 'খিলাফত' নামে ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠান স্বয়ং "একচ্ছত্র শাসক" নয় বরং একচ্ছত্র শাসকের প্রতিনিধি মাত্র।

গণতান্ত্রিক খিলাফত

আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি শব্দটি শোনার সংগে সংগে 'জিল্লুল্লাহ্' [আল্লাহ্‌র ছায়া], পোপবাদ এবং বাদশাহদের খোদায়ী অধিকার [Divine right of the kings] প্রভৃতির দিকে আপনাদের মন ও মানসিকতা যেনো বিচ্যুত না হয়। কুরআনের সিদ্ধান্ত এই যে, আল্লাহ্‌র এই প্রতিনিধিত্বের অধিকার বিশেষ কোনো ব্যক্তি, পরিবার, বংশ কিংবা নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত নয়। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের সমর্থক এবং রসূলের মারফতে প্রাপ্ত আল্লাহ্‌র বিধানকে উচ্চতর ও চূড়ান্ত আইন হিসেবে মান্যকারী সকল মানুষই আল্লাহ্‌র দেয়া এই প্রতিনিধিত্বের অধিকারী।

"আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি পৃথিবীতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদেরকে তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা নিযুক্ত করবেন।" [সূরা আননূর ঃ ৫৫]

এই জিনিসই ইসলামী খিলাফতকে রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, পোপবাদ এবং পাশ্চাত্য ধারণাভিত্তিক ধর্মরাষ্ট্র [Theocracy] প্রভৃতির বিপরীতে এক নিখুঁত ও পূর্ণ গণতন্ত্রে পরিণত করে। কিন্তু তা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র যেখানে জনগণকেই সার্বভৌমত্বের 'মালিক' মনে করে, সেখানে ইসলাম 'মুসলিম' জনগণকে কেবল খিলাফতেরই অধিকারী বলে অভিহিত করে। রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে দেশবাসীর ভোট গ্রহণ করা হয় এবং গণমতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয় এবং পরিবর্তিত হয়; ইসলামী গণতন্ত্রও তাই দাবী করে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য ধারণায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিরংকুশ ও সীমাহীন শক্তির মালিক। পক্ষান্তরে ইসলামের ধারণা অনুসারে গণতান্ত্রিক খিলাফত আল্লাহ্ তায়ালার আইনের অনুসরণ করতে বাধ্য।

২. রাষ্ট্রের কর্মসীমা

খিলাফতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকেই এই বিষয়টির সরাসরি সমাধান হয়ে যায় যে, ইসলামী সংবিধানে রাষ্ট্রের কর্মসীমা কতোদূর পর্যন্ত বিস্তৃত? ইসলামী রাষ্ট্র যখন আল্লাহ্‌র খিলাফত, এখানে যখন একমাত্র আল্লাহ্‌র আইনগত সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত, তখন তার ক্ষমতা ও ইখ্তিয়ার অনিবার্যরূপেই আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যেই গন্ডিবদ্ধ থাকতে বাধ্য। ইসলামী রাষ্ট্র তার কর্তব্য উক্ত সীমার মধ্যে অবস্থান করেই পালন করবে। সে সাংবিধানিক দিক থেকে এ সীমা লংঘন করতে পারেনা। আল্লাহ্‌র আইনগত সার্বভৌমত্বের নীতিমালা হতে এই কথা কেবল যুক্তি হিসেবেই যে পাওয়া যায় তা নয়, বরং কুরআন মজীদ স্বয়ং তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছে। কুরআনের স্থানে স্থানে বিধান প্রদান করে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে ঃ

"এটা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা, [তা লংঘন করা তো দূরের কথা] তার নিকটেও যেয়োনা।"

"এটা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা, তা লংঘন করোনা।"

"আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা যারা লংঘন করে তারা যালিম।"

অতঃপর কুরআন একটি মূলনীতি হিসেবে এই হুকুম জারী করেছে ঃ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র আনুগত্য করো, আল্লাহ্র রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বসম্পন্ন তাদেরও। কোনো বিষয়ে যদি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ হয়, তবে তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো।" [সূরা নিসা ঃ ৫৯]

এ আয়াত অনুসারে রাষ্ট্রের আনুগত্য অনিবার্যরূপে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের অধীন হবে, তা থেকে স্বাধীন হবেনা। এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ ও রসূলের বিধান অনুসরণের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে জনগণের নিকট আনুগত্য দাবী করার কোনো অধিকারই রাষ্ট্রের নেই। একথা নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করবে, তার আনুগত্য কিছুতেই করা যাবেনা।"

"স্রষ্টার হুকুম অমান্য করে সৃষ্টির আনুগত্য কিছুতেই করা যাবেনা।"

এই নীতিটির সংগে উক্ত আয়াত আর একটি মূলনীতিও নির্ধারণ করে। তা এই যে, মুসলিম সমাজে যে কোনো প্রকার মতবিরোধই হোক, ব্যক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে হোক, বিভিন্ন দলের মধ্যে হোক, কিংবা রাষ্ট্র ও প্রজা সাধারণের মধ্যে হোক, অথবা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে হোক তার মীমাংসা করার জন্য আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত চূড়ান্ত বিধানের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এই নীতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে রাষ্ট্রের অবশ্যই একটি সংস্থা থাকবে যা মতদ্বৈততামূলক বিষয় সমূহের চূড়ান্ত মীমাংসা আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ্ মুতাবিক করবে।

৩. রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কর্মসীমা ও পারস্পরিক সম্পর্ক

রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের [Organs of states] ক্ষমতা, অধিকার ও এখ্তিয়ারের সীমা ও উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কাররূপে জানা যায়।

আইন পরিষদের সীমা

আইন পরিষদ [Lagislature] কে আমাদের প্রাচীন পরিভাষায় বলা হয় "আহলুল-হাল্ল-ওয়াল-আকদ [আইন বিধিবদ্ধকারীগণ]। যে রাষ্ট্র আল্লাহ্ ও রসূলের আইনগত সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়ে গঠিত হয়েছে তার আইন পরিষদও যে কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রসূলের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ মতৈক্যের বলেও কোনো আইন পাশ করার অধিকারী হতে পারেনা, তা একেবারে সুস্পষ্ট। একটু আগেই আমি আপনাদেরকে কুরআনের এই ফায়সালা শুনিয়েছি যে, "আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসূল যে বিষয়ে চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করে দিয়েছেন সেই সম্পর্কে নতুন করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার কোনো ঈমানদার পুরুষ বা নারীর নেই" এবং "যারা আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুসারে ফায়সালা করেনা, তারাই কাফের।" এসব সুস্পষ্ট নির্দেশের অনিবার্য দাবি হলো আল্লাহ্ এবং রসূলের বিধানের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আইন রচনা করা আইন পরিষদের অধিকারের সীমাবহির্ভূত এবং আইন পরিষদ এই ধরনের কোনো আইন পাশ করলেও তা অনিবার্যরূপে সংবিধানের লংঘন [Ultrovires of the constitution] বলে অভিহিত হবে।

প্রসংগত এই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, এমতাবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রে আইন পরিষদকে নিম্নলিখিত অনেক কাজ করতে হবে।

১. যেসব ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং রসূলের সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত বিধান মওজূদ রয়েছে, আইন পরিষদ যদিও তাতে কোনো রদবদল করতে পারবেনা, কিন্তু সেই বিধান ও নির্দেশসমূহকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন ও পন্থা প্রণালী [Rules and Regulations] নির্ধারণ করা আইন পরিষদের কর্তব্য।

২. যেসব ব্যাপারে কুরআন হাদীসের বিধানের একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে তন্মধ্যে কোন্ ব্যাখ্যাটিকে আইন হিসেবে গ্রহণ করা হবে, তা নির্দিষ্ট করা আইন পরিষদেরই কাজ। এজন্য আইন পরিষদে অনিবার্যরূপে এমন সব লোক থাকতে হবে যাদের আল্লাহ্র বিধানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দক্ষতা ও যোগ্যতা আছে। অন্যথায় ঐসব বিধানের ভুল ব্যাখ্যা ইসলামী শরীয়াতকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করে দিতে পারে।

মূলত, এই প্রশ্নটি ভোটদাতাদের নির্বাচনী দৃষ্টিভংগি ও যোগ্যতার সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। নীতিগত ভাবে এই কথা স্বীকার করতে হবে যে, আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে একটি গ্রহণ করা ও তাকে বিধিবদ্ধ করার অধিকার আইন পরিষদের। ফলে আইন পরিষদের গৃহীত ব্যাখ্যাই আইন হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু শর্ত এই যে, সে যেনো ব্যাখ্যার সীমা অতিক্রম করে বিকৃতির সীমা পর্যন্ত পৌঁছে না যায়।

৩. যেসব ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং রসূলের কোনো নির্দেশ বা বিধান বিদ্যমান নেই, সেসব ব্যাপারে ইসলামের সাধারণ নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে নতুন আইন রচনা করা অথবা সেই সম্পর্কে ফিক্হের কিতাবসমূহে পূর্ব হতে প্রণীত কোনো আইন বর্তমান থাকলে তন্মধ্যে কোনো একটিকে গ্রহণ করা আইন পরিষদের কাজ।

৪. যেসব ব্যাপারে নীতিগত কোনো নির্দেশও পাওয়া যায়না, সে সম্পর্কে মনে করতে হবে যে, এই বিষয়ে আইন রচনার অধিকার আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে দিয়েছেন। কাজেই এসব ব্যাপারে আইন পরিষদ যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে শর্ত এই যে, সে আইন যেনো শরীয়তের কোনো হুকুম বা নীতির বিরোধী বা তার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। এ সম্পর্কে "যা নিষিদ্ধ নয় তা বৈধ" মূলনীতিটি গৃহীত হয়েছে।

এই চারটি নিয়ম রসূলের সুন্নাহ্, খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মধারা এবং মুজতাহিদদের অভিমত থেকে আমরা জানতে পারি। প্রয়োজনে এর প্রত্যেকটি নিয়মের উৎস কি তাও আমি বলে দিতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয়, ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ কেউ ভালো করে হৃদয়ংগম করে নিলে তার সাধারণ জ্ঞান [Common Sense] তাকে বলে দিবে যে, এই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইন পরিষদের কর্মসীমা অনুরূপই হওয়া উচিত।

শাসন বিভাগের কর্মসীমা

এখন শাসন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করবো। একটি ইসলামী রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের [Executive] আসল কাজ হচ্ছে আল্লাহ্র বিধান জারী করা এবং তাকে কার্যকর করার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যই তাকে একটি অমুসলিম রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে। তা না হলে একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং একটি কাফির রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকেনা। 'শাসন বিভাগ' সম্পর্কে কুরআন মজীদে 'উলিল আমর' এবং হাদীস শরীফে 'উমারা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন ও হাদীস উভয়ই তাদের 'আদেশ শোনা এবং মানা' [Obedience] সম্পর্কে জোর আদেশ দিয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে তাতে এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ্ ও রসূলের বিধানের অনুগত থাকতে হবে। তারা তা লংঘন করে নাফরমানী ও বিদয়াতের পথে পা বাড়াবেনা। কুরআন মজীদ এ সম্পর্কে পরিষ্কার বলে দিচ্ছে ঃ

> "কখনো এমন কোনো ব্যক্তির আনুগত্য করোনা যার অন্তর আমার [আল্লাহ্র] স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, এবং যে নিজের নফসের লালসা বাসনা চরিতার্থ করার পথ অবলম্বন করেছে আর সীমা লংঘন করাই যার অভ্যাস।" [সূরা কাহাফ ঃ ২৮]

> "যেসব সীমালংঘনকারী পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে, সংস্কারের কোনো কাজই করেনা, তোমরা তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আনুগত্য করোনা।" [সূরা শুয়ারা ঃ ১৫১-১৫২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো সুস্পষ্টভাবে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

> "তোমাদের উপর যদি কোনো নাককাটা ক্রীতদাসকেও আমীর বা 'রাষ্ট্র পরিচালক' নিযুক্ত করা হয় এবং সে আল্লাহ্র বিধান অনুসারে তোমাদের নেতৃত্ব দান করে তোমরা তার কথা শোনো এবং আনুগত্য করো।" [মুসলিম]

> "মুসলিম ব্যক্তিকে সবসময় আদেশ শ্রবণ ও অনুসরণ করে চলতে হবে, চাই সাগ্রহেই হোক, কিংবা বাধ্য হয়ে- যতক্ষণ না তাকে কোনো পাপ কাজের আদেশ করা হয়। কিন্তু কোনো পাপ কাজের হুকুম দেয়া হলে তা শোনা ও মানা যাবেনা।" [বুখারী, মুসলিম]

> "পাপ ও নাফরমানীর কাজে কোনো আনুগত্য নেই। কেবল ন্যায় ও যুক্তিসংগত কাজেই আনুগত্য করতে হবে।" [বুখারী, মুসলিম]

> "যে ব্যক্তি আমাদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় কোনো নতুন মতবাদের প্রচলন করবে যা তার সামগ্রিক প্রকৃতির সংগে খাপ খায়না, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত।" [বুখারী, মুসলিম]

> "কোনো বিদয়াতী [ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় কোনো অনৈসলামিক রীতি পদ্ধতি উদ্ভাবনকারী] কে যে ব্যক্তি সম্মান প্রদর্শন করলো সে ইসলামকে মূলোৎপাটনে সাহায্য করলো।" [বায়হাকীর শুয়াবুল ঈমান]

এসব সুস্পষ্ট আলোচনার পর এই সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ বা অস্পষ্টতা অবশিষ্ট থাকতে পারেনা যে, নির্বাহী সরকার ও তার ব্যবস্থাপনার জন্য ইসলামে কি সীমা নির্ধারিত করা হয়েছে? কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে তা স্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়।

বিচার বিভাগের কর্মসীমা বা অধিক্ষেত্র

এরপর বিচার বিভাগের [Judiciary] কথা। আমাদের প্রাচীন পরিভাষায় যা 'কাদা' [قضى]র সমার্থবোধক। বিচার বিভাগের অধিক্ষেত্র বা কর্মসীমা আল্লাহ্র আইনগত সার্বভৌমত্বের নীতিমালাই সরাসরি নির্দিষ্ট করে দেয়। ইসলাম যখনই তার নীতিমালার ভিত্তিতে রাষ্ট্র কায়েম করে, নবীগণই তার সর্বপ্রথম বিচারপতি হয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী জনগণের বিষয়সমূহের মীমাংসা করাই তাঁদের কাজ। নবীদের পরে যারা এই দায়িত্বে অভিষিক্ত হবেন, তারাও আবার নিজেদের বিচার কার্যের ভিত্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল থেকে প্রাপ্ত আইনের উপর স্থাপন করতে বাধ্য। কুরআন মজীদের 'সূরা মায়িদার' দুই রুকুব্যাপী এই বিষয়েরই আলোচনা রয়েছে। তাতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমি তাওরাত নাযিল করেছি; তাতে হিদায়াত ও উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা ছিলো এবং বণী ইসরাঈলের সকল নবীই এবং তাদের পরে সকল রব্বানী [আল্লাহ্ওয়ালা] ও পন্ডিতগণ তদনুসারে ইহুদীদের ব্যাপারসমূহের মীমাংসা করতেন। তাদের পরে আমি ঈসা ইবনে মারিয়ামকে প্রেরণ করেছি এবং তাকে হিদায়াত ও উজ্জ্বল আলোক বিশিষ্ট ইঞ্জীল কিতাব দিয়েছি। অতএব ইঞ্জীল কিতাবধারীদের কর্তব্য আল্লাহ্ প্রদত্ত ইঞ্জীলের হিদায়াত অনুসারে ফায়সালা করা। এই ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদানের পর আল্লাহ্ তায়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি এই কিতাব [কুরআন মজীদ] ঠিক ঠিকভাবে পরম সত্যতা সহকারে তোমার প্রতি নাযিল করেছি ঃ

"অতএব তুমি জনগণের মধ্যে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করো এবং তোমার নিকট আগত এই মহান সত্যকে উপেক্ষা করে মানুষের স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ করোনা।" [সূরা মায়িদা ঃ ৪৮]

সামনে অগ্রসর হয়ে আল্লাহ্ তায়ালা নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা এই আলোচনা সমাপ্ত করেন ঃ

"অতএব মানুষ কি জাহিলী যুগের ফায়সালা চায়? অথচ আল্লাহ্র প্রতি যাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া উত্তম ফায়সালাকারী আর কে হতে পারে?" [সূরা মায়িদা ঃ ৫০]

"এই দীর্ঘ আলোচনা চলাকালে আল্লাহ্ তায়ালা তিনবার বলেছেন ঃ যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করেনা তারা কাফির........ তারা যালিম.......... তারা ফাসিক।" [সূরা মায়িদা ঃ ৪৪-৪৯]

আল্লাহ্ তায়ালার এই কঠোর শাসন বাণীর পর একথা বলার হয়তো আর প্রয়োজন বাকী থাকেনা যে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত কেবল আল্লাহ্র আইন কার্যকর করার জন্য কায়েম হয়, তার বিপরীত ফায়সালা করার জন্য নয়।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক

এখন ইসলামী রাষ্ট্রের উল্লিখিত তিনটি বিভাগের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে এই প্রশ্নটির আলোচনা বাকী থাকলো। এ সম্পর্কে কুরআন হাদীসের সরাসরি নির্দেশ তো বিদ্যমান নেই, কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের কার্যক্রম ও ঐতিহ্য [Convention] থেকে আমরা পরিপূর্ণ পথনির্দেশ লাভ করতে পারি। এই উৎস থেকে আমরা এই তথ্য লাভ করতে পারি যে, রাষ্ট্র প্রধান শুধু রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার বলেই রাষ্ট্রের এই তিন বিভাগের প্রধান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্যাদায়ই অভিষিক্ত ছিলেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও তখন এই মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্র প্রধানের নীচের পর্যায়ে সেকালেও এই তিনটি বিভাগ পরস্পর থেকে পৃথক ছিলো। তখনকার যুগে "আহলুল হাল্লি-ওয়াল আকদ" সম্পূর্ণ আলাদা ছিলো। খিলাফতে রাশেদার যুগে তাঁদের পরামর্শের আলোকে প্রশাসন পরিচালিত হতো এবং আইন সম্পর্কিত বিষয়ের ফায়সালাও তাদেরই পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হতো। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আলাদা ছিলেন। বিচার বিভাগের উপর তাদের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার ছিলোনা। কাজী [বিচারকগণ] পৃথক ছিলেন, তাদের উপর শাসনকার্য পরিচালনার কোনো দায়িত্ব অর্পিত ছিলোনা।

রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নীতিনির্ধারণ কিংবা শাসনকার্য পরিচালনা আইন সংক্রান্ত বিষয়সমূহের সুষ্ঠু সমাধান করার যখনি প্রয়োজন দেখা দিতো, তখন খোলাফায়ে রাশেদীন "আহলুল হাল্লি-ওয়াল আকদ" এর সভা ডেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ চাইতেন। এবং পরামর্শভিত্তিক কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যেতো।

সরকারী প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ খলীফার অধীন ছিলেন। খলীফাই তাঁদের নিয়োগ দান করতেন এবং তাঁরই নির্দেশে তারা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

কাজী [বিচারক]দেরকেও যদিও খলীফাই নিযুক্ত করতেন; কিন্তু একবার কাজী নিযুক্ত হওয়ার পর তার বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার কোনো অধিকারই খলীফার ছিলোনা। বরং খলীফার ব্যক্তিগত ব্যাপারেই হোক কিংবা শাসন বিভাগের প্রধান হিসাবেই হোক, তার বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তাঁকেও 'কাজীর' সম্মুখে জবাবদিহি করার জন্য ঠিক সাধারণ নাগরিকের মতোই উপস্থিত হতে হতো।

একই সময় কোনো ব্যক্তি কোনো এলাকায় শাসকও হয়েছেন এবং বিচারকও হয়েছেন এরূপ কোনো উদাহরণ ইসলামের এই স্বর্ণযুগে পাওয়া যায়না। অথবা কোনো সরকারী পদস্থ কর্মকর্তা বা গভর্ণর, কিংবা স্বয়ং রাষ্ট্র প্রধান কোনো কাজীর আদালতী ফায়সালার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন বলেও কোনো প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়না। অনুরূপভাবে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা মুকদ্দমায় জবাবদিহি করতে অথবা আদালতে হাজির হওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে কোনো ব্যক্তি বিশেষকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছে বলেও কোনো উদাহরণ পাওয়া যায়নি।

বিচার ব্যবস্থার কাঠামোগত ব্যাপারে বৃহৎ পরিসরে বর্তমান কালের প্রয়োজন অনুসারে কিছুটা রদবদল করা যেতে পারে, কিন্তু তার মূলনীতি যথাযথভাবে অপরিবর্তিত থাকবে। তাতে যে ধরনের খুঁটিনাটি রদবদল করা যেতে পারে, তা এভাবে যে, রাষ্ট্র প্রধানের শাসনতান্ত্রিক ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ও এখ্‌তিয়ারকে খোলাফায়ে রাশেদীনের থেকে কিছুটা সীমিত ও সংকুচিত করা যেতে পারে। কারণ খোলাফায়ে রাশেদীন যতোখানি বিশ্বাসযোগ্য ও আস্তাভাজন ছিলেন, অনুরূপ রাষ্ট্র প্রধান বর্তমান যুগে পাওয়া যাবেনা। তাই আমরা রাষ্ট্র প্রধানের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার উপরও বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারি, যাতে সে ডিক্টেটরে পরিণত হতে না পারে। মামলা মুকাদ্দমা ও শুনানির জন্য সরাসরি তার সামনে পেশ না করা এবং সেই সম্পর্কে তাকে রায় দানে বিরত রাখাও বর্তমানে সংগত হতে পারে, যাতে সে কোনোরূপ অবিচার করার সুযোগ না পায়।

[মাওলানার বক্তৃতার এ পর্যায়ে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার এই মতের উৎস কি? তার উত্তরে মাওলানা মওদূদী বলেন ঃ

আমার এই কথার দলীল এই যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক ছিলো। আর রাষ্ট্র প্রধানের নিকট এই উভয় ক্ষেত্রের ক্ষমতা সে যুগে শরীয়তের কোনো বিধানের ভিত্তিতে একত্র করা হয়নি বরং এই ভরসায় একত্র করা হয়েছিল যে, তিনি বিচারক হিসেবে বিচারালয়ে আসীন হয়ে নিজের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহকে কিছুমাত্র প্রভাবশালী হতে দিবেননা। বরং খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি সেকালের জনগণের এতোদূর আস্থা ছিলো যে, তারা খলীফাকেই "সর্বশেষ মীমাংসাকারী" হিসেবে কামনা করতো, যাতে অন্য কোথাও বিচার না পাওয়া গেলেও তাঁর নিকট অবশ্যই সুবিচার পাওয়া যাবে। বর্তমান যুগে এ রকম আস্থাভাজন ব্যক্তি যদি আমরা লাভ করতে না পারি, তবুও রাষ্ট্র প্রধানকেই যুগপৎভাবে প্রধান বিচারপতি ও শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ পদে আসীন রাখতে হবে ইসলামী সংবিধানের কোনো ধারাই আমাদেরকে সেজন্য কিছুমাত্র বাধ্য করেনা।]

অনুরূপভাবে আমরা এই ব্যাপারে যেসব পরিবর্তন সাধন করতে পারি তা এই যে, আহ্‌লুল হাল্লি ওয়াল আকদের বা পার্লামেন্টের নির্বাচন পদ্ধতি এবং তাদের সংসদীয় নীতিমালা আমরা এ যুগের প্রয়োজন অনুসারে প্রণয়ন করতে পারি। আদালতে বিভিন্ন স্তররের এখ্‌তিয়ার, শুনানীর সীমারেখা ও কর্মসীমা নির্দিষ্ট করে দিতে পারি। এরূপে আরো অনেক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে।

এখানে আরো দু'টি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে- যার জবাব দেয়াও প্রয়োজন। প্রথম এই যে, বিচার বিভাগ "আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের" গৃহীত কোনো আইনকে কুরআন ও সুন্নাতের খিলাফ হওয়ার কারণে বাতিল করতে পারে কি? এই সম্পর্কে শরীয়াতের কোনো নির্দেশ আছে বলে আমার জানা নেই। খিলাফতে রাশেদার কর্মপন্থা এই ছিলো যে, সে যুগে বিচার বিভাগের এরূপ কোনো অধিকার বা ক্ষমতা ছিলোনা। কিংবা কোনো কাজী এরূপ করেছে এমন কোনো নজীর পাওয়া যায়না। কিন্তু আমার

মতে এর কারণ শুধু এই যে, সেকালের আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ [বা পরামর্শ সভা] এর লোকগণ কুরআন হাদীসে গভীর বুৎপত্তি রাখতেন। সর্বোপরি স্বয়ং খোলাফায়ে রাশেদীনের সম্পর্কে জনগণের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, তারা বিদ্ধমান থাকতে কুরআন ও সুন্নাতের বিপরীত কোনো ফায়সালা হতে পারেনা। বর্তমান যুগেও আমরা যদি আমাদের সংবিধানের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারি যে, কোনো আইন পরিষদ কুরআন ও সুন্নাতের বিপরীতে কোনো আইন পাশ করবেনা, তবে আজও বিচার বিভাগকে আইন পরিষদের ফায়সালা মানতে বাধ্য করা যায়। কিন্তু তদ্রূপ নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব না হলে নিরুপায় হয়েই বিচার বিভাগকে আইন পরিষদের গৃহীত কুরআন ও সুন্নাতের বিপরীত আইনসমূহ বাতিল করার এখ্‌তিয়ার দিতেই হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, ইসলামে আইন পরিষদের [আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ] সঠিক মর্যাদা কি? তা কি রাষ্ট্র প্রধানের নিছক মন্ত্রণাসভা, যার পরামর্শ গ্রহণ কিংবা বর্জনের অধিকার তার রয়েছে? অথবা রাষ্ট্র প্রধান কি আইন পরিষদের সংখ্যাগুরুর কিংবা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ফায়সালাসমূহ গ্রহণ করতে অবশ্যই বাধ্য থাকবেন।

এই প্রসংগে কুরআন মজীদ যা কিছু বলেছে তা এই যে, মুসলমানদের সামগ্রিক ব্যাপারসমূহ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়া বাঞ্চনীয় "তাদের সামগ্রিক ব্যাপারসমূহ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।" (সূরা শূরা ঃ ৩৮)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাষ্ট্রধান হিসেবে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

"সামগ্রিক ব্যাপারসমূহে তাদের সাথে পরামর্শ করো। [পরামর্শের পর] যখন তুমি [কোনো কাজের] সংকল্প করবে তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে কাজ করো।" [আলে ইমরান ঃ ১৫৯]

এই দুইটি আয়াতই সামগ্রিক ব্যাপারসমুহে পরামর্শ করাকে অপরিহার্য করে দিয়েছে। এতে রাষ্ট্র প্রধানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পরামর্শের ফলে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছলে পরে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে কাজ করে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আমাদের মূল প্রশ্নের কোনো জবাব তা থেকে পাওয়া যাচ্ছেনা। হাদীস থেকেও তার নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত কোনো জবাব পাওয়া যায়না। অবশ্য খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মধারা থেকে ইসলামী আইনজ্ঞগণ সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, রাষ্ট্র প্রধানই গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার জিম্মাদার এবং পরামর্শ সভার সাথে তিনি পরামর্শ করতে বাধ্য বটে, কিন্তু এর সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘুর কিংবা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাষ্ট্র প্রধান [সবসময়] বাধ্য নন। অন্য কথায়, রাষ্ট্র প্রধানকে 'ভেটো' প্রয়োগের অধিকার দেয়া হয়েছে।

কিন্তু এই মতটির সংক্ষিপ্ততা ও অস্পষ্টতার জন্য ভুল বুঝাবুঝির কারণ হতে পারে। কেননা লোকেরা এই মত বর্তমান পরিবেশে রেখে হৃদয়ংগম করতে চেষ্টা করে এবং সেই পরিবেশ তাদের সামনে নেই যে পরিবেশ [খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ] থেকে এই মত গ্রহণ করা হয়েছে। খিলাফতে রাশেদার যুগে যাদেরকে "আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ" বা পরামর্শ সভার সদস্য নির্দিষ্ট করা হতো, তারা ভিন্ন ভিন্ন দলের আকারে

সংগঠিত ছিলোনা। বর্তমান যুগের আইন পরিষদসমূহ যেসব পার্লামেন্টারী নিয়ম কানুনে শক্ত করে বাঁধা হয়ে থাকে, সেকালের পরামর্শ সভা সেরূপ ছিলোনা। তারা প্রথমে আলাদা আলাদা ভাবে নীতি নির্ধারণ করে, কার্যসূচী নির্দিষ্ট করে এবং পার্টি মিটিং-এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্টে আসতোনা। পরামর্শের জন্য যখন তাদেরকে আহ্বান করা হতো তখন তারা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত মনে পরামর্শস্থলে এসে বসতো। খলীফা স্বয়ং তাদের মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। আলোচ্য বিষয় তথায় পেশ করা হতো, সপক্ষে এবং বিপক্ষে সকল দিক দিয়েই স্বাধীনভাবে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হতে পারতো। তারপর উভয় পক্ষের যুক্তি প্রমাণ তুলনা করে খলীফা নিজের প্রমাণসহ নিজ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতেন। খলীফার এই মত সাধারণত এমন হতো যে, তা সমগ্র মজলিসই সমর্থন করতো। কোনো কোনো সময় কিছু সংখ্যক সদস্য খলীফার সাথে দ্বিমত পোষণ করতো কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ ভুল বা "সমর্থন অযোগ্য" মনে করতোনা, বরং তাকে আপেক্ষিকভাবে কম অগ্রাধিকারযোগ্য বলে মনে করতো এবং ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পর অন্তত তা মেনে নিতো। পরামর্শ সভায় পরামর্শ দাতাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে এবং কখনও এমন মতবিরোধের সৃষ্টি হয়নি যে, কতোজন কোন্ মতের পক্ষে তা গণনা করে দেখার প্রয়োজন হতো। পক্ষান্তরে খলীফা পরামর্শ সভার প্রায় সম্মিলিত ঐক্যমতের বিরুদ্ধে কাজ করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, খিলাফতে রাশেদার ইতিহাসে তদ্রূপ ঘটনা মাত্র দুইবার ঘটেছিলো। একবার উসামা বাহিনী প্রেরণের ব্যাপারে এবং দ্বিতীয়বার মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার ব্যাপারে। কিন্তু উভয় ঘটনায় সাহাবায়ে কিরাম খলীফার সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন। তা এই কারণে নয় যে, ইসলামী সংবিধান খলীফাকে 'ভেটো' প্রয়োগ ক্ষমতা করার দিয়ে রেখেছিলো এবং সাংবিধানিকভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা খলীফার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য ছিলেন। বরং তার প্রকৃত কারণ এই ছিলো যে, খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাজনীতি জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও অন্তদৃষ্টির প্রতি সাহাবায়ে কিরামের পূর্ণ আস্থা বিদ্যমান ছিলো। তারা যখন দেখলেন, হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নিজের মতের যথার্থতা সম্পর্কে এতোটা দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং দীন ইসলামের কল্যাণ দৃষ্টিতেই এই মতের প্রতি তিনি এতো বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তখন তাঁরা উদার চিত্তে তাঁর মতের সপক্ষে নিজেদের মত প্রত্যাহার করলেন। বরং পরে তাঁরা তাঁর মতের সত্যতা ও সুষ্ঠতার প্রকাশ্যভাবে প্রশংসা পর্যন্ত করেছিলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় স্বীকারও করেছিলেন যে, এই সংকট মুহূর্তে হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি দৃঢ়তা ও স্থৈর্যের পরাকাষ্ঠা না দেখাতেন, তবে ইসলামেরই চিরতরে সমাপ্তি ঘটতো। মুরতাদদের সম্পর্কে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, যিনি হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মতের সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠভাবে বিরোধিতা করেছিলেন, উদাত্ত কণ্ঠে বলে বেড়াতেন, আল্লাহ্ তায়ালা আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হৃদয়কে এই কাজের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফায়সালাই ছিলো যথার্থ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আপনারা অনুমান করতে পারেন যে, ইসলামে "ভেটো"র এই ধারণা মূলত কোন পরিবেশের নজির থেকে সৃষ্টি হয়েছে? শূরার কর্মনীতি ও তার অন্তর্নিহিত ভারধারা এবং শূরা সদস্যদের মনোবৃত্তি ও স্বভাব প্রকৃতি খিলাফতে রাশেদার অনুরূপ হলে উক্তরূপ কর্মনীতি অপেক্ষা উত্তম ও উন্নত কর্মপন্থা আর কিছুই হতে পারেনা। এই কর্মপন্থাকে যদি তার অনিবার্য পরিণতি ও শেষ মনযিল পর্যন্ত আমরা নিয়ে যেতে পারি, তবে খুব বেশী বললেও এতোটুকু বলা যায় যে, এই ধরনের মজলিসে শূরার রাষ্ট্র প্রধান ও পরিষদ সদস্যগণ যদি নিজ নিজ মত অন্যের সপক্ষে প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত না হয় বরং নিজের মতের উপর জিদ ধরে বসে, তবে তখন গণভোট [Referendum] গ্রহণ করা যাবে। তারপর যার মতকে জনমত বাতিল করে দিবে তাকে ইস্তফা দিতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ মনোবৃত্তি ও অভ্যন্তরীণ ভাবধারা সৃষ্টি করতে এবং সে ধরনের মজলিসে শূরা গঠন করা যতোদিন না সম্ভব হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শাসন বিভাগকে আইন পরিষদের সংখ্যাগুরুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

৪. রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

এখন আমরা আলোচনা করে দেখবো যে, ইসলাম কোন্‌সব মৌলিক উদ্দেশ্য [Objective] পেশ করে, যার জন্য একটি ইসলামী রাষ্ট্রকে কাজ করতে হবে। কুরআন মজীদ ও সুন্নতে রসূলে এই উদ্দেশ্যসমূহের যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা এই ঃ

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"আমি আমার রসূলদেরকে উজ্জ্বল দলীল প্রমাণ সহকারে পাঠিয়েছি এবং তাদের সংগে কিতাব ও 'মীযান' নাযিল করেছি, যেনো মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের উপর কায়েম হতে পারে।" [সূরা হাদীদ ঃ ২৫]

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

"যেসব মুসলমানকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হচ্ছে তাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখবে।" [সূরা হজ্জ ঃ ৪১]

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

"আল্লাহ্ তায়ালা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাহায্যে এমন কাজের পথ রুদ্ধ করেন যা কুরআনের দ্বারা বন্ধ করেননা।" [তাফসীরে ইবনে কাছীর]

অর্থাৎ যেসব অনাচার ও পাপাচার কেবল কুরআনে উপদেশ ও যুক্তির দ্বারা দূরীভূত হয়না, সেগুলো নির্মূল করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজন।

এ থেকে জানা গেলো যে, মানবতার কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ইসলাম যেসব সংস্কারমূলক কর্মসূচী পেশ করেছে, রাষ্ট্রের সমগ্র উপায় উপকরণের সাহায্যে তা বাস্তবায়িত করাই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠা, জাতীয় সীমান্ত রক্ষা এবং জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করাই রাষ্ট্রের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নয়। ইসলাম মানবতাকে যেসব কল্যাণকর ব্যবস্থায় সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ করে

তুলতে চায় সেগুলোর উন্নতি আর যেসব পাপাচার থেকে পবিত্র করতে চায় সেগুলো নির্মূল, নিস্তেজ ও দূর্বল করতে সকল শক্তি নিয়োজিত করাই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই ইসলামী রাষ্ট্রকে অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক করে দেয়।

৫. সরকার কিভাবে গঠিত হবে

এই মৌলিক বিষয়গুলোর বিশ্লেষণের পর আমাদের সম্মুখে পঞ্চম প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়। সেটি হলো, উপরোল্লিখিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে তার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য সরকার গঠন কিভাবে সম্পন্ন হবে? এ প্রসংগে রাষ্ট্র প্রধানের [Head of the State] ইসলামী পরিভাষায় যাকে ইমাম, আমীর বা খলীফা বলা হয় নিয়োগের ব্যাপারটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে ইসলামের নীতি হৃদয়ংগম করার জন্য ইসলামের প্রাথমিককালের ইতিহাস পর্যালোচনা করা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্র প্রধানের নির্বাচন

যেমন আপনারা সকলেই জানেন, আমাদের বর্তমান ইসলামী সমাজের সূচনা মক্কার কুফরী পরিবেশে হয়েছিলো এবং এই প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে ইসলামী সমাজের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন আমাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই ইসলামী সমাজ যখন তার সংগঠন ও রাজনৈতিক স্বাধীকারের দিক থেকে উন্নতি লাভ করে একটি রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করার মঞ্জিল পর্যন্ত পৌছে গেলো, তখন তার প্রথম 'রাষ্ট্রপ্রধান'ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ছিলেন এবং তিনি কারো দ্বারা নির্বাচিত ছিলেননা বরং সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ রূপে পালন করার পর তার 'শ্রেষ্ঠতম বন্ধুর' [আল্লাহ্] সাথে মিলিত হলেন। কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট, নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশ দিয়ে যাননি। তাঁর এই নীরবতা এবং কুরআন মজীদের বাণী "তাদের সামগ্রিক ব্যাপরসমূহ পারস্পরিক পরামর্শে সম্পন্ন হয়" এর আলোকে সাহাবায়ে কিরাম বুঝতে পারলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের দায়িত্ব মুসলমানদের নিজস্ব নির্বাচনের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং এই নির্বাচন মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতেই সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।[১] অতএব প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নির্বাচন প্রকাশ্য

---

১. সন্দেহ নাই যে, মুসলমানদের মধ্যে শীয়া মতাবলম্বীগণ মনে করেন যে, নবীদের ন্যায় ইসলামী সমাজের নেতৃত্ব পদে নিযুক্তিও আল্লাহর তরফ থেকেই হয়ে থাকে। কিন্তু এই মতবিরোধ সম্প্রতি এভাবে শেষ হয়ে গিয়েছে যে, শীয়াদের মতে দ্বাদশ ইমামের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর তার পুনরাবির্ভাব পর্যন্ত ইমামের পদ যেহেতু শূন্য রয়েছে, তাই বর্তমানে মুসলমানদের সামগ্রিক ব্যাপারসমূহ একজন আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত নয় এমন ব্যক্তির হাতেই ন্যস্ত হওয়া উচিত।

জনসম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। অতপর তাঁর অন্তিম সময় যখন উপস্থিত হলো, তখন তাঁর দৃষ্টিতে খিলাফতের জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি যদিও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়াল আনহু ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্তের নাম তিনি নিজে প্রস্তাব করলেননা, তিনি প্রবীণ ও বিশিষ্ট সাহাবাদের পৃথক প্রথকভাবে ডেকে প্রত্যেকের মত অবগত হলেন। তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সপক্ষে তাঁর নিজের শেষ উপদেশ লেখালেন। অতপর রোগাক্রান্ত অবস্থায়ই তিনি তাঁর ঘরের দরজায় উপস্থিত সকল মুসলমানদের সম্মেলনকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"জনমন্ডলি! আমি যাকে আমার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করবো তোমরা কি তাকে সমর্থন করবে? আল্লাহ্‌র শপথ! চিন্তা ও গবেষণা করে মত নির্ধারণে আমি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিনি। আমি আমার কোনো আত্মীয় ব্যক্তিকেও নিযুক্ত করছিনা। আমি ওমর ইবনুল খাত্তাবকেই স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করছি। অতএব তোমরা তাঁর কথা শুনো ও মেনে চলো।"

বিরাট জনসম্মেলন থেকে আওয়াজ উঠল ঃ

আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। [তাবারী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬১৮, মাতবায়াল ইসতিকামাহ্‌, মিশর]

এভাবে মুসলমানদের দ্বিতীয় খলীফা নিয়োগ কার্যও মনোনয়নের দ্বারা সম্পন্ন হয়নি বরং তদানীন্তন খলীফা মুসলানদের সাথে পরামর্শ করে এক ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করেন এবং সমবেত জনগণের সম্মুখে তা পেশ করে মঞ্জুর করিয়ে নেন।

অতপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অন্তিমকাল উপস্থিত হয়। তখন নবী করমী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সাহাবীগণের ছয়জন সাহাবী এমন ছিলেন, খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণের ব্যাপারে যাদের উপর মুসলমানদের প্রথম দৃষ্টি নিপতিত হতে পারে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এই ছয়জনের সমন্বয়ে একটি মজলিসে শূরা গঠন করেন এবং পারস্পরিক পরামর্শক্রমে একজনকে খলীফা নিযুক্ত করার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করেন। সেই সংগে তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ মুসলমানদের সাথে পরামর্শ না করেই জোরপূর্বক রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে বসবে, তোমরা তাকে হত্যা করো।" [মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কাল ঃ আল-ফারুক ওমর, ২খ, পৃঃ ৩১৩]

এই মজলিস খলীফা নির্বাচনের কাজ শেষ পর্যন্ত হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর অর্পণ করেন। তিনি মদীনার অলিগলি ঘুরে জনগণের মতামত জেনেছেন, বাড়ী বাড়ী গিয়ে পুরাবাসিনীদের নিকট পর্যন্ত এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রদের মতামতও জানতে চেষ্টা করেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হজ্জে আগত লোক- যারা মদীনা থেকে নিজ নিজ দেশে রওনা করছিলো তাদের মতও অবগত হন। এরূপ অবিশ্রান্ত অনুসন্ধানের পর তিনি নিঃসন্দেহে জানতে পারলেন যে, গোটা জাতির সর্বাধিক আস্থাভাজন ব্যক্তি বর্তমানে দুইজন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও হযরত আলী

রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং এদের মধ্যে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দিকে আবার অধিক সংখ্যক লোকের ঝোঁক রয়েছে। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সপক্ষেই এই গণমতের ভিত্তিতে অবশেষে ফায়সালা হলো এবং প্রকাশ্য সম্মেলনে তার হাতে 'বায়াত' [আনুগত্যের শপথ] গ্রহণ করা হয়।

অতপর হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদাতের হৃদয়বিধারক ঘটনা ঘটে। ফলে মিল্লাতে ইসলামিয়ার মধ্যে চরম নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই সময় কয়েকজন সাহাবী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘরে একত্রিত হন এবং তাঁকে বলেনঃ এই সংকট মুহূর্তে উম্মতের নেতৃত্বের যোগ্যতম ব্যক্তি আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। অতএব আপনি এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করুন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, যদিও তা অস্বীকার করলেন গ্রহণ করতে, কিন্তু তাঁরা তাঁকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন।

তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন- "আপনারা যদি বাস্তবিকই তা চান তবে মসজিদে চলুন ঃ

"কারণ আমার আনুগত্যের শপথ [বায়াত] গোপনে অনুষ্ঠিত হতে পারেনা এবং মুসলিম জনসাধারণের সম্মতি ব্যতীত তা সম্পন্নও হতে পারেনা।" [তাবারী ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৫০]

অতপর তারা মসজিদে নববীতে চলে গেলেন। আনসার এবং মুহাজিরগণ তথায় সমবেত হলেন। আর সকলের না হলেও অন্তত অধিকাংশ লোকের সমর্থনে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলীফা নির্বাচিত হন এবং তাঁর 'বায়াত' গ্রহণ করা হয়।

অতপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর যখন ঘাতকের আক্রমণ হয় এবং তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হন, তখন জনগণ তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলো, আপনার পরে আমরা আপনার পুত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকেই কি খলীফা নিযুক্ত করবো এবং তাঁর হাতেই কি 'বায়াত' করবো? উত্তরে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, শুধু এ টুকুই বলেছিলেন ঃ

"আমি এজন্য তোমাদের কোনো হুকুম দিচ্ছিনা, কোনো কিছু করতে তোমাদেরকে নিষেধও করছিনা। তোমরা নিজেরা খুব ভালো করে বিবেচনা করে দেখতে পারো।" [তাবারী, ৪খ, পৃঃ ১১২]

এই হচ্ছে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের ব্যাপারে খিলাফতে রাশেদার কার্যক্রম এবং সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মতিমূলক কর্মপন্থা। খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীরবতা এবং "তাদের সামগ্রিক ব্যাপার তাদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমেই আঞ্জাম পেয়ে থাকে"- আল্লাহ্‌র এই বাণীর উপর তাদের কর্মনীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই নির্ভরযোগ্য সাংবিধানিক ঐতিহ্য থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের নির্বাচন সাধারণ লোকদের সম্মতির উপর নির্ভরশীল। কোনো ব্যক্তিরই জোরপূর্বক রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার অধিকার

নাই।[১] বিশেষ কোনো পরিবার কিংবা শ্রেণীরও এর উপর একচেটিয়া আধিপত্য নাই।[২] উপরন্তু এই নির্বাচন হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জবরদস্তিমুক্ত এবং মুসলমানদের স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশের মাধ্যমে। কিন্তু মুসলমানদের স্বাধীন মনোভাব কিভাবে বা কি উপায়ে জানা যাবে? এই ব্যাপারে ইসলাম নির্দিষ্ট ও বাঁধাধরা কোনো পন্থা ঠিক করে দেয়নি। অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু বিশেষ শর্ত এই যে, যে পন্থাই গ্রহণ করা হোক- সমগ্র জাতির আস্থাভাজন ব্যক্তি কে? তা যেনো সেপন্থা দ্বারা সন্দেহাতীতরূপে জানতে পারা যায়।

মজলিসে শূরার গঠন

রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের পর মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচন আমাদের সম্মুখে অধিকতর জটিল বিষয়। এই মজলিস কিভাবে গঠিত হবে, এর সদস্য কিভাবে নির্ধারণ করা হবে এবং কারাইবা তাদেরকে নির্বাচিত করবে?

যৎসামান্য অধ্যয়নের ভিত্তিতে লোকেরা এই মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়েছে যে, খিলাফতে রাশেদার যুগে যেহেতু সাধারণ নির্বাচনের [General Election] মাধ্যমে শূরা সদস্যগণ নির্বাচিত হতেননা, তাই ইসলামে জনমত জানবার জন্য মূলতই কোনো পন্থা বিদ্যামান নেই; বরং সমসাময়িক খলীফার বুদ্ধিবিবেচনার উপর বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, সে নিজ ইচ্ছামতো যে কোনো লোকের সাথে পরামর্শ করতে পারে। মূলত সেকালের, বিষয়কে একালের পরিবেশে রেখে বুঝার চেষ্টার কারণে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সেকালের প্রত্যেকটি কথাকে সেকালের পরিবেশে রেখে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং তার বাস্তব খুঁটিনাটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সেই নীতিসমূহ হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করতে হবে।

---

১. কোনো কোনো লোকের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, ইসলামের প্রকৃত নিয়ম যদি তাই হবে, তাহলে রাজতন্ত্রের যুগে নাম করা আলেমগণ জোরপূর্বক রাজ তখ্‌ত দখলকারী লোকদের খিলাফত ও নেতৃত্ব কিরূপে স্বীকার করে নিলেন? উত্তরে বলা যায় যে, মূলত, এখানে দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়কে পরস্পর তালগোল পাকিয়ে ফেলার কারণে গোলক ধাঁধাঁর সৃষ্টি হয়েছে। একটি বিষয় তো এই যে, ইসলামে খলীফা বা শাসনকর্তা নির্বাচনের সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পন্থা কি? আর একটি এই যে, কখনো ভ্রান্ত পন্থায় কোনো ব্যক্তি যদি খিলাফতের গদী দখল করে বসে তবে তখন কি করা উচিত? প্রথম বিষয়ে আলেমগণের সর্বসম্মত উত্তর এই যে, মুসলিম জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচনই হচ্ছে সঠিক কর্মনীতি।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এরূপ পরিস্থিতিতে যেসব আলেম অধিকতর নরমপন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তারাও শুধু এতোটুকুই বলেছেন যে, শান্তি শৃংখলা এবং মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার খাতিরেই এরূপ 'খলীফাকে বরদাশত করে নিতে হবে। কিন্তু সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এরূপ জোরপূর্বক শাসন দখলকারী ব্যক্তি দীন ইসলামের মূলবিধান ও ভিত্তিকে যেনো বিগড়ে দিতে না পারে। এরূপ পরিস্থিতিতেও উক্ত শর্ত যদি বহাল পাওয়া যায়, তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করা তারা পছন্দ করেননা। কারণ তা করলে সমগ্র দেশে বিচ্ছিন্নতা, অশান্তি ও বিপর্যয় দেখা দিবে। এ কথার অর্থ কখনো এই নয় যে, যারা উপরোক্ত মত পোষণ করতেন তারাও জোরপূর্বক গদি দখল করাকে সুষ্ঠু ইসলামী পন্থা বলে মনে করতেন।

২. এই প্রসংগেও কতিপয় লোক সংশয় সৃষ্টি করে যে, তাহলে যেসব হাদীসে কুরাইশদেরকে খিলাফতের অধিক হকদার বলা হয়েছে তার অর্থ কি? এর উত্তর আমরা রাসায়েল ও মাসায়েল গ্রন্থে পেশ করেছি।

ইসলাম মক্কা মুয়াজ্জামায় একটি আন্দোলন হিসেবেই উত্থিত হয়েছিলো। দুনিয়ার আন্দোলনসমূহের একটি প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, সর্বপ্রথম যারাই এই আন্দোলনে যোগদান করেন, আন্দোলনের অগ্রনায়কের তারাই হয় বন্ধু, সংগী, সহকারী, পরামর্শদাতা এবং সাহায্যকারী। তাই যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা অতি স্বাভাবিকভাবেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বন্ধু ও পরামর্শদাতা হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র নিকট হতে যেসব ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নাযিল হতোনা, তিনি সেসব বিষয়ে তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন। উত্তরকালে এই আন্দোলনে যখন নতুন নতুন লোক যোগদান করতে লাগলো এবং বিরোধী শক্তিসমূহের সাথে তার দ্বন্দ্ব, সংঘাত ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠলো, তখন যেসব লোক নিজদের ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ খিদমত, আত্মদান, অনাবিল জ্ঞানবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির দিক দিয়ে গোটা জামায়াতের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন, তারা ভোটে নির্বাচিত হননি। বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমেই তারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রথমত, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন 'সাবিকুনাল আউয়ালুন'। দ্বিতীয়ত, পরবর্তীকালে যেসব পরীক্ষিত সাহাবী জামায়াতের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন এই উভয় শ্রেণীর সাহাবীগণের উপর ঠিক নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতোই সর্বসাধারণ মুসলমানের আস্থা ছিলো।

এরপর হিজরতের বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। হিজরতের সূচনা এভাবে হয় যে, দেড়-দুই বছর পুর্বে মদীনার কয়েকজন প্রভাবশালী লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের প্রভাব ও প্রচেষ্টায় আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের ঘরে ঘরে ইসলামের বিপ্লবী বাণী পৌঁছে গিয়েছিলো। এদেরই আহ্বানে নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য মুহাজির নিজ নিজ ঘরবাড়ী ত্যাগ করে মদীনায় চলে যান এবং সেখানে ইসলামের এই আন্দোলন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং একটি রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে। যাদের প্রভাব ও প্রচেষ্টায় ইতোপূর্বে মদীনায় ইসলাম প্রসারিত হয়েছিলো, এই নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অতি স্বাভাবিকভাবে তাঁরাই স্থানীয় নেতা হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তারাই নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে শূরায় সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবা এবং পরীক্ষিত মুহাজিরদের সংগে তৃতীয় দল হিসেবে শামিল হওয়ার অধিকারী হয়েছিলেন। বস্তুত পক্ষে তারাও অতি স্বাভাবিক নির্বাচন পদ্ধতিতেই নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে তাঁরা এতোদূর আস্থাভাজন ছিলেন যে, তখন আজকালকার আধুনিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও এসব লোকই নির্বাচিত হতেন।

অতপর মদীনার সমাজে দুইশ্রেণীর লোক আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। প্রথমতঃ যারা দীর্ঘ আট দশ বছর কালের রাজনৈতিক সামরিক ও প্রচারগত কঠিন কার্যসমূহ আঞ্জাম দিয়েছেন তাঁরা। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাদের প্রতিই লোকদের দৃষ্টি পতিত হতে লাগলো। দ্বিতীয়ঃ যারা কুরআন মজীদের জ্ঞান ও দীন ইসলামের সূক্ষ্ম জ্ঞানের দিক দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফলে দীন ইসলামের তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের দিক দিয়ে জনগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তাদেরকেই

অগ্রগণ্য ও নির্ভরযোগ্য মনে করতো। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জীবদ্দশায় এসব সাহাবীর নিকট কুরআন শিখবার এবং বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করার সাধারণ নির্দেশ দিয়ে তাদের যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততাকে অধিকতর বলিষ্ঠ করেছিলেন। এই দুই প্রকারের লোকও অতি স্বাভাবিক নির্বাচনের নিয়মে মজলিসে শূরায় স্থান লাভ করেছিলেন। তাদের মধ্যে কাউকে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ভোট গ্রহণের কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। আর ভোট যদি বাস্তবিকই লওয়া হতো, ইসলামী সমাজের সমগ্র জনতার প্রথম দৃষ্টি যে তাদের উপরই পড়তো, তাতো কোনো সন্দেহ নেই।

এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যে মজলিসে শূরা গঠিত হয়েছিলো, উত্তরকালে তাই খোলাফায়ে রাশেদীনেরও মন্ত্রণা পরষিদ বলে বিবেচিত হলো। ফলে এই নিয়মটি একটি সাংবিধানিক ঐতিহ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পরবর্তীকালে এমন সব লোক এই নিয়ম অনুসারে মজলিসে শূরায় প্রবেশ করতে থাকেন যারা নিজেদের অবদান এবং উচ্চতর নৈতিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার দ্বারা জনপ্রিয়তা লাভ করে এই মজলিসে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিলেন। এই লোকদেরকেই আরবী পরিভাষায় "আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ" [বন্ধনকারী ও বন্ধন মুক্তকারী] বলা হতো। তাদের সাথে পরামর্শ না করে খোলাফায়ে রাশেদীন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেননা। তাদের প্রকৃত মর্যাদা একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদাতের ঘটনার পর কয়েকজন সাহাবী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন ঃ

> "এটা তোমাদের ফায়সালা করার বিষয় নয়, শূরার সদস্য এবং বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের কাজ। বস্তুত শূরার সদস্য এবং বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ যাকে মনোনীত করবেন, তিনিই খলীফা হবেন। অতএব এখন আমরা সমবেত হবো এবং এই বিষয়ে বিবেচনা করবো।" [ইবনে কুতায়বা, আল-ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ, পৃঃ ৪১]

একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, "মজলিসে শূরার সদস্য সে যুগে কিছু নির্দিষ্ট লোক ছিলেন, যারা পূর্ব থেকেই এই মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহের চূড়ান্ত মীমাংসা করার ভার তাঁদের উপরই ন্যস্ত ছিলো। কাজেই খলীফা পরামশ গ্রহণে বাধ্য ছিলেননা- ইচ্ছা হলে কারো সাথে পরামর্শ করতেন নাহলে না-ই করতেন, আর করলেও জাতির গুরুতর বিষয়সমূহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী কারা ছিলো তা মোটেই জানা যেতোনা- একথা কিছুতেই বলা যায়না। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্ত বাণী থেকেই এরূপ কথার ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত হয়েছে।[১] খিলাফতে রাশেদার এই কার্যক্রম, বরং স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১. এখানে আরো একটি প্রশ্ন জাগে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় কেবল মদীনার লোকগণই কেন শূরার সদস্য হতেন এবং অন্যান্য এলাকা হতে

ওয়াসাল্লামের এই জীবনাদর্শ থেকে যে মূলনীতি নির্গত হয় তা এই যে, রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অবশ্যই পরামর্শ করবেন, কিন্তু সেই পরামর্শ যার তার কিংবা নিজের খেয়ালখুশি মতো মনোনীত লোকদের সাথে করতে পারবেনা। বরং সর্বসাধারণ মুসলমানের আস্থাভাজন লোকদের সাথে করবেন, যাদের স্বার্থহীনতা, নিষ্ঠাপূর্ণ কল্যাণ কামিতা এবং যোগ্যতা সম্পর্কে জনগণ নিশ্চিন্ত, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তসমূহে যাদের অংশ গ্রহণ এই বিষয়ের গ্যারান্টি যে, ঐ সিদ্ধান্তের পেছনে গোটা জাতির সমর্থন আছে বলে প্রমাণ করে। আর জনগণের আস্থাভাজন লোক কে কে, তা জানার যে উপায় ইসলামের প্রথম যুগে তখনকার বিশেষ পরিস্থিতিতে কার্যকরী ছিলো, আজ তা কোথাও পাওয়া যেতে পারেনা। আর সেকালের তামাদ্দুনিক অবস্থায় যেসব প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা ছিলো তাও আজ বর্তমান নেই। কাজেই বর্তমান যুগের অবস্থার দৃষ্টিতে ও আজকের প্রয়োজন মুতাবিক জাতির আস্থাভাজন ব্যক্তিদেরকে সঠিকভাবে নির্বাচিত করার জন্য আধুনিককালের উদ্ভাবিত সংগত ও নির্দোষ পন্থাসমূহও গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমান যুগের নির্বাচন পদ্ধতিও এই সংগত পন্থাসমূহের অন্যতম। এই পন্থাও গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু যেসব দুর্নীতি ও অসদুপায় অবলম্বনের অবাধ সুযোগ গণতন্ত্রকে একটি বিদ্রূপে পরিণত করেছে, সেসব কলংকময় ও অবাঞ্ছিত পন্থা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করা যেতে পারেনা।

সরকারের কাঠামো ও তার ধরন

অতপর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারের কাঠামো ও ধরন কি রূপ? এই প্রসংগে খিলাফতে রাশেদার যুগের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করলে আমরা সুস্পষ্টরূপে জানতে পারি যে, ঐ যুগে আমীরুল মুমিনীন [ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি] ছিলেন সে মূল ব্যক্তি যার নিকট নির্দেশ শোনার ও আনুগত্য করার শপথ গ্রহণ করা

বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি আহ্বান করা হয়নি কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, তা না করার মূলে দুইটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণ বিদ্যমান ছিলো ঃ

প্রথম কারণ এই যে, আরব দেশের এই ইসলামী রাষ্ট্র কোন জাতীয় রাষ্ট্র ছিলোনা, তা সম্পূর্ণ আলাদা পন্থায় অস্তিত্ব লাভ করেছিলো। প্রথমে একটি মতাদর্শের ব্যাপক প্রচার লোকদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলো। এই বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতিতে একটি আইনানুগ সমাজ দানা বেঁধে উঠেছিলো, তারপর এই সমাজ একটি আইনানুগ রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে। এই প্রকারের রাষ্ট্রে স্বভাবত কেন্দ্রীয় অস্থাভাজন ব্যক্তি তিনিই ছিলেন যিনি এই বিপ্লবের বীজ বপন করেছিলেন। তার পরে সেইসব লোকই এই বিপ্লবী সমাজের কেন্দ্রীয় আস্থাভাজন ব্যক্তি হয়েছিলেন, যারা এই বিপ্লব সৃষ্টিকারীর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। তাদের নেতৃত্বে ছিলো একটি স্বাভাবিক এবং যুক্তিসংগত নেতৃত্ব এবং এই সমাজে তাদের ছাড়া অন্য কেউই জনগণের আস্থাভাজন হতে পারতোনা। ইসলামী সমাজে সমালোচনার অবাধ অধিকার ও পূর্ণ সুযোগ থাকা স্বত্বেও কেবল এই কারণেই তাঁদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এবং "কেবল মদীনার লোকেরই কেন পরামর্শদানের অধিকার ভোগ করছে" বলে টু শব্দটিও সেকালের সারা আরব দেশের কোথাও ধ্বনিত হয়নি।

দ্বিতীয় কথা এই যে, সেকালের তামাদ্দুনিক অবস্থায় আফগানিস্তান থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট রাজ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া মোটেও সম্ভবপর ছিলোনা। এবং মজলিসে শূরার প্রত্যেক আঞ্চলিক সদস্যের পক্ষে সাধারণ এবং জরুরী অধিবেশনসমূহে এসে যোগদান করাও অসম্ভব ছিলো।

হতো এবং যাকে আস্থাভাজন ব্যক্তি মনে করে জনসাধারণ তাদের সামগ্রিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহ, অর্থাৎ সরকার পরিচালনার সর্বময় দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব তার উপর ন্যস্ত করতো। আমীরুল মুমিনীনের মর্যাদা ইংলন্ডের রাজা ও প্রধানমন্ত্রী, ফ্রান্স ও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এবং রাশিয়ার ষ্ট্যালিন প্রমুখের মর্যাদা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলো। তিনি নিছক রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেননা বরং মন্ত্রীপরিষদের প্রধানও তিনিই ছিলেন। তিনি সশীরে মজলিসে শূরায়ও উপস্থিত হতেন এবং সভাপতিত্বও করতেন। প্রত্যেক আলোচনায়ও তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করতেন, নিজ সরকারের সকল কাজের জবাবদিহি করতেন এবং নিজের দায়দায়িত্বের হিসেব নিজেই পেশ করতেন। তাঁর পার্লামেন্টে না ছিলো 'সরকারী দল' আর না ছিলো 'বিরোধী দল'। তিনি সত্যের অনুগামী হলে গোটা পার্লামেন্ট [শূরা] তার দল হিসেবেই কাজ করতো। আবার সমগ্র পার্লামেন্ট তার বিরোধী হয়ে যেতো, যদি তাকে ভুল বা বাতিল পথে অগ্রসর হতে দেখা যেতো। পার্লামেন্টের প্রত্যেক সদস্যই ছিলেন স্বাধীন, যে বিষয়ে তার মতৈক্য হতো তা প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করতেন, আবার যে ব্যাপারে তার মতবিরোধ হতো প্রকাশ্যভাবে তার বিরোধীতা করতেন। খলীফার নিজের মন্ত্রীসভা পর্যন্ত পার্লামেন্টে তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে পারতেন। তারপরও 'রাষ্ট্রপতিত্ব' এবং মন্ত্রীত্বের মধ্যে পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও সহযোগিতা বিদ্যমান থাকতো এবং কোনো পক্ষেরই ইস্তফা দেয়ার প্রশ্নই উঠতোনা। খলীফা কেবল পার্লামেন্টের নিকট দায়ী ছিলেননা, সমগ্র জাতির সামনেই তিনি প্রত্যেক কাজের, এমন কি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কেও জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন। তিনি দিনরাতে পাঁচটি সময় মসজিদে জনগণের সম্মুখীন হতেন, প্রত্যেক জুময়ার দিন তিনি জনগণের সম্মুখে বক্তৃতা দিতেন। জনসাধারণ তাদের শহরের অলি গলিতে প্রত্যেক দিন তাঁকে চলাফেরা করতে দেখতো এবং যে কোনো ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করতে বা সমালোচনা করতে পারতো। প্রত্যেক নাগরিকই যে কোনো সময় তার পরিধেয় টেনে ধরে নিজের প্রাপ্য দাবী করতে পারতো। তার নিকট কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হলে সেখানে বর্তমান কালের ধরাবান্ধা নিয়ম অনুযায়ী পার্লামেন্টারী প্রথায় করার প্রয়োজন হতোনা। তাঁর সাধারণ ঘোষণা ছিলোঃ

> "আমি যদি সঠিক কাজ করি তবে তোমরা আমার সাহায্য করো। আর আমি যদি অসদাচরণ করি তবে তোমরা আমাকে "সোজা" করে দিবে। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের অনুসরণ করতে থাকবো, তোমরা ততক্ষণ আমার আনুগত্য করবে। আর আমি যদি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নাফরমানী করি, তবে আমার আনুগত্য করা তোমাদের মোটেই কর্তব্য হবেনা।" [মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল, আবুবকর আস-সিদ্দীক, পৃঃ ৬৭]

এরূপ সরকার প্রণালীর সাথে বর্তমান যুগের অসংখ্য রাজনৈতিক পরিভাষার মধ্যে একটি পরিভাষারও সামঞ্জস্য না হলেও এই ধরনের শাসন পদ্ধতির সাথে ইসলামের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। অতএব এটাই আমাদের আদর্শ নমুনা। কিন্তু এ ব্যবস্থা ঠিক তখন খাপ খেতে পারে, যখন গোটা সমাজ ইসলামের বিপ্লবী দৃষ্টিভংগি অনুসারে পূর্ণরূপে প্রস্তুত হবে। তাই মুসলিম সমাজের যখনই পতন শুরু হয়েছে তখন এরূপ সরকার

পদ্ধতির সাথে তাঁর সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে গেলো। এখনো আমরা যদি এই আদর্শ নমুনার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাই, তবে প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে তা থেকে চারটি মূলনীতি আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে এবং তা বাস্তবায়িত করতে চেষ্টানুবর্তী হতে হবে।

১. সরকারের প্রকৃত দায়িত্ব যার উপরই ন্যস্ত করা হবে, তিনি কেবল গণপ্রতিনিধিদেরই নয় বরং জনগণের সম্মুখীন হতেও বাধ্য থাকবেন এবং নিজের যাবতীয় কাজকর্ম শুধু পরামর্শের ভিত্তিতে করলেই চলবেনা বরং নিজের কর্মকর্তাদের জন্যও তাকেই জবাবদিহি করতে হবে।
২. বর্তমানে প্রচলিত দলীয় পদ্ধতি থেকে মুক্ত হতে হবে। কারণ এটা গোটা সরকার ব্যবস্থাকেই গোঁড়ামি ও দলীয় কোন্দলে জর্জরিত করে। এই প্রথার সুযোগেই বর্তমান সময় যে কোনো ক্ষমতালিপ্সু ও সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করে জনসাধারণের অর্থে নিজের একটি মুসাহিব গোষ্ঠী তৈরি করে নিতে পারে। অতপর অজস্র মানুষের গগণবিদারী চিৎকার উপেক্ষা করে সেই মুসাহিব গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতায় জেঁকে বসে থাকবে।
৩. সরকার ব্যবস্থাকে বর্তমানের ন্যায় অত্যন্ত জটিল ও পেঁচালো নীতিমালার জালে জড়ানো বন্ধ করতে হবে। কারণ তাতে কর্মচারীদের পক্ষে কাজ করা, হিসেব গ্রহণকারীদের পক্ষে হিসেব গ্রহণ করা এবং বিপর্যয়ের জন্য প্রকৃত দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।
৪. সর্বশেষ, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এই যে, রাষ্ট্রপ্রধান ও পার্লামেন্টের সদস্য পদে এমন সব লোককে নিযুক্ত করতে হবে, যাদের মধ্যে ইসলাম প্রদত্ত অপরিহার্য গুণাবলী সর্বাপেক্ষা বেশী বিদ্যমান পাওয়া যায়।

৬. রাষ্ট্রপ্রধানের অপরিহার্য গুণাবলী ও যোগ্যতা

রাষ্ট্র প্রধানের গুণাবলী ও যোগ্যতার [Qualification] প্রশ্ন ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি আমি এতোদূর বলতে পারি যে, ইসলামী সংবিধান কার্যকরী হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণরূপে এরই উপর নির্ভর করে।

রাষ্ট্র প্রধান এবং মজলিসে শূরার [পার্লামেন্ট] সদস্য পদের জন্য একপ্রকারের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা তো আইনগত প্রকৃতির, যার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন বা একজন বিচারক যাচাই করে কোনো ব্যক্তির যোগ্য [Eligible] হওয়া বা না হওয়ার ফায়সালা করেন। আরও একপ্রকারের যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা জরুরী যার দৃষ্টিতে নির্বাচকমন্ডলী প্রার্থী বাছাই করার এবং মনোনয়ন দান করার কাজ সম্পন্ন করে এবং ভোট দাতাগণ ভোট প্রার্থীদের ভোট দেয়। প্রথম প্রকারের যোগ্যতা একটি দেশের কোটি কোটি বাসিন্দার প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান পাওয়া যায়। কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রকারের যোগ্যতা দুর্লভ, কোটি কোটি বাসিন্দাদের মধ্য হতে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই তা পাওয়া যায়। প্রথম প্রকারের যোগ্যতার মানদন্ড শুধু সংবিধানের কয়েকটি কার্যোপযোগী ধারায় অন্তর্ভুক্ত [Operative Clauses] করার জন্য নির্ধারিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের যোগ্যতার মানদন্ড সমগ্র সংবিধানের প্রাণসত্তায় বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। একটি

সংবিধানের সাফল্য জনগণের মনমানসিকতাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সঠিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত করার উপর নির্ভলশীল। একমাত্র এরূপ নির্বাচন পন্থাই সংবিধানের প্রাণসত্তা অনুসারে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন করা সম্ভব।

কুরআন এবং হাদীস এই উভয় প্রকার যোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে আলোচনা করেছে। প্রথম প্রকারের যোগ্যতার জন্য তা চারটি মানদন্ড নির্ধারণ করেছে।

১. তাকে মুসলমান হতে হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ
"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্র, আনুগত্য করো তাঁর রসূলের এবং সে লোকদের যারা তোমাদের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালক।" [সূরা আননিসা ঃ ৫৯]

২. তাকে পুরুষ হতে হবে। কুরআন মজীদে বলে ঃ
"পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন।" [সূরা আননিসা ঃ ৩৪]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ
"যে জাতি নিজের কাজের কর্তৃত্ব নারীর উপর সোপর্দ করলো, সে জাতি কখনো সকলকাম হতে পারবেনা।" [বুখারী]

৩. তাকে সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বালেগ হতে হবে। কুরআর মজীদে বলা হয়েছে ঃ
"তোমাদের ধন সম্পদ যাকে আল্লাহ্ তোমাদের অস্তিত্ব রক্ষার উপরকণ বানিয়েছেন তা নির্বোধ লোকদের হাতে সোপর্দ করোনা।" [সূরা আননিসা ঃ ৫]

৪. তাকে দারুল ইসলামের বাসিন্দা হতে হবে। কুরআন মজীদ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে ঃ
"যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করে [দারুল ইসলামে] আসেনি, তাদের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব তোমাদের নয়, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে।" [সূরা আনফাল ঃ ৭২]

এই হচ্ছে সে চারটি আইনগত যোগ্যতা। এ যোগ্যতা যার মধ্যে বিদ্যমান পাওয়া যাবে আইনের দৃষ্টিতে সে রাষ্ট্রপ্রধান বা পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে। কিন্তু এই আইনগত যোগ্যতাসম্পন্ন অসংখ্য লোকের মধ্যে কোন্ লোকদের উপরোক্ত দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহের জন্য আমরা নির্বাচিত করবো, আর কাদের নির্বাচিত করবোনা কুরআন ও হাদীসে আমরা এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব পেয়ে যাই ঃ

"আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ করেছেন যে, আমানতসমূহ [দায়িত্বপূর্ণ পদ] আমানতদার [বিশ্বাসযোগ্য] লোকদের উপর সোপর্দ করো।" [সূরা আননিসা ঃ ৫৮]

"তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত সে ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মুত্তাকী-আল্লাহ্ ভীরু।" [সূরা হুজুরাত ঃ ১৩]

"নবী বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা শাসন কার্যের জন্য তোমাদের উপর তাকে [তালুতকে] অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাকে বিদ্যাবুদ্ধি ও দৈহিক শক্তিতে সমৃদ্ধি দান করেছেন।" [সূরা বাকারা ঃ ২৪৭]

"এমন ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার করোনা, যার মন আল্লাহ্‌র স্মরণ শূন্য, যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কাজকর্ম সীমা লংঘনকারী।" [সূরা কাহ্‌ফ ঃ ২৮]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"যে কেউ বিদয়াতপন্থী ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলো সে ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করলো।" [বায়হাকী]

"আল্লাহ্‌র শপথ! এমন ব্যক্তিকে আমরা কখনো কোনো রাষ্ট্রীয় পদে নিযুক্ত করবোনা, যে নিজে তা পেতে চায় কিংবা তার জন্য লালায়িত হয়।" [বুখারী, মুসলিম]

"আমাদের দৃষ্টিতে পদপ্রার্থীই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় অবিশ্বস্ত।" [আবু দাউদ]

উল্লেখিত গুণাবলীর কতকগুলোকে আমরা অনায়াসেই আমাদের সংবিধানের ব্যবহারিক ধারা হিসেবে বিধিবদ্ধ করে নিতে পারি। যথাঃ প্রদপ্রার্থীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা যেতে পারে। অন্যান্য যেসব গুণকে আইনের আওতার মধ্যে সুনির্ধারিতভাবে গণ্য করা যায়না সেগুলিকে আমাদের সংবিধানের নীতিনির্ধারক মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ। এবং রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে উল্লিখিত অপরিহার্য গুণাবলী সম্পর্কে প্রত্যেক নির্বাচনের সময় জনগণকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা নির্বাচক মন্ডলীর অন্যতম কর্তব্য হিসেবে ধার্য করে দিতে হবে।

৭. নাগরিকত্ব ও তার ভিত্তি

এখন নাগরিকত্বের বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ইসলাম যেহেতু চিন্তা ও কর্মের একটি পূর্ণাংগ ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থার ভিত্তিতে সে একটি রাষ্ট্রও কায়েম করে। তাই ইসলাম তার রাষ্ট্রের নাগরিকত্বকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে। উপরন্তু সততা ও ন্যায় পরায়ণতা যেহেতু ইসলামের মূল প্রাণসত্তা, তাই কোনো প্রকার ধোঁকা বা প্রতারণা ব্যতিরেকেই সে নাগরিকত্বের এই দুই শ্রেণীকে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে। মুখে মুখে সকল নাগরিককে সমান মর্যাদা দানের কথা বলে এবং কার্যত তাদের মধ্যে কেবল পার্থক্য করেই নয় বরং তাদের বিরাট অংশকে মানবীয় অধিকার দিতেও কুণ্ঠিত হওয়ার মতো মারাত্মক প্রতারণা কিছুইতে ইসলাম করতে পারেনা। যেমন আমেরিকায় নিগ্রোদের, রাশিয়ায় অ-কমিউনিষ্টদের এবং দুনিয়ার সমস্ত ধর্মহীন গণতন্ত্রের [Secular Democracy] রাষ্ট্রে দেশের সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার বর্জিত দুরাবস্থার কথা দুনিয়ার কার না জানা আছে?

ইসলাম নাগরিকদের নিম্নোক্ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে ঃ

১. মুসলিম।

২. জিম্মী [অমুসলিম]।

১. মুসলিম নাগরিকদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে; আর যারা তাদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। পক্ষান্তরে যারা [শুধু] ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করে [দারুল ইসলামে] চলে আসেনি, তাদের বন্ধুতা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব তোমাদের নয়- যতক্ষণ না তারা হিজরত করলো।" [সূরা আনফাল ঃ ৭২]

এ আয়াতে নাগরিকত্বের দুইটি ভিত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ঈমান, দ্বিতীয় দারুল ইসলামের [ইসলামী রাষ্ট্রের] প্রজা [পূর্ব থেকেই কিংবা পরে] হওয়া। একজন মুসলমান তার ঈমান আছে; কিন্তু কাফেরী রাজ্যের আনুগত্য ত্যাগ করে হিজরত করে দারুল ইসলামে এসে যদি বসবাস করতে শুরু না করে, তবে সে দারুল ইসলামের নাগরিক বলে বিবেচিত হতে পারেনা। পক্ষান্তরে দারুল ইসলামের সকল ঈমানদার বাসিন্দাগণ দারুল ইসলামের নাগরিক, তাদের জন্ম দারুল ইসলামে হোক কিংবা দারুল কুফর থেকে হিজরত করেই আসুক এবং তারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী ও সহযোগী।[১]

এই মুসলিম নাগরিকদের উপরই ইসলাম তার পরিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার দায়িত্বভার চাপিয়ে দিয়েছে। কারণ তারাই নীতিগতভাবে এই ব্যবস্থাকে সত্য বলে মানে। তাদের উপর ইসলাম তার পরিপূর্ণ আইন জারী করে, তাদেরকেই তার সমগ্র ধর্মীয়, নৈতিক, তামাদ্দুনিক এবং রাজনৈতিক বিধানের অনুসারী হতে বাধ্য করে। তার যাবতীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের ভারও সে তাদের উপরই অর্পণ করে। দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রকার কুরবানী সে কেবল তাদের নিকটই দাবী করে। অতঃপর সে এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা নির্বাচনের অধিকারও তাদেরই দান করে এবং তার পরিচালনার জন্য সংসদে অংশ গ্রহণ এবং তার দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগও তারাই লাভ করে। যাতে এই আদর্শবাদী রাষ্ট্রের কর্মসূচী ঠিক তার মূল নীতিসমূহের সাথে সংগতি

রেখে বাস্তবায়িত হতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকাল এবং খিলাফতে রাশেদার স্বর্ণযুগ উল্লিখিত মূলনীতির সত্যতা ও যৌক্তিকতার দৃষ্টান্ত। যেমন এ সময় শূরার সদস্য হিসেবে কোনো প্রদেশের গভর্ণর হিসেবে কিংবা সরকারী কোনো বিভাগের মন্ত্রী, সেক্রেটারী, বিচারক বা সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে কোনো যিম্মীকে নিযুক্ত করা হয়নি। খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারেও তাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়নি। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও ইসলামী

---

১. হিজরত করে যারা আসে তাদের সম্পর্কে কুরআন একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলেছে যে, এই ধরনের লোকদের পরীক্ষা [Examine] করে দেখা আবশ্যক [সুরা মুমতাহিনা, ১০ নং আয়াত দ্রঃ]। এই ব্যবস্থা যদিও মুহাজির স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তা থেকে এই সাধারণ মূলনীতি জানা যায় যে, বহিরাগত ও হিজরতের দাবিদার ব্যক্তিকে দারুল ইসলামে গ্রহণ করার পূর্বে তার প্রকৃত মুসলমান ও মুহাজির হওয়া সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভ করতে হবে। যাতে করে হিজরতের সুযোগে ভিন্ন উদ্দেশ্য সম্পন্ন কোনো লোক দারুল ইসলামে প্রবেশ করতে না পারে। কোনো ব্যক্তির প্রকৃত ঈমানের অবস্থা আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ জানতে পারে না, কিন্তু বাহ্যিক উপায়ে যতদূর যাচাই করা সম্ভব তা করতে হবে।

রাষ্ট্রে তারা বর্তমান ছিলো। একথা আমাদের বুঝে আসেনা যে, এসব রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের অংশ গ্রহণের যদি কোনো অধিকারই থাকতো, তবে আল্লাহ্‌র নবী তাদের সে অধিকার কিভাবে হরণ করতে পারেন এবং স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সরাসরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকগণ ক্রমাগতভাবে ত্রিশ বছর পর্যন্ত কেমন করে তাদের অধিকার আদায় না করে থাকতে পারেন।

২. যিম্মী নাগরিক বলতে সেসব অমুসলিমকে বুঝায় যারা ইসলামী রাষ্ট্রের চতুর্সীমার মধ্যে বসবাস করে তার আনুগত্য ও আইন পালন করে চলার অংগীকার করবে, চাই তারা দারুল ইসলামে জন্ম গ্রহণ করে থাকুক কি বাইরের কোনো কাফের রাজ্যে [দারুল কুফর] থেকে এসে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা হওয়ার আবেদন করে থাকুক। এই দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়না। ইসলাম এই শ্রেণীর নাগরিকদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ব্যক্তি আইন [Personal Law] এবং জান মাল ও সম্মানের পূর্ণ নিরাপত্তা দান করে। তাদের উপর রাষ্ট্রের কেবল গণসাধারণ [Public Law] জারী করা হবে। এই গণআইনের দৃষ্টিতে তাদেরকেও মুসলমান নাগরিকদের সমান অধিকার ও মর্যাদা দেয়া হয়। দায়িত্বসম্পন্ন পদ [Key Post] ব্যতীত সকল প্রকার চাকুরীতেও তাদের নিযুক্ত করা যাবে। নাগরিক স্বাধীনতাও তারা মুসলমনাদের সমান ভোগ করবে, অর্থনৈতিক ব্যাপারেও তাদের সাথে মুসলমানদের অপেক্ষা কোনোরূপ স্বতন্ত্র আরচণ করা হয়না। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে তা সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

এই দুই শ্রেণীর নাগরিকত্ব ও তার পৃথক পৃথক মর্যাদা সম্পর্কে কারো আপত্তি থাকলে সে যেনো পৃথিবীর অন্যান্য আদর্শবাদী রাষ্ট্র অথবা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র- তার মূলনীতিসমূহ মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী সংখ্যালঘু নাগরিকদের প্রতি যে আচরণ করে সে দিকে দৃষ্টিপাত করে। বাস্তবিকই একথা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা যায় যে, একটি রাষ্ট্রের মধ্যে তার মূলনীতির সম্পূর্ণ পৃথক মূলনীতিতে বিশ্বাসী, যা অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে, ইসলামের চেয়ে অধিক ইনসাফ, সহিষ্ণুতা, উদারতা ও বদান্যতার সাথে অন্য কোনো ব্যবস্থা সে জটিলতার সমাধান করেনি। অন্যরা এ জটিলতার সমাধান প্রায়ই দুইটি পন্থায় করেছে; হয় তাকে [সংখ্যা লঘুকে] নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা করেছে অথবা শূদ্র বা অস্পৃশ্য শ্রেণী বানিয়ে রেখেছে। ইসলাম উপরোক্ত পন্থার পরিবর্তে তার নীতিমালা মান্যকারী ও অমান্যকারীদের মধ্যে ন্যায়ানুগ একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার পন্থা গ্রহণ করেছে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে তার নীতিমালা পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে বাধ্য করে এবং উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বভার তাদের উপর অর্পণ করে। আর যারা তার নীতিমালার অনুসারী নয় তাদেরকে সে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য অত্যাবশ্যক সীমা পর্যন্ত তার বিধান মানতে বাধ্য করে। ইসলাম তাদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার সাথে সাথে তাদের যাবতীয় সাংস্কৃতিক ও মানবীয় অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৮. নাগরিক অধিকার

এরপর আমাকে বলতে হবে যে, ইসলামে নাগরিকদের কি কি মৌলিক অধিকার [Fundamental Rights] স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

সর্ব প্রথম ইসলাম নাগরিকদেরকে জান মাল ও ইজ্জত আব্রুর পূর্ণ নিরাপত্তার অধিকার দান করেছে। আইন সংগত বৈধ কারণসমূহ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে তাদের উপর হস্তক্ষেপ করা যাবেনা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচুর সংখ্যক হাদীসে এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ভাষণে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। সে ভাষণে তিনি বলেছেন ঃ

"তোমাদের জান, তোমাদের মাল, তোমাদের মান সম্মান তদ্রূপ সম্মানার্হ [হারাম] যেমন আজকের এই হজ্জের দিনটি সম্মানার্হ।"

কেবল একটি অবস্থায় তা সম্মানার্হ [হারাম] থাকবেনা। তা তিনি অপর এক হাদীসে এভাবে বলেছেন ঃ

"ইসলামী আইনের আওতায় কারো জান মাল অথবা ইজ্জত আব্রুর উপর কোনো হক [অধিকার] প্রমাণিত হলে আইন অনুমোদিত পন্থায় অবশ্যই তা আদায় করতে হবে।"

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে, যে কোনো নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণ। দেশে প্রচলিত এবং সর্বজন স্বীকৃত আইন সংগত পন্থায় দোষ প্রমাণ না করে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে ইসলামে কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা যায়না। সুনানে আবু দাউদ- এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

একদা মদীনার কিছু সংখ্যক লোক কোনো সন্দেহের কারণে বন্দী হয়েছিলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে ভাষণদানরত থাকা অবস্থায় একজন সাহাবী দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর নিকট আরজ করলেন, আমার প্রতিবেশীদেরকে কোন্ অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রশ্নের প্রথম ও দ্বিতীয় বারে কোনো উত্তর না দিয়ে নীরব থাকলেন। শহরের পুলিশ প্রধানকে তাদের গ্রেপ্তারের সংগত কোনো কারণ থাকলে তা পেশ করার সুযোগ দেয়ার জন্য তিনি (স) নিরুত্তর থাকলেন। ঐ সাহাবী তৃতীয় বার তাঁর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে এবং পুলিশ প্রধান নিরুত্তর থাকলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

"তার প্রতিবেশীদের ছেড়ে দাও।" [আবু দাউদ, কিতাবুল কাদা]

উপরোক্ত ঘটনা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, কোনো সুনির্দিষ্ট অপরাধে দোষী সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত কোনো নাগরিককে গ্রেপ্তার করা যাবেনা। ইমাম খাত্তাবী [র] তাঁর "মায়ালিমুস সুনান" গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ "ইসলামে শুধু দুই প্রকারে গ্রেপ্তারী বৈধ। [এক] শাস্তিস্বরূপ আটক করা অর্থাৎ আদালতের রায়ে কোনো নাগরিককে কয়েদীর শাস্তি প্রদান করা হলে তাকে আটক করা। নিঃসন্দেহে এই আটক সম্পূর্ণ সংগত। [দুই] তদন্তের জন্য আটক করা অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তি বাইরে থাকলে

তদন্তকার্য ব্যাহত হতে পারে এরূপ আশংকা থাকলে তাকে কয়েদ করা যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকারের আটক বৈধ নয়।" [মায়ালিমুস সুনান, কিতাবুল কাদা]

ইমাম আবু ইউসুফ [র] তাঁর "কিতাবুল খারাজ" গ্রন্থে এই একই কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, কোনো ব্যক্তিকে নিছক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বন্দী করা যাবেনা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল দোষারোপের ভিত্তিতেই কাউকে বন্দী করতেননা। বাদী ও বিবাদী উভয়কে আদালতে হাযির হতে হবে। সেখানে বাদী দলীল প্রমাণসহ তার দাবী উত্থাপন করবে। সে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে ব্যর্থ হলে বিবাদীকে বেকসুর খালাস দিতে হবে। [কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ১০৭]

হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও একটি মুকদ্দমার রায় দিতে গিয়ে ঘোষণা করেন ঃ

"ইসলামে কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা যাবেনা।" [মুয়াত্তা ইমাম মালেক, বাব শারতিশ শাহিদ]

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার হচ্ছে, মত প্রকাশের এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামী আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তাঁর খিলাফত আমলে খারিজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়েছিলো। বর্তমানকালের নৈরাজ্যবাদী [Nihilist] দলসমূহের সাথে তাদের অনেকটা সামঞ্জস্য ছিলো। আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খিলাফতকালে তারা প্রকাশ্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই অস্বীকার করতো এবং অস্ত্রবলে এর অস্তিত্ব বিলোপের জন্য বদ্ধপরিকর ছিলো। আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এই অবস্থায় তাদেরকে নিম্নোক্ত পয়গাম পাঠান ঃ

"তোমরা যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারো। তোমাদের ও আমাদের মাঝে এই চুক্তি রইলো যে, তোমরা রক্তপাত করবেনা, ডাকাতি করবেনা এবং কারও উপর যুলুম করবেনা।" [নায়লুল আওতার, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৩০]

অপর এক জায়গায় তিনি তাদের বলেনঃ

"তোমরা যতক্ষণ বিপর্যয় ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদের আক্রমণ করবোনা।" [নায়লুল আওতার, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৩৩]

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোনো দলের মতবাদ যাই হোক না কেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মত যেভাবেই প্রকাশ করুক না কেন, ইসলামী রাষ্ট্র তাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেনা। কিন্তু তারা যদি নিজেদের মত শক্তি প্রয়োগে [By Violent Means] বাস্তবায়িত করতে এবং রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা চূর্ণ বিচূর্ণ করার চেষ্টা করে তবে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আরও একটি মৌলিক অধিকারের প্রতি ইসলাম যথেষ্ট জোর দিয়েছে। তাহলো ইসলামী রাষ্ট্র তার চতুঃসীমার মধ্যে বসবাসকারী কোনো নাগরিককে তার জীবন যাপনের মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত রাখতে পারবেনা। ইসলাম এ উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান ফরয করেছে এবং এ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"তাদের ধনীদের নিকট থেকে তা আদায় করা হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে তা বন্টন করা হবে।" [বুখারী ও মুসলিম]

অপর এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলনীতি হিসেবে ইরশাদ করেন ঃ

"যার পৃষ্ঠপোষক বা অভিভাবক নেই, তার পৃষ্ঠপোষক বা অভিভাবক হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার।"

অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"মৃত ব্যক্তি যে বোঝা [ঋণ অথবা পরিবারের অসহায় সদস্য] রেখে গেলো তার দায়িত্ব আমাদের উপর।" [বুখারী ও মুসলিম]

এ ক্ষেত্রে ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে মোটেই পার্থক্য করেনি। কোনো নাগরিককেই অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয়হীন অবস্থায় ত্যাগ করা যাবেনা। ইসলাম মুসলিম নাগরিকদের মতো তার অমুসলিম নাগরিকের অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থানের নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক ইহুদী বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে তার উপর আরোপিত কর মওকুফ করেন এবং তার জন্য রাজকোষ থেকে ভাতা মঞ্জুর করে রাজকোষ কর্মকর্তাকে লিখে পাঠান ঃ

"আল্লাহ্‌র শপথ! এ লোকটির যৌবনকালে যদি তার দ্বারা কাজ করিয়ে থাকি এবং এখন তার এই বার্ধক্যে তাকে নিরূপায় অবস্থায় ত্যাগ করি তবে তার সাথে মোটেই সুবিচার করা হবেনা।" [ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৭২]

হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হীরা নামক এলাকার অমুসলিম নাগরিকদের জন্য যে চুক্তিপত্র লিখে দিয়েছিলেন তাতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছিলো যে, যে ব্যক্তি বার্ধক্যে পৌঁছবে, অথবা যে ব্যক্তি আকস্মিক বিপদে পতিত হবে, অথবা যে ব্যক্তি গরীব হয়ে যাবে তার নিকট থেকে কর আদায় করার পরিবর্তে রাজকোষ থেকে তার এবং তার পরিবার পরিজনের জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে। [কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৮৫]

৯. নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের অধিকার

নাগরিকদেরকে প্রদত্ত এসব অধিকারের বিপরীতে তাদের উপর রাষ্ট্রেরও কতোগুলো অধিকার বর্তায়। এর মধ্যে সর্ব প্রথম অধিকার হচ্ছে, তাদের আনুগত্য লাভের অধিকার। ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় "শ্রবণ করা ও মেনে চলা"। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন ঃ

"শ্রবণ করা, অনুসরণ করা ও মেনে চলা অসময়ে ও সুসময়ে এবং আনন্দ ও নিরানন্দ সকল অবস্থায় অপরিহার্য।"

অর্থাৎ কোনো আইন নাগরিকদের পছন্দ হোক বা অপছন্দনীয় হোক, সহজসাধ্য হোক বা কষ্টসাধ্য হোক, তা মান্য করা এবং পালন করা সকলের জন্যই অপরিহার্য।

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ হবে ইসলামী রাষ্ট্রের বন্ধু ও হিতাকাংখী। নাগরিকদের উপর এটা ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কুরআন মজীদে ও সুন্নাতে রসূলে একথা প্রকাশের জন্য "নুসহ" পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এই শব্দটির ভাবার্থ [Loyalty] [রাজানুগত্য] ও [Allegiance] [রাজানুগত্য] শব্দদ্বয়ের তুলনায় অধিকতর ব্যাপক। এর দাবী এই যে, প্রত্যেক নাগরিক আন্তরিক ও

নিষ্ঠা সহকারে রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করবে এবং রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো কাজ বরদাশ্‌ত করবেনা, রাষ্ট্রের কল্যাণ ও মঙ্গলের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখবে।

শুধু তাই নয়, ইসলামী রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের উপর এর চেয়েও কঠিন কর্তব্য চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামী সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা করা নাগরিকদের অপরিহার্য কর্তব্য। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান এবং তার উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনবোধে নিজেদের জান মাল উৎসর্গ করতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হলে কুরআন মজীদ তাকে "প্রকাশ্য মুনাফিক" বলে সাব্যস্ত করেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে রাষ্ট্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সেই বৈশিষ্ট্যযুক্ত রাষ্ট্রকেই আমরা "ইসলামী রাষ্ট্র" হিসেবে আখ্যায়িত করি। এ পদ্ধতির রাষ্ট্রকে আধুনিককালের পরিভাষায় যে নামেই অভিহিত করা হোক, সেকুলার [ধর্মহীন], গণতান্ত্রিক বা ধর্মতান্ত্রিক ইত্যাদি যাই বলা হোক, তাতে কিছুমাত্র যায় আসেনা। কারণ পরিভাষা বা নাম নিয়ে আমাদের কোনো বিতর্ক নেই। আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা যে ইসলামকে মান্য করার দাবী করি, আমাদের জীবন ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থা সে ইসলামের নির্ধারিত মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হোক।

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামী সংবিধানের ভিত্তিসমূহ

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব
২. রিসালাতের মর্যাদা
৩. খিলাফতের ধারণা
৪. পরামর্শের নীতিমালা
৫. নির্বাচনের নীতিমালা
৬. নারীদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ
৭. রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য
৮. শাসক ও তার আনুগত্যের নীতিমালা
৯. মৌলিক অধিকার ও সামাজিক সুবিচার
১০. জনকল্যাণ

নিবন্ধটি ১৯৫২ সালের শেষ প্রান্তে রচিত। এই সময় একজন খ্যাতনামা উকীল ও লেখক চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে, কুরআন মজীদ থেকে কোনো সংবিধানের কাঠামো পাওয়া যায় কিনা। এই প্রসঙ্গে তিনি বিস্তারিত আলোকপাত করেন। মাওলানা মওদূদী তখন নিম্নোক্ত প্রবন্ধ রচনা করেন এবং তাতে সংবিধানের এক একটি ধারার উল্লেখপূর্বক কুরআন ও হাদীসে তার ভিত্তিসমূহ নির্দেশ করেন। -

ইসলামী সংবিধানের ভিত্তিসমূহ

দেশের সংবিধান প্রণয়নের কাজ যখন শেষ পর্যায়ে তখন বুদ্ধিজীবী সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে সংবিধান প্রণয়ন পরিষদকে যথার্থ ইসলামী সংবিধান প্রণয়নে যথাসাধ্য সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা। এ ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য সহযোগিতা করতে থাকবো। ১৯৫১ সালের শুরুতে মুসলমানদের সকল ফের্কার প্রতিনিধি স্থানীয় আলেমগণও ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন [পরিশিষ্ট-১ দ্রঃ]। কিন্তু একদল লোক অনবরত একদিকে মুসলিম জনসাধারণ ও শিক্ষিত সমাজকে এবং অপরদিকে সংবিধান প্রণয়ন পরিষদের সদস্যদেরকে যতোদূর সম্ভব ভুলবুঝাবুঝির শিকারে পরিণত করার অপচেষ্টায় নিরত থাকে। তাদের পক্ষ থেকে বার বার বিভিন্ন শব্দের মারপ্যাচের এ ধারণার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে যে, কুরআন মজীদে সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে কোনো পথনির্দেশ প্রদান করা হয়নি এবং ইসলাম কোনো বিশেষ পদ্ধতির রাষ্ট্র ব্যবস্থার দাবি করেনা এবং ইসলামী সংবিধান বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। এই বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের পেছনে কোনো যুক্তি নাই। কিন্তু ইসলামী জ্ঞান চর্চার এই পতনযুগে বুদ্ধির বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই অপপ্রচার প্রভাবশালী হতে পারে। তাই একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সাংবিধানিক বিধির সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যসমূহ একত্র করে পেশ করা প্রয়োজন মনে করছি, যাতে জনগণ জানতে পারে যে, আজ পর্যন্ত আলেমগণ যেসব মূলনীতিকে ইসলামের সাংবিধানিক নীতিমালা হিসেবে পেশ করছেন তার মূল উৎস কি এবং সাথে সাথে সংবিধান প্রণয়ন পরিষদের সদস্যদের সামনে যেনো আল্লাহ্ পাকের দলীল প্রমাণ পূর্ণমাত্রায় উদ্ভাসিত হয় এবং তারা যেনো কখনও এই ওজর পেশ করতে না পারে যে, আমাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধানসমূহ বলে দেয়া হয়নি।

উপরোক্ত প্রয়োজন পূরণের জন্য এই নিবন্ধ লেখা হচ্ছে। এতে আমি ক্রমিক নম্বর অনুসারে এক একটি সাংবিধানিক বিষয় সম্পর্কে কুরআনের বাণী এবং সহীহ হাদীসসমূহ পেশ করবো এবং সাথে সাথে এও বলে দেবো যে, তাথেকে কি বিধান নির্গত হয়।

১. আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব

হুকুম [সার্বভৌমত্ব] কেবল আল্লাহ্র জন্য। তাঁর নির্দেশ হলো, তোমরা তাঁর ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবেনা, এটাই সঠিক দীন। [সূরা ইউসুফ ঃ ৪০]

এই আয়াত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, ফায়সালা করার এখতিয়ার এবং শাসনকার্যের অধিকার [ভিন্ন শব্দে সার্বভৌমত্ব] আল্লাহ্ তায়ালার জন্য সুনির্দিষ্ট। এই সার্বভৌমত্বকে শুধুমাত্র "বিশ্বজনীন সার্বভৌমত্বের" [Universal Sovereignty] অর্থে সীমাবদ্ধ করার মতো কোনো শব্দ বা সম্বন্ধ এখানে বিদ্যমান নেই। আল্লাহ্ তায়ালার এই সার্বভৌমত্ব যেমন বিশ্বজনীন, তদ্রূপ রাজনৈতিক, আইনগত, নৈতিক ও বিশ্বাসগত সব দিকেই পরিব্যাপ্ত। স্বয়ং কুরআন মজীদে সর্ব প্রকারের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্ তায়ালার জন্য সুনির্দিষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব কুরআন মজীদ পরিষ্কার বাক্যে বলে যে, আল্লাহ্ তায়ালা কেবল "রব্বুন নাস" [মানুষের প্রভু] ও "ইলাহুন নাস" [মানুষের উপাস্য]-ই নন বরং "মালিকুন নাস" [মানুষের শাসক]-ও ঃ

"বলো [হে মুহাম্মাদ], আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রভু, মানুষের শাসক এবং মানুষের উপাস্যের নিকট।" [সূরা নাস ঃ ১-৩]

কুরআন মজীদ বলে, আল্লাহ্ তায়ালাই শাসনকর্তৃত্বের মালিক, কর্ণধার এবং এই বিষয়ে তাঁর কোনো অংশীদার নেই ঃ

"বলো ঃ হে আল্লাহ্! শাসন কর্তৃত্বের মালিক! তুমি যাকে চাও শাসন কর্তৃত্ব দান করো এবং যার নিকট থেকে চাও তা ছিনিয়ে নাও।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬]

"রাজত্বের ব্যাপারে তার কোনো অংশীদার নাই।" [সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১১]

কুরআন মজীদ আরোও পরিষ্কার ভাষায় বলে, নির্দেশ প্রদানের অধিকার কেবল আল্লাহ্ তায়ালার, কারণ তিনিই স্রষ্টা ঃ

"সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং নির্দেশও [চলবে] তাঁর।" [সূরা আরাফ ঃ ৫৪]

একথা পরিষ্কার যে, এটা কেবল বিশ্বজনীন সার্বভৌমত্ব নয় বরং সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং এর ভিত্তিতেই কুরআন মজীদ আইনগত সার্বভৌমত্বও আল্লাহ্ তায়ালার জন্য নির্ধারণ করেছে ঃ

"তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত জিনিসের অনুসরণ করো এবং তাঁকে ত্যাগ করে অন্যান্য অভিভাবকের অনুসরণ করোনা।" [সূরা আরাফ ঃ ৩]

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক ফায়সালা করেনা সে কাফের।" [সূরা মায়েদা ঃ ৪৪]

আল্লাহ্ তায়ালার রাজনৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্বের এই ধারণা ইসলামের সর্ব প্রাথমিক মৌলিক নীতিমালাসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রাথমিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের আইনবিদগণ [ফুকাহা] এই ব্যাপারে একমত যে, হুকুম দেয়ার অধিকার আল্লাহ্ তায়ালার জন্য সুনির্ধারিত। সুতরাং আল্লামা আমিদী উসূলে ফিক্হের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল ইহ্কাম ফী উসূলিল আহ্কাম" এ লিখেছেন ঃ

জেনো রাখো! আল্লাহ্ ছাড়া কোনো হাকিম [শাসক] নাই এবং তিনি যে হুকুম [বিধান] দিয়েছেন তাই কেবল হুকুম (বিধান) হিসেবে গণ্য।

শায়খ মুহাম্মাদ খুদারী তাঁর 'উসূলুল ফিক্হ" গ্রন্থে এটাকে গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যবদ্ধ আকীদা [বিশ্বাস] প্রমাণ করেছেন ঃ

মূলত আল্লাহ্‌র ফরমানকে হুকুম বলা হয়। অতএব হুকুম দেয়ার অধিকার আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কারো নাই। এটা এমন একটি কথা, যে সম্পর্কে সমস্ত মুসলমান একমত।

অতএব কোনো সংবিধান যখন সর্ব প্রথম আল্লাহ্‌ তায়ালার রাজনৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নেয় এবং অকাট্য বাক্যে একথা তাতে লিখতে হয় যে, এই রাষ্ট্র আল্লাহ্‌র অনুগত আর তাঁকে সর্বোচ্চ ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী স্বীকার করে এবং তাঁর বিধান পালন বাধ্যতামূলক মনে করে, তখনই তা ইসলামী সংবিধান হিসেবে গণ্য হতে পারে।

২. রিসালাতের মর্যাদা

সাধারণভাবে সকল নবী রসূল এবং বিশেষভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌ তায়ালার এই রাজনৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্বের প্রতিভূ। অথ্যাৎ যে মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তায়ালার এই সার্বভৌমত্ব মানুষের মাঝে কার্যকর হয় সে মাধ্যম হলেন আল্লাহ্‌র নবী। এজন্য তাঁর নির্দেশাবলীর আনুগত্য করা তার প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করা এবং ফায়সালাসমূহ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়া এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, দল ও সমাজের জন্য অপরিহার্য, যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে। বিষয়টি কুরআন মজীদে বার বার সুস্পষ্ট বাক্যে বিধৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ দেখা যেতে পারে ঃ

"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করলো সে মূলত আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করলো।" [সূরা নিসা ঃ ৮০]

"আমরা যে রসূলই প্রেরণ করেছি তাকে এজন্য প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশের ভিত্তিতে তার আনুগত্য করা হবে।" [সূরা নিসা ঃ ৬৪]

"[হে মুহাম্মাদ!] আমরা এই কিতাব সত্য সহকারে তোমার নিকট নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মাঝে ফায়সালা করো যা তোমাকে আল্লাহ্‌ হৃদয়ংগম করান তদনুযায়ী।" [সূরা নিসা ঃ ১০৫]

"আর রসূল তোমাদের যা কিছু দেয় তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের বাধা দেয় তাথেকে বিরত থাকো।" [সূরা হাশর ঃ ৭]

"অতএব না! তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষণ তোমাকে তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদে মীমাংসাকারী মেনে না নেয়, অতঃপর তুমি যে মীমাংসা করবে তাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবেনা এবং তা সন্তোষসহকারে মেনে নিবে।" [সূরা নিসা ঃ ৬৫]

এটি ইসলামী সংবিধানের দ্বিতীয় ভিত্তি। তাতে আল্লাহ্‌ তায়ালার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়ার পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ্‌কে আইনের উৎস হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সুন্নাহ্‌ পরিপন্থী বিধান দেয়ার, বিধান প্রণয়নের ও ফায়সালা প্রদানের এখতিয়ার থাকবেনা।

৩. খিলাফতের ধারণা

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি তাদের অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন, যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের ।" [সূরা নূর ঃ ৫৫]

উপরোক্ত আয়াত থেকে দুটি সাংবিধানিক বিষয় অবগত হওয়া যায়। [এক] ইসলামী রাষ্ট্রের সঠিক মর্যাদা হচ্ছে "খিলাফতের" [প্রতিনিধিত্বের] "সার্বভৌমত্বের" নয়। [দুই] ইসলামী রাষ্ট্রে খিলাফতের বাহক বা দায়িত্ব বহনকারী, কোনো ব্যক্তি, পরিবার গোত্র হবে না, শ্রেণী বরং গোটা মুসলিম উম্মাহ হবে তার বাহক, যাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা স্বাধীন রাষ্ট্র দান করবেন।

প্রথমোক্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা হলো, সার্বভৌমত্ব তার মূল বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই দাবি করে যে, সার্বভৌমত্বের অধিকারী সত্তার বাইরে এমন সত্তা থাকবেনা যে তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সীমাবদ্ধ করতে পারে এবং তাকে তার বানানো বিধান ও নীতিমালা ব্যতীত উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া বিধান ও নীতিমালার অনুগত বানাতে পারে।[১] এখন যদি একটি রাষ্ট্র প্রথম পদক্ষেপেই স্বীকার করে নেয় যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের হুকুম তার জন্য চূড়ান্ত ও অকাট্য বিধান, শাসন বিভাগ এর পরিপন্থী কাজ করতে পারবেনা, আইন প্রণয়ন বিভাগ এর পরিপন্থী কোনো বিধান রচনা করতে পারবেনা এবং তার বিচার বিভাগও এর পরিপন্থী কোনো রায় দিতে পারবেনা, তবে তার পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায়, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিপরীতে সার্বভৌমত্বের দায়িত্ব থেকে বিরত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনায় মূলত আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতিনিধির [খলীফা] মর্যাদা গ্রহণ করে নিয়েছে। এই অবস্থায় তার জন্য যথার্থ পরিভাষা "সার্বভৌমত্ব" নয় বরং "খিলাফতই" হতে পারে। অন্যথায় উপরোক্ত মর্যাদা বহাল রেখে তার জন্য "সার্বভৌমত্ব" শব্দের ব্যবহার করা কেবল পারিভাষিক বৈপরিত্য ছাড়া আর কি হতে পারে। অবশ্য সে যদি তার সর্বময় কর্তৃত্বকে আল্লাহ্‌র হুকুম ও রসূলের সুন্নাতের আনুগত্য করার সাথে শর্তযুক্ত না করে তবে নিঃসন্দেহে তার সঠিক মর্যাদা হবে "সার্বভৌমত্বের," কিন্তু এ অবস্থায় তার জন্য "ইসলামী রাষ্ট্র" পরিভাষাটি ব্যবহার করাও পারিভাষিক বৈপরিত্য হবে।

দ্বিতীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা এই যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রে তার সমস্ত মুসলিম নাগরিকের সামগ্রিকভাবে খিলাফতের ধারক ও বাহক হওয়াটা এমন একটি মূলনীতিগত সত্য যার উপর ইসলামে গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। ইসলাম পরিপন্থী গণতন্ত্রের ভিত্তি যেভাবে "জনগণের সার্বভৌমত্বের" [Popular Sovereignty] নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত, অনুরূপভাবে ইসলামী গণতন্ত্রের ভিত্তি "সামগ্রিক প্রতিনিধিত্বের" [Popular Vicegerency] উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে খিলাফত পরিভাষা এজন্য গ্রহণ করা হয়েছে যে, এখানে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র দান হিসেবে বিবেচিত এবং দানকে আল্লাহ্ নির্ধারিত

---

১. এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

সীমার মধ্যে অবস্থান করেই ব্যবহার করা যায়। কিন্তু খিলাফতের এই সীমাবদ্ধ কর্তৃত্ব কুরআনের উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে কোনো এক ব্যক্তি বা শ্রেণীর জন্য নয় বরং রাষ্ট্রের সকল মুসলমানের উপর একটি জামায়াত বা সমষ্টি হিসেবে অর্পণ করা হয়েছে, যার অনিবার্য দাবি হলো, মুসলমানদের মর্জি মতো সরকার গঠিত হবে, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে এবং তার প্রতি মুসলমানগণ যতক্ষণ সন্তুষ্ট থাকবে সেই সরকার ততক্ষণই ক্ষমতায় থাকবে। এই কারণেই হযরত আবু বক্‌র সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজেকে "আল্লাহ্‌র খলীফা" বলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। কারণ খিলাফত মূলত মুসলিম উম্মাহকে প্রদান করা হয়েছিলো, সরাসরি তাঁকে নয়। তাঁর মর্যাদা কেবল এই ছিলো যে, মুসলমানগণ তাদের মর্জি মাফিক তাদের খিলাফতের কর্তৃত্বকে তাঁর নিকট অর্পণ করেছিলেন মাত্র।

এই দুইটি বিষয় বিবেচনায় রেখে ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যা সার্বভৌমত্বের দাবি থেকে মুক্ত হবে এবং যার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য খিলাফত হিসেবে প্রতিভাত হবে।

৪. পরামর্শের নীতিমালা [শূরার আদর্শ]

সামষ্টিক খিলাফতের উপরোক্ত দাবিকে কুরআন মজীদ নিম্নোক্ত বাক্যে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে ঃ

এবং তাদের কাজ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। [সূরা শূরা ঃ ৩৮]

এ আয়াতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এই বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখানে সমস্ত সামাজিক বিষয় পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। এখানে শুধু বৈশিষ্ট্যই বর্ণনা করা হয়নি বরং বাক রীতির আওতায় পরামর্শের নির্দেশও প্রদান করা হয়েছে। এজন্য কোনো সামাজিক সামষ্টিক কাজ পরামর্শ গ্রহণ ব্যতীত সম্পাদন করা নিষেধ, খতীব বাগদাদী [রঃ] হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন ঃ

> "আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার পরে এমন বিষয়ের উদ্ভব হবে যে সম্পর্কে না কুরআন মজীদে কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, আর না আপনার নিকট থেকে কিছু শোনা গেছে। তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, আমার উম্মতের ইবাদত গুজার লোকদের একত্র করো[১] এবং বিষয়টি পরামর্শের জন্য তাদের সামনে উপস্থিত করো, কিন্তু এক জনের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিওনা।" [তাফসীরে রুহুল মায়ানী]

রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিম্নোক্ত বাক্যে ঐ পরামর্শের প্রাণসত্তাকে তুলে ধরেছেন ঃ

> "যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন পরামর্শ দান করে, যে সম্পর্কে সে জানে যে যথার্থ বিষয় এর বিপরীতে রয়েছে, সে মূলত তার ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো।" [আবু দাউদ]

---

১. **অর্থাৎ এমন** লোক যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে একনায়কত্বসুলভ স্বৈরাচারী আচরণ ও বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা গ্রহণকারী নয়।

এই হুকুম খুবই ব্যাপক শব্দে প্রদান করা হয়েছে এবং এখানে শূরার [পরামর্শ পরিষদের] কোনো বিশেষ কাঠামো নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। কারণ ইসলামের বিধান গোটা দুনিয়ার জন্য এবং চিরকালের জন্য। যদি পরামর্শ পরিষদের কোনো বিশেষ কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো তবে তা বিশ্বজনীন, সর্বাত্মক ও স্থায়ী হতে পারতোনা। পরামর্শ পরিষদ কি সরাসরি সমস্ত লোকের সমন্বয়ে গঠিত হবে, না তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে? প্রতিনিধিগণ কি জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হবেন, না বিশিষ্ট লোকদের ভোটে? নির্বাচন কি দেশব্যাপী হবে, না কেবল রাজধানী শহরে হবে? নির্বাচন কি ভোটের আকারে হবে, না এমন লোক প্রতিনিধি হিসেবে নেয়া হবে যারা সমাজে নেতৃস্থানীয়? পরামর্শ পরিষদ কি এক কক্ষ বিশিষ্ট হবে, না দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট? এগুলো এমন কতোগুলো প্রশ্ন যার একটিমাত্র উত্তর প্রত্যেক সমাজ ও প্রতিটি সভ্যতার জন্য একইভাবে যুতসই হতে পারেনা। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর বিভিন্নরূপ হতে পারে এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। এজন্য ইসলামী শরীয়া বিষয়টিকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছে, কোনো বিশেষ কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেয়নি এবং কোনো বিশেষ কাঠামো নিষিদ্ধও করেনি। অবশ্য নীতিগতভাবে উপরোক্ত আয়াত এবং তার ব্যাখ্যা প্রদানকারী হাদীসসমূহ তিনটি বিষয় বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে ঃ

১. মুসলমানদের কোনো সামাজিক সামষ্টিক কাজ পরামর্শ ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়টি রাজতন্ত্রের শিকড় কেটে দেয়। কারণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্র প্রধানের নিয়োগ। অন্যান্য বিষয়ে যদি পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক হয় তবে জোরপূর্বক রাষ্ট্র প্রধানের পদ দখল কি করে বৈধ হতে পারে? অনুরূপভাবে উপরোক্ত বিষয়টি একনায়কত্বকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কারণ একনায়কত্বের অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছাচার বা স্বৈরাচার এবং স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচার পরামর্শের পরিপন্থী। অনুরূপভাবে সংবিধানকে সাময়িক অথবা স্থায়ীভাবে স্থগিত বা বাতিল করার এখতিয়ারও এ হুকুমের উপস্থিতিতে রাষ্ট্র প্রধানকে দেয়া যেতে পারেনা। কারণ সংবিধান স্থগিত থাকাকালে অবশ্যই সে স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং স্বেচ্ছাচার নিষিদ্ধ।

২. পরামর্শের বিষয়টি যেসব লোকের সামাজিক বা সামষ্টিক কাজের সাথে জড়িত তাদের সকলকে পরামর্শে অংশগ্রহণ করতে হবে, চাই তারা সরাসরি অংশগ্রহণ করুক অথবা নিজেদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে অংশগ্রহণ করুক।

৩. পরামর্শ স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও নিষ্ঠাপূর্ণ হতে হবে। শক্তি প্রয়োগে অথবা প্রলোভন দিয়ে ভোট বা পরামর্শ লাভ করা মূলত পরামর্শ গ্রহণ না করারই সমতুল্য।

অতএব সংবিধানের বিস্তারিত রূপ যাই হোক তাতে শরীয়াতের এই তিনটি নীতিমালার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কোনো সময় জনগণের অথবা তাদের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিগণের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতিরেকে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ সংবিধানে রাখা উচিৎ নয়। সংবিধানে এরূপ নির্বাচন পদ্ধতির ব্যবস্থা রাখা উচিৎ যাতে গোটা জাতি পরামর্শে অংশ গ্রহণ করতে পারে। জনগণকে অথবা তাদের

প্রতিনিধিগণকে ভীতি প্রদর্শন করে অথবা প্রলোভন দিয়ে যাতে তাদের মতামত গ্রহণ করা সম্ভব না হয় তার ব্যবস্থাও সংবিধানে থাকতে হবে।

৫. নির্বাচনের নীতিমালা

রাষ্ট্র প্রধান, মন্ত্রী পরিষদ সদস্য, পরামর্শ পরিষদ সদস্য এবং প্রশাসক নির্বাচনে কি কি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে সে সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দিক নির্দেশনা নিম্নরূপ ঃ

"আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেনো তোমরা আমানতসমূহ [অর্থাৎ বিশ্বস্ততার যিম্মাদারী] বিশ্বস্ত লোকদের কাছে সোপর্দ করো।" [সূরা নিসা ঃ ৫৮]

"তোমাদের সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক খোদাভীরু।" [সূরা হুজরাত ঃ ১৩]

মহানবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন ঃ

"তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হলো সেসব লোক যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে, যাদেরকে তোমরা দোয়া করো এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। তোমাদের নিকৃষ্টতম নেতা হলো সেসব লোক যাদের তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে, যাদের তোমরা অভিসম্পাত করো এবং তারাও তোমাদেরকে অভিসম্পাত করে।" [সহীহ্ মুসলিম]

"আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা আমাদের এ রাষ্ট্রীয় কোনো দায়িত্বে এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করবোনা, যে তা পাওয়ার জন্য আবেদন করে অথবা তা পেতে লালায়িত।" [বুখারী ও মুসলিম]

"আমাদের নিকট তোমাদের মধ্যে সবেচেয়ে বড় খিয়ানতকারী হলো সে ব্যক্তি যে ঐ পদের প্রার্থী হয়।" [আবু দাউদ]

হাদীস অতিক্রম করে একথা ইতিহাসের পাতায়ও স্থান দখল করে নিয়েছে যে ইসলামের পদে প্রার্থী হওয়া খুবই অপছন্দনীয় কাজ। কালকাশানদী তাঁর সুবহুল আ'শা গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"হযরত আবু বকর [রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সরকারী পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আবু বকর! এই পদ তার জন্য যার উক্ত পদের প্রতি আকর্ষণ নাই, তার জন্য নয় যে, তা পাওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তা সে ব্যক্তির জন্য, যে উক্ত পদ এড়ানোর জন্য চেষ্টারত থাকে, তার জন্য নয়, যে তার জন্য ঝাপিয়ে পড়ে। ঐ পদ তার জন্য যাকে বলা হয় যে, এটা তোমার প্রাপ্য; তার জন্য নয় যে বলে, এটা আমার প্রাপ্য।" [১খ, পৃঃ ২৪০][1]

---

১. উপরোক্ত বর্ণনাটি হুবহু ঐ শব্দসহযোগে আমরা হাদীসের কিতাবে পাইনি বরং এটা একজন ঐতিহাসিকের বর্ণনা। কিন্তু আমরা তা এজন্য উদ্ধৃত করেছি যে, হাদীসের দুইটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা

উপরোক্ত দিক নির্দেশনা যদিও কেবল নীতিগত পর্যায়ের এবং তাতে একথা বলা হয়নি যে, বাঞ্ছিত গুণাবলীর অধিকারী নেতা বা প্রতিনিধি নির্বাচনের এবং অবাঞ্ছিত লোকদের প্রতিহত করার হাতিয়ার কি, কিন্তু তথাপি এই দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য যুক্তিসংগত পন্থা বা পদ্ধতি আবিষ্কার করা সমকালীন সংবিধান রচয়িতাদের কাজ। তাদেরকে নির্বাচনের এমন ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে যাতে বিশ্বস্ত ও খোদাভীরু এবং জনগণের প্রিয়ভাজন ও কল্যাণকামী লোক নির্বাচিত হতে পারে এবং এমনসব লোক নির্বাচিত না হতে পারে যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েও জনগণের নিকট ঘৃণার পাত্র, যাদেরকে সর্বত্র থেকে অভিসম্পাত করা হয়, যাদেরকে লোকেরা বদদোয়া করে এবং যাদেরকে সরকারী পদ প্রদান করা হয়না বরং তারা স্বয়ং উক্ত পদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে।

৬. নারীদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ

আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"পুরুষরা নারীদের কর্তা।" [সূরা নিসা ঃ ৩৪]

একটি হাদীসে নবী করিম (স) বলেছেন ঃ

"যে জাতি নিজেদের বিষয়সমূহ নারীদের উপর সোপর্দ করে সে জাতি কখনও সফলকাম হতে পারেনা।" [বুখারী]

উপরোক্ত আয়াত এবং রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এ বিষয়ে অকাট্য দলীল যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদ [তা রাষ্ট্র প্রধানের পদ হোক, অথবা মন্ত্রিত্ব হোক, অথবা সংসদের সদস্যপদ হোক অথবা রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থার প্রশাসনিক পদ হোক] নারীদের উপর সোপর্দ করা যায়না। তাই কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানে নারীদের উপরোক্ত পদে নিয়োগের ব্যবস্থা বা সুযোগ রাখা ঐসব সুস্পষ্ট দলীলের পরিপন্থী। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য স্বীকারকারী রাষ্ট্র উপরোক্ত মূলনীতির বিরোধিতা করার মোটেই অধিকার রাখেনা।[১]

৭. রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

মহান আল্লাহ ঃ

"আমরা তাদেরকে [মুসলমানদেরকে] পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্য নিষিদ্ধ করবে।" [সূরা হজ্জ ঃ ৪১]

উপরোক্ত আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লাভের উদ্দেশ্য ও তার মৌলিক কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কাফের রাষ্ট্রের মতো তার কাজ কেবল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষা করা, সীমান্তরেখা বরাবর দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। যার সাথে এ বর্ণনার অর্থগত সামঞ্জস্য রয়েছে। এ ধরনের দুর্বল রিওয়ায়াতের অনুকূলে সহীহ্ হাদীস বিদ্যমান থাকলে তা অর্থগত দিক থেকে শক্তিশালী হয়ে যায়।

১. বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হওয়ার জন্য এ গ্রন্থের ১১ নং অধ্যায়ে [কতিপয় সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয়] পাঠ করা যেতে পারে।

জোরদার করা এবং দেশের বৈষয়িক উন্নতির জন্য চেষ্টা করাই নয়, বরং একটি ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ার সুবাদে তার সর্ব প্রথম কর্তব্য হলো নামায ও যাকাত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা, যেসব বিষয়কে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণকর বলেছেন তার প্রসার ঘটানো এবং যেসব বিষয়কে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর বলেছেন তার প্রতিরোধ করা। নামায কায়েম হচ্ছে কি হচ্ছেনা, যাকাত প্রদান করা হচ্ছে কি হচ্ছেনা, কল্যাণকর বিষয় প্রসার লাভ করছে না পরাভূত হচ্ছে এবং নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর বিষয় পরাভূত হচ্ছে না মাথাচারা দিয়ে উঠছে– এসব ব্যাপারে যে রাষ্ট্রের কোনো মাথা ব্যথা নাই সে রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যেতে পারেনা। যে রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে যেনা, ব্যভিচার, মদ, জুয়া, অশ্লীল সাহিত্য ও পত্র পত্রিকা, অশ্লীল বিনোদন ও আনন্দ-স্ফূর্তি, অশ্লীল গানবাজনা, সহশিক্ষা, জাহিলী যুগের দৈহিক সৌন্দর্য প্রদর্শনী এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার ব্যাপক প্রচলন থাকে এবং এসব সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ কার্যাবলীর উপর বিধিনিষেধ আরোপিত নাই, কোনো ধরপাকড় নাই– সে রাষ্ট্রের নাম ইসলামী রাষ্ট্র রাখা খুবই বেমানান। অতএব একটি ইসলামী সংবিধানে অনিবার্যরূপে ইসলামী রাষ্ট্রকে সেসব বিষয়ের অনুসরণ করতে বাধ্য করতে হবে যেগুলোকে কুরআন মজীদ মৌলিক কর্তব্যরূপে নির্ধারণ করেছে।

৮. কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের নীতিমালা

"হে মুমিনরা! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাকো তবে তোমরা অনুগত্য করো আল্লাহ্‌র, অনুগত্য করো রসূলের এবং যারা তোমাদের মধ্যে কতৃত্বের অধিকারী তাদের। অতপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হলে তা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি সোপর্দ করো। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" [সূরা নিসা ঃ ৫৯]

উপরোক্ত আয়াতে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। সাংবিধানিক বিষয়ের সাথে এর প্রত্যেকটির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

১. আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যই হলো আসল আনুগত্য, প্রত্যেক মুসলমানকে ব্যক্তি হিসেবে এবং মুসলিম উম্মাহকে সমষ্টিগতভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুগত হতে হবে। এই আনুগত্য অন্য যে কোনো প্রকারের আনুগত্যের তুলনায় অগ্রগণ্য। এরপরে হচ্ছে কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকের আনুগত্য, আগে নয় এবং এই আনুগত্য হবে উপরোক্ত আনুগত্যের অধীন, স্বাধীন আনুগত্য নয়। এ বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ও রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে পেতে পারি।

"কোনো বিষয়ের মীমাংসা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল করে দিলে আবার সে বিষয়ে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর নিজস্বভাবে মীমাংসা করার অধিকার নাই। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণ করলে সে পথভ্রষ্টতায় বহু দূরে চলে যাবে।" [সূরা আহ্‌যাব ঃ ৩৬]

"যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক ফায়সালা করেনা তারা কাফের -- তারা যালেম--- তারা ফাসেক।" [সূরা মায়েদা ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭]

"স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় মুসলমানের জন্য [নির্দেশ] শোনা ও আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক, যতক্ষণ না তাকে পাপাচারের নির্দেশ দেয়া হয়। অতএব তাকে পাপাচারের নির্দেশ দেয়া হলে কোনো শ্রবণও নাই, আনুগত্যও নাই।" [বুখারী ও মুসলিম]

"যদি কোনো কর্তিতনাসা ক্রীতদাসকেও তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং সে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে তোমাদের নেতৃত্ব দান করে তবে তার নির্দেশ শোনো ও মান্য করো।" [সহীহ মুসলিম]

"পাপাচারের বেলায় কোনো আনুগত্য নাই, আনুগত্য কেবল সৎকাজে।" [বুখারী ও মুসলিম]

"আল্লাহ্‌র অবাধ্যচারীর আনুগত্য করা যাবেনা।" [তাবরানী]

"স্রষ্টার নাফরমানী হয় এমন কোনো বিষয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবেনা।" [শারহুস সুন্নাহ]

কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত অকাট্য দলীলসমূহ চূড়ান্তভাবে বলে দিচ্ছে যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নকারী সংসদের আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানের পরিপন্থী আইন প্রণয়নের কোনোই অধিকার নাই। তারা এরূপ কোনো আইন প্রণয়ন করলে তা সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং তা কার্যকর হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেনা।

অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ একথাও পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছে যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারালয়সমুহে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানই কার্যকর হতে হবে এবং যে কথা কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা সত্য প্রমাণিত হবে তাকে কোনো বিচারক একথা বলে রদ করতে পারবেনা যে, আইন প্রণয়নকারী সংসদের প্রণীত আইন তার পরিপন্থী। বৈপরিত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান নয় বরং সংবিধানের সে আইন সংবিধান থেকে খারিজ করে দিতে হবে।

অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ একথাও পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ এমন কোনো নির্দেশ প্রদানের বা নীতিমালা প্রণয়নের অধিকার রাখেনা যার দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। প্রশাসন যদি এমন কোনো নির্দেশ দেয় এবং জনগণ তা মান্য না করে তবে তারা অপরাধী সাব্যস্ত হবেনা বরং পক্ষান্তরে স্বয়ং সরকারই বাড়াবাড়ি করছে বলে সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইযে, কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের উলীল আমর তথা কর্ণধার কেবল একজন মুসলমানই হতে পারেন। তার দুইটি প্রমাণ স্বয়ং উপরোক্ত আয়াতেই বিদ্যমান রয়েছে। [এক] "হে ঈমানদারগণ" বলার পর 'তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের

অধিকারী" বলার অর্থ কেবল এ হতে পারে যে, এখানে যে কর্তৃত্বের অধিকারীর আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তাকে মুসলমানদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত করতে হবে। [দুই] বিরোধের ক্ষেত্রে বিরোধপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর একথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, দেশের নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ কেবল মুসলমান উলীল আমরই [কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি] মানতে পারে, কাফের উলীল আমর মানতে পারেনা। উপরন্তু নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের বক্তব্যও এর সমর্থন বরং জোর তাকিদ করে। এইমাত্র উপরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "একটি কর্তিতনাসা ক্রীতদাসকেও যদি তোমাদের আমীর বানানো হয় এবং সে আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে তোমাদের নেতৃত্ব দান করে তবে তার কথা শোনো এবং মান্য করো।" আরও এইযে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যাচারী তার আনুগত্য করা যাবেনা"। আরও একটি হাদীস হযরত উবাদা ইবনুস সামিত [রাদিয়াল্লাহু তায়লা আনহু] বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত বাক্যে আমাদের শপথ করিয়েছেন ঃ

> "আমরা আমাদের শাসকদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবোনা। কিন্তু আমরা যদি তাদেরকে প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত দেখি, যে সম্পর্কে আমাদের নিকট তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রমাণ রয়েছে। [তবে আমরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবো]।" [বুখারী, মুসলিম]

অপর এক হাদীসে এসেছে যে, সাহাবায়ে কিরাম [রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম] যখন নিকৃষ্ট দুরাচার শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অনুমতি চাইলেন তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

"না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করতে থাকে।" [মুসলিম]

উপরোক্ত আলোচনার পর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারেনা যে, কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো অমুসলিম ব্যক্তির "উলিল আমর" হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। ব্যাপারটি ঠিক এরূপ, যেমন কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রবাদ প্রত্যাখ্যানকারী কোনো ব্যক্তি কর্নধার হতে পারেনা এবং কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বিরোধী কোনো ব্যক্তির যুক্তিসংগতভাবে এবং কার্যত "উলীল আমর" হতে পারেনা।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, উপরোক্ত আয়াতের আলোকে দেশের নাগরিকগণের কোনো বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধিদের সাথে মতভেদে লিপ্ত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এবং এ ধরনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী হবে আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। এ সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সনদ যার অনুকূলেই ফায়সালা দান করবে তা সর্বান্তকরণে মেনে নিতে হবে, সে ফায়সালা উলীল আমরের পক্ষেই হোক অথবা নাগরিকগণের পক্ষেই হোক। এখন পরিষ্কার কথা এইযে, এ নির্দেশের দাবি পূরণের জন্য এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকতে হবে যার নিকট বিবাদপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা যেতে পারে এবং যার কাজ হবে আল্লাহ্র কিতাব ও

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক বিবাদের মীমাংসা করা। এ প্রতিষ্ঠান চাই বিশেষজ্ঞ আলেমগণের কমিটি হোক অথবা সুপ্রিম কোর্ট হোক অথবা অন্য কোনো কিছু- তার বিশেষ কোনো কাঠামো শরীয়ত আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দেয়নি যে, তাই মানতে হবে। কিন্তু যাই হোক, রাষ্ট্রের মধ্যে অনুরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে এবং তা এতোটা ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে যে, তার নিকট সরকার, সংসদ বা আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এবং বিচার বিভাগের বিধান ও সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। এ প্রতিষ্ঠানের মৌলিক নীতিমালা এই হবে যে, সে আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসা করবে।

৯. মৌলিক অধিকার ও সামাজিক সুবিচার

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"আমানত তার প্রকৃত প্রাপকের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।" [সূরা নিসা ঃ ৫৮]

"কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেনো তোমাদেরকে কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করো, এটা তাকওয়ার নিকটতর।" [সূরা মায়েদা ঃ ৮]

এই আয়াতদ্বয় যদিও ব্যাপক অর্থে মুসলমানদেরকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সুবিচার কায়েমের জন্য বাধ্য করে, কিন্তু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি থেকে ইসলামী রাষ্ট্রও মুক্ত থাকতে পারেনা। অবশ্যম্ভাবীরূপে ইসলামী রাষ্ট্রকেও ন্যায়বিচার ও সুবিচারের অনুসারী হওয়া উচিৎ বরং তাকে উত্তমরূপেই তার অনুসারী হতে হবে। কারণ মানুষের মাঝে সর্বাধিক শক্তিশালী বিচারক সংস্থা হচ্ছে রাষ্ট্র। অতএব তার আইনে বা ফায়সালায় যদি সুবিচার বিদ্যমান না থাকে তবে সমাজের অন্য কোথাও সুবিচার পাওয়ার আশা করা যায়না।

এখন দেখা যাক, রাষ্ট্র সম্পর্কে যদি আমরা চিন্তা করি তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ [অনুসৃত কার্যক্রম] থেকে মানুষের মাঝে সুবিচার ও ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কি পন্থা ও মূলনীতি পাওয়া যায়।

১. বিদায় হজ্জের সুপ্রসিদ্ধ ভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী রাষ্ট্রের যেসব মৌলিক নীতিমালা ঘোষণা করেছিলেন তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এই ছিলো যে ঃ

"নিশ্চয়ই তোমাদের জীবন, তোমাদের ধনসম্পদ এবং তোমাদের মান ইজ্জত সেরূপ সম্মানিত যেরূপ সম্মানিত তোমাদের আজকের এই হজ্জের দিনটি।"

এই ঘোষণায় ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জান মাল ও ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা ও মর্যাদার মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যে রাষ্ট্রই নিজেকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে দাবি করবে তাকেই এসব দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।[১]

২. এ মর্যাদা কোন্ অবস্থায় এবং কিভাবে ক্ষুণ্ণ হতে পারে? তাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত বাক্যে বলে দিয়েছেন।

"অতএব লোকেরা যখন একাজ [একত্ববাদের সাক্ষ্য, রিসালাতের সাক্ষ্য, নামায কায়েম, যাকাত প্রদান] করবে তখন তারা আমার থেকে তাদের জীবন রক্ষা করে নিলো। কিন্তু ইসলামের কোনো অধিকারের ভিত্তিতে অপরাধী সাব্যস্ত হলে স্বতন্ত্র কথা এবং তাদের নিয়্যত তথা উদ্দেশ্যের হিসাব গ্রহণ আল্লাহ্‌র যিম্মায়।" [বুখারী ও মুসলিম]

"অতএব তাদের জানমাল [তাতে হস্তক্ষেপ] আমার জন্য হারাম। কিন্তু জান ও মালের কোনো অধিকার তাদের উপর বর্তাইলে স্বতন্ত্র কথা। তাদের গোপন বিষয়ের হিসেব আল্লাহ্‌র যিম্মায়।" [বুখারী ও মুসলিম]

"অতএব যে ব্যক্তি এর [কলেমা তাওহীদের] প্রবক্তা হলো সে আমার থেকে তার মাল ও জান বাঁচিয়ে নিলো। তবে আল্লাহ্‌র কোনো অধিকার [কোনো অপরাধের কারণে] তার উপর বর্তাইলে স্বতন্ত্র কথা। তার গোপন বিষয়ের হিসেব আল্লাহ্‌র যিম্মায়।" [বুখারী]

উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো নাগরিকের জান মাল ও ইজ্জত আব্রুর উপর হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো নাগরিক ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে তার উপর [অথবা তার বিরুদ্ধে] কোনো অধিকার প্রমাণিত না হয় অর্থাৎ সে কোনো ব্যাপারে আইনত দোষী সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ তার উপর হস্তক্ষেপ করা যাবেনা।

৩. কোনো নাগরিকের উপর [অথাৎ তার বিরুদ্ধে] কিভাবে অধিকার প্রমাণিত হয়? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিম্নোক্ত বাক্যে বর্ণনা করেছেন।

"বাদী ও বিবাদী যখন তোমার সামনে উপস্থিত হবে তখন তুমি যেভাবে এক পক্ষের বক্তব্য শুনেছো সেভাবে অপর পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত তাদের মধ্যে ফায়সালা প্রদান করবেনা।" [আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহ্‌মদ]

হযরত ওমর ফারুক [রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু] একটি মোকদ্দমার ফায়সালা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"ইসলামে ন্যায়সংগত পন্থা ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে আটক করা যায়না।" [মুয়াত্তা ইমাম মালিক]

---

১. উপরোক্ত হাদীসে যদিও মুসলমানদের অধিকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে, কিন্তু ইসলামী শরীয়াতের একটি সর্বস্বীকৃত মূলনীতি এইযে, যে অমুসলিম ব্যাক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের চতুঃসীমার মধ্যে অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তাধীনে বসবাস গ্রহণ করে সে ইসলামের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন অনুসারে মুসলমানদের অনুরূপ অধিকার লাভ করবে।

আলোচ্য মোকদ্দমার যে বিবরণ উক্ত মুয়াত্তা গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে তা থেকে অবগত হওয়া যায় যে, ইরাকের নব-বিজিত এলাকায় মিথ্যা অভিযোগে লোকদের গ্রেপ্তার করা হতে থাকলে এবং তার বিরুদ্ধে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়লা আনহুর দরবারে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি তদপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত কথা বলেন। এ বর্ণনা থেকে প্রতিভাত হচ্ছে যে, এখানে "ন্যায়সংগত পন্থা" অর্থ 'যথাযথ বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম" [Due Process of Law] অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির অপরাধ প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণ করতে হবে এবং অপরাধীকে নিজের নির্দোষিতার পক্ষে বক্তব্য রাখার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া ইসলামে কোনো ব্যক্তিকে আটক করা যায়না।

৪. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনুহুর খিলাফতকালে খারিজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হলে, যারা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই প্রস্তুত ছিলোনা, তিনি তাদের লিখে পাঠান ঃ

> "তোমরা যথায় ইচ্ছা বসবাস করো। আমাদের ও তোমাদের মাঝে শর্ত এইযে, তোমরা খুনখারাবি করবেনা, রাহাজানি করবেনা এবং কারো উপর যুলুম করবেনা। তোমরা উপরোক্ত কোনো কাজে লিপ্ত হলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।" [নায়লুল আওতার]

অর্থাৎ তোমরা যে মত ইচ্ছা পোষণ করতে পারো। তোমাদের মতামত ও উদ্দেশ্যের জন্য গ্রেপ্তার করা হবেনা। অবশ্য তোমরা যদি তোমাদের মতামতের প্রেক্ষিতে প্রশাসন যন্ত্র জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা করো তবে অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া হবে।

উপরোক্ত আলোচনার পর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকেনা যে, ন্যায় ইনসাফের ইসলামী ধারণা কোনো অবস্থায়ই প্রশাসন বিভাগকে প্রচলিত বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম ব্যতীত যথেচ্ছভাবে যাকে ইচ্ছা গ্রেপ্তার করার, যাকে ইচ্ছা কয়েদ করার, যাকে ইচ্ছা নির্বাসন দেয়ার, ইচ্ছামতো কারো বাকশক্তি রুদ্ধ করার এবং যাকে ইচ্ছা মতামত প্রকাশের মাধ্যম থেকে বঞ্চিত করার এখতিয়ার প্রদান করেনা। রাষ্ট্র সাধারণভাবে এ ধরনের যেসব এখতিয়ার তার প্রশাসন বিভাগকে দান করে তা ইসলামী রাষ্ট্র কখনও দান করতে পারেনা।

উপরন্তু মানুষের মাঝে মীমাংসা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায় ইনসাফের অনুসরণের আরেক অর্থ, যা আমরা ইসলামের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহ্য থেকে জানতে পারি, তা এইযে, ইসলামে রাষ্ট্র প্রধান, গভর্নর, পদস্থ কর্মকর্তা ও সর্বসাধারণ সকলের জন্য একই আইন এবং একই বিচার ব্যবস্থা। কারো জন্য কোনো আইনগত স্বাতন্ত্র্য নাই, কারো জন্য বিশেষ আদালত নাই এবং কেউই আইনের হস্তক্ষেপ থেকে ব্যতিক্রম নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ সময়ে নিজেকে এভাবে পেশ করেন, আমার বিরুদ্ধে কারো কোনো দাবি থাকলে সে যেনো তা আদায় করে নেয়। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়লা আনহু জাবালা ইবনে আইহাম সাসানী নামক গভর্ণরের উপর এক বেদুইনের কিসাসের দাবি পূরণ করেন। হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু গভর্নরের জন্য আইনগত নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে হযরত

ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন এবং জনসাধারণকে গভর্নরদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে তা প্রকাশ্য আদালতে উত্থাপনের অধিকার প্রদান করেন।

১০. জনকল্যাণ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।" [সূরা যারিয়াত ঃ ১৯]

"তাদের সম্পদ থেকে যাকাত ও দান খায়রাত আদায় করে তাদেরকে [পুতিগন্ধময় স্বভাব থেকে] পবিত্র করো এবং [পুতপবিত্র স্বভাবেরই উন্মেষ ঘটিয়ে] পবিত্র করো এবং তাদের জন্য কল্যাণের দোয়া করো।" [সূরা তাওবা ঃ ১০৩]

"আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদের উপর একটি দান ফরজ করেছেন, যা তাদের সম্পদশালীদের নিকট থেকে আদায় করে তাদের গরীবদের নিকট ফেরত দেয়া হবে।" [বুখারী ও মুসলিম]

"যার কোনো পৃষ্ঠপোষক বা অভিভাবক নাই তার অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে সরকার।" [আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহ্মদ, ইবনে মাজা, দারিমী]

"যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ অবস্থায় মারা গেছে এবং তা পরিশোধ করার মতো মাল রেখে যায়নি তার ঋণ পরিশোদের দায়িত্ব আমার (সরকারের)। আর যে ব্যক্তি মাল রেখে মারা গেছে তা তার ওয়ারিশদের প্রাপ্য।"

"অপর বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি ঋণ রেখে গেছে অথবা এমন পোষ্য রেখে গেছে যাদের ধ্বংস হওয়ার আশংকা আছে, তারা যেনো আমার নিকট আসে, আমি তাদের পৃষ্ঠপোষক।"

"অপর বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি মাল রেখে গেছে তা তার ওয়ারিশদের প্রাপ্য। আর যে ব্যক্তি যিম্মাদারীর বোঝা [অসহায় পোষ্য] রেখে গেছে তা আমাদের [সরকারের] যিম্মায়।" [বুখারী ও মুসলিম]

"যার কোনো ওয়ারিশ নাই আমি [সরকার] তার ওয়ারিশ। আমি তার পক্ষ থেকে দিয়াত [রক্তপণ] আদায় করবো এবং তার পরিত্যক্ত মাল নিয়ে নিবো। [আবু দাউদ]

উপরে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহের মধ্যে একটি দায়িত্ব হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং তার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, তার রাষ্ট্রসীমার মধ্যে কেউ সাহায্যের মুখাপেক্ষী হলে, অন্ন বস্ত্র বঞ্চিত হলে তার সাহায্য করা।

এ হলো সেসব গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিধান যা আমরা কুরআন ও হাদীস থেকে পেয়ে থাকি। কুরআন ও হাদীসে যদিও আরও অনেক সাংবিধানিক দিক নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু যেহেতু তার অধিকতর সম্পর্ক সংবিধানের চেয়ে সাংবিধানিক আইনের সাথে রয়েছে, তাই আমরা সেগুলো এখানে বিবৃত করিনি।

এখন সংবিধান সম্পর্কে সামান্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিও আমাদের পেশকৃত এসব আয়াত ও হাদীস দেখে স্বয়ং সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন যে, এগুলোর মধ্যে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তিসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিনা? যদি কোনো ব্যক্তি আস্থার দাবির পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করতে পারে যে, উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের সংবিধানের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই; এবং আমাদের বলে দেয় যে, সংবিধানের এমন কোনো কোনো মৌলিক বিষয় [বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নাই, শুধু মৌলিক বিষয়] রয়েছে যার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস থেকে কোনো পথনির্দেশ পাওয়া যায়না, তাহলে আমরা অবশ্যই তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু যদি এটা প্রমাণ করা না যায় যে, যেসব বিষয়ে আমরা উপরে আলোচনা করেছি তা সাংবিধানিক বিষয় নয় এবং একথাও বলা না যায় যে, এসব বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস আলোকপাত করেনি, তবে এরপর যারা মোনাফিক নয় তাদের জন্য দু'টি বিকল্প রাস্তাই খোলা থাকে। হয় তারা সোজা পথে এসে উপরোক্ত বিধানসমূহ মেনে নিবে এবং দেশের সংবিধানে তা অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তারিত বিষয় যথাযথভাবে রচনা করতে থাকবে। নয়তো তারা পরিষ্কার বলে দিবে যে, আমরা না কুরআন মানি আর না হাদীস। আমরা সেই গণতন্ত্রের উপর ঈমান এনেছি, যা আমেরিকা, বৃটেন ও ভারতীয় সংবিধানে পাওয়া যায়। এই দুটি পথের যেটিই তারা অনুসরণ করবে তা অবশ্যই মোনাফিকী বর্জিত অকপট লোকেরই কাজ হতে পারে। এখন কোনো ব্যক্তি সূর্যালোক তার উজ্জল আভা নিয়ে বিচ্ছুরিত হওয়া সত্ত্বেও যদি বলে যে, কোথাও আলো বিদ্যমান নাই তবে তার একথায় জনগণ ধোঁকায় নিমজ্জিত হোক বা না হোক তার মানমর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবেই।

নবম অধ্যায়

ইসলামী রাষ্ট্রের উদাহরণীয় যুগ

নববী যুগ

খিলাফতে রাশেদা ও তার বৈশিষ্ট্য

আগের অধ্যায়গুলোতে ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এবার সেই বাস্তব আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শিক ও ঐতিহাসিক প্রতিবেদন পেশ করা হচ্ছে, যার সূচনা করেছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এবং যার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এ রাষ্ট্রটি ছিলো একটি আলোর মিনার। ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানরা সবসময় এ থেকে আলো গ্রহণ করে আসছে। ইসলাম শুধু একটি আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণাই পেশ করেনি বরং সেই সাথে সেই আদর্শ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠাও করে দেখিয়েছে। একটা দীর্ঘ সময় রাষ্ট্রটি তার পূর্ণ আলোকবর্তিকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিতও ছিলো। পৃথিবীকে একটি অনন্য আদর্শিক রাষ্ট্র উপহার দেবার এই অবদান কেবল ইসলামেরই। বিশ্বের অন্য কোনো আদর্শের দাবীদাররা তাদের পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র একদিন এমনকি এক মুহূর্তের জন্যও পৃথিবীকে উপহার দিতে পারেনি। এক্ষেত্রে ইসলাম অনন্য এবং একক মর্যাদার অধিকারী।

- সংকলক

১. নববী যুগ

ইসলামের অভ্যুদয়ের পর যে মুসলিম সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে এবং হিজরতের পর রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে তা যে রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করে, তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলো কুরআন মজীদের রাজনৈতিক শিক্ষার ওপর। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য তাকে অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে পৃথক করে ঃ

এক ঃ আল্লাহ্‌র আইনের কর্তৃত্ব

এ রাষ্ট্রের প্রথম মূলনীতি ছিলো এইযে, একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং ঈমানদারদের শাসন হচ্ছে মূলত খিলাফত বা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বশীল শাসন। কাজেই বলগাহীনভাবে কাজ করার তার কোনো অধিকার নেই। বরং আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহ্‌র উৎস থেকে উৎসারিত আল্লাহ্‌র আইনের অধীনে কাজ করা তার অপরিহার্য কর্তব্য। কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে এ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে আগের অধ্যায়ে আমরা তা উল্লেখ করেছি। তন্মধ্যে বিশেষ করে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এব্যাপারে একান্ত স্পষ্ট ঃ

সূরা নিসা ঃ ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৮০, ১০৫; আল-মায়েদা ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭; আল-আরাফ ঃ ৩; ইউসুফ ঃ ৪০; আন-নূর ঃ ৫৪, ৫৫; আল-আহযাব ঃ ৩৬ এবং আল-হাশর ঃ ৭।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার অসংখ্য বাণীতে এ মূলনীতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

> "আল্লাহ্‌র কিতাব মেনে চলা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ্‌র কিতাব যা হালাল করে দিয়েছে, তোমরা তাকে হালাল মানো, আর যা হারাম করেছে, তোমরা তাকে হারাম করো।"[১]
>
> "আল্লাহ্ তায়ালা কিছু করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তোমরা তা নষ্ট করোনা, কিছু হারাম বিষয় নির্দিষ্ট করেছেন, তোমরা তাতে ঢুকে পড়োনা, কিছু সীমা নির্ধারণ করেছেন, তোমরা তা অতিক্রম করোনা, ভুল না করেও কিছু ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করেছেন, তোমরা তার সন্ধানে পড়োনা।"[২]

---

১. কানযুল ওম্মাল, ত্বাব্‌রানী এবং মুসনাদে আহমদের উদ্ধৃতিতে, ১ম খন্ড, হাদীস নং-৯০৭-৯৬৬; দায়েরাতুল মায়ারেফ, হায়দারাবাদ সংস্করণ ১৯৫৫।

২. মিশকাত, দারেকুতনীর উদ্ধৃতিতে-বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবে ওয়াস সুন

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাব মেনে চলে, সে দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট হবেনা, পরকালেও হবেনা সে হতভাগা।"[৩]

"আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকবে, কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা,- আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাহ।"[৪]

"আমি তোমাদেরকে যে বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছি, তা গ্রহণ করো, আর যে বিষয় থেকে বারণ করছি, তা থেকে তোমরা বিরত থাকো।"[৫]

দুই ঃ সকল মানুষের প্রতি সুবিচার

দ্বিতীয় যে মূলনীতির ওপর সে রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিলো, তা ছিলো, কুরআন সুন্নাহর্‌ দেয়া আইন সকলের জন্য সমান, রাষ্ট্রের সামান্যতম ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র প্রধান পর্যন্ত সকলের উপর তা সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তাতে কারো জন্য কোনো ব্যতিক্রমধর্মী আচরণের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁর নবীকে একথা ঘোষণা করার নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

'এবং তোমাদের মধ্যে সুবিচার কায়েম করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" [সূরা আশ শূরাঃ ১৫]

অর্থাৎ পক্ষপাতমুক্ত সুবিচার নীতি অবলম্বন করার জন্য আমি আদিষ্ট ও নিয়োজিত। পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন করে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়া আমার কাজ নয়। সকল মানুষের সাথে আমার সমান সম্পর্ক- আর তা হচ্ছে আদল ও সুবিচারের সম্পর্ক। সত্য যার পক্ষে, আমি তার সাথী; সত্য যার বিরুদ্ধে, আমি তার বিরোধী। আমার দীনে কারো জন্য কোনো পার্থক্যমূলক ব্যবহারের অবকাশ নেই। আপন পর, ছোট বড়, শরীফ কমীনের জন্য পৃথক পৃথক অধিকার সংরক্ষিত নেই। যা সত্য তা সকলের জন্যই সত্য; যা গুনাহ, তা সকলের জন্যই গুনাহ; যা হারাম, তা সবার জন্যই হারাম; যা হালাল, তা সবার জন্যই হালাল; যা ফরয, তা সকলের জন্যই ফরয। আল্লাহ্‌র আইনের এ সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে আমার নিজের সত্ত্বাও মুক্ত নয়, নয় ব্যতিক্রম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন ঃ

"তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে, তারা এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, নিম্ন পর্যায়ের অপরাধীদেরকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দান করতো, আর উচ্চ পর্যায়ের অপরাধীদেরকে ছেড়ে দিতো। সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ নিহিত, [মুহাম্মাদের আপন কন্যা] ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে ফেলতাম।"[৬]

---

৩. মিশকাত, রাযীন-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত অধ্যায়।

৪. মিশকাত মুয়াত্তার উদ্ধৃতিতে, আলোচ্য অধ্যায়, কানযুল ওম্মাল, ১ম খন্ড হাদীস নং-৮৭৭, ৯৪৯, ৯৫৫, ১০০১।

৫. কানযুল ওম্মাল, ১ম খন্ড, হাদীস নং- ৮৮৬।

৬. বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, অধ্যায় ১১-১২।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন ঃ

"আমি নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপন সত্তা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখেছি।"[৭]

তিন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সাম্য

এ রাষ্ট্রের তৃতীয় মূলনীতি ছিলো, বংশ, বর্ণ, ভাষা এবং দেশকাল নির্বিশেষে সকল মুসলমানের অধিকার সমান। এ রাষ্ট্রের পরিসীমায় কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, বংশ বা জাতি কোনো বিশেষ অধিকার লাভ করতে পারেনা, অন্যের মুকাবিলায় কারো মর্যাদা খাটোও হতে পারেনা।

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

"মুমিনরা একে অন্যের ভাই।" [সূরা হুজরাত ঃ ১০]

"হে মানব মন্ডলী! এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের নানা গোত্র, নানা জাতিতে বিভক্তি করেছি, যেনো তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। মূলত আল্লাহ্র নিকট তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সম্মানার্হ, যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্কে ভয় করে।" [সূরা হুজরাত ঃ ১৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত উক্তি এ মূলনীতিকে আরও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করছে ঃ

"আল্লাহ্ তোমাদের চেহারা এবং ধন সম্পদের দিকে তাকাননা বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কার্যাবলীর দিকে তাকান।"[৮]

"মুসলমানরা ভাই ভাই। একজনের ওপর অন্যজনের কোনো মর্যদা নেই কিন্তু তাক্ওয়ার ভিত্তিতে।"[৯]

"হে মানব জাতি! শোনো, তোমাদের রব এক। অনারবের ওপর আরবের বা আরবের ওপর অনারবের কোনো মর্যাদা নেই। সাদার ওপর কালোর বা কালোর ওপর সাদারও নেই কোনো শ্রেষ্ঠত্ব। হাঁ, অবশ্য তাক্ওয়ার বিচারে।"[১০]

"যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে, আমাদের মতো সালাত আদায় করে, আমাদের জবাই করা জন্তু খায়, সে মুসলমান। মুসলমানের যে অধিকার, তারও সে অধিকার, মুসলমানের যে কর্তব্য, তারও সে কর্তব্য।"[১১]

---

৭. **কিতাবুল খারাজ**, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা-১১৬, আল-মাতবায়াতুস সলফিয়া, মিসর, ২য় সংস্করণ, **১৩৫২ হিঃ**; মুসনাদে আবু দা

৮. **তাফসীরে ইবনে** কাসীর, মুসলিম এবং ইবনে মাজার উদ্ধৃতিতে, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৭, মুস্তফা **মুহাম্মাদ প্রেস**, মিসর-১৯৩৭।

৯. **তাফসীরে ইবনে** কাসীর, তিবরানীর উদ্ধৃতিতে, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৭।

১০. **তাফসীরে রুহুল** মায়ানী, বায়হাকী এবং ইবনে মারদুইয়ার উদ্ধৃতিতে ২৬শ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪৮, **ইদারাতুত** তাবয়াতিল মুনিরিয়া, মিসর।

১১. **বুখারী**, কিতাবুস সালাত, অধ্যায়-২৮।

"সকল মুমিনের রক্তের মর্যাদা সমান, অন্যের মুকাবিলায় তারা সবাই এক। তাদের একজন সামান্যতম ব্যক্তিও তাদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিতে পারে।"[১২]

"মুসলমানদের ওপর জিযিয়া আরোপ করা যেতে পারেনা।"[১৩]

চার ঃ সরকারের দায়িত্ব ও জবাবদিহি

এ রাষ্ট্রের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ছিলো, শাসন কর্তৃত্ব এবং তার ক্ষমতা ইখতিয়ার ও অর্থ সম্পদ আল্লাহ্ এবং মুসলমানদের আমানত। আল্লাহ্‌ভীরু, ঈমানদার এবং ন্যায়পরায়ণ লোকদের হাতে তা ন্যস্ত করতে হবে। কোনো ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো বা স্বার্থবুদ্ধি প্রোণোদিত হয়ে এ আমানতে খেয়ানত করার অধিকার রাখেনা। এ আমানত যাদের সোপর্দ করা হবে তারা এজন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে বলেন ঃ

"আমানত বহনের যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে আমানত সোপর্দ করার জন্য আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। আর যখন মানুষের মধ্যে ফায়সালা করবে ন্যায়নীতির সাথে ফায়সালা করবে আল্লাহ্ তোমাদের ভালো উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চই আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও দেখেন। [সূরা নিসা ঃ ৫৮]

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নেতা-যিনি সকলের ওপর শাসক হন তিনিও দায়িত্বশীল তাঁকেও তাঁর সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"[১৪]

"মুসলিম প্রজাদের কাজ করাবারের প্রধান দায়িত্বশীল কোনো শাসক যদি তাদের সাথে প্রতারণা এবং খিয়ানতকারী অবস্থায় মারা যায় তাহলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।"[১৫]

"মুসলিম রাষ্ট্রের কোনো পদাধিকারী শাসক যে নিজের পদের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা করেনা, নিষ্ঠার সাথে কাজ করেনা; সে কখনো মুসলমানদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।"[১৬]

[নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যরকে বলেন] "আবু যার! তুমি দুর্বল মানুষ, আর সরকারের পদ মর্যাদা একটা আমানত। কিয়ামতের দিন তা লজ্জা এবং অপমানের কারণ হবে; অবশ্য তার জন্য নয়, যে পুরোপুরি তার হক আদায় করে এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে।"[১৭]

---

১২. আবু দাউদ, কিতাবুদ দিয়াত, অধ্যায়-১১; নাসায়ী, কিতাবুন কাসামাত, অধ্যায়-১০, ১৪।

১৩. আবু দাউদ, কিতাবুল ইমারাত, অধ্যায়-৩৪।

১৪. বুখারী, কিতাবুল আহকাম, অধ্যায়-১। মুসলিম কিতাবুল ইমারাত, অধ্যায়-৫।

১৫. বুখারী, কিতাবুল আহকাম, অধ্যায়-৮। মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায়-৬১; কিতাবুল ইমারাত, অধ্যায়-৫।

১৬. মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত, অধ্যায়-৫।

১৭. কানযুল ওম্মাল, ষষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-৬৮, ১২২।

"শাসকের জন্য আপন প্রজাদের মধ্যে ব্যবসা করা সবচেয়ে নিকৃষ্ট খিয়ানত।"[১৮]

"যে ব্যক্তি আমাদের রাষ্ট্রের কোনো পদ গ্রহণ করে, তার স্ত্রী না থাকলে বিবাহ করবে, খাদেম না থাকলে একজন খাদেম গ্রহণ করবে, ঘর না থাকলে একখানা ঘর করে নেবে, [যাতায়াতের] বাহন না থাকলে একটা বাহন গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশী অগ্রসর হয়, সে খিয়ানতকারী অথবা চোর।"[১৯]

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি শাসক হবে, তাকে সবচেয়ে কঠিন হিসেব দিতে হবে, আর সে সবচেয়ে কঠিন আযাবের আশংকায় পতিত হবে। আর যে ব্যক্তি শাসক হবেনা, তাকে হালকা হিসেব দিতে হবে, তার জন্য হালকা আযাবের আশংকা আছে। কারণ শাসকের দ্বারা মুসলমানদের ওপর যুলুমের সম্ভাবনা অনেক বেশী। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের ওপর যুলুম করে, সে আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।"[২০]

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন ঃ

"ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি বকরীর বাচ্চাও ধ্বংস হয় তবে আমার ভয় হচ্ছে, আল্লাহ্ আমাকে সে জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।"[২১]

পাঁচ ঃ শূরা বা পরামর্শ

এ রাষ্ট্রের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ছিলো মুসলমানদের পরামর্শ এবং তাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে রাষ্ট্র প্রধান নিযুক্ত হতে হবে। তাঁকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনাও করতে হবে পরামর্শের ভিত্তিতে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

"আর মুসলমানদের কাজকর্ম [সম্পন্ন হয়] পারস্পরিক পরামর্শক্রমে।" [সূরা শূরা ঃ ৩৮]

"হে নবী! কাজ কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে আরয করি যে, আপনার পর আমাদের সামনে যদি এমন কোনো বিষয় উপস্থিত হয়, যে সম্পর্কে কুরআনে কোনো নির্দেশ না থাকে এবং আপনার কাছ থেকেও সে ব্যাপারে আমরা কিছু না শুনে থাকি, তখন আমরা কি করবো? তিনি বলেনঃ

"এ ব্যাপারে দীনের জ্ঞান সম্পন্ন এবং ইবাদত গুযার ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করো এবং কোনো ব্যক্তি বিশেষের রায় অনুযায়ী ফায়সালা করবেনা।"[২২]

---

১৮. কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-৭৮।

১৯. কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-৩৪৬।

২০. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২৫০৫।

২১. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২৫১২।

২২. হাদীসে ইবাদতগুযার অর্থে এমনসব ব্যক্তিদের বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র বন্দেগী করে, স্বাধীনভাবে নিজের মনমতো কাজ করেনা। এ থেকে এই অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, যাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হবে, কেবল তাদের ইবাদতগুযারীর গুণটি দেখে নেয়া হবে; মতামত

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন ঃ

"মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া যে ব্যক্তি তার নিজের বা অন্য কারো নেতৃত্বের [ইমারাত] প্রতি আহবান জানায়, তাকে হত্যা না করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়।"[২৩]

অপর এক বর্ণনায় হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর এ উক্তি বর্ণিত আছেঃ

"পরামর্শ ব্যতীত কোনো খেলাফত নেই।"[২৪]

ছয় ঃ ভালো কাজে আনুগত্য

৬ষ্ঠ মূলনীতি-যার ওপর এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো-এই ছিলো যে, কেবল মাত্র মারুফ বা ভালো কাজেই সরকারের আনুগত্য অপরিহার্য। পাপাচারে [মা'সিয়াত] আনুগত্য পাওয়ার অধিকার কারোর নেই। অন্য কথায়, এ মূলনীতির তাৎপর্য এই যে, সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কেবল সেসব নির্দেশই তাদের অধীন ব্যক্তিবর্গ এবং প্রজাবৃন্দের জন্য মেনে চলা ওয়াজিব, যা আইনানুগ। আইনের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেয়ার তাদের কোনো অধিকার নেই; তা মেনে চলাও কারো উচিত নয়। কুরআন মজীদে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাইয়াত- আনুগত্যের শপথ গ্রহণকেও মারুফে আনুগত্যের শর্তে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অথচ তাঁর পক্ষ থেকে কোনো মা'সিয়াত বা পাপাচারের নির্দেশ আসার প্রশ্নই ওঠেনা ঃ

"এবং কোনো মারুফ কাজে তারা তোমার নাফরমানী-অবাধ্যতা করবেনা।" (সূরা মুমতাহানা ঃ ১২)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"একজন মুসলমানের ওপর তার আমীরের আনুগত্য করা শোনা এবং মেনে চলা ফরয; তা তার পছন্দ হোক বা না হোক, যতক্ষণ তাকে কোনো মা'সিয়াত বা পাপাচারের নির্দেশ না দেয়া হয়। মা'সিয়াতের নির্দেশ দেয়া হলে কোনো আনুগত্য নেই।"[২৫]

"আল্লাহর নাফরমানীতে কোনো আনুগত্য নেই; আনুগত্য কেবল মারুফ কাজে।"[২৬]

এবং পরামর্শ দানের যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়ার জন্য অন্যান্য যেসব গুণাবলী প্রয়োজন, তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবেনা।

২৩. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২৫৭৭। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এ উক্তির তাৎপর্য এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তির জোর পূর্বক চেপে বসার চেষ্টা করা এক মারাত্মক অপরাধ, তা বরদাস্ত করা উম্মতের উচিত নয়।

২৪. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২৩৫৪।

২৫. বুখারী, কিতাবুল আহকাম, অধ্যায়-৪; মুসলিম, তিকাবুল এমারত, অধ্যায়-৮। আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, অধ্যায়-৯৫। নাসায়ী, কিতাবুল বাইয়াত, অধ্যায়-৩৩। ইবনে মাজা, আবওয়াবুল জিহাদ, অধ্যায় ৪০।

২৬. মুসলিম, কিতাবুল এমারত, অধ্যায়-৮ আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, অধ্যায়-৯৫। নাসায়ী, কিতাবুল বাইয়াত, অধ্যায়-৩৩।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন উক্তিতে বিভিন্নভাবে এ বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। কোথাও তিনি বলেছেন ঃ

"যে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে, তার জন্য কোনো আনুগত্য নেই।" কখনো বলেছেন ঃ "স্রষ্টার নাফরমানীতে সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই," কখনো বলেছেন ঃ "যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করেনা তার জন্য কোনো আনুগত্য নেই," কখনো বলেছেন ঃ "যে শাসক তোমাকে কোনো মা'সিয়াতের নির্দেশ দেয়, তার আনুগত্য করোনা।"[২৭]

হযরত আবুবকর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তার এক ভাষণে বলেন ঃ

"যে ব্যক্তিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কোনো কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু সে লোকদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী কাজ করেনি, তার ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।"[২৮]

একারণেই খলীফা হওয়ার পর তিনি তাঁর প্রথম ভাষণেই ঘোষণা করেছিলেন ঃ

"যতক্ষণ আমি আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি, তোমরা আমার আনুগত্য করো। যখন আমি আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবো, তখন তোমাদের ওপর আমার কোনো আনুগত্য নেই।"[২৯]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন ঃ

"আল্লাহ্‌র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করা এবং আমানত আদায় করে দেয়া মুসলমানদের শাসকের ওপর ফরয। শাসক যখন এভাবে কাজ করে তখন তা শুনা ও মেনে চলা এবং তাদেরকে আহ্বান জানালে তাতে সাড়া দেয়া লোকদের কর্তব্য।"[৩০]

একদা তিনি তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন ঃ

"আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে আমি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেই, তা মেনে চলা তোমাদের ওপর ফরয-সে নির্দেশ তোমাদের পছন্দ হোক বা না হোক। আর আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে আমি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেই, তাতে আল্লাহ্‌র সাথে মা'সিয়াত বা পাপাচারের ক্ষেত্রে কারো জন্য আনুগত্য নেই; আনুগত্য কেবল মারুফে, আনুগত্য কেবল মারুফে, আনুগত্য কেবল মারুফে।"[৩১]

সাত ঃ পদমর্যাদার দাবী এবং লোভ নিষিদ্ধ

এটাও সে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি ছিলো যে, সাধারণত রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদ বিশেষত খেলাফতের জন্য সে ব্যক্তি বেশী অযোগ্য-অনুপযুক্ত, যে নিজে পদ লাভের অভিলাষী এবং সে জন্য সচেষ্ট।

---

২৭. কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৯, ৩০১।

২৮. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং- ২৫০৫।

২৯. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদিস নং- ২২৮২। অপর এক বর্ণনায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শব্দগুলো এইঃ আর আমি যদি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করি, তাহলে তোমরা আমার নাফরমানী করো। কানযুল ওম্মাল ৫ম খন্ড, হাদীস- ২৩৩০।

৩০. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২৫৩১।

৩১. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং- ২৫৮৭।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে বলেন ঃ

"আখেরাতের ঘর আমি তাদেরকে দেবো, যারা যমীনে নিজের মহত্ত্ব খুঁজে বেড়ায়না, বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়না।" [সূরা কাসাস ঃ ৮৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"আল্লাহ্র শপথ, এমন কোনো ব্যক্তিকে আমরা এ সরকারের পদ মর্যাদা দেইনা, যে তা চায় এবং তার জন্য লোভ করে।"৩২

"যে ব্যক্তি নিজে তা সন্ধান করে, আমাদের নিকট সে-ই সবচেয়ে বেশী খেয়ানতকারী।"৩৩

"আমরা এমন কোনো ব্যক্তিকে আমাদের সরকারী কর্মচারী হিসেবে গ্রহণ করিনা, যে নিজে উক্ত পদের অভিলাষী।"৩৪

"আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবদুর রহমান! সরকারী পদ দাবী করোনা। কেননা চেষ্টা তদবীর করার পর যদি তা তোমাকে দেয়া হয়, তবে তোমাকে তার হাতে সঁপে দেয়া হবে, আর যদি চেষ্টা তদবীর ছাড়াই তা লাভ করো, তবে তার হক আদায় করার ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাকে সাহায্য করা হবে।"৩৫

আট ঃ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য

এ রাষ্ট্রের শাসক এবং তার সরকারের সর্ব প্রথম কর্তব্য এই সাব্যস্ত হয়েছিলো যে, কোনো রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই যথাযথভাবে সে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করবে, ইসলামের চারিত্রিক মানদন্ডানুযায়ী ভালো ও সৎ-গুণাবলীর বিকাশ এবং মন্দ ও অসৎ গুণাবলীর বিনাশ সাধন করবে। কুরআন মজীদে এ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"[মুসলমান তারা] যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভালো কাজের নির্দেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করে।" [সূরা হজ্জ ঃ ৪১]

কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলিম মিল্লাতের অস্তিত্বের মূল লক্ষ্যও এটিই ঃ

---

৩২. বুখারী কিতাবুল আহকাম, অধ্যায়-৭। মুসলিম কিতাবুল এমারত, অধ্যায়-৩।

৩৩. আবু দাউদ, কিতাবুল এমারাত, অধ্যায়-২

৩৪. কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-২০৬।

৩৫. কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-৬৯। এখানে কারো যেনো সন্দেহ না হয় যে, এটা যদি মূলনীতি হয়ে থাকে, তাহলে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিশরের বাদশার নিকট সরকারের পদ দাবী করলেন কেনো? মূলত হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে এ পদ দাবী করেননি, দাবী করেছিলেন এক কাফের রাষ্ট্রে কাফের সরকারের কাছে। সেখানে এক বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক সন্ধিক্ষণে তিনি উপলব্ধি করেন যে, আমি যদি বাদশার নিকট রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ দাবী করি, তবে তা পেতে পারি। আর তার মাধ্যমে এদেশে আল্লাহ্র দীন বিস্তার করার পথ সুগম হতে পারে। কিন্তু আমি যদি ক্ষমতার দাবী থেকে বিরত থাকি, তাহলে কাফের জাতির হিদায়াতের যে দুর্লভ সুযোগ আমি পাচ্ছি, তা হাত ছাড়া হয়ে যাবে। এটা ছিলো এক বিশেষ পরিস্থিতি, তার ওপর ইসলামের নিয়ম আরোপ করা যায়না।

"এমনি করে আমি তোমাদের একটি মধ্যপন্থী উম্মত [বা ভারসাম্যপূর্ণ পথে অবিচল উম্মাত] করেছি, যেনো তোমরা লোকদের ওপর সাক্ষী হও আর রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের ওপর।" [সূরা বাকারা ঃ ১৪৩]

"তোমরা সে সর্বোত্তম উম্মাত, মানুষের [সংশোধন এবং পথ প্রদর্শনের] জন্য যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখবে।"

এতদ্ব্যতীত যে কাজের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পূর্বেকার সকল নবী-রাসূল আদিষ্ট ছিলেন, কুরআনের দৃষ্টিতে তা ছিলো এই ঃ

"দীন কায়েম করো এবং তাতে বিচ্ছিন্ন হয়োনা।" [সূরা শূরা ঃ ১৩]

অমুসলিম বিশ্বের মুকাবিলায় তার সকল চেষ্টা সাধনাই ছিলো এ উদ্দেশ্যে ঃ

"দীন যেনো সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র জন্যই নির্ধারিত হয়ে যায়।" (সূরা আনফাল ঃ ৩৯)

অন্যান্য সকল নবী রসূলের উম্মতের মতো তাঁর উম্মতের জন্যও আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছিলো ঃ

"তারা নিজের দীনকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র বন্দেগী করবে।" [সূরা বাইয়েনা ঃ ৫]

এজন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম কাজ ছিলো, দীনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থাকে কায়েম করা, তার মধ্যে এমন কোনো সংমিশ্রণ হতে না দেয়া, যা মুসলিম সমাজে দ্বিমুখী নীতি সৃষ্টি করে। এ শেষ বিষয়টি সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবী এবং স্থালাভিষিক্তদের কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন ঃ

"আমাদের এ দীনে যে ব্যক্তি এমন কোনো বিষয় উদ্ভাবন করবে, যা তার পর্যায়ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"[৩৬]

"সাবধান! নব উদ্ভাবিত বিষয় থেকে বিরত থাকবে। কারণ, সকল নব উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদয়াত, আর সকল বিদয়াতই গুমরাহী, পথ ভ্রষ্ঠতার অন্তর্ভুক্ত।"[৩৭]

"যে ব্যক্তি কোনো বিদয়াত উদ্ভাবকের সম্মান করে, সে ইসলামের মূলোৎপাটনে সাহায্য করে।"[৩৮]

এ প্রসংগে আমরা তাঁর এ উক্তিও দেখতে পাই যে, তিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বেশী না-পছন্দ, তাদের একজন হচ্ছে সে ব্যক্তি ঃ

"যে ইসলামে কোনো জাহেলী রীতিনীতির প্রচলন করতে চায়।"[৩৯]

নয় ঃ আমর বিল মারুফ ও নাহ্‌ই আনিল মুনকারের অধিকার এবং কর্তব্য

---

৩৬. মিশকাত, বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ।
৩৭. মিশকাত, বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ।
৩৮. মিশকাত, বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ।
৩৯. মিশকাত, বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ।

এ রাষ্ট্রের সর্বশেষ মূলনীতি যা তাকে সঠিক পথে টিকিয়ে রাখার নিশ্চয়তা দেয় তা ছিলো, মুসলিম সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি সত্যবাক্য উচ্চারণ করবে, নেকী ও কল্যাণের সহায়তা করবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের যেখানেই কোনো ভুল এবং অন্যায় কার্য হতে দেখবে, সেখানেই তাকে প্রতিহত করতে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করবে। মুসলিম সমাজের প্রতিটি সদস্যের এটা শুধু অধিকারই নয়, বরং অপরিহার্য কর্তব্যও। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের নির্দেশ হচ্ছে ঃ

> "নেকী এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পর সাহায্য করো এবং গুনাহ ও অবাধ্যতার কাজে সাহায্য করোনা।" [সূরা মায়েদা ঃ ২]
>
> ঈমানদাররা! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। [আহযাব ঃ ৭০]
>
> "ঈমানদাররা! তোমরা সকলে ন্যায় বিচারে অটল অবিচল থাকো এবং আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হও, তোমাদের সাক্ষ্য স্বয়ং তোমাদের নিজেদের বা তোমাদের পিতা মাতা বা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যাকনা কেন।" (সূরা নিসা ঃ ১৩৫)
>
> "মুনাফিক নারী পুরুষ একই থলের বিড়াল, তারা মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়, ভালো কাজ থেকে বারণ করে। আর মুমিন নারী পুরুষ একে অন্যের সাথী, তারা ভালো কাজের নির্দেশ দান করে আর মন্দ কাজ থেকে বারণ করে।" [সূরা তাওবা ঃ ৬৭-৭১]

আল কুরআনে ঈমানদারদের এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উক্ত হয়েছে ঃ

> "তারা নেকীর নির্দেশ দানকারী মন্দ কাজ থেকে বারণকারী এবং আল্লাহ্র সীমারেখা সংরক্ষণকারী।" [সূরা তাওবা ঃ ১১২]

এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ হলো ঃ

> "তোমাদের কেউ যদি কোনো মুনকার [অসৎ কাজ] দেখে, তবে তার উচিত হাত দিয়ে তা প্রতিহত করা। তা যদি না পারে, তবে মুখ দ্বারা বারণ করবে, তাও যদি না পারে, তবে অন্তর দ্বারা [খারাপ জানবে এবং বারণ করার আগ্রহ রাখবে], আর এটা হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।"[৪০]
>
> "অতঃপর অযোগ্য লোকেরা তাদের স্থানে বসবে। তারা এমনসব কথা বলবে, যা নিজেরা করবেনা, এমনসব কাজ করবে, যার নির্দেশ দেয়া হয়নি তাদেরকে। যে হাতের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সে মুমিন; যে জিহ্বার সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সে মুমিন; অন্তর দিয়ে যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সে মুমিন। ঈমানের এর চেয়ে ক্ষুদ্র সামান্যতম পর্যায়ও নেই।"[৪১]
>
> "যালেম শাসকের সামনে ন্যায় [বা সত্য কথা] বলা সর্বোত্তম জিহাদ।"[৪২]

---

৪০. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায়-২০। তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, অধ্যায়-১২। আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, অধ্যায়-১৭, ইবনে মাজা, আবওয়াবুল ফিতান, অধ্যায়-২০।

৪১. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায়-২০

৪২. আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, অধ্যায়-১৭। তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, অধ্যায়-১২। নাসায়ী, কিতাবুল বাইয়াত, অধ্যায়-৩৬। ইবনে মাজা, আবওয়াবুল ফিতান, অধ্যায়-২০।

"যালেমকে দেখেও যারা তার হাত ধরেনা [বাধা দেয়না] তাদের ওপর আল্লাহ্‌র আযাব প্রেরণ করা দূরে নয়।"[৪৩]

"আমার পর কিছু লোক শাসক হবে। যে ব্যক্তি মিথ্যার ব্যাপারে তাদেরকে সাহায্য করবে, সে আমার নয় এবং আমি তার নই।"[৪৪]

"অনতিবিলম্বে এমনসব লোক তোমাদের ওপর শাসক হবে, যাদের হাতে থাকবে তোমাদের জীবিকা, তারা তোমাদের সাথে কথা বললে মিথ্যা বলবে, কাজ করলে খারাপ কাজ করবে। তোমরা যতক্ষণ তাদের মন্দ কাজের প্রশংসা না করবে, তাদের মিথ্যায় বিশ্বাস না করবে, ততক্ষণ তারা তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেনা। সত্যকে বরদাশত করা পর্যন্ত তোমরা তাদের সামনে সত্য পেশ করে যাও। তারপর যদি তারা সীমালংঘন করে যায়, তাহলে যে ব্যক্তি এজন্য নিহত হবে, সে শহীদ।"[৪৫]

"যে ব্যক্তি কোনো শাসককে রাযী করার জন্য এমন কথা বলে, যা তার প্রতিপালককে নারায করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দীন থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছে।"[৪৬]

---

৪৩. আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, অধ্যায়-১৭। তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, অধ্যায়-১২।
৪৪. নাসায়ী, কিতাবুল বাইয়াত, অধ্যায়-৩৪-৩৫।
৪৫. কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-২৯৭।
৪৬. কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং- ৩০৯।

২. খিলাফতে রাশেদা ও তার বৈশিষ্ট্য

আগের অধ্যায়ে ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে শাসন নীতি বিবৃত হয়েছে, তাঁর পরে সেসব মূলনীতির ওপর খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষ শিক্ষা দীক্ষা ও কার্যকর নেতৃত্বের ভিত্তিতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, তার প্রত্যেক সদস্যই জানতো, ইসলামের বিধি বিধান ও প্রাণসত্তা অনুযায়ী কোন্ ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। নিজের স্থলাভিষিক্তের ব্যাপারে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ফায়সালা না দিয়ে গেলেও ইসলাম একটি শূরাভিত্তিক খিলাফত দাবী করে, মুসলিম সমাজের সদস্যরা এ কথা অবগত ছিলো। তাই সেখানে কোনো বংশানুক্রমিক বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বল প্রয়োগে কোনো ব্যক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি, খিলাফত লাভ করার জন্য কেউ নিজের তরফ থেকে চেষ্টা তদবীর করেনি বা নামমাত্র প্রচেষ্টাও চালায়নি। বরং জনগণ তাদের স্বাধীন মর্জিমতো পর পর চারজন সাহাবীকে তাদের খলীফা নির্বাচিত করে। মুসলিম মিল্লাত এ খিলাফতকে খিলাফতে রাশেদা [সত্যাশ্রয়ী খিলাফত] বলে গ্রহণ করেছে। এ থেকে আপনা আপনিই প্রকাশ পায় যে, মুসলমানদের দৃষ্টিতে এটিই ছিলো খিলাফতের সত্যিকার পদ্ধতি।

এক ঃ নির্বাচনী খেলাফত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্তের জন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নাম প্রস্তাব করেন। মদীনার সকলেই [বস্তুত তখন তারা কার্যত সারা দেশের প্রতিনিধির মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলো] কোনো প্রকার চাপ প্রভাব এবং প্রলোভন ব্যতীত নিজেরা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে পছন্দ করে তাঁর হাতে বাইয়াত [আনুগত্যের শপথ] করে।

হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর ওফাতকালে হযতর ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সম্পর্কে ওসীয়াত লিখান, অতঃপর জনগণকে মসজিদে নববীতে সমবেত করে বলেন ঃ

> "আমি যাকে স্থলাভিষিক্ত করছি তোমরা কি তার ওপর সন্তুষ্ট? আল্লাহ্‌র শপথ! সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বুদ্ধি বিবেক প্রয়োগে আমি বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিনি। আমার কোনো আত্মীয় স্বজনকে নয় বরং ওমর ইবনুল খাত্তাবকে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশ শুনবে এবং আনুগত্য করবে।"

সবাই সমস্বরে বলে ওঠে ঃ আমরা তাঁর নির্দেশ শুনবো এবং মানবো।[১]

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জীবনের শেষ বছর হজ্জের সময় এক ব্যক্তি বললো ঃ ওমর মারা গেলে আমি অমুক ব্যক্তির হাতে বাইয়াত করবো। কারণ, আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাইয়াতও তো হঠাৎই হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হয়েছেন।[২] হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ সম্পর্কে জানতে পেরে বললেনঃ এ ব্যাপারে আমি এক ভাষণ দেবো। জনগণের ওপর যারা জোরপূর্বক নিজেদেরকে চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছে, তাদের সম্পর্কে আমি জনগণকে সতর্ক করে দেবো। মদীনায় পৌঁছে তাঁর প্রথম ভাষণেই তিনি এ ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। সাকীফায়ে বনী সায়েদার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে বলেন যে, তখন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে হঠাৎ হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নাম প্রস্তাব করে আমি তাঁর হাতে বাইয়াত করেছিলাম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ তখন যদি এ রকম না করতাম এবং খিলাফতের মীমাংসা না করেই আমরা মজলিস ছেড়ে উঠে আসতাম, তবে রাতারাতি লোকদের কোনো ভুল সিদ্ধান্ত করে বসার আশংকা ছিলো। আর সে ফায়সালা মেনে নেয়া এবং তা পরিবর্তন করা- উভয়ই আমাদের জন্য কঠিন হতো। এ পদক্ষেপটি সাফল্যমন্ডিত হলেও ভবিষ্যতের জন্য একে নযীর হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারেনা। আবু বকরের মতো উন্নত মানের এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব তোমাদের মধ্যে আর কে আছে? এখন কোনো ব্যক্তি যদি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কারো হাতে বাইয়াত করে তাহলে সে এবং যার হাতে বাইয়াত করা হবে- উভয়ই নিজেকে মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করবে।[৩]

তাঁর নিজের ব্যাখ্যা করা এ পদ্ধতি অনুযায়ী হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খিলাফতের ফায়সালা করার জন্য তাঁর ওফাতকালে একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করে বলেনঃ 'মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যে ব্যক্তি জোর করে আমীর হওয়ার চেষ্টা করবে, তাকে হত্যা করো।' খিলাফত যাতে বংশানুক্রমিক পদাধিকারে পরিণত না হয়, সেজন্য তিনি খিলাফত লাভের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে নিজের ছেলের নাম

---

১. আত্তাবারী-তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬১৮। আল-মাতবায়াতুল ইস্তিকামা, কায়রো ১৯৩৯।

২. তিনি এদিকে ইংগিত করেছেন যে, সাকীফায়ে বনী-সায়িদার মজলিসে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হঠাৎ দাঁড়িয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নাম প্রস্তাব করেন এবং হাত বাড়িয়ে তখনই তাঁর হাতে বাইয়াত করেন। তাঁকে খলীফা করার ব্যাপারে পূর্বাহ্নে কোনো পরামর্শ করেননি।

৩. বুখারী, কিতাবুল মুহারিবীন, অধ্যায়-১৬। মুসনাদে আহমাদ, ১ম খন্ড, হাদীস নম্বর-৩৯১। তৃতীয় সংস্করণ, দারুল মায়ারিফ, মিসর ১৯৪৯। মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শব্দগুলো ছিলো এইঃ 'মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যে ব্যক্তি কোনো আমীরের হাতে বাইয়াত করে, তার কোনো বাইয়াত নেই; এবং যার হাতে বাইয়াত করে, তারও কোনো বাইয়াত নেই।' অপর এক বর্ণনায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এ বাক্যও দেখা যায়- 'পরামর্শ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে ইমারাত দেয়া হলে তা কবুল করা তার জন্য হালাল নয়।' [ইবনে হাযার, ফাতহুল বারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৫, আল-মাতবায়াতুল খাইরিয়া, কায়রো, ১৩২৫ হিজরী।]

সুস্পষ্টভাবে বাদ দিয়ে দেন।[৪] ছ'ব্যক্তিকে নিয়ে এ নির্বাচনী কমিটি গঠিত হয়। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মতে এরা ছিলেন কওমের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং জনপ্রিয়।

কমিটির সদস্য আবদুর রহমান ইবনে আওফকে কমিটি শেষ পর্যন্ত খলিফার নাম প্রস্তাব করার ইখতিয়ার দান করে। সাধারণ লোকদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে তিনি জানতে চেষ্টা করেন, কে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। হজ্জ শেষ করে যেসব কাফেলা বিভিন্ন এলাকায় ফিরে যাচ্ছিলো, তিনি তাদের সাথেও আলোচনা করেন। এ জনমত যাচাইয়ের ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অধিকাংশ লোকই হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে।[৫] তাই তাঁকেই খিলাফতের জন্য নির্বাচিত করা হয়। সাধারণ জনসমাবেশে তার বাইয়াত হয়।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদাতের পর কিছু লোক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে খলীফা করতে চাইলে তিনি বললেনঃ "এমন করার ইখতিয়ার তোমাদের নেই। এটা তো শূরার সদস্য এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাজ। তারা যাঁকে খলীফা করতে চান, তিনিই খলীফা হবেন। আমরা মিলিত হবো এবং এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করবো।"[৬] তাবারী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে, তা হচ্ছে ঃ "গোপনে আমার বাইয়াত অনুষ্ঠিত হতে পারেনা, তা হতে হবে মুসলমানদের মর্জী অনুযায়ী।"[৭]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ওফাতকালে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আমরা আপনার পুত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাতে বাইয়াত করবো? জবাবে তিনি বলেনঃ "আমি তোমাদেরকে নির্দেশও দিচ্ছিনা, নিষেধও করছিনা। তোমরা নিজেরাই এ ব্যাপারে ভালোভাবে বিবেচনা করতে পারো।"[৮] তিনি যখন আপন পুত্রদেরকে শেষ ওসীয়াত করছিলেন, ঠিক সে সময় জনৈক ব্যক্তি আরয করলো, আমীরুল মু'মিনীন" আপনি আপনার উত্তরসূরী মনোনয়ন করছেননা কেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ "আমি মুসলমানদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে যেতে চাই, যে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"[৯]

এসব ঘটনা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, খিলাফত সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সর্বসম্মত মত

---

৪. আত্‌তাবারী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯২। ইবনুল, আসীর, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪-৩৫। ইদারাতুত তিবয়াতিল মুনীরিয়া, মিসর, ১৩৫৬ হিজরী। তাবাকাতে ইবনে সা'দ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৪, বৈরুত সংস্করণ ১৯৫৭। ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৯।

৫. আত্‌তাবারী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৬। ইবনুল আসীর, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪৬।

৬. ইবনে কুতাইবা, আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪১।

৭. আত্‌তাবারী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৫০।

৮. আত্‌তাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১১২। আল-মাসউদী, মুরুজুয্ যাহাব, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৬। আল-মাতবায়াতুল বাহিয়্যা, মিসর, ১২৪৬ হিজরী।

৯. ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩-১৪ মাতবায়াতুস সায়াদাত, মিসর। আল-মাউদি, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৬।

এই ছিলো যে, খিলাফত একটা নির্বাচন ভিত্তিক পদমর্যাদা। মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই তা কায়েম করতে হবে। বংশানুক্রমিক বা বল প্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব করা তাঁদের মতে খিলাফত নয় বরং তা সৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্র। খিলাফত এবং রাজতন্ত্রের যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা সাহাবায়ে কিরামগণ পোষণ করতেন, হযরত আবু মুসা আশয়ারী হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তা ব্যক্ত করেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

> "ইমারাত [অর্থাৎ খিলাফত] হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেয়া হয়েছে। আর তরবারীর জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।"[১০]

দুই ঃ শূরাভিত্তিক সরকার

এ খলীফা চতুষ্ঠয় সরকারের নির্বাহী এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে জাতির বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ না করে কোনো কাজ করতেননা। সুনানে দারামীতে হযরত মাইমুন ইবনে মাহরানের একটি বর্ণনা আছে যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নীতি ছিলো, তাঁর সামনে কোনো বিষয় উত্থাপিত হলে তিনি প্রথমে দেখতেন এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কিতাব কি বলে। সেখানে কোনো নির্দেশ না পেলে এ ধরনের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ফায়সালা দিয়েছেন, তা জানতে চেষ্টা করতেন। রসূলের সুন্নায়ও কোনো নির্দেশ না পেলে জাতীয় শীর্ষস্থানীয় এবং সৎ ব্যক্তিদের সমবেত করে পরামর্শ করতেন। সকলের পরামর্শক্রমে যে মতই স্থির হতো, তদানুযায়ী ফায়সালা করতেন।[১১] হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কর্মনীতিও ছিলো অনুরূপ।[১২]

পরামর্শের ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদীনের দৃষ্টিভংগি ছিলো, শূরার সদস্যদের সম্পূর্ণ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে। এ ব্যাপারে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক পরামর্শ সভার উদ্বোধনী ভাষণে খিলাফতের পলিসি ব্যক্ত করেছেন এভাবে ঃ

> "আমি আপনাদের যে জন্য কষ্ট দিয়েছি, তা এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আপনাদের কার্যাদির আমানতের যে ভার আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে তা বহন করার কাজে আপনারাও আমার সঙ্গে শরীক হবেন। আমি আপনাদেরই মধ্যকার এক ব্যক্তি। আজ আপনারাই সত্যের স্বীকৃতি দানকারী। আপনাদের মধ্য থেকে যাদের ইচ্ছা, আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন; আবার যাদের ইচ্ছা আমার সাথে একমতও হতে পারেন। আপনাদের যে আমার মতামতকে সমর্থন করতে হবে- এমন কোনো কথা নেই এবং আমি তা চাই-ও না।"[১৩]

তিন ঃ বাইতুলমাল একটি আমানত

---

১০. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৩।
১১. সুনানে দারামী, বাবুল ফুতইয়া ওয়ামা ফীহি মিনাশ শিদ্দাহ্।
১২. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস-২২৮১।
১৩. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-২৫।

তারা বাইতুলমালকে আল্লাহ্ এবং জনগণের আমানত মনে করতেন। বেআইনীভাবে বাইতুল মালের মধ্যে কিছু প্রবেশ করা ও বেআইনীভাবে তা থেকে কিছু বের হয়ে যাওয়াকে তারা জায়েয মনে করতেননা। শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিগত স্বার্থে বাইতুলমাল ব্যবহার তাঁদের মতে হারাম ছিলো। তাদের মতে খিলাফত এবং রাজতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্যই ছিলো এই যে, রাজা বাদশাহরা জাতীয় ভান্ডারকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করে নিজেদের খাহেশ মতো স্বাধীনভাবে তাতে তসরুফ করতো, আর খলীফা তাকে আল্লাহ্ এবং জনগণের আমানত মনে করে সত্য ন্যায় নীতি মোতাবেক এক একটি পাই পয়সা উসূল করতেন, আর তা ব্যয়ও করতেন সত্য ন্যায় নীতি অনুসারে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একদা হযরত সালমান ফারসীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "আমি বাদশাহ, না খলীফা?" তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দেনঃ "মুসলমানদের ভূমি থেকে আপনি যদি এক দিরহামও অন্যায়ভাবে উসূল এবং অন্যায়ভাবে ব্যয় করেন তাহলে আপনি খলীফা নন, বাদশা।" অপর এক প্রসঙ্গে একদা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বীয় মজলিসে বলেন ঃ "আল্লাহ্র কসম, আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছিনা যে, আমি বাদশা, না খলীফা। আমি যদি বাদশাহ হয়ে গিয়ে থাকি, তবে তা তো এক সাংঘাতিক কথা!" এতে জনৈক ব্যক্তি বললো ঃ "আমিরুল মুমিনীন! এতদোভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।" হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জিজ্ঞেস করলেন, কি পার্থক্য? তিনি বললেন ঃ

> "খলীফা অন্যায়ভাবে কিছুই গ্রহণ করেননা, অন্যায়ভাবে কিছুই ব্যয়ও করেননা। আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে আপনিও অনুরূপ। আর বাদশাহ তো মানুষের ওপর যুলুম করে, অন্যায়ভাবে একজনের কাছ থেকে উসূল করে, আর অন্যায়ভাবেই অপরজনকে দান করে।"[১৪]

এ ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মধারা প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলীফা হওয়ার পরদিন কাপড়ের থান কাঁধে নিয়ে বিক্রি করার জন্য বেরিয়েছেন। কারণ, খিলাফতের পূর্বে এটিই ছিলো তাঁর জীবিকার অবলম্বন। পথে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাথে দেখা। তিনি বললেন, আপনি একি করছেন? জবাব দিলেন, ছেলে মেয়েদের খাওয়াবো কোত্থেকে? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, মুসলমানদের নেতৃত্বের ভার আপনার ওপর অর্পিত হয়েছে। ব্যবসায়ের সাথে খিলাফতের কাজ চলতে পারেনা। চলুন আবু ওবাইদার [বাইতুল মালের খাজাঞ্চী] সাথে আলাপ করি। তাই হলো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আবু ওবাইদার সাথে আলাপ করলেন। তিনি বললেন, একজন সাধারণ মুহাজিরের আমদানীর মান সামনে রেখে আমি আপনার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিচ্ছি। এ ভাতা মুহাজিরদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তির সমানও নয়; আবার সবচেয়ে দরিদ্রেরা পর্যায়েরও নয়। এমনিভাবে তাঁর জন্য একটা ভাতা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এর পরিমাণ ছিলো বার্ষিক চার হাজার দিরহামের কাছাকাছি। কিন্তু তাঁর

---

১৪. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৬-৩০৭।

ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি ওসীয়াত করে যান যে, আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আট হাজার দিরহাম বাইতুলমালকে ফেরত দেবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট তা আনা হলে তিনি বলেনঃ

"আল্লাহ্ আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি রহম করুন! উত্তরসূরীদেরকে তিনি মুশকিলে ফেলেগেলেন।"[১৫]

বাইতুলমালে খলীফার অধিকার কতোটুকু এ প্রসঙ্গে খলীফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একদা তাঁর এক ভাষণে বলেন ঃ

"গ্রীষ্মকালে এক জোড়া কাপড়, শীতকালে এক জোড়া কাপড়, কুরাইশের একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ অর্থ আপন পরিবার পরিজনের জন্য- এছাড়া আল্লাহ্র সম্পদের মধ্যে আর কিছুই আমার জন্য হালাল নয়। আমি তো মুসলমানদের একজন সাধারণ ব্যক্তি বৈ কিছুই নই।"[১৬]

অপর এক ভাষণে তিনি বলেন ঃ

"এ সম্পদের ব্যাপারে তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুকেই আমি ন্যায় মনে করিনা। ন্যায়ভাবে গ্রহণ করা হবে, ন্যায় মুতাবিক প্রদান করা হবে এবং বাতিল থেকে তাকে মুক্ত রাখতে হবে। এতীমের সম্পদের সাথে তার অভিভাবকের যে সম্পর্ক, তোমাদের এ সম্পদের সাথে আমার সম্পর্কও ঠিক অনুরূপ। আমি অভাবী না হলে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করবোনা, অভাবী হলে মারুফ পন্থায় গ্রহণ করবো।"[১৭]

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বেতনের যে মান ছিলো, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও তাঁর বেতনের মান তাই রাখলেন। তিনি পায়ের হাঁটু ও গোড়ালীর মাঝ বরাবর পর্যন্ত উঁচু তহবন্দ পরতেন। তাও আবার ছিলো তালিযুক্ত।[১৮] সারা জীবন কখনো একটু আরামে কাটাবার সুযোগ হয়নি। একবার শীতের মওসুমে জনৈক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। দেখেন, তিনি একখানা ছেঁড়া কাপড় পরে বসে আছেন আর শীতে কাঁপছেন।[১৯] শাহাদাতের পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির হিসাব নিয়ে দেখা গেলো মাত্র সাতশত দিরহাম। তাও তিনি এক পয়সা এক পয়সা করে সঞ্চয় করেছেন একটা গোলাম খরিদ করার জন্য।[২০] আমীরুল মু'মিনীন বলে চিনতে পেরে তাঁর কাছ থেকে যাতে কম মূল্য কেউ গ্রহণ না করে এ ভয়ে কোনো পরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে বাজারে কখনো কোনো জিনিস কিনতেননা।[২১] যে সময় হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাথে তাঁর সংঘর্ষ চলছিলো, কেউ কেউ তাঁকে পরামর্শ দেন ঃ হযরত মুয়াবিয়া

---

১৫. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং ২২৮০-২২৮৫।
১৬. ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃষ্ঠা-১৩৪।
১৭. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-১১৭।
১৮. ইবনে সা'দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮।
১৯. ইবনে কাসীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩।
২০. ইবনে সা'দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৮।
২১. ইবনে সা'দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮। ইবনে কাসীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩।

রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যে রকম লোকদেরকে অঢেল দান দক্ষিণা করে তাঁর সাথী করে নিচ্ছেন আপনিও তেমনি বাইতুল মালের ভান্ডার উজাড় করে টাকার বন্যা বইয়ে দিয়ে সমর্থক সংগ্রহ করুন। কিন্তু তিনি এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেন "তোমরা কি চাও, আমি অন্যায়ভাবে সফল হই?"[২২] তাঁর আপন ভাই হযরত আকীল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর কাছে টাকা দাবী করেন বাইতুলমাল থেকে। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করে বলেনঃ "তুমি কি চাও তোমার ভাইও মুসলমানদের টাকা তোমাকে দিয়ে জাহান্নামে যাক।"[২৩]

চার ঃ রাষ্ট্রের ধারণা

রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কি ছিলো, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিজের মর্যাদা এবং কর্তব্য সম্পর্কে তাঁরা কি ধারণা পোষণ করতেন, স্বীয় রাষ্ট্রে তাঁরা কোন্ নীতি মেনে চলতেন? খিলাফতের মঞ্চ থেকে ভাষণ দান প্রসঙ্গে তাঁরা নিজেরাই প্রকাশ্যে এসব বিষয় ব্যক্ত করেছেন। মসজিদে নববীতে গণ বাইয়াত ও শপথের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যে ভাষণ দান করেন, তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

> "আমাকে আপনাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে। অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন ন্যস্ত, আমি নিজে ইচ্ছা করে এ পদ গ্রহণ করিনি। অন্যের পরিবর্তে আমি নিজে এ পদ লাভের চেষ্টাও করিনি, এজন্য আমি কখনো আল্লাহ্‌র নিকট দোয়াও করিনি। এজন্য আমার অন্তরে কখনো লোভ সৃষ্টি হয়নি। মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ এবং আরবদের মধ্যে ধর্ম ত্যাগের ফেতনার সূচনা হবে- এ আশংকায় আমি অনিচ্ছা সত্ত্বে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এ পদে আমার কোনো শান্তি নেই। বরং এটা এক বিরাট বোঝা, যা আমার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ বোঝা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই। অবশ্য আল্লাহ্ যদি আমার সাহায্য করেন। আমার ইচ্ছা ছিলো, অন্য কেউ এ গুরুদায়িত্বভার বহন করুক। এখনও আপনারা ইচ্ছা করলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে হতে কাউকে এ কাজের জন্য বাছাই করে নিতে পারেন। আমার বাইয়াত এ ব্যাপারে আপনাদের প্রতিবন্ধক হবেনা। আপনারা যদি আমাকে রসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানদন্ডে যাচাই করেন, তাঁর কাছে আপনারা যে আশা পোষণ করতেন, আমার কাছেও যদি সে আশা করেন, তবে তার ক্ষমতা আমার নেই। কারণ, তিনি শয়তান থেকে নিরাপদ ছিলেন, তাঁর ওপর ওহী নাযিল হতো। আমি সঠিক কাজ করলে আমার সহযোগিতা করবেন, অন্যায় করলে আমাকে সোজা করে দেবেন। সততা হচ্ছে একটি আমানত। আর মিথ্যা একটি খিয়ানত। তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট সবল। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যতক্ষণ আমি তার অধিকার তাকে দান না

---

২২. ইবনে আবিল হাদীদ, নাহজুল বালাগার ভাষ্য, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮২। দারুল কুতুবিল আরাবিয়া, মিসর, ১৩২৯ হিজরী।

২৩. ইবনে কুতাইবা-আল-ইমামা ওয়াস সিয়াস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭১।

করি। আর তোমাদের মধ্যকার সবল ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল- যতক্ষণ আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমি তার কাছ থেকে অধিকার আদায় করতে না পারি। কোনো জাতি আল্লাহ্র রাস্তায় চেষ্টা সাধনা ত্যাগ করার পরও আল্লাহ্ তার ওপর অপমান চাপিয়ে দেননি- এমনটি কখনো হয়নি। কোনো জাতির মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করার পরও আল্লাহ্ তাদেরকে সাধারণ বিপদে নিপতিত করেননা- এমনও হয়না। আমি যতক্ষণ আল্লাহ্ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত থাকি, তোমরা আমার আনুগত্য করো। আমি আল্লাহ্ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্য হলে আমার ওপর তোমাদের কোনো আনুগত্য নেই। আমি অনুসরণকারী, কোনো নতুন পথের উদ্ভাবক নই।"[২৪]

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

"লোক সকল! আল্লাহ্র অবাধ্যতায় কারোর আনুগত্য করতে হবে- নিজের সম্পর্কে এমন অধিকারের দাবী কেউ করতে পারেনা।... লোক সকল! আমার ওপর তোমাদের যে অধিকার রয়েছে, আমি তোমাদের নিকট তা ব্যক্ত করছি। এসব অধিকারের জন্য তোমরা আমাকে পাকড়াও করতে পারো। আমার ওপর তোমাদের অধিকার এই যে, খিরাজ বা আল্লাহ্র দেয়া ফাই [বিনা যুদ্ধে বা রক্তপাত ছাড়াই যে গনীমাতের মাল লব্ধ হয়] থেকে বেআইনীভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করবোনা। আর আমার ওপর তোমাদের অধিকার এই যে, এভাবে যে অর্থ আমার হাতে আসে, অন্যায়ভাবে তার কোনো অংশও আমি ব্যয় করবোনা।"[২৫]

সিরিয়া ও ফিলিস্তিন যুদ্ধে হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে প্রেরণকালে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হিদায়াত দান করেন, তাতে তিনি বলেন ঃ

"আমর! আপন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল কাজে আল্লাহ্কে ভয় করে চলো। তাঁকে লজ্জা করে চলো। কারণ, তিনি তোমাকে এবং তোমার সকল কর্মকেই দেখতে পান।.....পরকালের জন্য কাজ করো। তোমার সকল কর্মে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখো। সঙ্গী-সাথীদের সাথে এমনভাবে আচরণ করবে, যেনো তারা তোমার সন্তান। মানুষের গোপন বিষয় খুঁজে বেড়িয়োনা। বাহ্যিক কাজের ভিত্তিতেই তাদের সঙ্গে আচরণ করো। ...... নিজেকে সংযত রাখবে, তোমার প্রজা সাধারণও ঠিক থাকবে।"[২৬]

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু শাসনকর্তাদের কোনো এলাকায় প্রেরণকালে সম্বোধন করে বলতেন ঃ

---

২৪. আত্তাবারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৫০। ইবনে হিশাম, আস সীরাতুন নববিয়্যা, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১১, মাতবায়াতু মুস্তফা আল-বাবী, মিসর-১৯৩৬, কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২২৬১, ২২৬৪, ২২৬৮, ২২৭৮, ২২৯১, ২২৯৯।

২৫. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-১১৭।

২৬. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২৩১৩।

"মানুষের দন্ড মুন্ডের মালিক বনে বসার জন্য আমি তোমাদের মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের ওপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করছিনা। বরং আমি তোমাদের এজন্য নিযুক্ত করছি যে, তোমরা সালাত কায়েম করবে, মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করবে, ন্যায়ের সাথে তাদের অধিকার বন্টন করবে।"[২৭]

বাইয়াতের পর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু প্রথম যে ভাষণ দান করেন, তাতে তিনি বলেন.ঃ

"শোনো, আমি অনুসরণকারী, নতুন পথের উদ্ভাবক নই। জেনে রেখো, আল্লাহ্র কিতাব এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মেনে চলার পর আমি তোমাদের নিকট তিনটি বিষয় মেনে চলার অঙ্গিকার করছি। একঃ আমার খিলাফতের পূর্বে তোমরা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে নীতি নির্ধারণ করেছো, আমি তা মেনে চলবো। দুইঃ যেসব ব্যাপারে পূর্বে কোনো নীতি পন্থা নির্ধারিত হয়নি, সেসব ব্যাপারে সকলের সাথে পরামর্শক্রমে কল্যাণাভিসারীদের পন্থা নির্ধারণ করবো। তিনঃ আইনের দৃষ্টিতে তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে না পড়া পর্যন্ত তোমাদের ওপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবো।"[২৮]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত কায়েস ইবনে সা'দকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাবারকালে মিসরবাসীদের নামে যে ফরমান দান করেন, তাতে তিনি বলেন ঃ

"সাবধান! আমি আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ মুতাবিক আমল করবো- আমার ওপর তোমাদের এ অধিকার রয়েছে। আল্লাহ্র নির্ধারিত অধিকার অনুযায়ী আমি তোমাদের কাজ কারবার পরিচালনা করবো এবং রসূলুল্লাহ্র সুন্নাহ কার্যকরী করবো। তোমাদের অগোচরেও তোমাদের কল্যাণ কামনা করবো।"

প্রকাশ্য জনসমাবেশে এ ফরমান পাঠ করে শোনাবার পর হযরত কায়েস ইবনে সা'দ ঘোষণা করেন ঃ

"আমি তোমাদের সাথে এভাবে আরচণ না করলে তোমাদের ওপর আমার কোনো বাইয়াত নেই।"[২৯]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জনৈক গভর্ণরকে লিখেন ঃ

"তোমাদের এবং জনসাধারণের মধ্যে দীর্ঘ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করোনা। শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতার পরিচায়ক। এর ফলে তারা সত্যিকার অবস্থা জানতে পারেনা। ক্ষুদ্র বিষয় তাদের জন্য বৃহৎ হয়ে দাঁড়ায়, আর বিরাট বিষয় ক্ষুদ্র। তাদের জন্য ভালো মন্দ হয়ে

---

২৭. আত্তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৩।
২৮. আত্তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৬।
২৯. আত্তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৫০-৫৫১।

দেখা দেয়, আর মন্দ গ্রহণ করে ভালোর আকার; সত্য মিথ্যা সংমিশ্রিত হয়ে যায়।"[৩০]

"হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কেবল একথা বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি অনুরূপ কাজও করেছেন। তিনি নিজে দোররা নিয়ে কুফার বাজারে বেরুতেন, জনগণকে অন্যায় থেকে বারণ করতেন, ন্যায়ের নির্দেশ দিতেন। প্রত্যেকটি বাজারে চক্কর দিয়ে দেখতেন, ব্যবসায়ীরা কাজ কারবারে প্রতারণা করছে কিনা! এ দৈনন্দিন ঘোরাঘুরির ফলে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি তাঁকে দেখে ধারণাই করতে পারতোনা যে, মুসলিম জাহানের খলীফা তার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কারণ, তাঁর পোশাক থেকে বাদশাহীর কোনো পরিচয় পাওয়া যেতোনা, তাঁর আগে আগে পথ করে দেয়ার জন্য কোনো রক্ষীবাহিনীও দৌড়ে যেতোনা।"[৩১]

একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু প্রকাশ্য ঘোষণা করেন ঃ

"তোমাদেরকে পিটাবার জন্য আর তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য আমি গভর্নরদের নিযুক্ত করিনি। তাদের নিযুক্ত করেছি এজন্য যে, তারা তোমাদেরকে দীন এবং নবীর তরীকা পদ্ধতি শিক্ষা দেবে। কারো সাথে এই নির্দেশ বিরোধী ব্যবহার করা হলে সে আমার কাছে অভিযোগ উত্থাপন করুক। আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি আমি তার [গভর্নরের] কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।" এতে হযরত আমর ইবনুল আস [মিসরের গভর্নর] দাঁড়িয়ে বলেনঃ "কেউ যদি মুসলমানদের শাসক হয়ে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য তাদেরকে মারে, আপনি কি তার কাছ থেকেও প্রতিশোধ নেবেন?" হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জবাব দেন ঃ "হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমি তার কাছ থেকেও প্রতিশোধ নেবো। আমি আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নিজের সত্তা থেকেও প্রতিশোধ নিতে দেখেছি!"[৩২]

আর একবার হজ্জ উপলক্ষে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সমস্ত গভর্ণরকে ডেকে প্রকাশ্য সমাবেশে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ এদের বিরুদ্ধে কারোর ওপর কোনো অত্যাচারের অভিযোগ থাকলে তা পেশ করতে পারো নির্দ্বিধায়। গোটা সমাবেশ থেকে মাত্র একজন লোক উঠে হযরত আমর ইবনুল আসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন ঃ তিনি অন্যায়ভাবে আমাকে একশ' দোররা মেরেছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন ঃ ওঠো এবং তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও। হযরত আমর ইবনুল আস প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, আপনি গভর্ণরদের বিরুদ্ধে এপথ উন্মুক্ত করবেননা। কিন্তু তিনি বললেন ঃ "আমি আল্লাহ্‌র রসূলকে নিজের থেকে প্রতিশোধ দিতে দেখেছি। হে অভিযোগকারী, এসে তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো।" শেষ

---

৩০. **ইবনে কাসীর**, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮।

৩১. **ইবনে কাসীর**, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪-৫।

৩২. **আবু ইউসুফ**, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-১১৫। মুসনাদে আবু দাউদ আত্‌তায়ালিসী, হাদীস নং-৫৫। **ইবনুল আসীর**, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০। আত্‌তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৩।

পর্যন্ত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে প্রতিটি বেত্রাঘাতের জন্য দু'আশরাফী দিয়ে আপন পিঠ রক্ষা করতে হয়।[৩৩]

পাঁচ ঃ আইনের প্রাধান্য

এ খলীফারা নিজেদেরকেও আইনের উর্ধ্বে মনে করতেননা। বরং আইনের দৃষ্টিতে নিজেকে এবং দেশের একজন সাধারণ নাগরিককে [সে মুসলমান হোক বা অমুসলিম যিম্মি] সমান মনে করতেন। রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে তাঁরা নিজেরা বিচারপতি [কাযী] নিযুক্ত করলেও খলীফাদের বিরুদ্ধে রায়দানে তারা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন, যেমন স্বাধীন ছিলেন একজন সাধারণ নাগরিকের ব্যাপারে। একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মধ্যে এক ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। উভয়ে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে শালিস নিযুক্ত করেন, বাদী বিবাদী উভয়ে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হলেন। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দাঁড়িয়ে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে তাঁর আসনে বসাতে চাইলেন, কিন্তু তিনি উবাই রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাথে বসলেন। অতঃপর হযরত উবাই রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর আর্যী পেশ করলেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু অভিযোগ অস্বীকার করলেন। নিয়ম অনুযায়ী যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উচিত ছিলো হযরত ওমরের কাছ থেকে কসম আদায় করা। কিন্তু তিনি তা করতে ইতস্তত করলেন, হযরত ওমর নিজে কসম খেয়ে মজলিস সমাপ্তির পর বললেন ঃ "যতক্ষণ যায়েদের কাছে একজন সাধারণ মুসলমান এবং ওমর সমান না হয় ততক্ষণ যায়েদ বিচারক হতে পারেনা।"[৩৪]

এমনি একটি ঘটনা ঘটে জনৈক খৃষ্টানের সাথে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর। কুফার বাজারে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দেখতে পেলেন, জনৈক খৃষ্টান তাঁর হারানো লৌহবর্ম বিক্রি করছে। আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে তিনি সে ব্যক্তির নিকট থেকে বর্ম ছিনিয়ে নেননি বরং কাযীর দরবারে ফরিয়াদ করলেন। তিনি সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে না পারায় কাযী তাঁর বিরুদ্ধে রায় দান করলেন।[৩৫]

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লেকান বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং জনৈক যিম্মী বাদী বিবাদী হিসেবে কাযী শোরাইহর আদালতের উপস্থিত হন। কাযী দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে অভ্যর্থনা জানান। এতে তিনি [হযরত আলী] বলেন, "এটা তোমার প্রথম বে-ইনসাফী।"[৩৬]

---

৩৩. আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-১১৬।

৩৪. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৬। দায়িরাতুল মায়ারিফ,হায়দাবাদ, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৫ হিজরী।

৩৫. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৬। দায়িরাতুল মায়ারিফ,হায়দাবাদ, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৫ হিজরী।

৩৬. ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আইয়ান, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬৮, মাকতাবাতুন নাহযাতিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৪৮।

ছয় ঃ বংশ-গোত্রের পক্ষপাতমুক্ত শাসন

ইসলামের প্রাথমিক যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, ইসলামের নীতি এবং প্রাণশক্তি অনুযায়ী তখণ বংশ গোত্র দেশের পক্ষপাতের উর্ধ্বে উঠে সকল মানুষের সাথে সমান আচরণ করা হতো, কারো সাথে কোনো রকম পক্ষপতিত্ব করা হতোনা।

আল্লাহ্‌র রসূলের ওফাতের পরে আরবের গোত্রবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ঝঞ্জার বেগে। নবূয়্যতের দাবীদারদের অভ্যুদয় এবং ইসলাম ত্যাগের হিড়িকের মধ্যে এ উপাদান ছিলো সবচেয়ে ক্রিয়াশীল। মোসাইলামার জনৈক ভক্তের উক্তি ঃ আমি জানি, মোসাইলামা মিথ্যাবাদী। কিন্তু রাবীয়ার মিথ্যাবাদী মোদারের সত্যবাদীর চেয়ে উত্তম।"[৩৭] মিথ্যা নবূয়্যতের অপর এক দাবীদার তোলাইহার সমর্থনে বনু গাতফানের জনৈক সর্দার বলেনঃ "খোদার কসম, কুরাইশের নবীর অনুসরণ করার চেয়ে আমাদের বন্ধুগোত্রের নবীর অনুসরণ আমার নিকট অধিক প্রিয়।"[৩৮]

মদীনায় যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাতে বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়, তখন গোত্রবাদের ভিত্তিতে হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর খিলাফত স্বীকার করা থেকে বিরত ছিলেন। এমনি করে গোত্রবাদের ভিত্তিতেই হযরত আবু সুফিয়ানের নিকট তাঁর খিলাফত ছিলো অপছন্দনীয়। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট গিয়ে বলেছিলেন ঃ 'কুরাইশের সবচেয়ে ছোট গোত্রের লোক কি করে খলীফা হয়ে গেলো? তুমি নিজেকে প্রতিদ্বন্দী হিসেবে দাঁড় করাতে প্রস্তুত হলে আমি পদাতিক এবং অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা সমগ্র উপত্যকা ভরে ফেলবো। কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক মোক্ষম জবাব দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করে দেন। তিনি বলেন ঃ তোমার একথা ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতা প্রমাণ করে। তুমি কোনো পদাতিক বা অশ্বারোহী বাহিনী আনো, আমি তা কখনো চাইনা। মুসলমানরা পরস্পরের কল্যাণকামী। তারা একে অপরকে ভালোবাসে। তাদের আবাস ও দৈহিক সত্তার মধ্যে যতোই ব্যবধান থাক না কেন। আবশ্য মুনাফিক একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী। আমরা আবু বকরকে এ পদের যোগ্য মনে করি। তিনি এ পদের যোগ্য না হলে আমরা কখনো তাঁকে এ পদে নিয়োজিত হতে দিতামনা।[৩৯]

এ পরিবেশে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতমুক্ত ইনসাফপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে কেবল আরবের বিভিন্ন গোত্রে নয় বরং অনারব নওমুসলিমদের সাথেও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করেন এবং বংশ গোত্রের সাথে কোনো প্রকার ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বিরত থাকেন। এর ফলে সব রকম বংশ গোত্রবাদ বিলীন হয়ে যায়। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের দাবী অনুযায়ী একটি আন্তর্জাতিক প্রাণশক্তি

---

৩৭. আত্‌তাবারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫০৮।
৩৮. আত্‌তাবারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৭।
৩৯. কান্‌যুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস-২৩৭৪। আত্‌তাবারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৯। ইবনুআব্দিল বার, আল-ইস্তিয়াব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৮৯।

ফুটে ওঠে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর খিলাফতকালে আপন গোত্রের কোনো লোককে কোনো সরকারী পদে নিয়োগ করেননি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর গোটা শাসনকালে তাঁর গোত্রের একজন মাত্র ব্যক্তিকে যার নাম ছিলো নো'মান ইবনে আদী- বসরার নিকটে মাইদান নামক এক ক্ষুদ্র এলাকার তহশিলদার নিযুক্ত করেছিলেন। অল্প কিছুদিন পরই আবার এ পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করেছিলেন।[৪০] এদিক থেকে এ দু'জন খলিফার কর্মধারা সত্যিকার আদর্শভিত্তিক ছিলো।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জীবনের শেষ অধ্যায়ে আশংকাবোধ করলেন, তাঁর পরে আরবের গোত্রবাদ [ইসলামী আন্দোলনের বিরাট বিপ্লবী প্রভাবের ফলেও যা এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়নি] পুনরায় যেনো মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে এবং তার ফলে ইসলামের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি না হয়ে যায়। একদা তাঁর সম্ভাব্য উত্তরসূরীদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ব্যাপারে বলেন ঃ "আমি তাঁকে আমার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করলে তিনি বনী আবিমুয়াইত [বনী উমাইয়া]-কে লোকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন। আর তারা লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র নাফরমানী করে বেড়াবে। আল্লাহ্র কসম, আমি ওসমানকে স্থলাভিষিক্ত করলে সে তাই করবে। আর ওসমান তাই করলে তারা অবশ্যই পাপাচার করবে। এ ক্ষেত্রে জনগণ বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করবে।[৪১] ওফাতকালেও এ বিষয়টি তাঁর স্মরণ ছিলো। শেষ সময়ে তিনি

---

৪০. হযরত নু'মান ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ছিলেন প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অন্যতম। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুরও আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতকালে যারা মক্কা ত্যাগ করে আবিসিনিয়া চলে যান, তাঁদের মধ্যে তিনি এবং তাঁর পিতা আদীও ছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন তাঁকে মাইসানের তহসিলদার নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর সংগে যাননি। তিনি সেখানে স্ত্রীর বিরহে কিছু কবিতা রচনা করেন। এ সকল কবিতায় কেবল মদের বিষয় উল্লেখ ছিলো। এতে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাকে পদচ্যুত করেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে তাকে কোনো পদ না দেয়ারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি। ইবনে আব্দুল বার, আল-ইস্তীয়াব, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৬। দায়িরাতুল মায়ারিফ, হায়দরাবাদ, মুজামুল, বুলদান, ইয়াকুত হামাবী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪২-২৪৩। দারে ছাদির, বৈরুত ১৯৫৭। অপর এক ব্যক্তি, হযরত কুদামা ইবনে মাযউন- যিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভগ্নিপতি ছিলেন- তিনি তাঁকে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি তাঁকে বরখাস্ত করে দন্ড দান করেন। [আল-ইস্তীয়াব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৩৪, ইবনে হাজর, আল-ইসাবা] ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৯-২২০।

৪১. ইবনে আব্দুল বার, আল-ইস্তীয়াব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৬৭। শাহ ওয়ালীউল্লাহ, ইযালাতুল খিফা, মাকসাদে আউয়াল, পৃষ্ঠা-৩৪২, বেরিলী সংস্করণ। কেউ কেউ এখানে প্রশ্ন তোলেনঃ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ওপর কি ইলহাম [সূক্ষ্ম ওহী] হয়েছিলো, যার ভিত্তিতে তিনি হলফ করে এমন কথা বলেছিলেন, পরবর্তী পর্যায়ে যা অক্ষরে অক্ষরে ঘটে গিয়েছিলো? এর জবাব এই যে, দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো কখনো পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাকে যুক্তির আলোকে পুনর্বিন্যাস করলে ভাবীকালে ঘটিতব্য বিষয় তাঁর সামনে এমনিভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যেমন ২+২=৪। ফলে ইলহাম ব্যতীতই তিনি দিব্য দৃষ্টি বলে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রত্যেককে ডেকে বলেন ঃ 'আমার পরে তোমরা খলীফা হলে স্ব স্ব গোত্রের লোকদেরকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেবেনা।[৪২] উপরন্তু ছয় সদস্যের নির্বাচনী শূরার জন্য তিনি যে হিদায়াত দিয়ে যান, তাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নোক্ত বিষয়টিও ছিলোঃ নির্বাচিত খলীফারা একথাটি মেনে চলবেন যে, তাঁরা আপন গোত্রের সাথে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ করবেননা।[৪৩] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঃ তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ ক্ষেত্রে ঈপ্সিত মানদন্ড বজায় রাখতে সক্ষম হননি। তাঁর শাসনমালে বনী উমাইয়াকে ব্যাপকভাবে বিরাট বিরাট পদ এবং বাইতুল মাল থেকে দান দক্ষিণা দেয়া হয়। অন্যান্য গোত্র তিক্ততার সাথে তা অনুধাবন করতে থাকে।[৪৪] তাঁর কাছে এটা ছিলো আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদাচারের দাবী। তিনি বলতেন ঃ ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আল্লাহ্র জন্য তাঁর নিকটাত্মীয়দের বঞ্চিত করতেন, আর আমি আল্লাহ্র জন্য আমার নিকটাত্মীয়দের দান করছি।[৪৫] একবার তিনি বলেন ঃ "বাইতুল মালের ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজেও অসচ্ছল অবস্থায় থাকা পছন্দ করতেন এবং নিজের আত্মীয় স্বজনকে সেভাবে রাখতে ভালো বাসতেন। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদাচার পছন্দ করি।[৪৬] অবশেষে এর ফল তাই হয়েছে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যা আশংকা করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিক্ষোভ দেখা দেয়। কেবল তিনি যে শহীদ হন তাই নয় বরং গোত্রবাদের চাপা দেয়া স্ফুলিঙ্গ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং অবশেষে এরি অগ্নিশিখা খিলাফতে রাশেদার ব্যবস্থাকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

আট ঃ গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি

সমালোচনা ও মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতাই ছিলো এ খিলাফতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যরাজির অন্যতম। খলীফারা সর্বক্ষণ জনগণের নাগালের মধ্যে থাকতেন। তাঁরা নিজেরা শূরার অধিবেশনে বসতেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতনে। তাঁদের কোনো সরকারী দল ছিলোনা। তাঁদের বিরুদ্ধেও কোনো দলের

আরবদের মধ্যে গোত্রবাদের বীজাণু কতো গভীরে শিকড় গেড়ে বেসেছে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তা জানতেন। তিনি এ-ও জানতেন যে, ইসলামের ২৫-৩০ বৎসরের প্রচার এখনও সেসব বীজাণু সমূলে উৎপাটিত করতে পারেনি।

৪২. আত্তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৬৪। তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪০-৩৪৪।

৪৩. ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৯-৫০। মুহিবুদ্দীন আত্তাবারী, আর-রিয়াযুন নাযিরা ফী মানাকিবিল আশারা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৬, হুসাইনিয়া প্রেস, মিসর, ১৩২৭ হিজরী। ইবনে খালদুন, দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা-১২৫, আল-মাতাবায়াতুল কুবরা, মিসর, ১২৮৪ হিজরী। [শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ [রঃ] তাঁর ইযালাতুল খিফায় এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মাকসাদে আউয়াল, পৃষ্ঠা-৩২৪ দ্রষ্টব্য।]

৪৪. তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৪, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬।

৪৫. আত্তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯১।

৪৬. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস-২৩২৪। তাবকাতে ইবনে সা'দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৪।

অস্তিত্ব ছিলোনা। মুক্ত পরিবেশে সকল সদস্য নিজ নিজ ঈমান এবং বিবেক অনুযায়ী মত প্রকাশ করতেন। চিন্তাশীল, উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সামনে সকল বিষয় যথাযথভাবে উপস্থাপিত করা হতো। কোনো কিছুই গোপন করা হতোনা। ফায়সালা হতো দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে, কারোর দাপট, প্রভাব প্রতিপত্তি, স্বার্থ সংরক্ষণ বা দলাদলির ভিত্তিতে নয়। কেবল শূরার মাধ্যমেই খলীফারা জাতির সম্মুখে উপস্থিত হতেননা; বরং দৈনিক পাঁচবার সালাতের জামায়াতে, সপ্তাহে একবার জুময়ার জামায়াতে এবং বৎসরে দু'বার ঈদের জামায়াতে ও হজ্জের সম্মেলনে তাঁরা জাতির সামনে উপস্থিত হতেন। অন্যদিকে এসব সময় জাতিও তাঁদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেতো। তাঁদের নিবাস ছিলো জনগণের মধ্যেই। কোনো দারোয়ান ছিলোনা তাঁদের গৃহে। সকল সময় সকলের জন্য তাঁদের দ্বার খোলা থাকতো। তাঁরা হাট বাজারে জনগণের মধ্যে চলাফেরা করতেন। তাঁদের কোনো দেহরক্ষী ছিলোনা, ছিলোনা কোনো রক্ষী বাহিনী। এসব সময়ে ও সুযোগে যে কোনো ব্যক্তি তাঁদের প্রশ্ন করতে, সমালোচনা করতে ও তাঁদের নিকট থেকে হিসেব চাইতে পারতো। তাঁদের নিকট থেকে কৈফিয়ত তবল করার স্বাধীনতা ছিলো সকলেরই। এ স্বাধীনতা ব্যবহারের তাঁরা কেবল অনুমতিই দিতেননা বরং এজন্য লোকদেরকে উৎসাহিতও করতেন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর খিলাফতের প্রথম ভাষণেই প্রকাশ্যে বলে দিয়েছিলেন, আমি সোজা পথে চললে আমার সাহায্য করো, বাঁকা পথে চললে আমাকে সোজা করে দেবে। একদা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জুময়ার খুতবায় মত প্রকাশ করেন যে, কোনো ব্যক্তিকে যেনো বিবাহে চারশ' দিরহামের বেশী মোহর ধার্যের অনুমতি না দেয়া হয়। জনৈক মহিলা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে বলেন, আপনার এমন নির্দেশ দেয়ার কোনো অধিকার নেই। কুরআন স্তূপিকৃত সম্পদ [কেনতার] মোহর হিসেবে দান করার অনুমতি দিচ্ছে। আপনি কে তার সীমা নির্ধারণকারী? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তৎক্ষণাৎ তাঁর মত প্রত্যাহার করেন।[৪৭] আর একবার হযরত সালমান ফারসী প্রকাশ্য মজলিশে তাঁর নিকট কৈফিয়ত তলব করেন, 'আমাদের সকলের ভাগে এক একখানা চাদর পড়েছে। আপনি দু'খানা চাদর কোথায় পেলেন? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তৎক্ষণাৎ স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাক্ষ্য পেশ করলেন যে, দ্বিতীয় চাদরখানা তিনি পিতাকে ধার দিয়েছেন।[৪৮] একদা তিনি মজলিশে উপস্থিত ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করলেনঃ আমি যদি কোনো ব্যাপারে শৈথিল্য দেখাই তাহলে তোমরা কি করবে? হযরত বিশ্‌র ইবনে সা'দ বললেন, এমন করলে আমরা আপনাকে তীরের মতো সোজা করে দেবো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, তবেই তো তোমরা কাজের মানুষ।[৪৯] হযরত

---

৪৭. তাফসীরে ইবনে কাসীর, আবু ইয়ালা ও ইবনুল মুনযির, এর উদ্ধৃতিতে, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৬৭।

৪৮. মুহিবুদ্দীন আত-তাবারী, আররিয়াযুন নাযিরা ফী মানাকিবিল আশারা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৬। মিসরীয় সংস্করণ। ইবনুল জাওযী, সীরাতে ওমর ইবনে খাত্তাব, পৃষ্ঠা-১২৭।

৪৯. কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস- ২৪১৪।

ওসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সবচেয়ে বেশী সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি কখনো জোরপূর্বক কারো মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। বরং সব সময় অভিযোগ এবং সমালোচনার জবাবে প্রকাশ্যে নিজের সাফাই পেশ করেছেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর খিলাফতকালে খারেজীদের অত্যন্ত কটু উক্তিকেও শান্ত মনে বরদাশ্‌ত করেছেন। একদা পাঁচজন খারেজীকে গ্রেফতার করে তাঁর সামনে হাযির করা হলো। এরা সকলেই প্রকাশ্যে তাঁকে গালি দিচ্ছিলো। তাদের একজন প্রকাশ্যেই বলছিলো, আল্লাহ্‌র কসম আমি আলীকে হত্যা করবো। কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এদের সকলকেই ছেড়ে দেন এবং নিজের লোকদের বলেন, তোমরা ইচ্ছে করলে তাদের গালমন্দের জবাবে গালমন্দ দিতে পারো। কিন্তু কার্যত কোনো বিদ্রোহাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিছক মৌখিক বিরোধিতা এমন কোনো অপরাধ নয়, যার জন্য তাদের শাস্তি দেয়া যেতে পারে।[৫০]

ওপরে আমরা খিলাফতে রাশেদার যে অধ্যায়ের আলোচনা করেছি, তা ছিলো আলোর মীনার। পরবর্তীকালে ফকাহা- মুহাদ্দিসীন এবং সাধারণ দীনদার মুসলমান সে আলোর মীনারের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। ইসলামের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাঁরা এ মীনারকেই আদর্শ মনে করে আসছেন।

---

৫০. সুরুখসী, আল-মাবসূত, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৫। সায়াদাত প্রেস, মিসর, ১৩২৪ হিজরী।

দশম অধ্যায়

ইসলামে আইন প্রণয়ন ও ইজতিহাদ

১ ইসলামে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র এবং তাতে ইজতিহাদের গুরুত্ব

২ কয়েকটি অভিযোগ ও তার জবাব

৩ আইন প্রণয়ন শূরা ও ইজমা

৪ ইসলামী ব্যবস্থায় বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিক পন্থা

১৯৫৮ সালের জানুয়ারীতে লাহোরে 'আন্তর্জাতিক ইসলামী মজলিশে মুযাকিরা'র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদ এবং সারাবিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনেরই একটি অধিবেশনে (৩০ জানুয়ারী ১৯৫৮) মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী 'আইন প্রণয়ন ও ইজতিহাদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ প্রবন্ধটি অর্থাৎ "ইসলামী রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা" আমাদের এই গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। তাই ওটিকে এখানে সংকলিত করে দেয়া হলো। প্রবন্ধের শেষে সেই প্রশ্নমালার জবাবও দিয়ে দেয়া হলো, যা জনৈক প্রগতিবাদীর জবাবে মাওলানা মওদূদী লিখেছিলেন। প্রসংগক্রমে সেসব আলোচনাও এখানে পেশ করা হলো যেগুলো আইনের ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কিত। - সংকলক।

১. ইসলামে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র এবং তাতে ইজতিহাদের গুরুত্ব ১

ইসালামে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র কতোটুকু এবং তাতে ইজতিহাদের কতোটা গুরুত্ব আছে তা অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টির সামনে দুটি বিষয় পরিষ্কার থাকা দরকার ঃ এক, আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও দুই, নবূয়্যতে মুহাম্মদী।

আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব

ইসলামে সার্বভৌমত্ব নির্ভেজালভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার জন্য স্বীকৃত। কুরআন মজীদ তৌহীদের আকীদার যে বিশ্লেষণ করেছে তার আলোকে এক এবং অদ্বিতীয় লা-শরীক আল্লাহ্ কেবল ধর্মীয় অর্থেই মা'বুদ নন বরং রাজনৈতিক এবং আইনগত অর্থের দিক থেকেও তিনি একচ্ছত্র অধিপতি, আদেশ নিষেধের অধিকারী এবং আইন প্রদানকারী। আল্লাহ্ তায়ালার এই আইনগত সার্বভৌমত্ব [Legal Sovereignty] কুরআন এতোটা পরিষ্কারভাবে এবং এতোটা জোরের সাথে পেশ করে যতোটা জোরের সাথে এবং পরিষ্কারভাবে তাঁর ধর্মীয় সার্বভৌমত্বের আকীদা পেশ করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র এদুটি মর্যাদা তাঁর উলুহিয়াতের [খোদায়ী] অবশ্যম্ভাবী ফল। এর একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না। এর কোনো একটিকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র উলুহিয়াতকে অস্বীকার করা। তাছাড়া ইসলাম এরূপ সন্দেহ করারও কোনো অবকাশ রাখেনি যে, খোদায়ী কানুন বলতে হয়তো প্রাকৃতিক বিধানকে বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামের গোটা দাওয়াতের ভিত্তি এই যে, মানুষ তার নৈতিক এবং সামাজিক জীবনে আল্লাহ্‌র সেই শরয়ী আইন স্বীকার করে নেবে যা তিনি তাঁর নবীদের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। এই শরয়ী আইন মেনে নেয়া এবং এর সামনে নিজের স্বাধীন সত্তাকে বিলিয়ে দেয়ার নাম তিনি ইসলাম [Surrender] রেখেছেন এবং এখানে যেসব ব্যাপারে ফায়সালা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে দিয়েছেন সেসব ক্ষেত্রে মানুষের ফায়সালা করার অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে ঃ

"আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল যখন কোনো ব্যাপারে ফায়সালা করে দেন তখন কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর নিজের সে ব্যাপারে ভিন্নরূপ ফায়সালা করার অধিকার

---

১. লেখক এই প্রবন্ধটি ১৯৫৮ সালের ৩ জানুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে পাঠ করেন।

নেই। আর যেব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয়, সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হলো।" [সূরা আহযাব ঃ ৩৬]

নবুয়্যতে মুহাম্মাদী

আল্লাহ্র একত্ববাদের মতো দ্বিতীয় যে জিনিসটি ইসলামে মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী তা হচ্ছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র সর্বশেষ নবী। মূলত এই সেই জিনিস যার বদৌলতে আল্লাহ্র একত্ববাদের আকীদা শুধু কল্পনা বিলাসের পরিবর্তে একটি বাস্তব ব্যবস্থার রূপ লাভ করে এবং এর উপরই ইসলামের গোটা জীবন ব্যবস্থার ইমারত নির্মিত হয়েছে। এই আকীদার আলোকে পূর্ববর্তী সমস্ত নবীর আনীত শিক্ষা অনেক পরিবর্ধন সহকারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া শিক্ষার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। এজন্য খোদায়ী হিদায়াত এবং শরীয়তের স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য উৎস এখন কেবল এই একটিই এবং ভবিষ্যতেও এমন আর কোনো হিদায়াত এবং শরীয়তের আগমন ঘটবেনা যে দিকে মানুষের প্রত্যাবর্তন করা জরুরী হতে পারে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই শিক্ষাই হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন [Supreme Law] যা মহান বিচারক আল্লাহ্র ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে। এই বিধান আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুই আকারে পেয়েছি। এক, কুরআন মজীদ, যা অক্ষরে অক্ষরে মহাবিশ্বের প্রতিপালক নির্দেশ ও হিদায়াতের সমষ্টি। দুই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসওয়ায়ে হাসানা বা উত্তম আদর্শ তাঁর সুন্নাহ্, যা কুরআনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু আল্লাহ্র বাণীর ধারকই ছিলেননা যে, কিতাব পৌছে দেয়া ছাড়া তাঁর কোনো কাজ ছিলোনা। তিনি তাঁর নিযুক্ত পথপ্রদর্শক, আইনপ্রণেতা এবং শিক্ষকও ছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিলো এই যে, তিনি নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র বিধানের ব্যাখ্যা পেশ করবেন, তার সঠিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করবেন, এই উদ্দেশ্য মুতাবিক লোকদের প্রশিক্ষণ দেবেন, অতপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদেরকে একটি সুসংগঠিত জামায়াতের রূপ দিয়ে সমাজের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করবেন, অতপর এই সংশোধিত সমাজকে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রের রূপ দান করে দেখিয়ে দেবেন যে, ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে একটি পূর্ণাংগ সভ্যতার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা কিভাবে কায়েম হতে পারে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই গোটা কাজ যা তিনি নিজের তেইশ বছরের নবুয়্যতী জীবনে আঞ্জাম দিয়েছেন- সেই সুন্নাহ্ যা কুরআনের সাথে মিলিত হয়ে মহান আল্লাহর উচ্চতর আইনকে বাস্তবে রূপদান ও পরিপূর্ণ করে। ইসলামের পরিভাষায় এই উচ্চতর আইনের নামই হচ্ছে শরীয়া।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র

স্থুল দৃষ্টি সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি এ মৌলিক সত্যটি শুনার পর ধারণা করতে পারে যে, এ অবস্থায় কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে মানবীয় আইন প্রণয়ন করার মোটেই কোনো সুযোগ নেই। কেননা এখানে তো আইনদাতা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্। আর

মুসলমানদের কাজ হচ্ছে কেবল নবীর মাধ্যমে দেয়া আল্লাহ্র এই আইনের আনুগত্য করে যাওয়া। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, ইসলাম মানুষের আইন প্রণয়নকে চূড়ান্তভাবেই নিষিদ্ধ করে দেয়না বরং তাকে আল্লাহ্র আইনের প্রাধান্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ করে দেয়। এই সর্বোচ্চ আইনের অধীনে এবং তার নির্ধারিত সীমার মধ্যে মানুষের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র কি তা আমি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করছি ঃ

আইনের ব্যাখ্যা

মানুষের ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে এক ধরনের বিষয় এমন রয়েছে, যে সম্পর্কে কুরআন এবং সুন্নাহ্ সুস্পষ্ট এবং চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে, অথবা কোনো বিশেষ মূলনীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ ধরনের বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো ফকীহ, কোনো কাযী [বিচারক] অথবা কোনো আইন প্রণয়নকারী সংস্থা শরীয়ার দেয়া নির্দেশ অথবা তার নির্ধারিত মূলনীতি পরিবর্তন করতে পারেনা। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এর মধ্যে আইন প্রণয়নের কোন সুযোগই নেই। এ অবস্থায় মানুষের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র হচ্ছে এই যে, প্রথমে সঠিকভাবে জানতে হবে আসলে নির্দেশটি কি? অতপর তার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নির্ধারণ করতে হবে এবং কোন্ অবস্থা ও ঘটনার জন্য এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অনুসন্ধান করতে হবে। অতপর বাস্তব ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তার উপর এই নির্দেশ প্রয়োগের পন্থা এবং সংক্ষিপ্ত নির্দেশের আনুসংগিক ব্যাখ্যা করতে হবে। সাথে সাথে এও নির্ধারণ করতে হবে যে, ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থা ও পরিস্থিতিতে এসব নির্দেশ ও মূলনীতি থেকে সরে গিয়ে কাজ করার সুযোগ কোথায় এবং কোন্ সীমা পর্যন্ত রয়েছে।

কিয়াস

দ্বিতীয় প্রকারের বিষয় হলো, যে সম্পর্কে শরীয়া সরাসরি কোনো নির্দেশ দেয়নি কিন্তু তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে শরীয়া একটি নির্দেশ দান করে। এ ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের কাজ এভাবে হবে যে, নির্দেশের কারণসমূহ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে যেসব ক্ষেত্রে বাস্তবিকপক্ষেই এই কারণসমূহ পাওয়া যাবে সেখানে এই নির্দেশ জারী করতে হবে এবং যেসব ক্ষেত্রে বাস্তবিকই এই কারণসমূহ পাওয়া যাবেনা সেগুলোকে এ থেকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করতে হবে।

ইস্তিম্বাত [বিধান নির্গতকরণ]

এমন এক প্রকারের বিষয়ও রয়েছে যেখানে শরীয়া নির্ধারিত কোনো হুকুম নেই বরং কতিপয় সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাংগ মূলনীতি দান করা হয়েছে। অথবা শরীয়তদাতা এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন যে, কোন্ জিনিস পছন্দনীয় যার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন এবং কোন্ জিনিস অপছন্দনীয় যার বিলুপ্তি হওয়া প্রয়োজন। এরূপ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের কাজ হচ্ছে এই যে, শরীয়াতের এই মূলনীতিসমূহ ও শরীয়াতদাতার এই উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে হবে এবং বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য এমন আইন কানুন প্রণয়ন করতে হবে যার ভিত্তি এই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শরীয়াতদাতার উদ্দেশ্যও পূর্ণ করবে।

স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র

উপরে উল্লেখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও এমন অনেক বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে শরীয়া সম্পূর্ণ নীরব, এ সম্পর্কে সরাসরি কোনো হুকুমও দেয়না এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে শরীয়াতে এমন কোনো নির্দেশও পাওয়া যায়না যার উপর এটাকে কিয়াস করা যেতে পারে। এই নীরবতা স্বয়ং একথার প্রমাণ বহন করে যে, মহান আইনদাতা আল্লাহ্ এ ক্ষেত্রে মানুষকে নিজের রায় প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দিচ্ছেন। এজন্য এ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। কিন্তু এই আইন প্রণয়নের কাজ এমনভাবে হতে হবে যেনো তা ইসলামের প্রাণশক্তি এবং তার সাধারণ মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তার মেজাজ প্রকৃতি ইসলামের মেজাজ প্রকৃতির বিপরীত না হয় এবং তা যেনো ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সঠিকভাবে সংস্থাপিত হতে পারে।

ইজতিহাদ [গবেষণা]

আইন প্রণয়নের এসব কাজ- যা ইসলামের আইন ব্যবস্থাকে গতিশীল রাখে এবং যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সাথে তার ক্রমবিকাশে সহায়তা করে- এক বিশেষ ইলমী তাহকীক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। ইসলামের পরিভাষায় একে বলে 'ইজতিহাদ'। এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে "কোনো কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করা।" কিন্তু এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- "আলোচ্য কোনো বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ অথবা তার উদ্দেশ্য কি তা জানার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করা।" কোনো কোনো লোক ভ্রান্তির শিকার হয়ে 'মতের সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্যবহারকে' ইজতিহাদের অর্থের মধ্যে গণ্য করে থাকে। ইসলামী আইনের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত এমন কোনো ব্যক্তি এই ভুল ধারণায় পতিত হতে পারেনা যে, এই ধরনের একটি আইন ব্যবস্থায় স্বাধীন ইজতিহাদের কোনো অবকাশ থাকতে পারে। এখানে তো আইনের উৎস হচ্ছে কুরআন এবং হাদীস। মানুষ যে আইন প্রণয়ন করতে পারে তা অপরিহার্যরূপে- হয় আইনের উৎস থেকে গৃহীত হতে হবে অথবা যে সীমা পর্যন্ত সে স্বাধীন মত প্রয়োগের সুযোগ দেয় তা সেই সীমার মধ্যে প্রণীত হতে হবে। এই বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করে যে ইজতিহাদ করা হবে, তা না ইসলামী ইজতিহাদ আর না ইসলামী আইন ব্যবস্থায় তার কোনো স্থান আছে।

ইজতিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী

ইজতিহাদের উদ্দেশ্য যেহেতু আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনকে মানব রচিত আইনের দ্বারা পরিবর্তন করা নয় বরং তাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং আইন পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামের আইন ব্যবস্থাকে যুগের গতির সাথে গতিশীল করে তোলা- এজন্য আমাদের আইন প্রণয়নকারীদের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলী বর্তমান না থাকলে কোনো সঠিক এবং সুস্থ ইজতিহাদ হতে পারেনা ঃ

১. আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়তের উপর ঈমান, তা সত্য হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস, তা অনুসরণ করার একনিষ্ঠ সংকল্প, তার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার খায়েশ না

থাকা এবং উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও মূল্যবোধ অন্য কোনো উৎস থেকে গ্রহণ করার পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়া থেকে গ্রহণ করা।

২. আরবী ভাষা, তার ব্যাকরণ ও সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। কেননা কুরআন এই ভাষায় নাযিল হয়েছে এবং সুন্নাহ্‌কে জানার উপকরণও এই ভাষার মধ্যেই রয়েছে।

৩. কুরআন ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞান- যার মাধ্যমে ব্যক্তি শুধু আনুসংগিক নির্দেশ এবং তার প্রয়োগস্থান সম্পর্কেই অবহিত হবেনা বরং শরীয়াতের মূলনীতি এবং তার উদ্দেশ্যসমূহও ভালোভাবে হৃদয়ংগম করবে। তাকে একদিকে জানতে হবে যে, মানব জীবনের সংশোধন ও সংস্কারের জন্য শরীয়তের সামগ্রিক পরিকল্পনা কি এবং অন্যদিকে জানতে হবে যে, এই সামগ্রিক পরিকল্পনায় জীবনের প্রতিটি বিভাগের মর্যাদা কি, শরীয়ত তার গঠন কোন্ কাঠামোয় করতে চায় এবং তা গঠনে তার সামনে কি কল্যাণ রয়েছে? অন্য কথায় বলা যায়, ইজতিহাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্‌র এমন জ্ঞান দরকার যা শরীয়তের মূলে পৌঁছে যায়।

৪. উম্মতের পূর্ববর্তী মুজতাহিদদের অবদান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। ইজতিহাদের প্রশিক্ষণের জন্যই শুধু এর প্রয়োজন নয় বরং আইনগত বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যও প্রয়োজন। ইজতিহাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই এই নয় এবং এই হওয়াও উচিত নয় যে, প্রতিটি উত্তরসূরী [Generation] পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া নির্মাণ কাঠামো ধ্বংস করে দিয়ে অথবা পরিত্যক্ত ঘোষণা করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মাণ শুরু করবে।

৫. বাস্তব জীবনের অবস্থা, পরিস্থিতি ও সমস্যা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান।। কেননা এগুলোর উপরেই শরীয়াতের নির্দেশ ও মূলনীতি প্রযোজ্য হবে।

৬. ইসলামী নৈতিকতার মানদন্ড অনুযায়ী উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। কেননা তাছাড়া কারো ইজতিহাদ জনগণের কাছে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য গণ্য হতে পারেনা। চরিত্রহীন লোকের ইজতিহাদের মাধ্যমে যে আইন রচিত হয় তার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হতে পারেনা।

এসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, প্রত্যেক ইজতিহাদকারীকে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে, তার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে। বরং এর উদ্দেশ্য কেবল একথা প্রকাশ করা যে, ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশ যদি সঠিক কাঠামোর উপর হতে হয়, তাহলে তা কেবল সেই অবস্থায়ই হতে পারে যখন আইনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আলেম তৈরী করতে পারে। এছাড়া যে আইন প্রণয়ন করা হবে তা ইসলামী আইন ব্যবস্থার মধ্যে নিজের স্থানও করে নিতে পারবেনা এবং মুসলিম সমাজও তা একটি উপাদেয় খাদ্য হিসেবে হজম করতে পারবেনা।

ইজতিহাদের সঠিক পন্থা

ইজতিহাদ এবং তার ভিত্তিতে প্রণীতব্য আইন গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারটি যেভাবে ইজতিহাদকারীর যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল অনুরূপভাবে এই ইজতিহাদ সঠিক পন্থায় হওয়ার উপরও নির্ভরশীল। মুজতাহিদ চাই আইনের ব্যাখ্যা দান করুক অথবা কিয়াস ও ইস্তিম্বাত করুক অবশ্যই তাকে নিজের যুক্তির ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাতের উপর রাখতে হবে। বরং বৈধ কাজ [মুবাহ] সমূহের আওতায় স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করতে গিয়েও তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্ বাস্তবিকপক্ষেই অমুক ব্যাপারে কোনো নির্দেশ অথবা মূলনীতি নির্ধারণ করেনি এবং কিয়াসের জন্যও কোনো ভিত্তি সরবরাহ করেনি। অতপর কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে যে প্রমাণ পেশ করা হবে তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞ আলেমদের স্বীকৃত পন্থায় হতে হবে। কুরআন থেকে প্রমাণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো আয়াতের এমন অর্থই গ্রহণ করতে হবে, আরবী ভাষার অভিধান, ব্যাকরণ এবং প্রচলিত ব্যবহারে যেরূপ অর্থ করার সুযোগ রয়েছে। এই অর্থ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাক্যের পূর্বাপরের সাথে মিল থাকতে হবে, একই বিষয়ে কুরআনের অন্যান্য বর্ণনার সাথে তা সংঘর্ষপূর্ণ হবেনা এবং সুন্নাতের মৌখিক অথবা বাস্তব ব্যাখ্যায় তার সমর্থন বর্তমান থাকতে হবে অথবা অন্ততঃপক্ষে সুন্নাহ্ এই অর্থের বিরোধী হবেনা। সুন্নাহ্ থেকে দলীল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ভাষা এবং তার ব্যাকরণ ও পূর্বাপরের দিকে লক্ষ্য রাখার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, যেসব রিওয়ায়াত থেকে কোনো বিষয়ের সমর্থন বা প্রমাণ গ্রহণ করা হচ্ছে তা ইলমে উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য হতে হবে, এই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীসও দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে এবং কোনো একটি হাদীস থেকে এমন কোনো সিদ্ধান্ত বের করা যাবেনা, যা নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত অন্যান্য হাদীসের পরপন্থী।

এসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রেখে পছন্দসই ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে ইজতিহাদ করা হবে, তাকে যদি শক্তিবলে আইনের মর্যাদা দেয়াও হয়, তবে মুসলমানদের সামগ্রিক বিবেক তা গ্রহণ করতে পারেনা। আর তা বাস্তবে ইসলামী আইন ব্যবস্থার অংশও হতে পারেনা। যে রাজনৈতিক শক্তি তা কার্যকর করবে তাদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সাথে সাথে এই আইনও আবর্জনার পাত্রে নিক্ষিপ্ত হবে।

ইজতিহাদ কিভাবে আইনের মর্যাদা লাভ করে

কোনো ইজতিহদের আইনের মর্যাদা লাভ করার ব্যাপারে ইসলামী আইন ব্যবস্থায় বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। যেমন ঃ

১. এর উপর গোটা উম্মাহ্র বিশেষজ্ঞ আলেমগণের ইজমা হওয়া।
২. কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার ইজতিহাদ সাধারণভাবে গৃহীত হওয়া এবং লোকের নিজ থেকেই তা অনুসরণ করতে শুরু করা। যেমন হানাফী, শাফিঈ, মালিকী এবং হাম্বলী ফিকাহকে মুসলমানদের বিরাট বিরাট জনসমষ্টি ও জনপদ আইন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।

৩. কোনো ইজতিহাদকে কোনো মুসলিম সরকার কর্তৃক আইন হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া। যেমন তুর্কী উসমানী রাজত্ব এবং ভারতের মোগল রাজত্ব হানাফী ফিকাহকে নিজেদের রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে গ্রহণ করেছিলো।

৪. রাষ্ট্রের অধীনে কোনো সংস্থার সাংবিধানিক মর্যাদাবলে আইন প্রণয়নের অধিকার লাভ করা এবং তাদের ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো আইন প্রণয়ন করা।

এসব পন্থা ছাড়া বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ আলেম যেসব ইজতিহাদ করে থাকেন তার মর্যাদা ফতোয়ার অধিক নয়। এখন থাকলো কাযীদের [ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারক] সিদ্ধান্ত । তা ঐসব বিশেষ মোকাদ্দমায় তো অবশ্যই আইন হিসেবে প্রযোজ্য হয় যেসব মামলায় ঐ সিদ্ধান্ত কোনো আদালত করেছে। এগুলো কোর্টের নযীর হিসেবেও মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। কিন্তু সার্বিক অর্থে তা আইন নয়। এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীন কাযী হিসেবে যেসব ফায়সালা করেছেন তাও ইসলামে আইন হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। ইসলামী আইন ব্যবস্থায় কাযীদের প্রণীত আইনের [Judge Made Law] কোনো ধারণা বর্তমান নেই। [তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী ১৯৫৮]

১. জনৈক হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীর অভিযোগ ও তার জবাব

ইসলামে আইন প্রণয়ন ও ইজতিহাদের বিষয় সম্পর্কিত আমার প্রবন্ধের উপর যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, আমি এখানে অতি সংক্ষেপে তার জবাব দেয়ার চেষ্টা করবো।

কুরআনের সাথে সুন্নাতের যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, প্রথম প্রশ্ন তার উপর উত্থাপন করা হয়েছে। এর জবাবে ক্রমিক ধারা অনুযায়ী আমি কয়েকটি কথা বলবো যাতে বিষয়টি আপনাদের সামনে পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে যায়।

১. এটা এমন এক ঐতিহাসিক সত্য যা কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায়না যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবূয়্যতের পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে শুধু কুরআন পৌঁছে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি, বরং একটি ব্যাপক আন্দোলনের নেতৃত্বও দিয়েছেন। এর ফলশ্রুতিতেই একটি মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন হয়, সভ্যতা সংস্কৃতির এক নতুন ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে এবং একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম হয়। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, কুরআন পৌঁছে দেয়া ছাড়াও এসব কাজ যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন- তা শেষ পর্যন্ত কি হিসেবে করেছেন? এসব কাজ কি নবীর কাজ হিসেবে সম্পাদিত হয়েছিলো যার মধ্যে তিনি আল্লাহ্র মর্জীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন- যেমনটি কুরআন আল্লাহ্র মর্জীর প্রতিনিধিত্ব করছে? নাকি তাঁর নবূয়্যতী মর্যাদা কুরআন শুনিয়ে দেয়ার পর শেষ হয়ে যেতো এবং এরপর তিনি সাধারণ মুসলমানদের মতো শুধু একজন মুসলমান হিসেবে থেকে যেতেন, যার কথা ও কাজ নিজের মধ্যে কোনো আইনের সনদ ও দলীলের মর্যাদা রাখতোনা? যদি প্রথম কথাটি মেনে নেয়া হয় তাহলে সুন্নাহ্কে কুরআনের সাথে আইনের উৎস ও দলীল হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য দ্বিতীয় অবস্থায় সুন্নাহ্কে আইনের মর্যাদা দেয়ার কোনো কারণ থাকতে পারেনা।

২. কুরআনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল পত্রবাহক ছিলেননা বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিযুক্ত করা প্রথপ্রদর্শক, আইন প্রণেতা এবং শিক্ষকও ছিলেন, যাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য

১. ১৯৫৮ সালের ৩ জানুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সেমিনারে পূর্বোক্ত প্রবন্ধ পাঠের পর জনৈক মুনকিরে হাদীস [হাদীস প্রত্যাখ্যানকারী] উঠে দাঁড়িয়ে তার উপর কতিপয় অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। ঐ মজলিসেই প্রবন্ধকারের পক্ষ থেকে এ জবাব দেয়া হয়।

বাধ্যতামূলক ছিলো এবং যাঁর জীবনকে সমগ্র ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নমুনা হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছিলো। বুদ্ধিবিবেক সম্পর্কে যতোদূর বলা যায়, তা একথা মেনে নিতে অস্বীকার করে যে, একজন নবী কেবল আল্লাহ্‌র কালাম পড়ে শুনিয়ে দেয়া পর্যন্ত তো নবী থাকবেন, কিন্তু এরপর তিনি একজন সাধারণ ব্যক্তি মাত্র রয়ে যাবেন। মুসলমানদের সম্পর্কে যতোদূর বলা যায়, তারা ইসলামের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিটি যুগে এবং গোটা দুনিয়ায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ, তাঁর অনুসরণ অপরিহার্য এবং তাঁর আদেশ নিষেধের আনুগত্যকে বাধ্যতামূলক বলে স্বীকার করে আসছে। এমনকি কোনো অমুসলিম পন্ডিতও এই বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার করতে পারেনা যে, মুসলমানরা সব সময় তাঁর এই মর্যাদা স্বীকার করে আসছে এবং এরই ভিত্তিতে ইসলামের আইন ব্যবস্থায় সুন্নাহ্‌কে কুরআনের সাথে আইনের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে।

এখন আমি জানিনা, কোনো ব্যক্তি সুন্নাতের এই আইনগত মর্যাদা কিভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পরিষ্কারভাবে না বলে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু কুরআন পড়ে শুনিয়ে দেয়া পর্যন্ত নবী ছিলেন এবং একাজ সম্পন্ন করার সাথে সাথে তাঁর নবূয়্যতী মর্যাদা শেষ হয়ে গেছে? অনন্তর সে যদি এরূপ দাবী করেও তাহলে তাকে বলতে হবে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ধরনের মর্যাদা সে নিজেই দিচ্ছে না কুরআন তাঁকে এই ধরনের মর্যাদা দিয়েছে? প্রথম ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে তাঁর দাবীর কথার কোনো সম্পর্ক নেই এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাকে কুরআন থেকে তার দাবীর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে।

৩. সুন্নাহ্‌কে স্বয়ং আইনের একটি উৎস হিসেবে মেনে নেয়ার পর এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তা জানার উপায় কি? আমি এর জবাবে বলতে চাই, আজ চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে যাবার পর এই প্রথম বারের মতো আমরা এ প্রশ্নের সম্মুখীন হইনি যে, দেড় হাজার বছর পূর্বে যে নবূয়্যতের আবির্ভাব হয়েছিলো তা কি সুন্নাহ্ রেখে গেছে? দুটি ঐতিহাসিক সত্য কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায়না ঃ

এক ঃ কুরআনের শিক্ষা এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপর যে সমাজ ইসলামের সূচনার প্রথম দিন কায়েম হয়েছিলো, তা সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত অবিরত জীবন্ত রয়েছে, তার জীবনে একটি দিনেরও বিচ্ছিন্নতা ঘটেনি এবং তার সমস্ত বিভাগ ও সংস্থা এই পুরা সময়ে উপর্যুপরি কাজ করে আসছে। আজ সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে আকীদা বিশ্বাস, চিন্তাপদ্ধতি, চরিত্র নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ইবাদত ও মুয়ামালাত, জীবন পদ্ধতি এবং জীবন পন্থার দিক থেকে যে গভীর সামঞ্জস্য বিরাজ করছে, যার মধ্যে মতভেদের উপাদানের চাইতে ঐক্যের উপাদান অধিক পরিমাণে বর্তমান রয়েছে, যা তাদেরকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও একটি উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত রাখার সবচেয়ে বড় বুনিয়াদ। কারণ- এগুলোই একথার পরিষ্কার প্রমাণ যে, এ সমাজকে কোনো একটি সুন্নাতের উপরই কায়েম করা হয়েছিলো এবং সে সুন্নাত শতাব্দীর পর শতাব্দীর দীর্ঘতায় অবিরতভাবে জারী রয়েছে। এটা কোনো

হারানো জিনিস নয় যা অনুসন্ধান করার জন্য আমাদেরকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়াতে হবে।

দুই ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর থেকে প্রতিটি যুগে মুসলমানরা এটা জানার জন্য অবিরত চেষ্টা করতে থাকে যে, প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত সুন্নাত কি এবং নতুন কোনো জিনিস তাদের জীবন ব্যবস্থায় কোনো কৃত্রিম পন্থায় অনুপ্রবেশ করছে কিনা? সুন্নাত যেহেতু তাদের জন্য আইনের মর্যাদা রাখতো, এর ভিত্তিতে তাদের বিচারালয়সমূহে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো এবং তাদের ঘর থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্তকার ব্যবস্থা পরিচালিত হতো, এজন্য তারা এর তথ্যানুসন্ধানে বেপরোয়া ও নির্ভীক হতে পারেনা। এই অনুসন্ধানের উপায় এবং তার ফলাফলও ইসলামের প্রথম খিলাফতের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমরা বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে গেছি এবং কোনো বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই প্রতিটি জেনারেশনের অবদান সংরক্ষিত আছে।

এই দুটি সত্যকে যদি কোনো ব্যক্তি ভালোভাবে হৃদয়ংগম করে নেয় এবং সুন্নাতকে জানার উপায় ও মাধ্যমগুলো রীতিমতো অধ্যয়ন করে তাহলে সে কখনো এই সন্দেহের শিকার হতে পারেনা যে, এটা কোনো সমাধানের অযোগ্য গোলক ধাঁ ধাঁ, তারা যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

৪. সুন্নাতের অনুসন্ধান, পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিসন্দেহে অনেক মতবিরোধ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে। কিন্তু এরূপ মতবিরোধ কুরআনের অসংখ্য নির্দেশ ও বাণীর অর্থ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রেও হয়েছে এবং হতে পারে। এসব মতবিরোধ যদি কুরআনকে পরিত্যাগ করার জন্য দলীল হতে না পারে তাহলে সুন্নাত পরিত্যাগ করার জন্য এই মতবিরোধকে কিভাবে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে? এই মূলনীতি পূর্বেও মান্য করা হয়েছে এবং আজো তা না মেনে কোনো উপায় নেই যে, যে ব্যক্তিই কোনো নির্দেশকে কুরআনের নির্দেশ অথবা সুন্নাতের নির্দেশ বলে দাবী করবে তাকে নিজের একথার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে। তার কথা যদি বলিষ্ঠ হয় তাহলে উম্মাতের বিশেষজ্ঞ আলেমদের দ্বারা অথবা অন্ততপক্ষে তাদের কোনো বিরাট অংশের দ্বারা নিজের মতকে গ্রহণযোগ্য করিয়ে নেবে। আর যেকথা প্রমাণের দিক থেকে দুর্বল হবে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। এই সেই মূলনীতি যার ভিত্তিতে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী কোটি কোটি মুসলমান কোনো একটি ফিকাহ ভিত্তিক মাযহাবে সম্মিলিত হয়েছে এবং তাদের বিরাট বিরাট জনবসতি কুরআনী নির্দেশের কোনো ব্যাখ্যা এবং প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের কোনো সমষ্টির উপর নিজেদের সামগ্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেছে।

আমার প্রবন্ধের উপর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করা হয়েছে যে, আমার বক্তব্যে স্ববিরোধীতা রয়েছে। অর্থাৎ আমার এ বক্তব্য ঃ "কুরআন ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট এবং চূড়ান্ত নির্দেশসমূহের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার অধিকার কারো নেই।" প্রশ্নকারীর মতে আমার এই বক্তব্য আমার নিম্নোক্ত বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক ঃ "ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থা ও ঘটনার ক্ষেত্রে এই নির্দেশসমূহ থেকে সরে গিয়ে কাজ করার অবকাশ এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে তার প্রয়োগস্থান নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।" আমি বুঝতে

পারছিনা এর মধ্যে কি বৈপরিত্য অনুভব করা হয়েছে। একান্ত উপায়ান্তরহীন পরিস্থিতিতে সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম দুনিয়ার প্রতিটি আইনে রয়েছে। কুরআনেও এধরনের অনুমতির অনেক দৃষ্টান্ত মওজূদ রয়েছে। এই দৃষ্টান্তসমূহ থেকে ফিকাহবিদগণ সেই মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন যাকে অনুমতির সীমা ও তার প্রয়োগস্থান নির্ধারণ করার জন্য বিবেচনায় রাখতে হয়। যেমন ঃ

তৃতীয় প্রশ্ন সেসব লোকদের সম্পর্কে করা হয়েছে যারা এখানে নিজেদের প্রবন্ধসমূহে ইজতিহাদের কতিপয় শর্ত বর্ণনা করেছেন। আমিও যেহেতু তাদের মধ্যে একজন, তাই এর জবাব দেয়ার দায়িত্ব আমারও রয়েছে। আমি আবেদন করবো, অনুগ্রহপূর্বক আর একবার আমার বর্ণনাকৃত শর্তগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। অতপর বলুন, আপনি এর মধ্যকার কোন্ শর্তটি বাদ দিতে চান। এই শর্তটি কি, ইজতিহাদকারীদের মধ্যে শরীয়তকে অনুসরণ করার একনিষ্ঠ ইচ্ছা থাকতে হবে এবং তারা এর সীমা লংঘন করার খাহেশমান্দ হবেননা? নাকি এই শর্তটি যে, তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাতের ভাষা অর্থাৎ আরবী ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে? নাকি এই শর্তটি, তাদেরকে অন্তত কুরআন ও সুন্নাত এই পরিমাণ অধ্যয়ন করতে হবে যাতে তারা শরীয়তের ব্যবস্থা ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়? অথবা পূর্বেকার মুজতাহিদদের কৃত কাজের উপরও তাদের দৃষ্টি থাকতে হবে-এই শর্তটি? অথবা তাদের চলমান বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে-এই শর্তটি? অথবা তারা দুশ্চরিত্র এবং ইসলামের নৈতিক মানদন্ড থেকে নীচে অবস্থান করবেননা-এই শর্তটি?

এসব শর্তের যেটিকে আপনি অপ্রয়োজনীয় মনে করেন তা চিহ্নিত করে দিন। একথা বলা যে, গোটা ইসলামী দুনিয়ায় দশ বারজনের অধিক এমন লোক পাওয়া যাবেনা, যারা এই শর্তের মানদন্ডে উৎরে যেতে পারে- আমার মতে দুনিয়াব্যাপী মুসলমানদের সম্পর্কে এটা অত্যন্ত জঘন্য মন্তব্য। খুব সম্ভব আজ পর্যন্ত আমাদের বিরোধীরাও আমাদেরকে এতোটা পতিত মনে করেনি যে, চল্লিশ পঞ্চাশ কোটি মুসলমানের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিত্বের সংখ্যা দশ বারজনের অধিক হবেনা। তদুপরি আপনি যদি ইজতিহাদের দরজা পন্ডিত মূর্খ নির্বিশেষে সবার জন্য খুলে দিতে চান তাহলে আনন্দের সাথে খুলে দিন। কিন্তু আমাকে বলুন দুশ্চরিত্র, জ্ঞানহীন এবং অসৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন লোকেরা যে ইজতিহাদ করবে তাকে আপনি কিভাবে মুসলিম জনতার কন্ঠনালীর নীচে নামাবেন? [তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী ১৯৫৮]

৩. আইন প্রণয়ন, শূরা [পরামর্শ পরিষদ] ও ইজমা

ইসলামী আইন প্রবর্তনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী আইন প্রণয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন রকম মত প্রকাশ করা হচ্ছে। এই প্রসংগে এক বন্ধু নিজের মনের জটিলতা দূর করার উদ্দেশ্যে লিখেছেন ঃ

"ইসলামে আইন প্রণয়নের যথার্থতা ও প্রকৃতি এবং তার কর্মপরিসর নির্ধারণে অনেক বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। একদিকে বলা হচ্ছে, ইসলামে আইন প্রণয়নের মূলত কোনো অবকাশই নেই। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল আইন প্রণয়ন করে দিয়েছেন। মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে তদনুযায়ী কাজ করা এবং তা কার্যকর করা। অপরদিকে কতিপয় লোকের মতে বর্তমানে আইন প্রণয়নের পরিসর এতোটা প্রশস্ত হয়ে যাচ্ছে যে, মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের এই অধিকার দেয়া হয়েছে যে, তারা ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত বিস্তারিত নিয়ম কানুনে পরিবর্তন ও সংকোচন করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা নামায এবং রোযার বাহ্যিক কাঠামোর মধ্যে সংকোচন ও সংযোজন করতে পারেন।

অনুগ্রহপূর্বক বিস্তারিতভাবে বলে দিন যে, ইসলামে আইন প্রণয়নের সীমা এবং তার বিভিন্ন পর্যায় কি কি? তাছাড়া একথাও পরিষ্কারভাবে বলে দিন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের ব্যক্তিগত এবং শূরাভিত্তিক সিদ্ধান্ত ও ফিকাহের ইমাম ও মুজতাহিদদের রায়ের আইনগত মর্যাদা কি? এই সাথে যদি শূরা [পরামর্শ পরিষদ] এবং ইজমার [ঐক্যমত] তাৎপর্যের উপর কিছুটা আলোকপাত করা হয় তাহলে ভালোই হয়।"

১. জবাব ঃ আইন প্রণয়নের বুনিয়াদী মূলনীতি

ইসলামে ইবাদতের পরিমন্ডলে চূড়ান্তভাবেই আইন প্রণয়নের কোনো অবকাশ নেই। অবশ্য ইবাদত ছাড়া নির্বাহী কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে কেবল সেখানেই আইন প্রণয়নের অবকাশ রয়েছে যেখানে কুরআন ও সুন্নাহ্ নীরবতা অবলম্বন করেছে। ইসলামে আইন প্রণয়নের ভিত্তি হচ্ছে এই মূলনীতি যে, "ইবাদতের ক্ষেত্রে কেবল সে কাজ করো যা বলে দেয়া হয়েছে এবং নিজের পক্ষ থেকে ইবাদতের কোনো নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করোনা। আর মুয়ামালাতের নির্বাহী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার আনুগত্য করো, যা থেকে বিরত রাখা হয়েছে- তা করা থেকে বিরত থাকো এবং যে জিনিস সম্পর্কে শরীয়া প্রণেতা [আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল] নীরব থেকেছেন সে ক্ষেত্রে

তোমরা নিজেদের সঠিক দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী কাজ করার জন্য স্বাধীন।" ইমাম শাতিবী [রহঃ] তাঁর 'আল-ই'তিসাম' গ্রন্থে উল্লেখিত মূলনীতিটি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

> "ইবাদতের নির্দেশ অভ্যাসের নির্দেশ থেকে ভিন্নতর। অভ্যাসের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে এই যে, যে জিনিস সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, তাতে যেনো নিজের সঠিক দৃষ্টিকোণের উপর কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে ইবাদতের ক্ষেত্রে এমন কোনো কথা ইস্তিম্বাতের [কারণ দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ] মাধ্যমে বের করা যায়না যার মূল শরীয়াতে বর্তমান নেই। কেননা ইবাদতের কাঠামো পরিষ্কার নির্দেশ এবং পরিষ্কার অনুমতির সম্পর্ক দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে, অভ্যাসের ক্ষেত্রে তদ্রূপ নয়। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, অভ্যাসের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে আমাদের জ্ঞান সঠিক পথ জেনে নিতে পারে এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের জ্ঞানের সাহায্যে এটা জানতে পারিনা যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের পথ কোন্‌টি।" [২য় খন্ড, পৃঃ ১১৫]

২. আইন প্রণয়নের চারটি বিভাগ

মুয়ামালাত বা আদান প্রদান ও নির্বাহী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের চারটি বিভাগ রয়েছে ঃ

১. ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ অর্থাৎ যেসব ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতা আদেশ অথবা নিষেধের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন সে সম্পর্কে নসের [কুরআনের আয়াত] অর্থ অথবা তার উদ্দেশ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

২. কিয়াস ঃ অর্থাৎ যেসব ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতার সরাসরি কোনো নির্দেশ বর্তমান নেই, কিন্তু যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাপারের নির্দেশ বর্তমান আছে। এর মধ্যে নির্দেশের কারণ নির্ধারণ করে এই নির্দেশকে এই ভিত্তির উপর জারী করা যে, এখানেও ঐ একই কারণ পাওয়া যায়- যার ভিত্তিতে ঐ নির্দেশ তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্রে দেয়া হয়েছিলো।

৩. ইস্তিম্বাত ও ইজতিহাদ ঃ অর্থাৎ শরীয়তের বর্ণিত ব্যাপক মূলনীতিকে প্রাসংগিক মাসয়ালা ও বিষয়ের অনুকূল করা এবং নসসমূহের ইংগিত, লক্ষণ ও দাবীকে উপলব্ধি করে বুঝে নেয়া যে, শরীয়ত প্রণেতা আমাদের জীবনের ব্যাপারসমূহকে কোন্ আকারে ঢেলে সাজাতে চান।

৪. যেসব ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতা কোনো পথ নির্দেশ দেননি সেসব ক্ষেত্রে ইসলামের ব্যাপক উদ্দেশ্য ও সার্বিক স্বার্থ সামনে রেখে এমন আইন প্রণয়ন করা, যা প্রয়োজনও পূরণ করবে এবং সাথে সাথে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থার প্রাণসত্ত্বা ও মেজাজ প্রকৃতির পরিপন্থীও হবেনা। ফিকাহবিদগণ এই জিনিসকে 'মাসালিহে মুরসালা' ও 'ইস্তিহসান' ইত্যাদি নামকরণ করেছেন। মাসালিহে মুরসালার অর্থ হচ্ছে, সেই সার্বিক কল্যাণকর জিনিস যা আমাদের সঠিক দৃষ্টিভংগির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আর ইস্তিহসানের অর্থ হচ্ছে কোনো একটি ব্যাপারে কিয়াস প্রকাশ্যত একটি হুকুম আরোপ করে, কিন্তু দীনের মহান স্বার্থে অন্যরূপ নির্দেশের দাবী করে। এজন্য প্রথম নির্দেশের পরিবর্তে দ্বিতীয় নির্দেশকে অগ্রাধিকার দিয়ে তা কার্যকর করা হয়।

৩. মাসালিহে মুরসালা ও ইস্তিহসান

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, কিয়াস ও ইস্তিম্বাতের জন্য তো অধিক আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্য মাসালিহে মুরসালা ও ইস্তিহসানের উপর আরো কিছু আলোকপাত করবো। ইমাম শাতিবী (রহঃ) তাঁর 'আল ই'তিসাম' গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন এবং এসম্পর্কে এতো মূল্যবান আলোচনা করেছেন যে, এর চেয়ে ভালো আলোচনা উসূলে ফিক্‌হের কোনো কিতাবে দৃষ্টিগোচর হয়নি। এতে তিনি বিস্তারিত দলীলের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, মাসালিহে মুরসালার অর্থ আইন প্রণয়নের অবাধ অনুমতি নয়, যেমন কতিপয় লোক মনে করে থাকে। বরং এর জন্য তিনটি অপরিহার্য শর্ত রয়েছে ঃ

এক ঃ এই পন্থায় যে আইন প্রণয়ন করা হবে তা শরীয়তের উদ্দেশ্যর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, তার পরিপন্থী হতে পারবেনা।

দুই ঃ যখন তা জনগণের সামনে পেশ করা হবে, সাধারণ জ্ঞানের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

তিন ঃ তা কোনো প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অথবা কোনো প্রকৃত অসুবিধা দূর করার জন্য হতে হবে। [আল-ই'তিসাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১০-১১৪]

অতপর তিনি ইস্তিহসান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, প্রকাশ্যত কোনো দলীলের ভিত্তিতে যদি কিয়াসের দাবী এই হয় যে, একটি ব্যাপারে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া প্রয়োজন, কিন্তু ফিক্‌হের দৃষ্টিতে এই নির্দেশ সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী, অথবা এর দ্বারা এমন কোনো ক্ষতি বা ত্রুটি সংঘটিত হতে পারে যা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দূর করার যোগ্য, অথবা তা উরফের [প্রচলিত রীতি] পরিপন্থী- তখন এটাকে পরিত্যাগ করে ভিন্নতর নির্দেশ দান হচ্ছে ইহসান। অবশ্য ইস্তিহসানের জন্য শর্ত হচ্ছে এই যে, প্রকাশ্য কিয়াসকে পরিত্যাগ করে কিয়াসের পরিপন্থী নির্দেশ দানের জন্য কোনো শক্তিশালী কারণ বর্তমান থাকতে হবে যাকে যুক্তিসংগত দলীল সহকারে বিবেচনাযোগ্য প্রমাণ করা যেতে পারে। [আল-ই'তিসাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৮-১৯]

৪. আদালতের সিদ্ধান্ত এবং রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যেকার পার্থক্য

এই চারটি বিভাগ সম্পর্কে কোনো মুজতাহিদ অথবা ইমামের ব্যক্তিগত রায় এবং পর্যালোচনা একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ রায় এবং পর্যালোচনা তো হতে পারে, যার ওজন রায়দাতার বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিত্বের ওজন অনুযায়ী-ই হবে। কিন্তু তথাপি তা আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারেনা। আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের আরবাবে হল ওয়াল আকদের [সিদ্ধান্ত এবং সমাধান পেশ করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের] পরামর্শ পরিষদ থাকবে এবং তারা নিজেদের ইজমা অথবা অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে একটি ব্যাখ্যা, একটি কিয়াস, একটি ইস্তিম্বাত ও ইজতিহাদ অথবা একটি ইস্তিহসান ও মুসলিহাতে মুরসালাকে গ্রহণ করে তাকে আইনের রূপ দেবেন। খিলাফতে রাশেদার আমলে আইন প্রণয়নের জন্য এই ব্যবস্থাই ছিলো। আমি আমার "ইসলামী দস্তুর কী তাদবীন" [ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন] পুস্তিকায় এর ব্যাখ্যা করেছি।

অতএব এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।[১] এখানে আমি মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করবো। তা থেকেই অনুমান করা যাবে যে, খিলাফতে রাশেদার যুগে জাতীয় প্রয়োজন দেখা দিলে কিভাবে আইন প্রণয়ন করা হতো এবং সে যুগে আইন ও আদালতের ফায়সালাসমূহের মধ্যে কি পার্থক্য ছিলো।

কতিপয় দৃষ্টান্ত

১. মদ সম্পর্কে কুরআন মজীদে কেবল হারাম হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এই অপরাধের জন্য শাস্তির কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এজন্য কোনো নির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণ করা হয়নি বরং তিনি যাকে যেরূপ শাস্তি প্রদান উপযুক্ত মনে করতেন তা দিতেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজেদের যুগে চল্লিশটি বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্ধারণ করেন, কিন্তু এ জন্য রীতিমতো কোনো আইন প্রণয়ন করেননি। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যুগে যখন শরাব পানের অভিযোগ বৃদ্ধি পেতে লাগলো, তখন তিনি সাহাবাদের পরামর্শ পরিষদে বিষয়টি উত্থাপন করেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রস্তাব দিলেন যে, এজন্য আশি বেত্রদন্ডের ব্যবস্থা করা হোক। পরামর্শ পরিষদ তাঁর সাথে একমত হলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য ইজমা সহকারে এই আইন প্রণয়ন করেন। [আল-ই'তিসাম, ২য় খন্ড, পৃ ঃ ১০১]

২. খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এই আইনও প্রণয়ন করা হলো যে, কারিগর বা শিল্পীদের যদি কোনো জিনিস তৈরী করতে দেয়া হয় [সেলাই করার জন্য কাপড়, অথবা অলংকার বানানোর জন্য সোনা] এবং তা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে এর মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। এই সিদ্ধান্তও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিম্নোক্ত ভাষণের ভিত্তিতে হয়েছে যে, কারিগরদের যদিও এই অবস্থায় বাহ্যত দোষী সাব্যস্ত করা যায়না, যখন তা তার অবহেলার কারণে ধ্বংস না হয়ে থাকে, কিন্তু যদি এরূপ না করা হয় তাহলে জিনিসপত্রের হিফাজতের ক্ষেত্রে শিল্পীদের অবহেলা প্রদর্শনের আশংকা রয়েছে। এজন্য সামগ্রিক স্বার্থের দাবী হচ্ছে এই যে, তাদেরকে এই জিনিসের জামানতদার সাব্যস্ত করা হবে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তও ইজমার সাহায্যে হয়েছে। [ই'তিসাম, ২য় খন্ড, পৃ ঃ ১০২]

৩. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এক ব্যক্তির হত্যাকান্ডে যদি একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকে তাহলে সবার উপর কিসাসের দন্ড কার্যকর হবে। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফিঈ [রহ ঃ] এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেন, কিন্তু এটাকে আইন হিসেবে মেনে নেয়া হয়নি। কেননা এটি একটি আদালতী ফায়সালা ছিলো, পরামর্শ পরিষদে ইজমার মাধ্যমে অথবা অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে আইন হিসেবে বানানো হয়নি। [ই'তিসাম, ২য় খন্ড, পৃ ঃ ১০৭]

---

১. উক্ত পুস্তিকাটি এগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৪. নিখোজ ব্যক্তির স্ত্রী যদি আদালতের অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় বিবাহ করে নেয়, অতপর তার পূর্বতন স্বামী ফিরে আসে, তাহলে তাকে কি প্রথম স্বামী পাবে না সে দ্বিতীয় স্বামীর কাছে থাকবে? এই প্রসংগে খোলাফায়ে রাশেদীন বিভিন্নরূপ ফায়সালা করেন। কিন্তু কোনো ফায়সালাই আইনের মর্যাদা লাভ করেনি। কেননা এই প্রসংগটিকে পরামর্শ পরিষদে পেশ করে ইজমা অথবা অধিকাংশের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কোনো ফায়সালায় পরিণত করা হয়নি। [ই'তিসাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ১২৬]

উপরে উল্লেখিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ আইনে আদালতের সিদ্ধান্তের যে মর্যাদা রয়েছে, ইসলামে আদালতের সিদ্ধান্তের সে মর্যাদা নেই। বৃটিশ আইনের বিচারকদের সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্তসমূহ আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারে কিন্তু ইসলামে যদিও কোনো বিচারকের ফায়সালা অবশ্যই কার্যকর হবে, যা তিনি কোনো মামলায় নসের একটি ব্যাখ্যা গ্রহণ করে, অথবা নিজের কিয়াস অথবা ইজতিহাদের ভিত্তিতে করে থাকবেন, কিন্তু তা একটি স্বতন্ত্র আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারেনা। বরং একই বিচারক একটি মামলায় একটি ফায়সালা দেয়ার পর সব সময়ের জন্য নিজের এই ফায়সালা অনুসরণ করা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এরপরও তিনি উল্লেখিত মামলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য মামলায় ভিন্নরূপ ফায়সালা করতে পারেন- যদি তার সামনে পূর্বেকার ফায়সালার ত্রুটি পরিষ্কার হয়ে যায়।

খিলাফতে রাশেদার পর যখন পরামর্শ পরিষদ ব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে যায়, তখন মুজতাহিদ ইমামগণ ফিক্হের যে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন- তা আধা আইনের মর্যাদা এজন্য লাভ করে যে, কোনো এলাকার অধিবাসীদের সর্বাধিক সংখ্যক লোক কোনো এক ইমামের ফিকাহ গ্রহণ করে নেয়। যেমন ইরাক ইমাম আবু হানীফার ফিকাহ, স্পেনে ইমাম মালেকের ফিকাহ, মিসরে ইমাম শাফিঈর ফিকাহ ইত্যাদি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু এই ব্যাপক গ্রহণ কোথাও কোনো ফিকাহকে সঠিক অর্থে আইনে পরিণত করেনি। যেখানেই তা আইনে পরিণত হয় তা এই ভিত্তিতে যে, দেশের সরকার তাকে আইন হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে।

ইজমার সংজ্ঞা

ইজমার সংজ্ঞা নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ [রহঃ]-এর মতে, "কোনো মাসয়ালার ক্ষেত্রে সমস্ত বিশেষজ্ঞ আলেমের ঐক্যমত এবং এর পরিপন্থী কোনো মত বর্তমান না থাকলে তাকে ইজমা বলে।" ইবনে জারীর তাবারী [রহঃ] এবং আবু বাক্র আল-রাযী [রহঃ]-এর পরিভাষায় অধিকাংশের মতকেও ইজমা বলে। ইমাম আহমদ [রহঃ] যখন কোনো মাসয়ালার ক্ষেত্রে একথা বলেন যে, "আমাদের জানা মতে এর পরিপন্থী কোনো মত নেই," তখন এর এই অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, তাঁর মতে এই মাসয়ালার উপর ইজমা হয়েছে।

ইজমা হুজ্জাত হওয়ার মর্যাদাটি সবার কাছে স্বীকৃত। অর্থাৎ নসের যে ব্যাখ্যার উপর, অথবা যে কিয়াস ও ইজতিহাদের উপর অথবা সামগ্রিক কল্যাণ সম্বলিত যে আইনের উপর উম্মাতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। ইজমার হুজ্জাত হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই, কিন্তু ইজমার প্রমাণ ও

প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্পর্কে মতবিভেদ আছে। খোলাফায়ে রাশেদীনে যুগ সম্পর্কে বলা হয়, এ যুগে যেহেতু ইসলামী সংগঠন ব্যবস্থা যথারীতি কায়েম ছিলো এবং পরামর্শ পরিষদের অধীনে তা পরিচালিত ছিলো, তাই সে সময়কার ইজমা ও অধিকাংশের ফায়সালা জ্ঞাত এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন সংগঠন ব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে গেলো এবং পরামর্শ পরিষদ ব্যবস্থাও বিলুপ্ত হয়ে গেলো তখন এটা জ্ঞাত হওয়ার কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকলোনা যে, বাস্তবিকপক্ষে কোন্ জিনিসের উপর ইজমা আছে আর কোন্ জিনিসের উপর নেই। এর কারণে খিলাফতে রাশেদার যুগের ইজমা তো স্বীকৃত এবং তা প্রত্যাখ্যান করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু পরবর্তী যুগের কোনো লোক যখন দাবী করে যে, অমুক মাসয়ালার উপর ইজমা হয়েছে, তখন বিশেষজ্ঞ আলেমগণ তার এ দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। এ কারণে আমাদের মতে, কোন্‌টির উপর ইজমা হয়েছে আর কোন্‌টির উপর হয়নি তা জানার জন্য ইসলামী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন।

ইমাম শাফিঈ [রহঃ] এবং ইমাম আহমদ [রহঃ] আদৌ ইজমার অস্তিত্বকে স্বীকার করতেননা বলে যে কথা সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, অথবা অন্য কোনো ইমাম ইজমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন- এসব কিছু উপরে উল্লেখিত কথা না বুঝার কারণেই হয়েছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যখন কোনো মাসয়ালার উপর আলোচনা করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি দাবী করে যে, সে যা কিছু বলছে তার উপর ইজমা রয়েছে- কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর কোনো প্রমাণ বর্তমান থাকতোনা-তখন এই লোকেরা উল্লেখিত দাবী মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। ইমাম শাফিঈ [রহঃ] তাঁর 'জিমাউল ইল্‌ম' গ্রন্থে এই বিষয়ের উপর ব্যাপক আলোচনা করে বলেছেন যে, ইসলামী বিশ্বের পরিধি বিস্তৃত হওয়া ও বিভিন্ন এলাকায় বিশেষজ্ঞ আলেমদের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া এবং সংগঠন ব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে যাবার পর এখন কোনো আংশিক বা আনুসংগিক মাসয়ালার ব্যাপারে আলেমদের মতামত কি তা জানাটা কঠিন হয়ে পড়েছে। এজন্য আনুসংগিক মাসয়ালার ক্ষেত্রে ইজমার দাবী করাটা মূলত ভুল। অবশ্য ইসলামের মূলনীতিসমূহ, তার রুকনসমূহ এবং বড় বড় মাসয়ালা সম্পর্কে এটা অবশ্যই বলা যায় যে, এর উপর ইজমা রয়েছে। যেমন নামাযের ওয়াক্ত পাঁচটি, অথবা রোযার সীমারেখা এই ইত্যাদি। একথাটিকে ইমাম ইবনে তাইমিয়া [রহঃ] এভাবে বলেছেন ঃ

> "ইজমার অর্থ হচ্ছে, কোনো মাসয়ালার উপর উম্মতের সমস্ত আলেমের একমত হয়ে যাওয়া। আর যখন কোনো মাসয়ালার উপর গোটা উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন কোনো ব্যক্তির তা থেকে বেরিয়ে আসার অধিকার থাকেনা। কেননা গোটা উম্মত কখনো গোমরাহীর উপর একমত হতে পারেনা। কিন্তু এমন অনেক মাসয়ালাও রয়েছে, যে সম্পর্কে কোনো কোনো লোকের ধারণা হচ্ছে যে, তার উপর ইজমা হয়েছে। কিন্তু মূলত তা হয়নি বরং কখনো কখনো ভিন্নমত অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে।" [ফতোয়া ইবনে তাইমিয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০৬]

উপরে উল্লেখিত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কোনো মাসয়ালার ক্ষেত্রে শরীয়াতের নসের কোনো ব্যাখ্যার উপর, অথবা কোনো কিয়াস বা ইস্তিম্বাতের

উপর, অথবা কোনো মাসালিহে মুরসালার উপর আজো যদি প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তিগণের ইজমা হয়ে যায়, অথবা অধিকাংশের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা হুজ্জাতের মর্যাদা লাভ করবে এবং আইনে পরিণত হবে। যদি গোটা বিশ্বের মুসলিম মনীষীগণ এই ধরনের মাসয়ালায় ঐক্যমত হয়ে যান, তাহলে সেটা গোটা দুনিয়ার জন্য আইনে পরিণত হবে। আর যদি কোনো একটি ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞগণ ঐক্যমত হন, তাহলে অন্ততপক্ষে ঐ রাষ্ট্রের জন্য তা আইনে পরিণত হবে। [তরজমানুল কুরআন, শা'বান ১৩৭৪; মে ১৯৯৫]

৪. ইসলামী ব্যবস্থায় বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিক পন্থা

তাফহীমুল কুরআনের পাঠকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে নিজের একটি জটিলতার কথা বর্ণনা করে লিখেছেন ঃ

কুরআন মজীদের আয়াত ঃ

"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র, আনুগত্য করো তাঁর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যেকার কর্তৃত্বের অধিকারী লোকদের। অতপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তবে তা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরেয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ্‌ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক থেকেও এটাই উত্তম।" [সূরা নিসা ঃ ৫৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আপনি তাফহীমুল কুরআনে লিখেছেন, "আলোচ্য আয়াতে যে কথা স্থায়ী এবং চূড়ান্ত মূলনীতির আকারে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তা এই যে, ইসলামী ব্যবস্থায় আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং রসূলের তরীকা মৌলিক আইন এবং সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সনদের মর্যাদা রাখে। মুসলমানদের মাঝে অথবা সরকার ও জনগণের মাঝে যে বিষয়কে নিয়েই বিতর্ক সৃষ্টি হবে, সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের জন্য কুরআন ও সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর এখানে যে ফায়সালা পাওয়া যাবে তার সামনে সবাই আত্মসমর্পণ করবে। এভাবে জীবনের যাবতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূলুল্লাহ্‌র সুন্নাতকে সনদ, প্রত্যাবর্তনস্থল এবং সর্বশেষ কথা হিসেবে মেনে নেয়া ইসলামী সমাজের এমন একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যা তাকে কুফরী জীবন ব্যবস্থা থেকে পৃথক করে দেয়।[১]

"আপনার এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে একথা পরিষ্কারভাবে সামনে এসে যায় যে, যাবতীয় বিতর্কিত বিষয়ে সর্বশেষ এবং সিদ্ধান্তকারী জিনিস হচ্ছে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ। এই প্রসংগে একটি জটিলতা হচ্ছে এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এটাতো সম্পূর্ণই সম্ভব ছিলো যে, যখনই কোনো মতবৈষম্য দেখা দিয়েছে সাথে সাথে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এখন যেহেতু তিনি আমাদের মাঝে বর্তমান নেই বরং শুধু তাঁর শিক্ষাই আমাদের সামনে উপস্থিত আছে, এ সময় যদি ইসলামের কোনো নির্দেশের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে একটি

---

১. তাফহীমুল কুরআন, ১ম খন্ড, সূরা নিসা, আয়াত ঃ ৫৯।

ইসলামী ব্যবস্থায় কোন্ ব্যক্তি বা সংস্থা এই বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার লাভ করবে যে, এ ব্যাপারে শরীয়াতের লক্ষ্য কি? আশা করি আপনি এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করে বাধিত করবেন।"

জবাব ঃ

বিরোধ দূরীকরণে কুরআনের তিনটি মৌলিক হিদায়াত

এই প্রশ্নে যে জটিলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা দূর করার জন্য কুরআন, সুন্নাহ্, সাহাবাদের যুগের কার্যাবলী একত্র হয়ে আমাদের সাহায্য করে। সর্বপ্রথম কুরআনকে দেখুন। তা এ ব্যাপারে তিনটি মৌলিক হিদায়াত দান করে ঃ

প্রথম হিদায়াত ঃ আহলে যিকিরের কাছে প্রত্যাবর্তন

"এই আহ্লুয যিক্র-এর কাছে জিজ্ঞেস করে দেখো, যদি তোমরা নিজেরা না জানো।" [সূরা নহল ঃ ৪৩; আম্বিয়া ঃ ৭]

এ আয়াতে "আহ্লুয যিক্র" শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। কুরআন মজীদের পরিভাষায় 'যিকির' শব্দটি বিশেষভাবে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল কোনো জাতিকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর যে লোকদের এই শিক্ষা দেয়া হয় তাদের বলা হয় 'আহ্লুয-যিক্র'। এই শব্দের অর্থ কেবল জ্ঞান [Knowledge] মনে করা যেতে পারেনা। বরং এর অর্থ অপরিহার্যরূপে কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞানই হতে পারে। অতএব এই আয়াত সিদ্ধান্ত দিচ্ছে যে, সমাজে প্রত্যাবর্তন স্থলের অধিকারী কেবল এমন লোকদের হওয়া উচিৎ, যারা আল্লাহ্র কিতাবের জ্ঞান রাখেন এবং যে পথে চলার জন্য আল্লাহ্র রসূল শিক্ষা দিয়েছেন সে সম্পর্কে যারা অবহিত।

দ্বিতীয় হিদায়াত ঃ কর্তৃত্বসম্পন্ন লোকদের কাছে প্রত্যাবর্তন

"আর যখনই তাদের সামনে শান্তিপূর্ণ অথবা ভীতিপ্রদ কোনো ব্যাপার এসে যায়, তখন এটাকে সর্বত্র প্রচার করে দেয়। অথচ তারা যদি এটাকে রসূল এবং নিজেদের কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকদের পর্যন্ত পৌঁছে দিতো, তাহলে যেসব লোক এর সঠিক ফলাফল বের করতে সক্ষম তারা এটা জানার সুযোগ পেতো।" [সূরা নিসা ঃ ৮৩]

এ থেকে জানা গেলো, সমাজ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হবে- চাই তা শান্তিপূর্ণ অবস্থার সাথেই সম্পর্কিত হোক, অথবা যুদ্ধকালীন অবস্থার সাথে, ভয়ংকর ধরনের হোক অথবা সাধারণ প্রকৃতির- তাতে কেবল মুসলমানদের কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকেরাই হতে পারেন প্রত্যাবর্তনস্থল, যাদের উপর সমাজের সামগ্রিক পরিচালনভার অর্পণ করা হয় এবং যারা ইস্তিম্বাত করার যোগ্যতা রাখেন। অর্থাৎ আগত সমস্যার প্রকৃতিও অনুধাবন করতে পারেন এবং আল্লাহ্র কিতাব ও আল্লাহ্র রসূলের তরীকার মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারেন যে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে কি করা উচিৎ। এই আয়াত সমষ্টিগত সমস্যা এবং সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে সাধারণ আহলে যিকিরদের পরিবর্তে কর্তৃত্বশীল লোকদের প্রত্যাবর্তনস্থল ঘোষণা করে। কিন্তু

তাদেরকেও অবশ্যই আহলে যিকিরদের মধ্যেকার ব্যক্তিই হতে হবে। কেননা তাদের সামনে যে সমস্যা এসেছে তাতে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর রসূলের দেয়া মৌখিক এবং কর্মগত হিদায়াতকে দৃষ্টির সামনে রেখে তারাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

তৃতীয় হিদায়াত ঃ শূরা বা পরামর্শ পরিষদ গঠন

তারা নিজেদের যাবতীয় সামগ্রিক ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে। [সূরা শূরা ঃ ৩৮]

এই আয়াত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, মুসলমানদের সমষ্টিগত ব্যাপারসমূহের সর্বশেষ ফায়সালা কিভাবে হওয়া উচিৎ?

এই তিনটি মূলনীতিকে যদি একত্র করে দেখা যায় তাহলে সমস্ত বিতর্কিত বিষয়ে "ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়ার রসূলি"র উদ্দেশ্য পূর্ণ করার বাস্তব পন্থা হচ্ছে এই যে, মানুষের জীবনে সাধারণত যেসব সমস্যা এসে থাকে তা তারা আহলুয যিকিরদের কাছে রুজু করবে এবং তারা তাদের বলে দেবেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের কি নির্দেশ রয়েছে। যেসব বিষয় রাষ্ট্র ও সমাজের দিক থেকে গুরুত্বের দাবীদার, তা কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকদের (উলিল আমর) সামনে পেশ করতে হবে। তারা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবেন যে, আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূলুল্লাহর সুন্নাতের আলোকে কোন্ জিনিস হক ও সত্যের অধিক কাছাকাছি?

নববী যুগে উল্লেখিত মূলনীতিসমূহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ

এখন দেখা যাক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্যাণময় যুগে এবং তাঁর পরে খিলাফতে রাশেদার যুগের কার্যপ্রণালী কিরূপ ছিলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবদ্দশায় যেসব বিষয় সরাসরি তাঁর কাছে পৌছতো, সেগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্য বর্ণনা এবং তদনুযায়ী বিতর্কিত বিষয়ে ফায়সালাকারী ছিলেন তিনি নিজেই। কিন্তু পরিষ্কার কথা হচ্ছে এই যে, গোটা ইসলামী রাষ্ট্রে ছড়িয়ে থাকা জনবসতি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতো তার সবই সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করা হতোনা এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছ থেকে সিদ্ধান্ত অর্জন করা হতোনা। এর পরিবর্তে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে তাঁর পক্ষ থেকে শিক্ষকগণ নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। তারা লোকদের আল্লাহ্‌র দীনের শিক্ষা দান করতেন। সাধারণ লোকেরা নিজেদের দৈনন্দিন ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে জেনে নিতো যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের নির্দেশ কি এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ তরীকা শিখিয়েছেন। তাছাড়া প্রতিটি এলাকায় গভর্ণর, কার্যনির্বাহী অফিসার এবং বিচারক নিযুক্ত থাকতো। তারা নিজ নিজ কর্মপরিসরে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান পেশ করতো। এই লোকদের জন্য 'ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়ার রসূলি'র উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যে পন্থা পছন্দ করেছেন তা হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিখ্যাত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ইয়ামনের কাযী করে পাঠালেন তখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কিভাবে ফায়সালা করবে? তিনি আরয করলেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে যে হিদায়াত রয়েছে তদনুযায়ী। রসূলুল্লাহ বললেনঃ যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে না পাওয়া যায়? তিনি আরয করলেন, তাহলে রসূলের সুন্নাহ্‌ অনুযায়ী। রসূলুল্লাহ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র রসূলের সুন্নাতেও যদি না পাওয়া যায়? তিনি আরয করলেন, আমি আমার রায়ের মাধ্যমে [সত্য পর্যন্ত পৌঁছার] পূর্ণ চেষ্টা করবো। এর উপর তিনি বললেন ঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আল্লাহ্‌র রসূলের দূতকে এমন পন্থা অবলম্বন করার তৌফিক দিয়েছেন যা আল্লাহ্‌র রসূলের পছন্দনীয়।" [তিরমিযী ঃ আবওয়াবুল আহকাম, আবু দাউদ ঃ কিতাবুল আকদিয়া]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কল্যাণময় যুগে পরামর্শ পরিষদ [শূরা] ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং এমন প্রতিটি ব্যাপারে, যে সম্পর্কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি কোনো নির্দেশ পাননি- সমাজের রায় প্রদানের যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের সাথে পরামর্শ করতেন। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো, নামাযের ওয়াক্তসমূহে লোকদের একত্র করার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে, এ সম্পর্কে তিনি যে পরামর্শ গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন তা। আর এর ফলশ্রুতিতেই শেষ পর্যন্ত তিনি আযানের পন্থা নির্ধারণ করেন।

খিলাফতে রাশেদার যুগে উল্লেখিত মূলনীতির প্রতি গুরুত্বারোপ

রিসালাত যুগের পর খিলাফতে রাশেদার যুগেও প্রায় এই কর্মপন্থাই কার্যকর ছিলো। শুধু এতোটুকু পার্থক্য ছিলো যে, রিসালাত যুগে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্তমান ছিলেন। এজন্য যাবতীয় বিষয়ের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করা যেতো। পরবর্তীকালে তাঁর সত্তা আর প্রত্যাবর্তনস্থল [মারজা] রইলোনা বরং তাঁর রেখে যাওয়া ঐতিহ্য হয়ে গেলো প্রত্যাবর্তনস্থল, যা তাঁর সুন্নাতের আকারে লোকদের কাছে সংরক্ষিত ছিলো। এই যুগে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি সংস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। এগুলো নিজ নিজ স্থান ও অবস্থানের দিক থেকে "ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়ার রসূলি"র উদ্দেশ্য পূর্ণ করতো ঃ

১. সাধারণ আলেম সমাজ, যারা কিতাবুল্লাহ্‌র জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন এবং যাদের কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালাসমূহ, অথবা তাঁর কর্মপন্থা, অথবা তাঁর অনুমোদন[১] সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান বর্তমান ছিলো।

কেবল সাধারণ লোকেরাই তাদের জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে এদের কাছ থেকে ফতুয়া জানতেননা বরং খোলাফায়ে রাশেদীনেরও যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে এটা জানার প্রয়োজন দেখা দিতো যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নির্দেশ দিয়েছেন কিনা- তখন এই লোকদের কাছে রুজু

---

১. অনুমোদন (তাকরীর) বলতে বুজায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে কোনো কাজ করা হয়েছিল এবং তিনি তা বহাল রেখেছেন।

করতেন। কখনো কখনো এরূপও হতো যে, সমসাময়িক খলীফা অজ্ঞতা বশত কোনো ব্যাপারে নিজের রায়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দিতেন, অতপর যখন জানা যেতো যে এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভিন্নতর সিদ্ধান্ত বর্তমান রয়েছে, তখন তিনি নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নিয়েছেন। এই আলেম সমাজের বর্তমান থাকাটা শুধু এতোটুকু উপকারীই ছিলোনা যে, ব্যক্তিগতভাবে তারা জনসাধারণ ও ক্ষমতাসীন লোকদের [উলিল আমর] জন্য ইলমের একটি মাধ্যমের কাজ দিতেন বরং এর চেয়েও বড় ফায়দা এই ছিলো যে, তারা সামগ্রিকভাবে সে কোনো আদালত, কোনো সরকার এবং কোনো মজলিশে শূরা যেনো আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাতের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত নিতে না পারে দায়িত্বও পালন করেন। তাদের সুদৃঢ় রায় সাধারণ ইসলামী ব্যবস্থার আশ্রয়াধীন ছিলো। প্রতিটি ভুল সিদ্ধান্তের সমালোচনার জন্য তাদের সজাগ সতর্ক থাকাটা ইসলামী ব্যবস্থার সঠিকভাবে চলার জন্য গ্যারান্টি ছিলো। কোনো বিষয়ে তাদের ঐক্যমত প্রমাণ করতো যে, এই বিশেষ ব্যাপারে দীনের রাস্তা সুনির্ধারিত এ থেকে বিচ্যুত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারেনা। আবার তাদের মতবিরোধের অর্থ এই ছিলো যে, এ ব্যাপারে দুই অথবা ততোধিক মত পোষণের সুযোগ রয়েছে, যদিও সিদ্ধান্ত একটির উপরই হয়েছে। তাদের বর্তমান থাকার কারণে উম্মতের মধ্যে সাধারণভাবে কোনো বিদায়াত চালু হওয়া অসম্ভব ছিলো। কেননা সর্বত্র দীনের জ্ঞানসম্পন্ন লোক এ ব্যাপারে পাকড়াও করার জন্য বর্তমান ছিলো।

২. কাযা অর্থাৎ বিচার বিভাগ। কাযী শূরাইর নামে লিখিত হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি নির্দেশনামায় এর ব্যাখ্যা বর্তমান রয়েছে ঃ

> "আল্লাহ্‌র কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী ফায়সালা করুন। যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে না থাকে, তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ অনুযায়ী ফায়সালা করুন। যদি আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাতে না থাকে, তাহলে সালিহীনগণ যে ফায়সালা করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করুন। কিন্তু যদি কোনো ব্যাপারের নির্দেশ আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রসূলের সন্নাতে পাওয়া না যায় এবং সালিহীনদের ফায়সালার নজীরও না পাওয়া যায় তাহলে আপনার এখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, অথবা অপেক্ষাও করতে পারেন। তবে আমার মতে অপেক্ষা করাটাই আপনার জন্য অধিক কল্যাণকর।"[২] [নাসায়ী, কিতাবুল আদাবিল কুদাত]

এই পন্থাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

> "এমন এক যামানা অতীত হয়েছে যখন আমরা ফায়সালা করতামনা এবং ফায়সালা করার মর্যাদাও আমাদের ছিলোনা। [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ]। এখন তাকদীরে ইলাহীর কারণে আমরা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো। অতএব এখন তোমাদের সামনে ফায়সালার জন্য

---

২. অপেক্ষা করার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক, অন্য কোনো আদালত অনুরূপ কোনো ব্যাপারে সামনে অগ্রসর হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত স্থাপন করে কিনা। দুই, বিচারক নিজে ফয়সালা করার পরিবর্তে বিষয়টি পূর্বোল্লেখিত তৃতীয় সংস্থার কাছে রুজু করবে।

কোনো বিষয় উত্থাপিত হলে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবে। যদি এমন কোনো বিষয় এসে যায় যার হুকুম আল্লাহ্র কিতাবে বর্তমান নেই, তাহলে এর ফায়সালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালা অনুযায়ী করবে। কিন্তু যদি এমন বিষয় উপস্থিত হয় যার হুকুম আল্লাহ্র কিতাবেও বর্তমান নেই এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অনুরূপ বিষয়ের ফায়সালা করেননি তাহলে সালিহীনগণ যে ফায়সালা করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করবে। যদি এমন কোনো বিষয় সামনে এসে যায় যার হুকুম আল্লাহ্র কিতাবেও বর্তমান নেই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অনুরূপ বিষয়ের সিদ্ধান্ত দেন নাই এবং সালিহীনদের থেকেও অনুরূপ বিষয়ের সিদ্ধান্ত বর্তমান নেই, তাহলে সে বিষয়ে ইজতিহাদের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার পূর্ণ চেষ্টা করবে। কিন্তু একথা বলবেনা, আমি ভয় করছি, আমি ভয় পাচ্ছি। কেননা হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দু'টি জিনিসের মাঝখানে কতোগুলো সংশয়পূর্ণ জিনিস রয়েছে। অতএব সংশয়পূর্ণ জিনিসের ক্ষেত্রে এমন ফায়সালা করতে হবে যা ব্যক্তির মনকে দোদুল্যমান না করতে পারে। আর দোদুল্যমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে ব্যক্তিকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।" [নাসায়ী, কিতাবুল আদাবিল কুদাত]

এই বিচার বিভাগ কেবল জনসাধারণের পারস্পরিক বিবাদের মীমাংসা করারই অধিকারী ছিলোনা বরং তা সরকারী প্রশাসনের [Executive] বিরুদ্ধেও জনগণের অভিযোগ শ্রবণ করতো এবং তা ফায়সালা দান করতো। এই আদালতের সামনে হাযির হওয়ার ব্যাপারে কোনো গভর্নরও আইনের ঊর্ধ্বে ছিলোনা এবং সমসাময়িক খলীফা এবং সরকারকেও। যদি কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিগত বা সরকারী অভিযোগ থাকতো তাহলে আদালতের সাহায্য নিতে হতো এবং আদালতই সিদ্ধান্ত করতো যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের বিধানের আলোকে এর সঠিক ফায়সালা কি হতে পারে।

৩. উলিল আমর, অর্থাৎ খলীফা এবং তাঁর মজলিসে শূরা। এটা সর্বশেষ কর্তৃত্বশালী সংস্থা যা কুরআনের হিদায়াত অনুযায়ী পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো যে, সমাজ এবং রাষ্ট্র যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, সেসব ব্যাপারে আল্লাহ্র কিতাব এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে কি হুকুম প্রমাণিত রয়েছে? যদি কোনো ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাতের ফায়সালা বর্তমান না থাকে তাহলে এ ব্যাপারে কোন্ ধরনের কর্মপন্থা দীনের মূলনীতি ও তার প্রাণসত্তা এবং মুসলিম সমাজের সার্বিক স্বার্থের দিক থেকে সত্যের অধিকতর কাছাকাছি? এই সংস্থার অধিকাংশ সিদ্ধান্ত হাদীস এবং ফিকহের গ্রন্থসমূহে নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে সংকলিত হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফায়সালা গ্রহণ করাকালীন সময়ে শূরার বৈঠকে সাহাবাদের মধ্যে যে আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছিলো তাও সংকলিত হয়েছে। তার মূল্যায়ন করলে জানা যায়, এই সংস্থা পূর্ণ কঠোরতার সাথে যে মূলনীতির অনুসরণ করতো তা ছিলো এই যে, প্রতিটি বিষয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তায়ালার কিতাবের দিকে রুজু করতে হবে। অতপর জানতে হবে যে, এই ধরনের কোনো বিষয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে উদ্ভূত হলে তিনি এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেছেন। অতপর যদি এ দুটি উৎস থেকে কোনো পথনির্দেশ না পাওয়া যায় তাহলে কেবল তখনই নিজের নির্ভুল চিন্তার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যে কোনো ব্যাপারেই আল্লাহ্‌র কিতাবের কোনো আয়াত অথবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্‌ থেকে কোনো নযীর পাওয়া গেলে তারা তা থেকে সরে গিয়ে ভিন্নতর কোনো ফায়সালা করতেননা। সাহাবাদের গোটা যুগে এই মূলনীতি বিরোধী একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবেনা। যদিও রাষ্ট্রে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এখতিয়ার কার্যত উলিল আমরের হাতেই ছিলো, কিন্তু আইনত কুরআন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্‌ সর্বশেষ সিদ্ধান্তকারী সনদ হিসেবে স্বীকৃত ছিলো। মুসলিম সমাজও এই ভরসার ভিত্তিতে তাদের কর্তৃত্বের আনুগত্য করতো যে, তারা নিজেদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাতের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাবেনা। তাদের কারো মন মগজে এই ধারণা পর্যন্ত ছিলোনা যে, তারা কুরআনের অকাট্য প্রমাণের পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন অথবা নির্দেশ দেয়ার অধিকারী। অনুরূপভাবে তাদের কারো মনে এরূপ দূরতম ধারণাও ছিলোনা যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যুগের নির্দেশদাতা ছিলেন এবং আমরা আমাদের যুগের নির্দেশদাতা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শাসনকালে যে ফায়সালা দিয়েছেন তার নযীর অনুসরণ করতে আমরা বাধ্য নই। তাঁর ইন্তিকালের পর যেদিন খিলাফত নামক সংস্থা অস্তিত্ব লাভ করলো, সেদিনই প্রথম খলীফা তাঁর ভাষণে ঘোষণা করলেন ঃ

> "আমি যতক্ষণ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবো তোমরা ততক্ষণ আমার আনুগত্য করবে। আমি যদি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হই তাহলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।"

উপরোক্ত ঘোষণা থেকে পরিষ্কার জানা যায়, খিলাফতের সংস্থা কেবল এই উদ্দেশ্যেই কায়েম হয়েছিলো যে, খলীফা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবেন এবং উম্মাত খলীফার আনুগত্য করবে। অন্য কথায় জনগণের জন্য খলীফার আনুগত্য ছিলো শর্তসাপেক্ষ আর তা হচ্ছে তিনি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের আনুগত্য করবেন। এই শর্ত বিলীয়মান হয়ে গেলেই উম্মাতের উপর থেকে খলীফার আনুগত্য করার কর্তব্য আপনা আপনি রহিত হয়ে যায়।

বিতর্কের সমাধানে সাধারণ জ্ঞানের দাবী

অতপর সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে সামান্য চেষ্টা করে দেখুন, কুরআন মজীদের আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি এবং তার দাবী কার্যত কিভাবে পূর্ণ হতে পারে। এই আয়াত গোটা মুসলিম সমাজকে সম্বোধন করে তাকে ক্রমিক পর্যায়ে তিনটি জিনিসের আনুগত্য করতে বাধ্য করে। প্রথমে আল্লাহ্‌র আনুগত্য, অতপর তাঁর রসূলের আনুগত্য এবং সমাজের মধ্য থেকে নির্বাচিত উলিল আমরের আনুগত্য। বিতর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে এই আয়াতের নির্দেশ হচ্ছে, এর ফায়সালার জন্য আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের দিকে রুজু করো। এ থেকে আয়াতের যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রকাশ পায় তা হচ্ছে- আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা সমাজের জন্য বাধ্যতামূলক। আর উলিল আমরের আনুগত্য আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের অধীন। মতবিরোধ কেবল

জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জনসাধারণ এবং উলিল আমরের মধ্যেও মতবিরোধ হতে পারে। মতবিরোধের যাবতীয় ক্ষেত্রে সর্বশেষ সিদ্ধান্তকারী কর্তৃপক্ষ উলিল আমর নয় বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল। তাঁদের যে নির্দেশ পাওয়া যাবে তার সামনে জনসাধারণকেও এবং উলিল আমরকেও মাথা নতো করতে হবে।

এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, ফায়সালার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে রুজু করার তাৎপর্য কি? একথা পরিষ্কার যে, আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ স্বয়ং সামনে উপস্থিত থাকবেন এবং তাঁর সামনে মুকদ্দমা পেশ করে সিদ্ধান্ত হাসিল করা হবে, বরং এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাবের দিকে প্রর্তাবতন করে জানতে হবে বিতর্কিত বিষয়ে তাঁর নির্দেশ কি? অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে প্রত্যাবর্তন করার তাৎপর্যও এই হতে পারেনা যে, রসূলের সত্ত্বার কাছ থেকে সরাসরি সিদ্ধান্ত লাভ করতে হবে। কিন্তু নিঃসন্দেহে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, রসূলের শিক্ষা এবং তাঁর কথা ও কাজ থেকে পথনির্দেশ লাভ করতে হবে। এটাতো স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ও সম্ভব ছিলোনা যে, এডেন থেকে তাবুক পর্যন্ত এবং বাহরাইন থেকে জিদ্দা পর্যন্ত গোটা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক নিজের প্রতিটি ব্যাপারের সিদ্ধান্ত সরাসরি তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করবে। এ যুগেও রসূলের সুন্নাহ্ই নির্দেশের উৎস।

অতপর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, মতবিরোধের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাহ্ থেকে ফায়সালা হাসিল করার পন্থা কি হতে পারে? পরিষ্কার কথা হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত মানুষই দেবে, কিতাব ও সুন্নাহ্ নিজে তো আর বলবেনা। কিন্তু অবশ্যই তাকে কিতাব ও সুন্নাতের নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। আর কিতাব ও সুন্নাতের ভিত্তিতে ফায়সালাকারী অবশ্যই মতভেদে লিপ্ত পক্ষদ্বয় হতে পারেনা, তাদের ছাড়া এমন কোনো তৃতীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি বা সংস্থা হতে হবে, যে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। কোন্ ধরনের মতবিরোধের ক্ষেত্রে ফায়সালা দেয়ার জন্য কোন্ ব্যক্তি উপযুক্ত হবে- তা বিতর্কের ধরন ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে। এক ধরনের মতবিরোধ এমন রয়েছে যার মীমাংসা যে কোনো জ্ঞানবান ব্যক্তি করতে পারে। অন্য এক ধরনের বিবাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন হবে। আবার কতিপয় বিবাদের ধরন এমনও হতে পারে যার চূড়ান্ত ফায়সালা উলিল আমর ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রেই ফায়সালার উৎস হবে কুরআন ও সুন্নাহ্।

এই সেকথা যা সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে আয়াতের শব্দগুলোর উপর চিন্তা করে প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে তার মন মগজে কোনোরূপ বক্রতা থাকবেনা। এখন এটাও এক নযর দেখা যাক যে, এই আয়াতের পেশকৃত ব্যবস্থা এবং তার কার্যকর পন্থা অনুধাবন করার ক্ষেত্রে দুনিয়ার প্রসিদ্ধ পন্থা আমাদরে কি সাহায্য করে। দুনিয়াতে আজ আইনের শাসনের [Rule of Law] খুব চর্চা চলছে এবং বলা হচ্ছে যে, দুনিয়াতে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের সার্বভৌমত্ব একান্ত অপরিহার্য। এর সামনে বড় ছোট সবাই সমান বিবেচিত হবে এবং জনসাধারণ,

সরকারী কর্তৃপক্ষ ও স্বয়ং সরকারের উপর নিরপেক্ষ পন্থায় কার্যকর হবে। একটি সংসদেরই এই আইন প্রণয়ন করা উচিৎ। কিন্তু যখন তা আইনে পরিণত হয়ে যাবে তখন এটা বলবৎ থাকা পর্যন্ত স্বয়ং সংসদকেও তার অনুসরণ করতে হবে। আইনের সার্বভৌমত্বের এই মতবাদকে যেখানেই বাস্তবরূপ দান করা হয়েছে, সেখানেই চারটি জিনিসের উপস্থিতি অপরিহার্য মনে করা হয়েছে ঃ

১. এমন একটি সমাজ যা আইনের প্রতি হবে শ্রদ্ধাশীল এবং তার আনুগত্য করার প্রকৃতই ইচ্ছা রাখে।
২. সমাজে এমন অনেক লোক থাকতে হবে যারা আইন সম্পর্কে অবগত, যারা জনগণকে আইনের অনুসরণের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। এবং তাদের সামগ্রিক জ্ঞান ও প্রভাবের দরুন সমাজও আইনের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারবেনা এবং সরকারী কর্তৃপক্ষও আইনকে উপেক্ষা করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবেনা।
৩. একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ থাকবে, যা জনসাধারণ, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও সরকারের মধ্যেকার বিবাদে আইন অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত দান করবে।
৪. একটি অতীব শক্তিশালী সংস্থা থাকবে, যা সমাজে উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সর্বশেষ সমাধান পেশ করবে এবং তা আইন হিসেবে সমাজে কার্যকর হবে।

এসব বিষয় সামনে রেখে যখন আপনি চিন্তা করবেন তখন জানতে পারবেন, কুরআন মজীদের আলোচ্য আয়াত মূলত ইসলামী সমাজে আইনের শাসন কায়েম করে এবং তাকে কার্যকর করার জন্য উল্লেখিত চারটি জিনিসের প্রয়োজন। যদি কোনো পার্থক্য থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই যে, কুরআন যে আইনের শাসন কায়েম করে সে মূলতই তার অধিকারী আর দুনিয়াতে যে আইনের সার্বভৌমত্ব কায়েম করা হচ্ছে তা তার অধিকারী নয়। কুরআন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আইনকে সার্বভৌম আইন হিসেবে স্বীকৃতি দেয় যার সামনে সবাইকে মাথা নতো করে দিতে হবে এবং যার অধীন হওয়ার ক্ষেত্রে সবাই সমান। তা এমন একটি সমাজকে সম্বোধন করে যা এই আইনের উপর ঈমান রাখে এবং নিজেদের বিবেকের দাবীতে তার আনুগত্য করে। এর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে- সমাজে আহলুয যিকরের এক ব্যাপক সংখ্যক লোক বর্তমান থাকবে, যাদের সাহায্যে সমাজের সদস্যগণ নিজেদের জীবনের ব্যাপারসমূহে প্রতিটি স্থানে প্রতিটি মুহূর্তে এই সার্বভৌম আইন থেকে পথ নির্দেশ লাভ করতে থাকবে এবং যাদের মাধ্যমে জনমত এই ব্যবস্থার হিফাজতের জন্য সব সময় সজাগ থাকবে। এর আরো দাবী হচ্ছে এই যে, একটি বিচার ব্যবস্থা বর্তমান থাকতে হবে, যা শুধু জনসাধারণের মধ্যেই নয় বরং জনসাধারণ এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মাঝেও এই সার্বভৌম আইন মুতাবিক ফায়সালা করবে। তা উলিল আমরের এমন একটি সংস্থারও দাবী করে, যে নিজেও এই সার্বভৌম আইনের অধীন হবে এবং সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং এর অধীনে ইজতিহাদ করার সর্বশেষ এখতিয়ারও ব্যবহার করবে। [তরজমানুল কুরআন, রজব ১৩৭৭, এপ্রিল ১৯৫৮০]

একাদশ অধ্যায়

কতিপয় সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয়

১ ইসলামী রাষ্ট্রের কয়েকটি দিক

২ খিলাফাত ও স্বৈরতন্ত্র

৩ জাতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ

৪ অমুসলিমদের অধিকার

৫ আরো কয়েকটি বিষয়

মাওলানা মওদূদী দেশে সাংবিধানিক বিতর্ক চলাকালে সৃষ্ট বিভিন্ন সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক (তাত্ত্বিক) বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে বক্তব্য রেখেছেন। কতক বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন লাহোরের দাংগা সংক্রান্ত তদন্ত আদালতে দেয়া জবানবন্দীতে, কতক বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন পত্রপত্রিকায় প্রদত্ত বিবৃতিতে ও সভাসমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতায়। আবার কতক বিষয়ের জট খুলে দিয়েছেন লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। এ জাতীয় বক্তব্যের সংখ্যা যদিও প্রচুর, তবে আমরা এ সবের মধ্য থেকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য বাছাই করে এখানে পেশ করছি।

- সংকলক

১. ইসলামী রাষ্ট্রের কয়েকটি দিক

ক. ধর্মহীন গণতন্ত্র, ধর্মীয় রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্র

যে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ আমাদের লক্ষ্য, তা পাশ্চাত্য পরিভাষা অনুযায়ী কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্রও [Theocracy] নয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও নয়, বরং তা হচ্ছে এই উভয় ব্যবস্থার মধ্যবর্তী এক পৃথক ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের মনে "ইসলামী রাষ্ট্র" সংক্রান্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, মূলত সংশ্লিষ্ট পাশ্চাত্য পরিভাষাগুলোর ব্যবহার থেকেই এর উৎপত্তি। পাশ্চাত্যের এই পরিভাষাগুলো স্বভাবতই এবং অনিবার্যভাবেই পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণা ও চিন্তাধারা, এবং পাশ্চাত্যের ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক রূপও পাঠকের মানসপটে তুলে ধরে। পাশ্চত্য পরিভাষায় ধর্মীয় রাষ্ট্র তথা [Theocracy] দুটো মৌলিক ধারণার সমষ্টিঃ

১. আল্লাহ্‌র রাজত্ব, তবে সেটা আইনগত সার্বভৌমত্ব [Legal Sovereignty] অর্থে।
২. পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের একটা গোষ্ঠী, যারা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি ও মুখপাত্র হয়ে আল্লাহ্‌র এই রাজত্বকে আইনগত ও রাজনৈতিকভাবে কার্যকর করে।

উল্লিখিত দুটো ধারণার ওপর তৃতীয় একটা বাস্তব ব্যাপারও সংযুক্ত হয়েছে। সেটি এই যে, হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঞ্জীলের নৈতিক শিক্ষা ছাড়া কোনো আইনগত নির্দেশাবলী রেখে না যাওয়ার কারণে সেন্টপল শরীয়াতকে অভিশাপ আখ্যায়িত করে খৃষ্টানজগতকে তাওরাতের নির্দেশাবলী থেকে অব্যাহতি দেন। এরপর ইবাদত, সামাজিক আচার আচরণ, লেনদেন ও রাজনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে খৃষ্টানদের যখন বিভিন্ন আইন ও বিধির প্রয়োজন দেখা দিলো, তখন তাদের ধর্মযাজকরা মনগড়া আইন দিয়ে সেই প্রয়োজন পূরণ করলো। আর সেসব আইনকে আল্লাহ্‌র আইন বলে চালিয়ে দিলো। ইসলামে এই ধর্মীয় রাষ্ট্রের কেবল একটা অংশ স্থান পেয়েছে। সে অংশটি হলো আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের আকীদা, এর দ্বিতীয় অংশটি [অর্থাৎ ধর্মযাজকদের শাসন] ইসলামে আদৌ গৃহীত হয়নি। তৃতীয় অংশটির স্থলে ইসলামে কুরআন স্বীয় সর্বব্যাপী ও বিস্তৃত বিধিবিধানসহ বিদ্যমান। আর তার ব্যাখ্যার জন্য রয়েছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কর্মকান্ডের বিবরণ সম্বলিত হাদীস। এসব

হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করার নির্ভরযোগ্য উপায় উপকরণও আমাদের হাতে রয়েছে। এ দুটি উৎস থেকে আমরা যা কিছু পাই, সেটাই আমাদের আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিধান। এছাড়া কোনো ফকীহ, ইমাম, ওলী বা আলেমের এ মর্যাদা নেই যে, তার কথা ও কাজকে আল্লাহ্‌র হুকুমের মতো নির্বিবাদে মেনে নেয়া যেতে পারে। এই সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান থাকতে ইসলামী রাষ্ট্রকে পাশ্চাত্যের পরিভাষা অনুসারে ধর্মীয় রাষ্ট্র [Theocracy] বলা সম্পূর্ণ ভুল।

অপরদিকে পাশ্চাত্যে যে জিনিসকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র [Democracy] বলা হয়। তাও দুটো মৌলিক ধারণার সমন্বিত রূপ। যথা ঃ

১. জনগণের আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব, যা কার্যকরী হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অথবা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মাধ্যমে।
২. রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকার জনগণের অবাধ ও স্বাধীন ইচ্ছা বলে গঠিত ও পরিবর্তিত হতে পারবে।

ইসলাম এর কেবল দ্বিতীয় অংশকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করে। আর প্রথমাংশকে দুইভাগে বিভক্ত করে। আইনগত সার্বভৌমত্বকে সে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করে। এজন্য কুরআন অথবা হাদীসের মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহ্‌র আইন ও বিধান রাষ্ট্রের জন্য অকাট্য ও অপরিবর্তনীয় আইনের মর্যাদা রাখে। আর রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বকে "সার্বভৌমত্বের" পরিবর্তে খিলাফত [অর্থাৎ প্রকৃত শাসক আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব] নামে আখ্যায়িত করে রাষ্ট্রের সাধারণ মুসলিম অধিবাসীদের কাছে সমর্পণ করে। এই খিলাফত মুসলিম জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা তাদের আস্থা সম্পন্ন প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এই মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান থাকতে ইসলামী রাষ্ট্রকে পাশ্চাত্য পরিভাষা অনুসারে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র [Democracy] বলাও সঠিক নয়।

খ. ইসলামে আইন প্রণয়ন

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে একথা আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলাম যে ধরনের রাষ্ট্র গঠন করে তাতে একটা আইনসভা [Legislature] থাকা জরুরী। এ আইনসভা মুসলিম জনগণের আস্থা সম্পন্ন প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে এবং তার সর্বসম্মত রায় অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের রায় ইসলামী রাষ্ট্রে আইনরূপে চালু হবে। এই আইনসভার গঠন, তার কার্যপরিচালনা বিধি এবং তার সদস্যদের নির্বাচন পদ্ধতি ইসলামে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। প্রত্যেক যুগের পরিস্থিতি পরিবেশ ও প্রয়োজনের দাবী অনুসারে এর আলাদা আলাদা ধরন ও রূপ অবলম্বন করা যেতে পারে। কিন্তু নীতিগতভাবে যে বিষয়গুলো স্থির করে দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে ঃ

১. রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকান্ড পরামর্শের ভিত্তিতে চালাতে হবে।
২. সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতি অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।
৩. কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবেও গ্রহণ করা যাবেনা।

৪. কুরআন ও সুন্নাতের বিধির যে ব্যাখ্যা সর্বসম্মতভাবে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় মুতাবিক গৃহীত হবে, তা রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হবে।

৫. যেসব ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো নির্দেশ থাকেনা। সেসব ব্যাপারে মুসলিম জনপ্রতিনিধিরা আইন প্রণয়ন করতে পারেন এবং তাদের সর্বসম্মত অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

৬. নাগরিকদের মধ্যে, সরকার ও জনগণের মধ্যে, আইনসভা ও জনগণের মধ্যে অথবা সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা অংশের মধ্যে যে কোনো বিবাদ বিসম্বাদ ঘটুক, তার নিস্পত্তি যাতে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে করা যায়, সেজন্য একটা যুৎসই ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে।

গ. ইসলামী রাষ্ট্র কেনো?

পাকিস্তানকে এ ধরনের একটা ইসলামী রাষ্টে পরিণত করার সপক্ষে আমাদের দাবীর একাধিক যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে তিনটি ঃ

প্রথমত ঃ এটি আমাদের ঈমানের ঐকান্তিক দাবী। স্বাধীনতা ও সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের পরও এবং কুরআন ও রসূলের বাণীর সত্যতায় বিশ্বাসী হয়েও যদি আমরা কুরআন ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশাবলী কার্যকর করতে না পারি, তাহলে আমরা আমাদের ঈমানে কখনো নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক হতে পারিনা। দ্বিতীয়ত ঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী করাই হয়েছিলো এজন্য যে, এখানে আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা হবে। আর এই আকাংখ্যার পেছনেই লক্ষ লক্ষ মুসলিম নর নারী নিজেদের জান মাল ও ইজ্জত বিসর্জন দিয়েছিলো। তৃতীয়তঃ পাকিস্তানের অধিবাসীদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ চায় যে, তাদের জাতীয় রাষ্ট্র একটা ইসলামী রাষ্ট্র হোক এবং সংখ্যাগুরুর এই দাবীর বাস্তবায়ন সর্বাবস্থায় কাম্য। একথা সত্য যে, এখানে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক এমন রয়েছে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কৃষ্টি এবং তার মতবাদগুলোকে সঠিক মনে করে এবং তাদের পক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা মেনে নেয়া দুস্কর। তাছাড়া পাকিস্তানের আমলা শ্রেণীতেও এমন কিছু লোক বিদ্যমান, যাদের সমস্ত তাত্ত্বিক, মানসিক ও বাস্তব প্রশিক্ষণ পাশ্চাত্য ধাঁচের রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যই হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন দেখে তাদের মনে নানা ধরনের ভীতি ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু যে জিনিস অনিবার্য ও অবধারিত, তার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে প্রস্তুত করাই সমীচীন, যেমন ইতিপূর্বে তাদের পূর্ব পুরুষেরা ইংরেজ শাসন সমাগত দেখে নিজেদেরকে নবযুগের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। তাদের অধিকাংশ নিজেদেরকে গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক রূপে জাহির করে থাকেন। এখন এটা তাদেরই ভেবে দেখা উচিত যে, মুষ্টিমেয় কিছু লোক বা পরিবারের সুবিধার খাতিরে দেশের বিপুল

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যা চায়, তার পথরোধ করা কতোখানি সঠিক এবং কোথাকার গণতন্ত্র?

ঘ. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, সেগুলোর জবাব ধারাবাহিকভাবে নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ক. ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদেরকে ইসলামী পরিভাষায় "যিম্মী" তথা "সংরক্ষিত নাগরিক" বলা হয়। "যিম্মী" কোনো গালি নয়। এটা শুদ্র বা ম্লেচ্ছের সমার্থকও নয়। আরবী ভাষার 'যিম্মা' শব্দটা [Guarantee] বা নিশ্চয়তার সমার্থক। যিম্মী সে ব্যক্তিকে বলা হয় যার অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে। ইসলামী সরকার এ দায়িত্ব শুধু নিজের পক্ষ থেকে বা মুসলিম অধিবাসীদের পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকে গ্রহণ করে। এ দায়িত্বের গুরুত্ব এতো বেশী যে, কোনো অমুসলিম দেশে যদি মুসলমানদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করেও ফেলা হয়, তথাপি আমরা আমাদের দেশে অবস্থানরত ঐ দেশের অধিবাসীদের সমধর্মাবলম্বী যিম্মীদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারিনা। একটি ইসলামী রাষ্ট্রের আইনসভা তাদের শরীয়াত সম্মত অধিকারসমূহ ছিনিয়ে নেয়ার আদৌ কোনো অধিকার রাখেনা।

খ. যিম্মীরা তিন শ্রেণীর ঃ এক, যারা কোনো চুক্তির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছে। দুই, যারা যুদ্ধে বিজিত হয়েছে। তিন, যারা বিজিতও নয়, চুক্তিবদ্ধও নয়। প্রথম শ্রেণীর যিম্মীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী আচরণ করা হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর যিম্মীদের শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অধিকার প্রদান করা হবে। আর তৃতীয় শ্রেণীর যিম্মীদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকার তো দেয়াই যাবে, উপরন্ত ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী নয় এবং আমাদের পরিস্থিতির আলোকে সমীচীন হয় এমন কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধাও আমরা তাদেরকে দিতে পারি।

গ. যিম্মীদের [অমুসলিম প্রজাদের] যে ন্যূনতম অধিকার শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত তা নিম্নরূপ ঃ পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্মীয় শিক্ষার অনুমতি, ধর্মীয় বই পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশনার অনুমতি, আইনের আওতায় ধর্মীয় আলোচনার অনুমতি, উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ, পারিবারিক আইনের রক্ষণাবেক্ষণ, জানমাল ও ইজ্জতের হিফাজত, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনে মুসলমানদের সাথে পুরোপুরি সমতা, সরকারের সাধারণ কর্মকান্ডে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্যহীনতা, অর্থনৈতিক কায়কারবারের সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের মতো সমান সুযোগ দান। অভাবী হলে মুসলমানের ন্যায় যিম্মীদেরও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সাহায্য লাভের সমান অধিকার। এসব অধিকার ইসলামী রাষ্ট্র শুধু কাগজে কলমেই দেয়না বরং সে আপন দীন ও ঈমানের আলোকে কার্যত তা বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে আদৌ একথা বিবেচনায় আনা হবেনা যে, অমুসলিম রাষ্ট্রগুলো মুসলমানদের সাথে কাগজে কলমেই বা কি কি অধিকার দিচ্ছে, আর বাস্তবেই বা কি দিচ্ছে।

ঘ. অমুসলিমদেরকে শহর এলাকা ছাড়া আর কোথাও উপাসনালয় বানাতে নিষেধ করা হয়েনি, তবে শহর এলাকায় অবস্থিত পুরানো উপাসনালয়গুলোর মেরামত করা যাবে। এখানে শহর এলাকা বলতে মুসলমানরা শুধুমাত্র নিজেদের বসবাসের জন্য যেসব শহর নির্মাণ করেছে, সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। যেমন কুফা, বসরা ও ফিসতাত। অন্যান্য শহরে নতুন উপাসনালয় নির্মাণ ও পুরানো উপাসনালয় মেরামতের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

ঙ. কিছু কিছু ফিকাহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থে অমুসলিমদের ওপর পোশাক ইত্যাদির ব্যাপারে যেসব কড়াকড়ি ও বিধিনিষেধের উল্লেখ করা হয়েছে, তা দ্বারা ভুলবুঝাবুঝির শিকার হওয়া উচিত নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের ফকীহগণ পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের তাগিদে যে তিন ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করেছিলেন তা হচ্ছেঃ

১. তাদেরকে সামরিক পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছিলো। মুসলমানদের নিষেধ করা হয়নি। কেননা সে সময় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ওপর সামরিক চাকুরী করা বাধ্যতামূলক ছিলো। অমুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিলোনা।

২. মুসলমানদেরকে অমুসলমানদের এবং অমুসলমানদেরকে মুসলমানদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পরতে নিষেধ করা হয়েছিলো। কেননা এধরনের সাদৃশ্য দ্বারা নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এতে আশংকা আছে যে, রকমারি কৃষ্টির মিশ্রণে একটা জগাখিচুড়ি কৃষ্টি তৈরী হয়ে যেতে পারে। এমন আশংকাও আছে যে, মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয়ে হতোদ্যম হয়ে অমুসলিমদের ভেতরে দাসসুলভ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়ে যাবে। এধরনের দাসসুলভ মানসিকতার কারণে পরাজিত জাতি পোশাক পরিচ্ছদ ও চালচলনে বিজয়ী জাতির অনুকরণ করতে থাকে । ইসলাম এধরনের মানসিকতা কোনো কাফিরের মধ্যেও সৃষ্টি হোক তা দেখতে চায়না। এজন্য অমুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা নিজেদের কৃষ্টি সংস্কৃতি, চালচলন, বেশভূষা ও নিজেদের ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলো যেনো সংরক্ষণ করে এবং মুসলমানদের অনুকরণ না করে। হানাফী ফিকাহর বিখ্যাত গ্রন্থ "বাদায়েউস্ সানায়ে"তে এ নির্দেশটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

অমুসলিমদের এমন আলামত ও নিদর্শন বহাল রাখতে বাধ্য করা হবে, যা দ্বারা তাদের চেনা যায়। তাদেরকে পোশাক পরিচ্ছদে মুসলমানদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে দেয়া হবেনা। [৭ম খন্ড, ১১৩ পৃঃ]

এছাড়া এতে আইনগত জটিলতা সৃষ্টির আশংকাও আছে। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলমানদের জন্য মদ খাওয়া, রাখা ও বিক্রয় করা ফৌজদারী অপরাধ। অথচ অমুসলিমদের জন্য সেটা অপরাধ নয়। এমতাবস্থায় একজন মুসলমান যদি অমুসলিমদের সদৃশ পোশাক পরে, তবে সে এ জাতীয় অপরাধ করেও পুলিশের ধর পাকড় থেকে রেহাই পেতে পারে। আর কোনো অমুসলিম মুসলমানদের সদৃশ্য পোশাক পরলে সে পুলিশের ধর পাকড়ের শিকার হতে পারে।

৩. আরেক ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছিলো তৎকালীন বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। সে সময় সিন্ধু থেকে স্পেন পর্যন্ত বহুসংখ্যক দেশ মুসলমানদের

দ্বারা বিজিত হয়েছিলো। আর স্বাভাবিকভাবেই ঐসব দেশের অধিবাসীদের মধ্যে সাবেক শাসক গোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যক লোক বিদ্যমান ছিলো। তাদের ভেতরে নিজেদের হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের উচ্চাভিলাষ তখনো ছিলো। মুসলমানরা দুনিয়ার অন্যান্য বিজেতাদের ন্যায় এসব জনগোষ্ঠীকে কচুকাটা তো করেইনি বরং 'যিম্মী' বানিয়ে তাদেরকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করেছিলো। কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাদেরকে কিছু না কিছু দমিত রাখাও জরুরী ছিলো, যাতে তারা আবার মাথা তোলার সাহস না করে। এজন্য তাদের বেশভূষায়, যানবাহনে ও অন্যান্য চালচলনে এমন জাকজমক প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো, যা দ্বারা তাদের অতীত শাসনামলের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়। তবে এধরনের নির্দেশাবলী নিতান্তই সাময়িক ছিলো, চিরস্থায়ী ছিলোনা। আর এসব বিধি ফিকাহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ থাকলেও তাকে চিরদিন সকল অমুসলিম প্রজার ওপর প্রয়োগ করা চলেনা।

চ. রাষ্ট্র প্রধান, মন্ত্রী, সেনাপতি, বিচারপতি ও এধরনের অন্য যেসব শীর্ষ পদে আসীন হয়ে সরকারের নীতি নির্ধারণে অংশীদার হওয়া যায়, সেসব পদে কোনো অমুসলিম সমাসীন হতে পারবেনা। এর কারণও কোনো সংকীর্ণতা বা জাতি বিদ্বেষ নয়। বরং এর সোজা ও সঠিক কারণ এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। তাই এই রাষ্ট্রে এসব পদে এমন ব্যক্তিরাই অধিষ্ঠিত হতে পারবে, যারা এই আদর্শকে ভালোভাবে উপলব্ধি করে এবং একে বিশুদ্ধ ও সত্য বলে মানে। যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে; তাই সে নিজের অমুসলিম প্রজাদের মধ্যে ভাড়াটে মানসিকতা সৃষ্টি করা পছন্দ করেনা। বরঞ্চ সে তাদেরকে বলে যে, তোমরা যদি আমাদের আদর্শকে ও নীতিমালাকে সঠিক মনে করো তাহলে প্রকাশ্যে তাকে সত্য ও সঠিক বলে ঘোষণা করো। তোমাদের জন্য শাসকদলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত রয়েছে। আর যদি তোমরা তার সত্যতায় বিশ্বাসী না হও, তাহলে নিছক পেট ও পদমর্যাদা লাভের খাতিরে এই ব্যবস্থার পরিচালনা ও উৎকর্ষ সাধনের কাজে অংশ নিওনা। কেননা আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে তো তোমরা ওটাকে ভ্রান্তই মনে করে থাকো।

ছ. অমুসলিম দেশগুলো আপন আপন রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে মুসলমানদের সাথে কী আচরণ করে এবং কী আচরণ করেনা, সে প্রশ্ন আমাদের কাছে মোটেই কোনো গুরুত্ব রাখেনা। আমরা যে জিনিসকে সত্য ও সঠিক মনে করবো, নিজেদের দেশে তাকে বাস্তবায়িত করবো। অন্যেরা যে জিনিসকে সঠিক মনে করে, তাকে তারা বাস্তবায়িত করবে কিনা, সেটা তাদের ব্যাপার। এ ব্যাপারে তারা পুরোপুরি স্বাধীন। আমাদের ও তাদের সামগ্রিক কর্মকান্ড বিশ্বজনমতের সামনে একদিন আমাদের ও তাদের সত্যিকার পরিচয় তোলে ধরবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমরা এরূপ ভন্ডামী করতে পারিনা যে, আমাদের সংবিধানের পাতায় প্রদর্শনীমূলকভাবে অমুসলিমদেরকে সকল অধিকার দিয়ে দেবো, কিন্তু বাস্তবে তাদেরকে ভারতের মুসলমানদের, আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের এবং রাশিয়ার অকম্যুনিষ্টদের মতো শোচনীয় দশায় ফেলে রাখবো। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এমতাবস্থায় অমুসলিম সংখ্যালঘুরা কি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত থাকতে

পারবে? এর জবাব এই যে, সংবিধানের কয়েকটি শব্দ থেকেই আনুগত্য ও আনুগত্যহীনতার উৎপত্তি হয়না বরং সামগ্রিকভাবে ও বাস্তবে সরকার ও সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী নিজেদের অধীনস্থ সংখ্যালঘুদের সাথে যে আচরণ করে থাকে তা থেকেই তার উৎপত্তি ঘটে।

ঙ. ইসলামে মুরতাদের শাস্তি

ইসলামে মুরতাদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড। কেউ যদি বলতে চায়, এমনটি হওয়া উচিত নয়, তাহলে সেকথা বলার স্বাধীনতা তার রয়েছে। কিন্তু সে যদি বলে, এধরনের শাস্তি আসলেই ইসলামে নেই, তাহলে সে হয় ইসলামী আইন সম্পর্কে অজ্ঞ, নচেত "প্রতিবেশীর বিদ্রূপে" লজ্জা পেয়ে নিজ ধর্মের একটা বিধানকে সে গোপন করে। ইসলামের এই আইনকে বুঝতে লোকেরা যে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তার একাধিক কারণ রয়েছে ঃ

প্রথমত ঃ তারা ধর্ম হিসেবে ইসলাম এবং রাষ্ট্র হিসেবে ইসলামের পার্থক্য বোঝেনা। ফলে একটার বিধান অপরটার ওপর প্রয়োগ করে। অথচ উক্ত দুটি অবস্থার ধরন ও বিধিতে পার্থক্য রয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ তারা বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে এই বিধানটি বিবেচনা করে। বর্তমান পরিস্থিতি এই যে, অমুসলিম দেশের কথা বাদ দিন, খোদ মুসলিম দেশেও অনৈসলামিক শিক্ষা ও অনৈসলামিক কৃষ্টির প্রভাবে মুসলমানদের নতুন প্রজন্মে বহুলোক গোমরাহ হয়ে আর্বিভূত হচ্ছে। অথচ একটা যথার্থ ইসলামী রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকলে তার সর্বপ্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এই যে, যেসব কারণে কোনো মুসলমান সত্যি সত্যিই ইসলাম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ ও মুরতাদ হবার প্ররোচণা পায়, সেসব কারণ দূর করবে। ইসলামী রাষ্ট্র যদি নিজের যথার্থ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে, তাহলে তো অমুসলিমদের পক্ষেও কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানের পক্ষে ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা।

তৃতীয়ত ঃ তারা একথা ভুলে যায় যে, মুসলিম সমাজই ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রস্তর। এই ভিত্তি প্রস্তর কতোখানি মজবুত, তার ওপরই রাষ্ট্রের মজবুতী নির্ভর করে। পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্র কোথায় আছে, যা তার নিজের ভেতরেই নিজের ধ্বংসের উপায় উপকরণ লালন ও সংরক্ষণ করে? আমরা তো যথাসাধ্য চেষ্টা করবো যাতে রাষ্ট্রের এই ভিত্তি প্রস্তরটির সাথে তার প্রতিটি কণা অন্তর দিয়ে লেগে থাকে । তা সত্ত্বেও যদি এমন কোনো কণা বেরিয়েই পড়ে, যা ঐ প্রস্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে আমরা তাকে বলবো যে, তুমি যদি বিচ্ছিন্ন হতেই চাও, তবে আমাদের সীমানা থেকে বেরিয়ে যাও। নচেত এখানে বসে তুমি অন্যান্য কণারও নষ্ট হওয়ার কারণ হবে, তা আমরা হতে দিতে পারিনা এবং সেজন্য তোমাকে স্বাধীন ছেড়ে দিতে পারিনা।

চতুর্থত ঃ সকল ধরনের মুরতাদের সর্বাবস্থায় হত্যাই করা হবে তারা এই ভুল ধারণায় নিমজ্জিত আছে। অথচ একটা অপরাধের চরম শাস্তি কেবল অপরাধটির নিকৃষ্টতম ধরনের ওপরই প্রয়োগ করা হয়, সাধারণ পর্যায়ের অপরাধের ওপর নয়। কখনো এমন হয়ে থাকে যে, এক ব্যক্তি কেবল আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইসলাম থেকে

বিচ্যুত হয়ে গেছে। অপর একজন প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করে ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে বসে। তৃতীয়জন শুধু মুরতাদ হয়েই ক্ষ্যান্ত হয়না বরং ইসলামের বিরোধীতায় সক্রিয় তাৎপরতা চালাতে থাকে। এধরনের সকল মানুষকে ইসলামী আইন সর্বাবস্থায় একই দৃষ্টিতে দেখবে, এটা কিভাবে ভাবা যায়? [মাওলানা মওদূদী রচিত "ইসলামী আইনে মুরতাদের শাস্তি" নামক গ্রন্থে বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য। -সম্পাদক]

চ. ইসলামের সমর আইন ও দাস প্রথা

ইসলামের সমর আইন ও দাস প্রথা নিয়েও কিছু প্রশ্ন উঠেছে। এ প্রসংগে বুঝে নিতে হবে যে, ইসলামের যুদ্ধ আইন বাস্তবিক পক্ষে একটি আইন এবং ইসলামী রাষ্ট্রে তাকে অবশ্যই কার্যকর করা হবে, চাই আমাদের সাথে যুদ্ধরত অন্যান্য জাতি এ আইনের বিধিনিষেধ ও সীমা সংরক্ষণ করুক বা না করুক। পক্ষান্তরে যে জিনিসটাকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইন নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে, তা আসলে কোনো আইন নয়, বরঞ্চ আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের একটি সমষ্টি মাত্র। এর সীমা ও বিধিসমূহ মেনে চলতে সকল জাতিই এই আশায় ও এই সমঝোতার ভিত্তিতে রাযী হয়েছে যে, অন্যান্য জাতিও যুদ্ধের সময় এগুলো মেনে চলবে। ইসলাম আমাদেরকে যুদ্ধের কয়েকটি ন্যূনতম বিধি ও নৈতিক নীতিমালার আনুগত্য করতে আদেশ দিয়েছে। এগুলো অন্যেরা ভংগ করলেও আমরা ভংগ করতে পারিনা। আর ওগুলোর চেয়ে বেশী আরো কিছু সুসভ্য আইনে যদি অন্যান্য জাতি সম্মত হয়, তাহলে আমরা শুধু যে তাদের সাথে এ ব্যাপারে সমঝোতায় আসতে পারি তা নয়, বরং যুদ্ধে অধিকতর সুসভ্য আচরণ করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা আমাদেরই কর্তব্য। উদাহরণ স্বরূপ, দাস প্রথার ব্যাপারটাই ধরুন। ইসলাম এর অনুমতি শুধু সে অবস্থায় দিয়েছে, যখন শত্রুপক্ষ যুদ্ধবন্দী বিনিময়েও সম্মত হয়না, আবার মুক্তিপণের বিনিময়ে নিজেদের বন্দী মুক্ত করা ও আমাদের বন্দী ছাড়ার প্রস্তাবও গ্রহণ করেনা। এরূপ পরিস্থিতিতে ইসলাম বন্দীদেরকে কারাগারে পাঠানো কিংবা শ্রমশিবিরে রেখে শ্রম খাটাতে বাধ্য করা পছন্দ করেনি। বরং তাদেরকে মুসলিম সমাজের সদস্যদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে বন্টন করে দেয়ার নীতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যাতে তাদের মুসলমানদের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া সহজতর হয়। একথা সত্য যে, সেকালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসদাসী হিসেবেই রেখে দিতো এবং দাসত্ব বা গোলামী শব্দটা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল জাতির যৌথ সম্পত্তি ছিলো। তবে দাসদাসীদের জীবনে ইসলাম যে পরিবর্তন এনেছিলো, তার নজীর পৃথিবীতে বিরল। মুসলিম জাতি ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো জাতিতে এতো বেশী সংখ্যক দাস ও দাসপুত্র উঁচু স্তরের পন্ডিত ও মনীষী, বিচারপতি, সেনাপতি ও শাসক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে- এমন দৃষ্টান্ত দেখানো যাবেনা। ইসলামী আইন আমাদেরকে মানবতা ও সভ্যতার যে ন্যূনতম মানে প্রতিষ্ঠিত করে, তা ছিলো এই যে, দাস প্রথা রহিত করা যখন সম্ভব ছিলোনা তখনও দাসদেরকে সমাজে এতো সম্মানজনক আসন দিয়েছে। এখন যদি দুনিয়ার অন্যান্য জাতি যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের নীতি গ্রহণ করে থাকে, তবে তাকে স্বাগত জানাতে আমাদেরকে বাধা দেবে এমন কিছুই ইসলামে নেই। আমাদের জন্য তো এটা আনন্দের ব্যাপার যে, যে জিনিস গ্রহণের জন্য

আমরা শত শত বছর আগে দুনিয়াবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলাম, তা অবশেষে জগতবাসী গ্রহণ করেছে।

ছ. ইসলাম ও শিল্পকলা

এই মর্মেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে শিল্পকলার কী দশা হবে, বিশেষত স্থির চিত্র, চলচ্চিত্র, ভাস্কর্য, নাটক, গানবাজনা ইত্যাদির? আমি এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দেবো যে, শিল্পকলা তো মানুষের স্বভাব প্রকৃতির একটা জন্মগত চাহিদা। স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টাও তার প্রতিটি সৃষ্টিকর্মে শিল্পকলার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। তাই গোটা শিল্পকলার অবৈধ হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা। তবে আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতায় শিল্পকলার যে প্রকাশ ও অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়, সেটাই মেনে নেয়া জরুরী একথা ঠিক নয়। বরং প্রত্যেক সভ্যতা স্বীয় চিন্তাধারা, মতাদর্শ ও ভাবপ্রবণতার আলোকে বিভিন্ন পন্থায় মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির এই চাহিদার স্ফুরণ ঘটায় এবং অন্যান্য সভ্যতার গৃহীত সেসব বৈধ কি অবৈধ, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। পাশ্চাত্য জগত থেকে যে জিনিস আমদানী করা হচ্ছে, কেবল তারই নাম শিল্পকলা, এটা কোন্ যুক্তিতে ধরে নেয়া হয়েছে? পাশ্চাত্যের শিল্পকলায় কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে শিল্পকলাটাই খতম হয়ে যাবে- এমন আশংকাই বা কেন করা হয়? শিল্পকলা সম্পর্কে ইসলামের একটা স্বতন্ত্র মতাদর্শ রয়েছে। মানব মনের এই স্বভাব সুলভ চাহিদাকে সে পৌত্তলিকতা, সৌন্দর্যপূজা ও যৌন লালসার পথে ঠেলে দেয়ার বিরোধী। এর প্রকাশ ও স্ফুরণের জন্য সে ভিন্ন পথ দেখায়। ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামের নিজস্ব মতাদর্শই কর্তৃত্বশীল হবে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও মতাদর্শের কর্তৃত্ব সেখানে কোনোমতেই চালু থাকতে পারবেনা।

জ. ফিকাহ শাস্ত্রীয় মতভেদ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় নয়

এ প্রশ্নও তোলা হয়েছে যে, মুসলিম ফের্কাসমূহের মধ্যে আকীদাগত ও বিধিগত মতভেদের ধরন কী? তাদের মধ্যে যখন মৌলিক বিষয়েও মতৈক্য নেই, এমনকি "সুন্নাহ্" পর্যন্ত শীয়া ও সুন্নীদের মধ্যে সর্বসম্মত বিষয় নয়, তখন একটা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন কিভাবে চলবে? এর জবাবে আমি শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি যে, কথিত ৭৩ ফের্কার সমস্যাটির অস্তিত্ব কার্যত পাকিস্তানে নেই। আর কোনো ব্যক্তি কোনো পত্রপত্রিকায় যে কোনো একটা উদ্ভট চিন্তা তোলে ধরলেই এবং বিক্ষিপ্তভাবে কিছু লোক তা গ্রহণ করলেই তা কোনো উল্লেখযোগ্য ফের্কার উৎপত্তি ঘটায়না। আমাদের দেশে বাস্তবিক পক্ষে মাত্র তিনটে ফের্কা রয়েছেঃ [১] হানাফী ফের্কা। দেওবন্দী ও বেরেলভী এই দুই উপদলে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও এই ফের্কার ফিকাহ্ শাস্ত্রে কোনো বিভেদ নেই। [২] আহলে হাদীস এবং [৩] শীয়া। এই তিন ফের্কার মতভেদ কার্যত একটা ইসলামী রাষ্ট্র গঠনে ও পরিচালনায় কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করেনা। যদি এই নীতি সর্বসম্মতভাবে মেনে নেয়া হয় যে, পারিবারিক আইন, ধর্মীয় রসমাদি ও ইবাদত এবং ধর্মীয় শিক্ষার পর্যায়ে প্রত্যেক ফের্কার অনুসৃত রীতি অন্য ফের্কার হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকবে এবং দেশের প্রশাসন সংসদের সংখ্যাগুরু সদস্য কর্তৃক

নির্ধারিত আইন ও বিধি অনুসারে চলবে। এ প্রসংগে ৭৩ ফের্কার কল্প কাহিনীটির রহস্য উন্মোচন করে দেয়াও আমি সমীচীন মনে করছি। কেননা লোকেরা খামাখাই এই বিষয়টি নিয়ে মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগে। আসল ব্যাপার এই যে, বিভিন্ন বইপুস্তকে মুসলমানদের যে বিপুল সংখ্যক ফের্কার উল্লেখ পাওয়া যায়, তার একটি বিরাট অংশের নেহাত কাগজে অস্তিত্ব ছাড়া আগেও কোনো অস্তিত্ব ছিলোনা, এখনো নেই। কোনো ব্যক্তি যখনই কোনো নতুন চাঞ্চল্যকর মতামত পেশ করেছে এবং তার দুই একশো অনুসারী সৃষ্টি হয়ে গেছে, অমনি আমাদের গ্রন্থকারগণ তাকে একটা ফের্কা হিসেবে গণনা করে ফেলেছেন। এ ধরনের ফের্কাগুলো ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক ফের্কা এমনও রয়েছে, যা বিগত ১৪শ বছরে জন্মেছেও আবার নিশ্চিহ্নও হয়ে গেছে। বর্তমানে সারা দুনিয়ায় মুসলমানদের বড়জোর ৬/৭টি ফের্কা বা উপদল অবশিষ্ট রয়েছে।

মৌলিক মতপার্থক্যের কারণে এগুলোকে স্বতন্ত্র ফের্কা বলা যায় এবং অনুসারীর সংখ্যার বিচারেও এগুলো মোটামুটি উল্লেখযোগ্য। তবে এগুলোর মধ্যেও কোনো কোনোটি অতিমাত্রায় ক্ষুদ্রাকৃতির। এগুলো হয় বিশেষ বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ, নচেত সারা দুনিয়ায় এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে, কোথাও তাদের কোনো উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা নেই। দুনিয়ার বড় বড় মুসলিম ফের্কা মাত্র দুটো ঃ সুন্নী ও শীয়া। তন্মধ্যে উম্মাহর বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ সুন্নীদের নিয়ে গঠিত। এদের শাখা প্রশাখাগুলোর মধ্যে সত্যিকার অর্থে মৌলিক মতপার্থক্য নেই। শুধুমাত্র খুটিনাটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারী কিছু মাযহাব [School of thought] রয়েছে, যাকে তার্কিকেরা ফের্কাররূপ দিয়ে ফেলেছে। কোনো বাস্তবতাবাদী রাজনীতিক যদি দুনিয়ার কোনো দেশে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে এসব মতভেদ তার পথে কখনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা।[১]

---

১. এ পর্যন্ত সমগ্র আলোচনাটি তদন্ত আদালতে প্রদত্ত মাওলানার জবানবন্দী থেকে গৃহীত এবং এটি "কাদিয়ানী সমস্যা এবং তার নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক" নামক গ্রন্থের একটি অংশ। - সংকলক।

২. খিলাফত ও স্বৈরতন্ত্র

ক. ইসলামী রাষ্ট্র ও খিলাফত প্রসংগে কয়েকটি প্রশ্ন

[জনৈক জার্মান ছাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ও খিলাফত সম্পর্কিত কতিপয় সমস্যার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবার উদ্দেশ্যে এ প্রশ্নগুলো করেন। আসল প্রশ্নগুলো ছিলো ইংরেজীতে। নীচে তার অনুবাদ দেয়া হলো।]

প্রশ্ন ঃ এক. ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের জন্যে কি শুধুমাত্র 'খলীফা' শব্দটিই ব্যবহার করা যেতে পারে?

দুই. উমাইয়া খলীফাদের কি সঠিক অর্থে খলীফা বলা যেতে পারে?

তিন. আব্বাসীয় খলীফাগণ বিশেষ করে আল মামুন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

চার. হযরত ইমাম হাসান রাদিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহুর রাজনৈতিক কার্যক্রমকে আপনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন? আপনার মতে ৬৮০ইং সালে মিল্লাতে ইসলামীয়ার আসল নেতা কে ছিলো, হুসাইন না ইয়াযীদ?

পাঁচ. ইসলামী রাষ্ট্রে বিদ্রোহ কি একটি সৎকর্ম গণ্য হতে পারে?

ছয়. বিদ্রোহীরা যদি মসজিদ বা অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহে [যেমন কা'বা ও হারাম শরীফ] আশ্রয় নেয়, তাহলে এ অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে?

সাত. ইসলামী রাষ্ট্র কুরআন ও সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী তার নাগরিকদের কাছ থেকে কোন্ ধরনের কর আদায় করতে পারে?

আট. কোনো খলীফা কি এমন কোনো কাজ করতে পারে, যা পূর্ববর্তী খলীফাদের কার্যক্রম থেকে ভিন্নতর?

নয়. গভর্নর ও শাসক হিসেবে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

দশ. ইসলামী রাষ্ট্র কি এমন কোনো কর আরোপ করার অধিকার রাখে, যা কুরআন ও সুন্নাতে উল্লিখিত হয়নি এবং পূর্ববর্তী খলীফাদের আমলেও যার কোনো নজীর নেই?

জবাব ঃ আপনি যে প্রশ্নগুলো পাঠিয়েছেন তার বিস্তারিত জবাব দিতে গেলে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন, আর সে সময় আমার নেই। তাই এগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি।

এক. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানের জন্য 'খলীফা' শব্দটি এমন কোনো অপরিহার্য পারিভাষা নয় যে, এছাড়া অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করা যাবেনা। আমীর, ইমাম, সুলতান ইত্যাদি শব্দগুলোও হাদীস, ফিক্‌হ, কালাম ও ইসলামের ইতিহাসে বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু নীতিগতভাবে যে জিনিসটির প্রয়োজন তা হলো, রাষ্ট্রের ভিত্তি খিলাফতের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। একটি সঠিক ইসলামী রাষ্ট্র কখনো রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র হতে পারেনা। আবার তা এমন কোনো গণতন্ত্রও হতে পারেনা, যা জনগণের সার্বভৌমত্বের [Popular Sovereignty] ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বিপরীত পক্ষে, একমাত্র সে রাষ্ট্রকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলা যেতে পারে, যে রাষ্ট্র আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয়, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শরীয়তকে শ্রেষ্ঠ আইন এবং আইনের প্রধান ও প্রথম উৎস বলে মেনে নেয় এবং আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে কাজ করার স্বীকৃতি দেয়। এই রাষ্ট্রে কর্তৃত্বশালীদের কর্তৃত্ব লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ্‌র বিধানের পুনরুজ্জীবন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অসৎ বৃত্তির বিনাশ ও সৎবৃত্তির বিকাশ সাধন। এই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কোনো সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নয় বরং এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব ও তাঁর আমানত। এরি নাম খিলাফত।

দুই. উমাইয়া শাসকদের সরকার আসলে খিলাফত ছিলোনা। যদিও ইসলামই ছিলো তাদের সরকারের আইন, কিন্তু শাসনতন্ত্রের অনেকগুলো ইসলামী ধারাকে তারা নাকচ করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও তাদের সরকারের প্রাণসত্তা ইসলামের প্রাণসত্তা থেকে বেশ দূরে সরে গিয়েছিলো। তাদের শাসনকালের প্রথম দিকেই এ বিষয়টি অনুধাবন করা হয়েছিলো। তাই এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মু'য়াবীয়া রাদিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজেই বলেন, 'আনা আউয়ালুল মুলক' [অর্থাৎ আমি সর্বপ্রথম বাদশাহ]। আর যে সময় আমীর মু'য়াবীয়া রাদিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর ছেলেকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন, তখনই হযরত আবু বকর রাদিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আবদুর রহমান রাদিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহু উঠে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'এতো রোমের কাইজারদের পদ্ধতিই হলো, কাইজার মরে গেলে তার পুত্রই কাইজার হয়।'

তিন. নীতিগতভাবে আব্বাসীয় খলীফাদের অবস্থাও বনী উমাইয়াদের মতোই। পার্থক্য শুধু এতোটুকু, উমাইয়া খলীফারা দীনের ব্যাপারে ছিলেন উদাসীন [Indifferent], বিপরীত পক্ষে আব্বাসীয় খলীফারা নিজেদের ধর্মীয় খিলাফত ও আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য দীনের ব্যাপারে ইতিবাচক আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু তাদের এ আগ্রহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীনের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। যেমন মামুনের আগ্রহ এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে, যার ফলে তিনি দর্শনের একটি বিষয়, যা আসলে দীনের বিষয় ছিলোনা, তাকে অনর্থক দীনের বিষয়ে পরিণত করেন। দীনের একটি আকীদারূপে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান এবং সরকারী ক্ষমতাবলে জোর করে মুসলমানদের কাছ থেকে তার সপক্ষে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য অমানুষিক যুলুম নির্যাতন চালান।

চার. যে যুগ সম্পর্কে এ প্রশ্নটি করা হয়েছে সেটি ছিলো আসলে ফিতনার যুগ। সে সময় মুসলমানরা মারাত্মক মানসিক নৈরাজ্যের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। সে সময় কার্যত মুসলমানদের আসল নেতা কে ছিলো একথা বলা বড় কঠিন। কিন্তু একথা দিবালোকের মতো সত্য, ইয়াযীদের যা কিছু রাজনৈতিক প্রভাব ছিলো তার মূল ভিত্তি ছিলো মাত্র একটি, তার হাতে ছিলো ক্ষমতার চাবিকাঠি। তার পিতা একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করে তাকে সে রাষ্ট্রের শাসক বানিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনাটা যদি এভাবে সাজানো না হতো এবং ইয়াযীদ সাধারণ মুসলমানদের কাতারে থাকতো, তাহলে সম্ভবত নেতৃত্বের আসনে বসাবার জন্য মুসলমানদের সর্বশেষ দৃষ্টি তার ওপর পড়তো। বিপরীতপক্ষে হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহু সে সময় উম্মতের সুপরিচিত ও সর্বজন সমাদৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং কোনো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সম্ভবত মুসলিম জনতার সর্ব প্রথম দৃষ্টি তাঁর ওপরই পড়তো।

পাঁচ. কোনো সৎ ও ইনসাফ ভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকলে যালিম শাসকদের মুকাবিলায় বিদ্রোহ করা কেবল বৈধই নয়, ফরযও। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার [রঃ] মতামত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আবু বকর জাস্‌সাস তাঁর 'আহকামুল কুরআন' এবং আল মুওয়াফফিকুল মূল্‌কী তাঁর 'মানাকিবে আবু হানীফা' গ্রন্থে এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পক্ষান্তরে সৎ ও ইনসাফ ভিত্তিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ একটি বিরাট গুনাহ। এই ধরনের বিদ্রোহ দমন করার ব্যাপারে সরকারের সাথে সহযোগিতা করা সমস্ত মুমিন সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য। মাঝামাঝি অবস্থায় যখন সরকার ন্যায়নিষ্ঠ নয়, কিন্তু অন্যদিকে সৎ ব্যক্তিদের বিপ্লবের সম্ভাবনাও সুস্পষ্ট নয়, এ ক্ষেত্রে অবস্থা সংশয়িত হয়ে যায়। ফিক্‌হের ইমামগণ এ অবস্থায় বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করেছেন। কেউ কেউ এ অবস্থায় কেবল হক কথা বলে দেয়াটাই যথেষ্ট মনে করেছেন, কিন্তু বিদ্রোহকেও বৈধ গণ্য করেছেন। অনেকে বিদ্রোহ বৈধ করেছেন এবং শাহাদতবরণ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আবার অনেকে সংশোধনের আশায় সরকারের সাথে সহযোগিতাও করেছেন।

ছয়. ন্যায়নিষ্ঠ সরকারের মুকাবিলায় যারা বিদ্রোহ করে তারা যদি মসজিদে আশ্রয় নেয়, তাহলে তাদেরকে অবরোধ করা যেতে পারে। যদি তারা ভেতর থেকে গোলাবর্ষণ করে, তাহলে তাদের জবাবে গোলাবর্ষণ করা যেতে পারে। তবে যদি তারা বাইতুল হারামে আশ্রয় নেয়, তাহলে এ অবস্থায় কেবলমাত্র তাদেরকে অবরোধ করে তাদের এতোটা সংকটে ফেলা যেতে পারে, যার ফলে তারা নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। হারাম শরীফে রক্তপাত করা বা পাথর ও গোলাবর্ষণ করা জায়েয নয়। বিপরীত পক্ষে, একটি যালিম সরকারের অস্তিত্বই হচ্ছে মূর্তিমান গুনাহ। আর তার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের জন্য প্রচেষ্টা চালানোও কেবল গুনাহ বৃদ্ধিই করে মাত্র।

সাত. কুরআন ও সুন্নাহ কর আরোপ করার জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থার নির্দেশ দেয়নি। বরং মুসলমানদের ওপর ইবাদত হিসেবে যাকাত এবং অমুসলিমদের ওপর আনুগত্যের চিহ্ন হিসেবে জিযিয়া কর আরোপ করার পর দেশের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে জনগণের ওপর কর আরোপ করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারের ওপর ন্যস্ত করেছে।

খারাজ, শুল্ক, আমদানী ও রপ্তানী কর, এগুলো একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কুরআন ও সুন্নাহ শরীয়তের বিধান হিসেবে এগুলো আরোপ করেনি বরং ইসলামী হুকুমতগুলো নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলো আরোপ করেছিলো। এ ব্যাপারে আসল মানদন্ড হচ্ছে দেশের প্রকৃত প্রয়োজন। কোনো শাসক নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যদি কোনো কর আদায় করে তাহলে তা হারাম গণ্য হবে। দেশের যথার্থ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য দেশবাসীর সমর্থন নিয়ে কর আরোপ করলে তা বৈধ ও হালাল বিবেচিত হবে।

আট. জী হ্যাঁ। কেবল এটিই নয় বরং নিজের পূর্বের সিদ্ধান্তগুলোও বদলাতে পারেন।

নয়. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ পার্থিব রাজনীতির দৃষ্টিতে বড়ই যোগ্য ছিলেন, আর দীনি দৃষ্টিতে একজন নিকৃষ্ট যালিম শাসক।

দশ. হ্যাঁ, ৭ নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে। [তর্জমানুল কুরআন, মে ১৯৫৯]

খ. আল খিলাফাত না আল হুকুমাত

প্রশ্ন ঃ বিংশ শতাব্দীতেও যদি ইসলামের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়, তাহলে বর্তমান ভাবধারা ও মতাদর্শের স্থলে ইসলামের ভাবধারা ও মতাদর্শকে অভিষিক্ত করতে গিয়ে যে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে, তা নিরসনে ইবনে খালদুনের আল হুকুমাহ ও [আল খিলাফাহ] এই দুই তত্ত্বের কোনটি বেশী সহায়ক হবে?

জবাব ঃ বর্তমান যুগে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার পথে যে জিনিস প্রধান অন্তরায় এবং যে ভাবধারা ও মতাদর্শ তার পথ আগলে রয়েছে, তা পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, মুসলিম দেশগুলোতে তা পশ্চিমা জাতিসমূহের দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক আধিপত্য ও প্রভুত্বের সৃষ্টি। পশ্চিমা জাতিগুলো যখন আমাদের দেশগুলোতে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তখন তারা আমাদের আইন কানুন বাতিল করে নিজেদের আইন চালু করে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে তারা নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী লোকদের তারা বরখাস্ত করে এবং তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে বেরুনো লোকদের জন্য সকল সরকারী চাকুরী নির্দিষ্ট করে দেয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তারা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানাদি ও রীতিনীতি চালু করে এবং অর্থনীতির ময়দানও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক বাহকদের জন্য হয়ে যায় একচেটিয়া। এভাবে তারা আমাদের ভেতরেই আমাদের সভ্যতা, কৃষ্টি ও আদর্শ বিবর্জিত একটি জেনারেশন গড়ে তোলে যা ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী শিক্ষা ও ঐতিহ্য থেকে কাজেকর্মেও যেমন সম্পর্কচ্যুত, আবেগ অনুভূতিতে এবং মন মানসিকতায়ও তেমনি সংশ্রবহীন। মূলত এ জিনিসটাই আমাদের ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনে অন্তরায়। আর এ কারণেই এ ভ্রান্ত ধারাণারও সৃষ্টি হয়েছে যে, ইসলাম বর্তমান যুগে কার্যোপযোগী নয়। যাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা অনৈসলামিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে, তাদের ইসলামকে অবাস্তব ও অনুপযোগী বলা ছাড়া আর কিইবা বলার থাকতে পারে? কেননা তারা ইসলামকে জানেওনা, তদনুসারে কাজ করার জন্যও তাদেরকে গড়ে তোলা হয়নি। যে জীবন ব্যবস্থার উপযোগী করে তাদেরকে

তৈরী করা হয়েছে সেটাকেই কার্যোপযোগী ভাবা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় অনিবার্যভাবে আমাদের সামনে দুটো পথই থাকে। হয় আমাদেরকে জাতি হিসেবে কাফির হয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং অনর্থক ইসলামের নাম নিয়ে বিশ্বকে ধোঁকা দেয়া বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে [মুনাফিকীর সাথে নয়] আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার পুংখানুপুংখ বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, এর কোন্ কোন্ উপাদান আমাদেরকে ইসলাম থেকে বিপথগামী করে দেয় এবং এতে কি কি পরিবর্তন এনে আমরা ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার যোগ্য লোক বানানোর কাজ এর দ্বারা নিতে পারি। আমি অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের শিক্ষা কমিশন এ বিষয়ের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেয়নি। অথচ এ সমস্যাটা খুব ঠান্ডা মাথায় বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিলো। কেননা যতক্ষণ আমরা এ সমস্যার সমাধান না করবো ততক্ষণ ইসলামী বিধানের বাস্তবায়নের পথ কিছুতেই সুগম হবেনা।

ইবনে খালদুনের কোনো মতবাদই এ সমস্যার সমাধানে সহায়ক হবেনা। কেননা এ সমস্যার যে গুণগত অবস্থা এখন সৃষ্টি হয়েছে, তা ইবনে খালদুনের আমলে সৃষ্টি হয়নি। সমস্যাটার প্রকৃত ধরন এই যে, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ বিদায় নেয়ার সময় আমাদের দেশে তাদের নিজস্ব শিক্ষা সংস্কৃতির দুধকলা দিয়ে পোষা এমন একটি শ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে রেখে গেছে, যারা দৈহিক দিক দিয়ে আমাদের জাতির অংশ হলেও জ্ঞান, চিন্তা, মানসিকতা ও চরিত্রের দিক দিয়ে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদের যথার্থ উত্তরাধিকারী। এ শ্রেণীর শাসন থেকে যে সমস্যার উদ্ভব হয় তার সমাধান এতো জটিল যে, তার সমাধান ইবনে খালদুনের মতবাদের সাধ্যাতীত। এজন্য অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় চিন্তা ভাবনা করা এবং পরিস্থিতি বুঝে সংস্কারের নতুন পথ উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। [তরজামানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৬১]

গ. ইসলামী রাষ্ট্র এবং পোপতন্ত্রের আদর্শিক পার্থক্য

প্রশ্নঃ আবু সায়ীদ বযমী সাহেব 'রিসালায়ে হক' নামক সাময়িকীতে তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

সেটাও ইসলামী রাজনীতির একটি ধারণা, ইদানীং মাওলানা আবুল আলা মওদূদী খুব জোরে শোরে যা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর পেশকৃত ইসলামী রাজনীতির মৌলিক দৃষ্টিকোণ হচ্ছে এই যে, সরকার জনগণের নিকট জবাবদিহী করবেনা। ঐতিহাসিক দিক থেকে এটা কোনো নতুন মূলনীতি নয়। ইউরোপে দীর্ঘকাল পর্যন্ত থিওক্রেসি [Theocracy] নামে এরি চর্চা হচ্ছিলো। রোমের প্রধান পোপের নেতৃত্ব এই ধারণারই ফলশ্রুতি। কিন্তু লোকেরা মনে করছে, যেহেতু খোদা কোনো বক্তব্য প্রকাশক প্রতিষ্ঠান নয়, তাই খোদার নামে যে ব্যক্তিই ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভ করে, সে খুব সহজেই তা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করতে পারে। মাওলানা মওদূদীর সমর্থকরা দাবী করছে যে তাদের উপস্থাপিত রূপরেখা পোপতন্ত্রের চাইতে ভিন্নতর, কিন্তু যেহেতু সে সরকার জনগণের সামনে জবাবদিহী করতে বাধ্য নয় এবং এর ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে ভ্রান্ত মনে করে, তাই এ ধারণা এবং পোপতন্ত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকেনা

অতপর বযমী সাহেব নিজের পক্ষ থেকে একটা সমাধান পেশ করেন। কিন্তু সেটাও সন্তোষজনক নয়। মেহেরবাণী করে তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করে সঠিক দৃষ্টিকোণ পেশ করবেন।

জবাব ঃ বযমী সাহেব সম্ভবত আমার "ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ" বইটি পড়ে দেখেননি। পড়লে তিনি দেখতেন, আমার নীতির উপর তিনি যেসব আপত্তি তোলেছেন, সেগুলোর পূর্ণ জবাব তাতে রয়েছে। কিন্তু তিনি যদি বইটি পড়ে থাকেন, তবে তাঁর মন্তব্যের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই আমার করার নেই। এ ব্যাপারে আমার সে বইটির নিম্নোক্ত বাক্যগুলো দেখুন ঃ

"কিন্তু ইউরোপ যে থিওক্রেসির সাথে পরিচিত, ইসলামী থিওক্রেসি তার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ইউরোপ তো সেই থিওক্রেসীর সাথেই পরিচিত, যাতে একটা বিশেষ ধর্মীয় শ্রেণী খোদার নাম করে নিজেদেরই মনগড়া আইন কানুন চালিয়ে দেয় এবং কার্যত সকল নাগরিকের উপর নিজেদের খোদায়ী চাপিয়ে দেয়। এ রকম রাষ্ট্রকে খোদায়ী রাষ্ট্র বলার পরিবর্তে শয়তানী রাষ্ট্র বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত। পক্ষান্তরে ইসলামী থিওক্রেসি এর চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সেটা কোনো বিশেষ ধর্মীয় শ্রেণীর মুষ্টিবদ্ধ থাকেনা, বরঞ্চ তা থাকে সাধারণ মুসলমানদের করায়ত্বে। আর মুসলমান সাধারণ এ রাষ্ট্রকে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রসূলের সুন্নাহ্ মুতাবিক পরিচালিত করে। আমাকে যদি একটি নতুন পরিভাষা তৈরী করার অনুমতি দেয়া হয় তবে আমি এ পদ্ধতির রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে "খোদায়ী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র" [Theo Democratic state] নামে অবিহিত করবো। কেননা এতে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব এবং তার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধীনে মুসলমানদেরকে একটি সীমিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দান করা হয়েছে। এর কার্যনির্বাহী পরিষদ তৈরী হবে মুসলমানদের মতামতের ভিত্তিতে। এ পরিষদকে পদচ্যুত করার ক্ষমতাও মুসলমানদেরই হাতে থাকবে। যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয় এবং সেসব বিষয়, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্‌র শরীয়তে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ বর্তমান নেই- সেগুলো মুসলমানদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে ফায়সালা হবে। আর যেখানে খোদায়ী কানুনের ব্যাখ্যা দান প্রয়োজন হবে সেখানে কোনো তবকা এবং গোত্রের লোকেরা নয়, বরঞ্চ সর্ব সাধারণ মুসলমানদের মধ্য থেকে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ব্যাখ্যা প্রদানের জন্যে উপযুক্ত বিবেচিত হবেন, যিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন।"

অতপর এ বাক্যগুলোর নিচে আমি একটি টীকায় আরো স্পষ্ট করে বলেছি ঃ

খ্রীষ্টান পাদ্রী ও পোপদের নিকট ঈসা আলাইহিস্ সালামের কয়েকটি নৈতিক শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নেই। মানুষের বাস্তব ধর্ম ও সামাজিক জীবনের জন্যে মূলত তাদের নিকট কোনো শরীয়তই ছিলোনা। তাই তারা নিজেদের মর্জী মতো নিজেদের লালসা ও ইচ্ছা বাসনা অনুসারে আইন তৈরী করতো এবং সেটাকেই আল্লাহ্‌র দেয়া আইন বলে চালু করতো।

যে ব্যক্তি খৃষ্টান ধর্ম এবং পোপতন্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এ বাক্যগুলোতে আমি যেদিকে ইংগিত করেছি, তিনি তা বুঝতে ভুল করতে পারেননা। ইউরোপের পোপতন্ত্র ছিলো সেন্ট পলের অনুসারী। ইনি মূসা আলাইহিস্ সালামের

শরীয়তকে অভিশপ্ত আখ্যায়িত করে কেবল সেসব নৈতিক শিক্ষার উপর খৃষ্টবাদের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেন যা নিউ টেষ্টমেন্টে পাওয়া যায়। এসব নৈতিক শিক্ষার মধ্যে এমন কোনো আইন কানুন বর্তমান নেই, যদ্বারা একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করা যেতে পারে। কিন্তু পোপরা যখন ইউরোপে বিনা কারণে বা কারণে থিওক্রেসী প্রতিষ্ঠা করলো, তখন তারা একটি আইনের বিধানও তৈরী করলো। একথা সুস্পষ্ট যে তাদের এ বিধান কোনো অহী বা ইলহাম থেকে গৃহীত হয়নি। বরঞ্চ এ ছিলো তাদের মনগড়া জিনিস। এতে তারা যে আকীদাহ বিশ্বাসের বিধান, ধর্মীয় কর্মকান্ড ও আচার অনুষ্ঠানে যেসব নযর নিয়াজ এবং যেসব সামাজিক বিধি বন্ধন প্রভৃতি তৈরী করে নিয়ে ছিলো, তার কোনোটিই আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে গ্রহণের কোনো প্রমাণ তাদের নিকট ছিলোনা। এমনি করে আল্লাহ্ এবং বান্দার মাঝখানে তারা ধর্মীয় নেতাদের যে স্থায়ী মিডিয়া নির্ধারণ করেছে, সেটাও সম্পূর্ণই তাদের মনগড়া। এ ছাড়া গীর্জা ব্যবস্থার কর্মীদের জন্যে তারা যেসব ক্ষমতা ও অধিকার ধার্য করেছে এবং লোকদের উপর ধর্মীয় টেক্স ধার্য করেছে এগুলোও তারা গ্রহণ করেছে তাদের নিজেদের ইচ্ছা আকাংখা এবং কামনা বাসনা থেকে। এ ধরনের ব্যবস্থাকে তারা যতোই থিওক্রেসী নাম দিক না কেন প্রকৃত পক্ষে এটা থিওক্রেসী নয়। এটাকে ইসলামী হুকুমাত বা খোদায়ী শরীয়ত ভিত্তিক রাষ্ট্রের সাথে কিভাবে তুলনা করা যেতে পারে? ইসলামী রাষ্ট্র তো কিতাব ও সুন্নাতের এক অপরিবর্তনীয় রদবদল অযোগ্য সমুদ্ভাসিত চিরস্থায়ী শাশ্বত বিধান। এ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব বিশেষ কোনো ধর্মীয় শ্রেণী ইজারা করে নেয়নি।

বযমী সাহেবের এ বক্তব্য আরো অধিক বিস্ময়কর, যাতে তিনি বলেছেন যে, আমি ইসলামের খলীফাকে সে পজিশন দিয়েছি, খৃষ্টবাদে পোপের যে পজিশন রয়েছে এবং আমি খলীফাকে জনসাধারণের নিকট জবাবদিহী করতে হবেনা বলে মনে করেছি। এর জবাবে আমার সে বইটি থেকেই আরো কয়েকটি অংশ উল্লেখ করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি :

> "যারা ঈমান এনে আমলে সালেহ্ (যোগ্যতার সাথে কাজ) করবে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তিনি তাদের তেমনি রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করবেন, যেমন দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের।" (সূরা আননূর : ৫৫)

এ আয়াতটি উল্লেখ করে আমি লিখেছি :

> "এ আয়াত থেকে দ্বিতীয় যে তত্ত্বটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে এই যে, খলীফা নিযুক্তির প্রতিশ্রুতি সকল মুমিনের সংগেই দেয়া হয়েছে। 'মুমিনদের কোনো একজনকে খলীফা বানাবো'- আয়াতে এ কথা বলা হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মূলত সকল মুমিনই খিলাফতের দায়িত্বশীল খলীফা। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মুমিনদের যে খিলাফত দান করা হয়েছে তা সার্বজনীন খিলাফত।"

আরেকটু সামনে অগ্রসর হয়ে আমি লিখেছি :

> "এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই খলীফা। মুসলমান জনসাধারণের খিলাফত অধিকারকে হরন করে কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টি নিজেরাই নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক ও হর্তাকর্তা হয়ে বসা সম্ভব নয়। শাসন শৃংখলা স্থাপনের জন্যে ইসলামী সমাজের প্রত্যেক

নাগরিক-ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী প্রত্যেক খলীফা নিজ নিজ খিলাফত অধিকার যখন স্বেচ্ছায় ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে, তখন সে-ই ইসলামী সমাজের শাসনকর্তা। সে ব্যক্তি এক দিকে আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী থাকে। অপর দিকে দায়ী থাকে জনগণ তথা সাধারণ খলীফাদের নিকট যারা নিজেদের খিলাফত অধিকার তার হাতে সোপর্দ করেছে।"

অতপর বইয়ের অন্য স্থানে আমি স্পষ্ট করে বলেছি ঃ

"ইসলামী রাষ্ট্রের ইমাম, আমীর বা রাষ্ট্রপতির প্রকৃত মর্যাদা হচ্ছে এই যে, স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহ্ প্রদত্ত যে খিলাফত লাভ করেছে, সে ক্ষমতা সে নিজ সমাজ থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে তাঁর হাতে স্বেচ্ছায় আমানত রাখে মাত্র। তাকে যে খলীফা নামে অভিহিত করা হয় তার অর্থ এ নয় যে, তিনি একাই আল্লাহ্‌র খলীফা। বরঞ্চ সর্ব সাধারণ মুসলমানের স্বতন্ত্র খিলাফত তার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে বলেই তাকে খলীফা বলা হয় মাত্র।"

অতপর নিম্নোক্ত প্যারাটিও আমার বইটিতে বর্তমান আছে ঃ

"আমীর সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। প্রত্যেক মুসলমানই তার সমালোচনা করতে পারে। কেবল তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম সম্পর্কেই যে সমালোচনা করা যাবে তা নয়, বরঞ্চ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও সমালোচনা করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। [প্রয়োজনে] আমীরকে পদচ্যুতও করা যাবে। আইনের দৃষ্টিতে একজন সাধারণ নাগরিকের মতোই তার মর্যাদা। তার বিরুদ্ধে আদালতে মুকাদ্দমা দায়ের করা যাবে। আদালতকে তার সাথে বিশেষ সম্মানের আচরণ করতে হবে এ অধিকার তিনি রাখেননা। আমীরকে পরামর্শ করে কাজ করতে হবে। এমন লোকদের নিয়ে পরামর্শ পরিষদ গঠন করতে হবে, যারা হবে সাধারণ মুসলমানদের আস্থাভাজন। মজলিসে শূরার সদ্যদেরকে মুসলমানরা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার ব্যাপারেও শরয়ী কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সর্বাবস্থায় সর্বসাধারণ মুসলমানরা একথার প্রতি লক্ষ্য রাখবে যে, আমীর তার এই ব্যাপক ক্ষমতা তাকওয়া এবং খোদা ভীতির সাথে ব্যবহার করছে, নাকি নিজের খেয়াল খুশী মতো? অন্য কথায়, জনগণের রায় ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরকে পদচ্যুত করতে পারে।"

এসব সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরও কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের থিওক্রেসীকে রোমের পাদ্রীদের তৈরী করা থিওক্রেসীর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করে, তবে আমরা তো আর তাকে তার স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার রাখিনা। কিন্তু একথা বলার অধিকার অবশ্যি রাখি যে, তার এই মতামত জ্ঞান, যুক্তি ও দলিল প্রমাণের সীমা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

ঘ. ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্র[১]

---

১. ১৯৫২ সালের ২৪শে নভেম্বর করাচী বার সমিতির পক্ষ থেকে যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। ঘ তে বর্ণিত প্রশ্নোত্তর সেখান থেকে নেয়া হয়েছে। -সংকলক

প্রশ্ন ঃ খিলাফতে রাশেদার পর মুসলমানদের যেসব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলো ইসলামী রাষ্ট্র ছিলো, না অনৈসলামিক রাষ্ট্র?

উত্তর ঃ আসলে সেগুলো পুরোপুরি ইসলামী রাষ্ট্রও ছিলোনা, পুরোপুরি অনৈসলামিক রাষ্ট্রও ছিলোনা। ঐসব রাষ্ট্রে ইসলামী শাসনতন্ত্রের দুটো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে বিকৃত করে ফেলা হয়েছিলো। প্রথমত ঃ নেতৃত্বকে নির্বাচিত হতে হবে। দ্বিতীয়ত ঃ সরকারের কর্মকান্ড পরামর্শের ভিত্তিতে চালাতে হবে।

এছাড়া ইসলামী শাসনতন্ত্রের বাদবাকী অংশও যথাযথ প্রাণশক্তি সহকারে বহাল ছিলোনা। তবে তাকে পরিবর্তিত বা রহিতও করা হয়নি। ঐসব রাষ্ট্রে কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস বলে গণ্য করা হয়েছিলো। আদালতগুলোতে ইসলামী আইনই কার্যকর হতো এবং ইসলামী আইন বাতিল করে তার জায়গায় মানব রচিত আইন চালু করার ধৃষ্টতা মুসলিম শাসকরা কখনো দেখায়নি। আর যদিও বা কখনো কোনো শাসক এই স্পর্ধা দেখিয়ে থাকে। তবে ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কোনো না কোনো বান্দা তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ পরিচালনা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ মহাপাপের উচ্ছেদ সাধিত হয়েছে। ইবনে তাইমিয়া ও মুজাদ্দিদে আলফে সানী [রঃ] এ ধরনের ঘৃণ্য উদ্যোগের বিরুদ্ধে কিরূপ ভূমিকা পালন করেছেন, ইতিহাস তার সাক্ষী রয়েছে।

৩. জাতীয় রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ[১]

ক. আইন সভায় মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রশ্ন

আমার কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, মহিলাদের আইন সভার সদস্য হওয়া কোন্ ইসলামী বিধি বলে নিষিদ্ধ? আইন সভাকে কুরআন ও হাদীসের কোন্ উক্তিতে শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে?

এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে একটি বিষয় আমাদের খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সেটি হলো, যে আইন সভার সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার সম্পর্কে বিতর্ক চলছে, সেই আইন সভার চরিত্র ও প্রকৃতি কি ধরনের?

এসব পরিষদকে আইন সভা নামে আখ্যায়িত করার কারণে এই ভুল ধারণা জন্মে যে, এসব আইন সভার কাজ শুধু আইন প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অতঃপর মনের অভ্যন্তরে এই ভুল ধারণাকে বহাল রেখে একজন মানুষ দেখতে পায় যে, সাহাবায়ে কিরামের আমলে মহিলারা আইনগত বিষয়ে আলাপ আলোচনা, কথাবার্তা ও মতামত প্রকাশ করতেন, অনেক সভায় স্বয়ং খলীফারাও তাদের মতামত নিতেন এবং তার মূল্যও দিতেন। অতঃপর সে অবাক হয়ে ভাবে যে, তাহলে আজ ইসলামী আদর্শের নামে এ ধরনের পরিষদগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণকে ভ্রান্ত বলা যায় কিভাবে? কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বর্তমান যুগে আইন সভা নামে আখ্যয়িত পরিষদগুলোর কাজ কেবল আইন প্রণয়নে সীমাবদ্ধ নয়, বরং কার্যত এই আইন সভাই সমগ্র দেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই পরিষদই মন্ত্রীসভা ভাংগে ও গড়ে, রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নিদ্ধারণ করে। অর্থনীতির সমস্যাগুলোর সমাধান করে এবং যুদ্ধ ও সন্ধির চাবিকাঠি তারই হাতে নিবদ্ধ থাকে। এ দিক থেকে এই পরিষদ শুধু ফকীহ বা মুফতী নয় বরং রাষ্ট্রের "পরিচালক শক্তি"।

এবার আসুন দেখা যাক, কুরআন এ "পরিচালক" এর মর্যাদা কাকে দেয় এবং কাকে দেয়না।

সূরা নিসায় আল্লাহ্ বলেন ঃ

"পুরুষরা নারীদের পরিচালক। আল্লাহ্ তাদের একজনকে অপরজনের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন আর যেহেতু পুরুষ স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহ করে। সৎ নারীরা অনুগত ও আল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণের আওতাধীনে অনুপস্থিতাবস্থায় রক্ষকের ভূমিকা পালন করে।" (আয়াত ঃ ৩৪)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুরুষকেই পরিচালকের মর্যাদা দিয়েছেন। আর সৎ স্ত্রীদের দুটো গুণ বর্ণনা করছেন, এক. আনুগত্যশীলতা, দুই. পুরুষের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্ যে সব জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণ করাতে চান, তার রক্ষণাবেক্ষণ করা।

আপনি হয়তো বলবেন, এটা তো পারিবারিক শৃংখলার জন্য, রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য নয়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ প্রথমতঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা এ কথা বলেননি যে, পুরুষ শুধু ঘরোয়া বা পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীর পরিচালক, বরং কথাটা সাধারণ ও শর্তহীনভাবে বলেছেন। তাছাড়া এ ব্যাখ্যা যদি মেনে নেয়াও হয় যে, পুরুষকে পারিবারিক জীবনে নারীর পরিচালক করা হয়েছে, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে যে, যে নারীকে আল্লাহ্ ঘরের ভেতরেও পরিচালিকা ও নেত্রী বানালেননা, বরং অনুগত করে রাখলেন, আপনারা তাকে গোটা দেশের পরিচালকে পরিণত করতে চান কোন্ যুক্তিতে? গৃহাভ্যন্তরের পরিচালকের দায়িত্বের তুলনায় তো দেশের পরিচালকের দায়িত্ব অনেক বড়। আল্লাহ্র সম্পর্কে কি আপনি এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, তিনি স্ত্রী লোককে একটা গৃহের পরিচালিকা বানাবেননা, অথচ লক্ষ লক্ষ গৃহের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল দেশের পরিচালিকা বানিয়ে দেবেন?

আরো দেখুন, কুরআন স্পষ্ট ভাষায় নারীর কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করে দিচ্ছে এই বলে ঃ

"নিজ নিজ গৃহে সসম্মানে অবস্থান করো এবং অতীত জাহিলিয়াতের ন্যায় সেজেগুজে বাইরে বের হয়োনা।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৩)

আপনি হয়তো আবারও বলবেন যে, এ হুকুম তো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহের মহিলাদেরকে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু আমি জানতে চাই যে, আপনার মহত ধারণা অনুসারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহের মহিলাদের মধ্যে কি এমন কোনো গুরুতর দোষ ছিলো যার দরুণ গৃহের বাইরের দায়িত্ব পালনে তারা অক্ষম ছিলেন? আর অন্য মহিলারা কি এদিক দিয়ে তাদের চেয়ে কোনো শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী? এখন যদি এ সংক্রান্ত সকল আয়াতকে শুধুমাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহের মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ধরে নিই, তাহলে স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তেও আসতে হয় যে, অন্যান্য মুসলিম মহিলাদের জন্য জাহিলী কায়দায় সেজেগুজে বাইরে বের হওয়া জায়েয। এটা কি আপনি মেনে নেবেন? তাদের জন্য কি ভিন্ন পুরুষদের সাথে এমনভাবে কথা বলা জায়েয, যাতে তাদের মনে আকর্ষণ জন্মে? আল্লাহ্ কি স্বীয় নবীর গৃহ বাদে সকল মুসলমানের গৃহকে "অপবিত্র" দেখতে চান?

এরপর হাদীসের প্রসংগে আসুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ঃ

"যখন তোমাদের নেতা ও শাসকগণ তোমাদের সবচেয়ে অসৎ লোক হবে, যখন তোমাদের ধনী লোকেরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের সামষ্টিক বিষয়ের দায়িত্ব স্ত্রী লোকদের হাতে থাকবে। তখন পৃথিবীর পেট হবে তোমাদের জন্য তার পিঠের চেয়ে উত্তম ।" (তিরমিযী)

"হযরত আবু বকর থেকে বর্ণিত যে, যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন, ইরানীরা তাদের সম্রাটের মেয়েকে সম্রাট বানিয়েছে, তখন তিনি বললেন, যে জাতি কোনো নারীকে নিজেদের শাসক বানায় সে জাতি কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা।" (বুখারী)

এই উভয় হাদীস আল্লাহ্ তায়ালার "পুরুষরা স্ত্রীদের পরিচালক" এই উক্তির যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করে। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাজনীতি ও দেশ শাসন নারীর কর্মসীমা বহির্ভূত। প্রশ্ন ওঠে যে, তাহলে স্ত্রীর কর্মসীমা কী? এর জবাব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত বাণীসমূহ থেকে পাওয়া যায় ঃ

"স্ত্রী লোক স্বীয় স্বামীর ঘরবাড়ী ও সন্তানদের রক্ষক। তাদের সম্পর্কে তাকে জবাবদিহী করতে হবে।" (আবু দাউদ)

"তোমরা সসম্মানে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করো" এই আয়াতাংশের যথার্থ তাফসীর উপরোক্ত হাদীসে পাওয়া যাচ্ছে। আরো কয়েকটি হাদীসে মহিলাদেরকে রাজনীতি ও দেশ শাসনের চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ের গৃহবহির্ভূত কর্মকান্ডও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঐ হাদীসগুলো দ্বারা উক্ত আয়াতাংশের আরো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ ধরনের দুটি হাদীস নিম্নে দিলাম ঃ

"জামায়াতে জুময়ার নামায পড়া প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য কেবল চার ব্যক্তি ছাড়া ঃ দাস, নারী, শিশু ও রোগী।" (আবু দাউদ)

"উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত যে, আমাদেরকে কফিনের সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।" (বুখারী)

যদিও আমাদের কাছে নিজ দৃষ্টিভংগির সপক্ষে অকাট্য ও সুদৃঢ় যুক্তি প্রমাণও রয়েছে এবং চ্যালেঞ্জ দিলে আমরা সে সকল যুক্তি তোলে ধরতে পারি। কিন্তু প্রথমতঃ সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ আমি কোনো মুসলমানের এ অধিকার স্বীকার করতে প্রস্তুত নই যে, সে আল্লাহ্ ও রসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশ জানার পরও তা পালন করার আগে এবং পালন করার শর্ত স্বরূপ যুক্তি প্রমাণ চাইতে পারে। প্রকৃতই মুসলমান হয়ে থাকলে তাকে প্রথমে হুকুম পালন করতে হবে। তারপর নিজের বিবেকের তৃপ্তির জন্য যুক্তি প্রমাণ চাইতে পারে। কিন্তু সে যদি বলে যে, আমাকে আগে যুক্তি দিয়ে সন্তুষ্ট করো, নচেৎ আমি আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম মানবোনা, তাহলে আমি তাকে মুসলমানই স্বীকার করিনা, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকারের তো প্রশ্নই ওঠেনা। হুকুম পালনের শর্ত স্বরূপ যে ব্যক্তি যুক্তির দাবী করে তার স্থান ইসলামের গন্ডীর ভেতরে নয়, বাইরে।

রাজনীতি ও দেশ শাসনে নারীর অধিকারকে যারা শরীয়তসম্মত প্রমাণ করতে চায়, তাদের একমাত্র যুক্তি এই যে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হত্যার বিচার দাবী করে হযরত আলীর বিরুদ্ধে উষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু প্রথমত ঃ এই যুক্তি নীতিগতভাবেই ভ্রান্ত। কেননা যে ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান সে ব্যাপারে কোনো সাহাবীর ব্যক্তিগত কাজ, যদি সেই নির্দেশের বিপরীত প্রতীয়মান হয়, তবে কোনো মতেই তা

গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। সাহাবায়ে কিরামের পবিত্র আদর্শ জীবন নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য আলোর মশাল স্বরূপ। কিন্তু সেটা শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, আমরা সেই মশালের আলোতে আল্লাহ্ ও রসূলের পথে চলবো- এ উদ্দেশ্যে নয় যে, আল্লাহ্ ও রসূলের পথ নির্দেশ বর্জন করে তাঁদের কারো ব্যক্তিগত পদস্খলনের অনুসরণ করবো। তাছাড়া যে কাজকে সে যুগেরই বড় বড় সাহাবাগণ ভ্রান্ত আখ্যায়িত করেছিলেন এবং যে কাজের জন্য পরবর্তীকালে স্বয়ং হযরত আয়েশাও অনুতপ্ত হয়েছিলেন, তাকে কিভাবে ইসলামে একটা নতুন বিদয়াতের সূত্রপাত করার জন্য যুক্তি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে!

হযরত আয়েশার এই উদ্যোগের খবর পাওয়া মাত্রই উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা তাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা ইবনে কুতাইবা স্বীয় "আল ইমামাতু ওয়াস্ সিয়াসাহ" নামক গ্রন্থে এবং ইবনে আব্দু রব্বিহি স্বীয় "ইকদুল ফরীদ" নামক গ্রন্থে পুরোপুরি উদ্ধৃত করেছেন। সে চিঠিটা পড়ে দেখলে বুঝা যাবে যে, কত দৃঢ়তা ও তেজস্বীতার সাথে তিনি বলেছেন ঃ

> কুরআন আপনাকে সংকুচিত করে দিয়েছে, আপনি নিজেকে প্রসারিত করবেননা। ....আপনার কি মনে নেই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামে বাড়াবাড়ি করতে আপনাকে নিষেধ করেছেন।..... রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আপনাকে এ ভাবে উটের পিঠে চড়ে কোনো মরুভূমিতে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটাছুটি করতে দেখতেন, তাহলে আপনি তাঁকে কি জবাব দিতেন?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের এ উক্তিটাও স্মরণ করার মতো যে, "আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার জন্য তাঁর গৃহ তার উটের হাওদার চেয়ে উত্তম।"

বুখারী শরীফে হযরত আবু বকরা (রা) এই উক্তি লক্ষ্য করুন যে, "আমি উষ্ট্র যুদ্ধের বিভ্রাটে পড়া থেকে শুধু এজন্য বেঁচে গিয়েছিলাম যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীটি আমার মনে পড়ে গিয়েছিলো, যে জাতি নিজের সামষ্টিক কর্মকান্ডের দায়িত্ব কোনো নারীর হাতে সোপর্দ করে, সে জাতির কল্যাণ নেই।"

সে যুগে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর চেয়ে বেশী শরীয়তের পারদর্শী আর কেউ ছিলোনা। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় হযরত আয়েশাকে লেখেন, আপনার এ উদ্যোগ শরীয়তের সীমানা বহির্ভূত। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা অতি উচ্চ স্তরের বিদুষী ও বিচক্ষণ মহিলা হওয়া সত্ত্বেও জবাবে কোনো যুক্তি প্রমাণ পেশ করতে পারেননি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছিলেন, "একথা সত্য যে, আপনি আল্লাহ ও রসূলের খাতিরেই ক্রুদ্ধ হয়ে বাইরে বেরিয়েছেন। কিন্তু আপনি এমন একটা কাজের পেছনে লেগেছেন, যার দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পণ করা হয়নি। যুদ্ধ ও সমাজ সংস্কারের সাথে নারীদের কী সম্পর্ক! আপনি হযরত উসমানের হত্যার বিচার দাবী করছেন, কিন্তু আমি সত্য বলছি যে, যে ব্যক্তি আপনাকে এই বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং এই গুনাহর কাজে প্ররোচিত করেছে, সে আপনার জন্য উসমানের হত্যাকারীদের চেয়ে বেশী পাপী।"

দেখুন, এই চিঠিতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত আয়েশার কাজকে সুস্পষ্ট ভাষায় শরীয়ত বিরোধী আখ্যায়িত করছেন। কিন্তু হযরত আশেয়া এর জবাবে শুধুমাত্র এই কথাটা বলতে পেরেছিলেন, "ঘটনা এখন এতোদূর গড়িয়ে গেছে যে, তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে কাজ হবেনা।"

তারপর উষ্ট্র যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটার পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সাথে দেখা করতে তাঁর উষ্ট্রের কাছে গেলেন, তখন তাকে বললেন ঃ

"হে উষ্ট্রারোহিনী! আল্লাহ্ আপনাকে ঘরে বসে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনি যোদ্ধার বেশে বাইরে বেরিয়ে এলেন!"

কিন্তু এ সময়েও হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলতে পারেননি যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে ঘরে বসে থাকতে বলেননি, রাজনীতি ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অধিকার আমাদের রয়েছে।

এ কথাও ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, অবশেষে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা অনুতাপ করতে থাকেন। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার স্বীয় গ্রন্থ 'আলইস্তীয়াবে' লিখেছেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে অনুযোগের সূরে বলেন, "তুমি কেন আমাকে এ কাজে যেতে বাধা দিলেনা?" তিনি জবাব দিলেন, "আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি [অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের] আপনার মতামতকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং আপনি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলতে পারবেন বলে আমার আশা ছিলোনা।" তখন উম্মুল মুমিনীন বললেন, "তুমি যদি আমাকে নিষেধ করতে তবে আমি বেরুতামনা।"

এরপর হযরত আয়েশার কাজ দেখিয়ে এই মর্মে যুক্তি প্রদর্শনের আর অবকাশ কোথায় যে, ইসলামে নারীকেও রাজনীতি ও দেশ শাসনের দায়িত্বের অংশীদার করা হয়েছে? অবশ্য যারা মনে করে দুনিয়ার বিজয়ী জাতিগুলো যে কাজ করে সেটাই সত্য ও সঠিক এবং যারা সবাই যেদিকে চলে সেদিকেই চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, তাদেরকে কে বলেছে যে, ইসলামকেও সাথে নিয়ে যাও? তাদের যেদিক ইচ্ছা হয় চলুক। কিন্তু এতোটুকু সৎ সাহস তো তাদের থাকা উচিৎ যে, তারা আসলে যাদের অনুসারী, তাদের নামটাই বলবে এবং যুক্তি প্রমাণ ছাড়া ইসলামের ওপর এমন কোনো জিনিস চাপাবেনা যা আল্লাহ্‌র কিতাব, রসূলের হাদীস এবং প্রথম শতাব্দীগুলোর ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করছে।

খ. ইসলামী রাষ্ট্রে মহিলাদের কর্মক্ষেত্র

প্রশ্ন ঃ ইসলাম যখন এই দাবীতেই সোচ্চার যে, সে চরম নাজুক মুহূর্তেও নারীকে একটা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে, তখন এ যুগের ইসলামী সরকার কি তাকে পুরুষদের সমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দেবেনা? এ যুগে নারীকে কি পুরুষের সমান উত্তরাধিকার দেয়া যাবে? তাদেরকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা অথবা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করে দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধিশালী করার অনুমতি দেয়া হবে কি? মনে করুন, ইসলামী

সরকার যদি নারীদের ভোটাধিকার দেয় এবং তারা সংখ্যাগুরু ভোটে মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়, তাহলে এই বিংশ শতাব্দীতেও কি তারা ইসলামী নীতি মুতাবিক সর্বোচ্চ পদে আসীন হতে পারবেনা? মহিলাদের সর্বোচ্চ পদ অলংকৃত করার দৃষ্টান্ত তো আজকাল ভুরি ভুরি। শ্রীলংকায় বর্তমানে মহিলা প্রধানমন্ত্রী রয়েছে। নেদারল্যান্ডের সর্বোচ্চ শাসকও একজন মহিলা। বৃটেনের রাজমুকুটও এক মহিলার মাথায় শোভা পাচ্ছে। রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে ভূপালের নবাবের বোন আবিদা সুলতানা দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমান বেগম রানা লিয়াকত আলী নেদারল্যান্ডে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত, মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত বৃটেনে ভারতের বর্তমান হাই কমিশনার রয়েছেন। এর আগে তিনি জাতিসংঘের সভাপতিও ছিলেন। মোগল সম্রাজ্ঞী নূর জাহান এবং ঝাঁসীর রানী রাজিয়া সুলতানার নজীরও লক্ষ্যণীয়। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের মহিষী হযরত মহল ইংরেজদের বিরুদ্ধে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন।

এভাবে নারীরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে যোগ্য প্রমাণ করেছেন। এই পটভূমিতে মুহতারামা ফাতেমা জিন্নাহ যদি আজ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়ে বসেন, তাহলে ইসলামী বিধানের আলোকে পাকিস্তানের ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় তা কি অনুমোদিত হবে? মহিলারা কি এখনো ডাক্তার, উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, সামরিক কর্মকতা, অথবা বৈমানিক হতে পারবেনা? নার্স হিসেবে মহিলারা রোগীদের কিরূপ পরিচর্যা করে সেটাও দেখার মতো। স্বয়ং ইসলামের প্রথম যুদ্ধে নারীরা যুদ্ধাহতদের পরিচর্যা করেছেন, পানি খাইয়েছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন। এমতাবস্থায় আজও কি ইসলামী রাষ্ট্রে অর্ধেক দেশবাসীকে বাড়ীর চৌহদ্দিতে বন্দিনী করে রাখা হবে?

জবাব ঃ ইসলামী সরকার দুনিয়ার কোনো ব্যাপারেই ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতির বিরুদ্ধে কাজ করার অধিকারী নয়। এমনকি তার ইচ্ছা করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, যদি তার পরিচালনায় প্রকৃত ইসলামী আদর্শের নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী ও বাস্তব অনুসারী লোকেরা নিয়োজিত থেকে থাকে। নারীর ব্যাপারে ইসলামের নীতি হলো, তারা সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে পুরুষের সমান, নৈতিক মানের বিচারেও সমান, আখিরাতে কর্মফলেও সমান, কিন্তু উভয়ের কর্মক্ষেত্র এক নয়। রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, সামরিক কর্মকান্ড এবং এ জাতীয় অন্যান্য যেসব কাজ পুরুষের কর্মক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেসব কর্মক্ষেত্রে নারীকে টেনে আনার অনিবার্য পরিণাম এই হবে যে আমাদের পারিবারিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে, যেখানে নারীর দায়িত্বই বেশী। তাছাড়া এতে নারীর ওপর দ্বিগুণ দায়িত্ব বর্তাবে। একদিকে তাকে তার প্রকৃতিগত দায়িত্বও পালন করতে হবে, যাতে পুরুষ কোনো ক্রমেই অংশীদার হতে পারেনা। তদুপরি পুরুষের দায়িত্বেরও অর্ধেক তার নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে। দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন তো কার্যত সম্ভব নয়। কাজেই অনিবার্যভাবে প্রথম পরিণতিটাই দেখা দেবে। পাশ্চাত্য জগতের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, সেখানে তা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে এবং তাদের পারিবারিক জীবনে ধস নেমেছে। অন্যের নির্বুদ্ধিতাকে চোখ বুজে অনুকরণ করা কোনো বুদ্ধিমত্তা নয়।

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার পুরুষের সমান হবার কোনো অবকাশ নেই। কুরআনের অকাট্য বিধান এ ব্যাপারে অন্তরায়। উভয়ের অংশ সমান হওয়া সুবিচারের পরিপন্থী। কারণ ইসলামী বিধানে পরিবারের লালন পালনের সমস্ত আর্থিক দায়দায়িত্ব পুরুষের ওপর চাপানো হয়েছে। স্ত্রীর মোহরানা এবং ভরণপোষণও তারই দায়িত্ব। অপরদিকে স্ত্রীর ওপর কোনো দায়দায়িত্বই ন্যস্ত হয়নি। এমতাবস্থায় কোন্ যুক্তিতে নারীকে পুরুষের সমান অংশীদার করা যেতে পারে।

নীতিগতভাবেই ইসলাম নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিপক্ষে। পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা চায় এমন কোনো সমাজ ব্যবস্থা অবাধ মেলামেশার পরিবেশ কামনা করেনা। পাশ্চাত্য জগতে এর শোচনীয় পরিণতি দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের মানুষের যদি সে পরিণতি ভোগ করার সাধ জেগে থাকে তবে সানন্দে তা ভোগ করুক। তাই বলে ইসলাম যে কাজ কঠোরভাবে নিষেধ করে, তা জোরপূর্বক বৈধ প্রমাণ করার কি দরকার পড়ছে?

ইসলামে যদি যুদ্ধের সময় নারীকে আহতদের পরিচর্যার কাজে লাগানো হয়ে থাকে, তবে তার অর্থ এটা হয়না যে, স্বাভাবিক অবস্থায়ও নারীকে অফিস আদালতে, কল কারখানায়, ক্লাবে ও পার্লামেন্টে নিয়ে আসতে হবে। পুরুষের কর্মক্ষেত্রে এসে নারীরা কখনো পুরুষের মুকাবিলায় সফল হতে পারেনা। কেননা তাদেরকে এসব কাজের জন্য তৈরীই করা হয়নি। এসব কাজের জন্য যে ধরনের নৈতিক ও মানসিক গুণাবলীর প্রয়োজন, তা মূলত পুরুষের মধ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

নারী যদি কৃত্রিমভাবে এসব গুণ কিছু কিছু অর্জনের চেষ্টাও করে তবে তার উল্টো ক্ষতি তার নিজের এবং সমাজের ওপর সমভাবে বর্তে। তার নিজের ক্ষতি এই যে, সে পুরোপুরি স্ত্রীও থাকেনা পুরোপুরি পুরুষও হতে সক্ষম হয়না। ফলে নিজের সহজাত কর্মক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যায়। সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি এই যে, যোগ্য কর্মীর বদলে সে অযোগ্য কর্মীকে কাজে নিয়োগ করে। নারীর আধা মেয়েলী ও আধা পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্য রাজনীতি ও অর্থনীতিকে বিপর্যস্থ করে তোলে। এ ব্যাপারে মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রাচীন মহিলার অবদান উল্লেখ করে লাভ কি? দেখতে হবে, যেখানে লক্ষ লক্ষ কর্মীর প্রয়োজন সেখানে সকল নারী মানানসই হবে কি? সম্প্রতি মিসরের সরকারী ও বাণিজ্যিক মহল অভিযোগ তুলেছে যে, সেখানে কর্মরত সর্বমোট এক লক্ষ দশ হাজার মহিলা কর্মোপযোগী প্রমাণিত হচ্ছেনা। পুরুষের তুলনায় তাদের তৎপরতা শতকরা ৫৫ ভাগের বেশী নয়। মিসরের বাণিজ্যিক মহলের সর্বব্যাপী অভিযোগ হলো, নারীদের কাছে কোনো কিছুর গোপনীয়তা রক্ষিত হয়না। পাশ্চাত্য জগতে গোয়েন্দাগিরির যেসব ঘটনা ঘটে, তাতে সাধারণত কোনো না কোনোভাবে মহিলারা জড়িত থাকে।

ইসলাম নারী শিক্ষায় বাধা দেয়না। যতো উচ্চ শিক্ষা সম্ভব তাদের দেয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত, তবে কয়েকটা শর্ত আছে। প্রথমত, তারা নিজেদের বিশেষ কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত হতে পারে, এমন শিক্ষাই তাদের দিতে হবে। হুবহু পুরুষদের শিক্ষা তাদেরকে দেয়া যাবেনা। দ্বিতীয়ত, সহশিক্ষা চলবেনা। নারীদেরকে নারীদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষিকা দ্বারাই শিক্ষা দিতে

হবে। সহশিক্ষার সর্বনাশা কুফল পাশ্চাত্য জগতে এমন প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে যে, এখন যাদের জ্ঞানচক্ষু একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে, তারা ছাড়া আর কেউ তা অস্বীকার করতে পারেনা। উদাহরণ স্বরূপ, আমেরিকায় ১৭ বছর পর্যন্ত বয়সের যে মেয়েরা হাইস্কুলে পড়ে, সহশিক্ষার কারণে প্রতি বছর তাদের মধ্য থেকে গড়ে এক হাজার জন গর্ভবতী হয়ে পড়ে।[১] যদিও এ পরিস্থিতি এখনো আমাদের দেশে দেখা দেয়নি তবে সহশিক্ষার কিছু কিছু কুফল আমাদের এখানেও দেখা দিতে শুরু করেছে। তৃতীয়ত, উচ্চ শিক্ষিত মহিলাদেরকে এমন প্রতিষ্ঠানাদিতে নিয়োগ করতে হবে, যা শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যই নির্দিষ্ট। যেমন মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মহিলা হাসপাতাল ইত্যাদি।

গ. ইসলামী রাষ্ট্রে সমাজ সংস্কার ও জনশিক্ষা কার্যক্রম

প্রশ্ন ঃ ইসলামী সরকার কি নারী স্বাধীনতার ক্রমবর্দ্ধমান প্রবণতাকে শক্তি প্রয়োগে দমন করবে? বিচিত্র সাজসজ্জা, অর্ধ নগ্ন পোশাক ও নিত্য নতুন ফ্যাশন ধারণের প্রবণতায় যেভাবে আধুনিক নারীরা মেতে উঠেছে, বিশেষত যুবতী মেয়েরা অত্যন্ত আঁটসাঁট ও মনমাতানো সুরভিত পোশাকে ভূষিত হয়ে রং বেরংগের প্রসাধনী শোভিত হয়ে এবং দেহের অঙ্গ প্রত্যক্ষ ও উঁচুনীচুর প্রদর্শনী করে যেভাবে প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এবং আজকাল উঠতি বয়সের ছেলেরাও হলিউডের ছায়াছবি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেভাবে টেডি বয় সেজে চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি প্রত্যেক মুসলিম ও অমুসলিম তরুণ তরুণীর লাগামহীন বেলেল্লাপনা রোধ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেবে? আইন লংঘনে তাদেরকে শাস্তি প্রদান এবং অভিভাবকদের থেকে জরিমানা আদায় করবে? এটা করলে আবার তাদের নাগরিক অধিকার কি ক্ষুণ্ন হবেনা? গার্লস গাইড, মহিলা সমিতি, ওয়াই এম সি এ [খৃষ্টান যুব সমিতি] ওয়াই ডব্লিউ সি এ [খৃষ্টান যুবতী সমিতি ইত্যাকার প্রতিষ্ঠান কি ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় বরদাশ্‌ত করা হবে? নারীরা কি আদালত থেকে নিজেই তালাক নিতে পারবে এবং পুরুষদের একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করা হবে? ইসলামী আদালতের সামনে কি যুবক যুবতীরা কোর্ট ম্যারেজ [Civil marriage] করার অধিকারী হবে? নারীদের যুব উৎসব, খেলাধূলা, প্রদর্শনী, নাটক, নৃত্য, ছায়াছবি অথবা সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ কিংবা বিমানবালা হওয়ার ওপর কি ইসলামী সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে? জাতীয় চরিত্র বিধ্বংসী সিনেমা, টেলিভিশন ও রেডিওতে অশ্লীল গান, অশ্লীল বইপুস্তক, বাজনা, নাচ ও ঢলাঢলিতে পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি কি বন্ধ করে দেয়া হবে, না এগুলোকে কল্যাণমূলক খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব হবে?

জবাব ঃ ইসলাম সমাজ সংস্কার ও জনশিক্ষার সকল কার্যক্রম কেবল আইনের ডান্ডার জোরে চালায়না। শিক্ষা, প্রচার ও জনমতের চাপ ইসলামের সংস্কার কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এ সকল উপায় উপকরণ প্রয়োগের পরও যদি কোনো ত্রুটি থেকে যায়, তাহলে ইসলাম আইনগত ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণেও

---

১. এটা ১৯৬২ সালের কথা। বর্তমানে এ সংখ্যা বহুগুণ বেশী। এমনকি বহুবিধ গর্ভনিরোধ আবিষ্কার করেও তারা কুমারীদের গর্ভধারণ ঠেকাতে পারছেনা। -সম্পাদক

কুণ্ঠিত হয়না। নারীদের নগ্নতা ও বেহায়াপনা আসলেই একটা মারাত্মক ব্যাধি। কোনো যথার্থ ইসলামী সরকার এটা সহ্য করতে পারেনা। সংশোধনের অন্যান্য পন্থা প্রয়োগে যদি এ ব্যাধি দূর না হয়, কিংবা তার কিছুটা অবশিষ্ট থেকে যায়, তাহলে আইনের সাহায্যে তা রোধ করতেই হবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এর নাম যদি নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়, তাহলে জুয়াড়িদের ধর পাকড় করা এবং পকেটমারদের শাস্তি দেয়াও নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করার শামিল। সামাজিক জীবনে ব্যক্তির ওপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করতেই হয়। ব্যক্তি নিজের স্বভাবগত অসৎ প্রবণতা এবং অন্যদের কাছ থেকে শেখা অপকর্ম দ্বারা সমাজকে দূষিত করুক এজন্য তাকে বলগাহীন ছেড়ে দেয়া যেতে পারেনা।

গার্লস গাইডের স্থান ইসলামে নেই। মহিলাদের সমিতি থাকতে পারে। তবে শর্ত এই যে, কেবল মহিলাদের মধ্যেই তার তৎপরতা সীমিত রাখতে হবে এবং মুখে কুরআনের বুলি কপচানো আর কাজে কুরআন বিরোধী দুর্নীতি চালিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। খৃষ্টান যুবতী সমিতি খৃষ্টান তরুণীদের জন্য থাকতে পারে। কিন্তু কোনো মুসলিম নারীকে তাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যেতে পারেনা। মুসলিম নারীরা যদি ইসলামী বিধানের আওতায় থেকে মুসলিম তরুণী সমিতি বানাতে চায় তবে বানাতে পারে।

মুসলিম নারী ইসলামী আদালতের মাধ্যমে 'খুলা' বিধির আওতায় বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। বিয়ে বাতিলকরণ এবং চির বিচ্ছেদ [Judicial seperation] এর ঘোষণাও আদালত থেকে লাভ করতে পারে। তবে শর্ত হলো, শরীয়তের বিধি মুতাবিক এ ধরনের কোনো ঘোষণা অর্জনের যোগ্যতা তার মধ্যে থাকা চাই। কিন্তু তালাক [Divorce] এর ক্ষমতা কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শুধু পুরুষকেই দিয়েছে। পুরুষের এই ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কোনো আইনের নেই। কুরআনের নাম ভাঙ্গিয়ে যদি কুরআন বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হয় তবে সেটা ভিন্ন কথা। তালাক দেয়ার ক্ষমতা পুরুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং কোনো আদালত বা পঞ্চায়েত তাতে নাক গলাবে, এমন ধারণা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত গোটা ইসলামের ইতিহাসে অপরিচিত। এ ধারণা সরাসরি ইউরোপ থেকে আমাদের দেশে আমদানী হয়েছে। যারা এটা আমদানী করেছে তারা একটিবারও চোখ মেলে দেখেনি যে, ইউরোপে তালাকের এ আইনের পটভূমি কি ছিলো এবং সেখানে এর কি কি কুফল দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে ঘরোয়া কেলেংকারীর হাড়ি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে হাটে বাজারে গিয়ে ভাঙ্গবে, তখন আল্লাহ্‌র আইন সংশোধন করতে যাওয়ার পরিণতি কি হয় তা মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

পুরুষদের একাধিক বিয়ের ওপর আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ বা রোধ করার ধারণাও একটা বিদেশী পণ্য, যাকে কুরআনের ভূয়া লাইসেন্স দেখিয়ে আমদানী করা হয়েছে। এটা এসেছে এমন সমাজ থেকে, যেখানে কোনো মহিলাকে যদি বিবাহিত স্ত্রীর উপস্থিতিতে রক্ষিতা করে রাখা হয়, তাহলে সেটা শুধু সহনীয়ই নয় বরং তার অবৈধ

সন্তানের অধিকার সংরক্ষণের কথাও ভাবা হয় [ফ্রান্সের উদাহরণ আমাদের সামনেই রয়েছে]। অথচ সে মহিলাকেই যদি বিয়ে করা হয় তাহলে সেটা হয়ে যায় অপরাধ। যেনো যতো কড়াকড়ি কেবল হালালের বিরুদ্ধে, হারামের বিরুদ্ধে কিছুই নয়। আমার প্রশ্ন হলো, কেউ যদি কুরআনের ক ও জানে তবে সে কি এই মূল্যবোধ [Value] গ্রহণ করতে পারে? ব্যভিচার আইনত বৈধ হবে আর বিয়ে আইনত নিষিদ্ধ হবে, এমন উদ্ভট দর্শন কি তার কাছে ন্যায়সংগত হতে পারে? এ ধরনের আইন প্রণয়নের একমাত্র পরিণাম এই হবে যে, মুসলমানদের সমাজে ব্যভিচারের ছড়াছড়ি হবে, বান্ধবী ও রক্ষিতার সংখ্যা বাড়বে, কেবল দ্বিতীয় স্ত্রীর অস্তিত্ব থাকবেনা। এ ধরনের সমাজ কাঠামোগত দিক দিয়ে ইসলামের আসল সমাজ থেকে অনেক দূরে এবং পাশ্চাত্য সমাজের অনেক কাছাকাছি হবে। এ ধরনের পরিস্থিতির কথা ভাবতে কারো ভালো লাগে তো লাগুক, কোনো মুসলানের কাছে এটা ভালো লাগতে পারেনা।

কোর্ট ম্যারেজের প্রশ্ন কোনো মুসলিম নারীর বেলায় যে ওঠেইনা, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এ প্রশ্ন ওঠে কেবল কোনো মুশরিক, খৃষ্টান কিংবা ইহুদী নারীকে বিয়ে করার বেলায়। এ ধরনের বিধর্মী মহিলা ইসলামী আইন মতে ইসলাম গ্রহণপূর্বক কোনো মুসলমানকে বিয়ে করতে প্রস্তুত থাকেনা। অথচ মুসলমান পুরুষ তার প্রেমে মজে গিয়ে কোনো ধর্মের কড়াকড়ি তাকে মানতে হবেনা, এই অঙ্গীকার দিয়ে তাকে বিয়ে করে। এ ধরনের কাজ কারোর যদি করতেই হয় তবে তার ইসলামের ফতুয়া নেয়ার প্রয়োজন পড়ে কিসে? ইসলাম তার অনুগত লোককে এ কাজের অনুমতি কেন দেবে? মুসলমানদের এ ধরনের বিয়ে দেয়াটা ইসলামী আদালতের দায়িত্ব হলোই বা কবে থেকে?

একটা ইসলামী সরকারও যদি যুব উৎসব [Youth festival], খেলাধূলা, নাটক, নাচগান ও সুন্দরী প্রতিযোগিতায় মুসলিম যুবতীদের টেনে আনে অথবা বিমানবালা নিয়োগ করে যাত্রীদের মনোরঞ্জনের কাজ নেয়, তাহলে আমি জানতে চাই যে, ইসলামী সরকারের প্রয়োজন কি? এসব কাজ তো কুফরী সমাজে এবং কাফির শাসিত রাষ্ট্রে সহজেই হতে পারে। সেখানে বরং এ কাজ আরো অবাধে হওয়া সম্ভব।

সিনেমা, ফিল্ম, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি করা জাগতিক শক্তি ছাড়া কিছু নয়। এগুলোতে সৃষ্টিগতভাবে দোষের কিছু নেই। এগুলোর চরিত্র বিধ্বংসী ব্যবহারটাই শুধু দূষণীয়। এগুলোকে মানুষের কল্যাণার্থে ব্যবহার করা এবং নৈতিক বিচ্যুতির কাজে ব্যবহারের পথ বন্ধ করাই ইসলামী সরকারের একমাত্র কাজ।

৪. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার

ক. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক

প্রশ্ন ঃ আমি হিন্দু মহাসভার কর্মী। গত বছর হিন্দু মহাসভার প্রাদেশিক প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি। কিছুদিন হলো আমি আপনার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। ইতোমধ্যে আপনার কতিপয় গ্রন্থও পড়েছি। যেমন ঃ মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত ১ম ও ৩য় খন্ড,[১] ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ, ইসলামী বিপ্লবের পথ ও শান্তি পথ প্রভৃতি। এ গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের ফলে ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এ জিনিসটা যদি আরো কিছুকাল আগে প্রতিষ্ঠিত হতো, তবে হিন্দু মুসলমান সমস্যা এতোটা জটিল হতোনা। আপনি যে ইসলামী রাষ্ট্রের দাওয়াত দিচ্ছেন, তার অধীনে জীবন যাপন করা গৌরবের বিষয়। তবে কতিপয় প্রশ্ন আছে। এগুলোর জবাবের জন্য চিঠিপত্র ছাড়া প্রয়োজন হলে আমি আপনার সান্নিধ্যে হাযির হবো।

আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে হিন্দুদের কি মর্যাদা প্রদান করা হবে? তাদের কি আহলে কিতাবদের সমপর্যায়ের অধিকার দেয়া হবে নাকি যিম্মী ধরা হবে? আহলে কিতাব এবং যিম্মীদের অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ আপনার উক্ত গ্রন্থগুলোতেও নেই। আরবদের সিন্ধু অভিযানের ইতিহাস আমি যতোটা জানি, তাতে দেখা যায় মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং তার উত্তরসূরীরা সিন্ধুতে হিন্দুদেরকে আহলে কিতাবের অধিকার প্রদান করেছিলো। আশা করি এ বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা পেশ করবেন। আহলে কিতাব এবং যিম্মীদের অধিকারের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে তাও লিখবেন। তারা দেশের প্রশাসনিক কাজে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে কি? যদি না পারে তবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে আপনি হিন্দুদেরকে কোন্ মর্যাদা প্রদান করতে চাচ্ছেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে হলো, কুরআনের ফৌজদারী বিধানসমূহ কি মুসলমানদের মতো হিন্দুদের উপরও কার্যকর হবে? হিন্দুদের জাতীয় আইন [Personal Law] তাদের উপর কার্যকর হবে কিনা? আমার বক্তব্য হচ্ছে হিন্দুরা তাদের উত্তরাধিকার আইন, যৌথ পরিবার ব্যবস্থা, পালকপুত্র গ্রহণ ইত্যাদি বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী [মনু শাস্ত্রের ভিত্তিতে] জীবন যাপন করতে পারবে কি?

---

১. এ গ্রন্থগুলো বর্তমানে 'উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।–সম্পাদক

প্রকাশ থাকে যে, প্রশ্নগুলো একজন সত্য সন্ধানীর প্রশ্ন।

জবাব ঃ পত্রে প্রকাশিত আপনার ধ্যান ধ্যারণা আমার নিকট সম্মানার্হ। এটা বাস্তব যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ককে জটিল ও তিক্ত করার ব্যাপারে সেসব লোকেরাই দায়ী, যারা ন্যায় ও সত্য মূলনীতির পরিবর্তে ব্যক্তিগত, বংশগত, শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত এবং জাতিগত মূলনীতির ভিত্তিতে মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছে। এর পরিণাম অনিবার্যভাবেই তাই হওয়ার ছিলো যা এখন আমরা সচক্ষে দেখছি। আমরা আপনারা সকলেই এ মন্দ পরিণতির সমান অংশীদার। কল্যাণ কেউই লাভ করতে পারেনি।

আপনার প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব ক্রমানুসারে নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তার অবস্থা এরূপ হবেনা যে একটি জাতি আরেকটি জাতি বা অন্য জাতিগুলোর উপর শাসক হয়ে বসবে। বরঞ্চ তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই হবে যে, একটি আদর্শের ভিত্তিতে দেশে সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। একথা পরিষ্কার যে, এরূপ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেশের সেসব নাগরিকরাই বহন করতে পারবে যারা হবে উক্ত আদর্শের ধারক ও বাহক। যারা এ আদর্শের ধারক ও বাহক হবেনা, অন্তত এর উপর সন্তুষ্ট হবেনা, স্বাভাবিকভাবেই তারা এ রাষ্ট্রে যিম্মীর মর্যাদা লাভ করবে। অর্থাৎ তাদের 'নিরাপত্তার যিম্মাদারী' সেসব লোকেরা গ্রহণ করবে যারা উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পরিচালক হবে।

২. আহলে কিতাব এবং সাধারণ যিম্মীদের মধ্যে একটি ছাড়া আর কোনো পার্থক্য থাকবেনা। সেটি হচ্ছে এই যে, আহলে কিতাবের মহিলাদেরকে মুসলমানরা বিয়ে করতে পারবে এবং অন্যদের পারবেনা। কিন্তু অধিকারের ব্যাপারে আহলে কিতাব এবং অন্য যিম্মীদের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য থাকবেনা।

৩. যিম্মীদের অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ তো এ চিঠিতে দেয়া সম্ভব নয়। তবে এ ব্যাপারে মৌলিক কথা হচ্ছে এই যে, যিম্মী দু'প্রকারের হতে পারে। এক প্রকার হচ্ছে সেসব যিম্মী, যারা কোনো চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী হয়েছে বা নিরাপত্তা গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় প্রকার যিম্মী হচ্ছে তারা, যারা কোনো প্রকার চুক্তি ছাড়াই যিম্মী হয়েছে। প্রথম ধরনের যিম্মীদের সংগে কৃত চুক্তি মুতাবিক আচরণ করা হবে। দ্বিতীয় প্রকার যিম্মীদের যিম্মী হওয়া দ্বারাই আমাদের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত হয় যে, আমরা তেমনি করে তাদের জান মাল ও ইজ্জত আবরুর হিফাযত করবো যেমনি করে হিফাযত করি আমাদের নিজেদের জান মাল ও ইজ্জত আবরুর। তাদের আইনগত অধিকার তা-ই হবে যা হবে মুসলমানদের। তাদের রক্তমূল্য তা-ই হবে যা মুসলমানদের রক্তমূল্য। নিজেদের ধর্ম পালনের পূর্ণ আযাদী তাদের থাকবে। তাদের উপাসনালয়সমূহ নিরাপদ থাকবে। তাদেরকে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের

অধিকার দেয়া হবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে তাদের উপর ইসলামী শিক্ষা চাপিয়ে দেয়া হবেনা।

আল্লাহ্ চাহেন তো অমুসলিম নাগরিকদের সম্পর্কে ইসলামের শাসনতান্ত্রিক ধারাসমূহ আমরা পৃথক পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করবো।[১]

৪. অমুসলিমদের "পার্সোনাল ল" তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার আবশ্যিক অংশ। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র তাদের বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার, পালকপুত্র গ্রহণ এবং অনুরূপ অন্যান্য আইন যা দেশীয় আইনের [Law of the land] সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তাদের উপর প্রয়োগ করবে। কেবল সেসব ক্ষেত্রে তাদের 'পার্সোনাল ল'কে বরদাশ্ত করা হবেনা যেগুলোর কুফল জনগণকে প্রভাবিত করবে। যেমন কোনো অমুসলিম জাতি যদি সূদকে বৈধ রাখতে চায় তবে ইসলামী রাষ্ট্রে সূদী লেনদেনের অনুমতি আমরা দেবোনা। কারণ এতে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভাবিত হবে। কিংবা কোনো অমুসলিম জাতি যদি ব্যভিচার বৈধ রাখতে চায়, তবে এ অনুমতিও আমরা দেবোনা। তারা নিজেদের মধ্যেও এ কুকর্মের [Prostitution] ব্যবসা চালু রাখতে পারবেনা। কেননা এটা সর্ব স্বীকৃতভাবে মানব জাতির নৈতিকতা বিরোধী কাজ। আর এটা আমাদের ফৌজদারী আইনের [Criminal Law] সাথেও সাংঘর্ষিক। এ কথা স্পষ্ট যে, এটাই হবে রাষ্ট্রীয় আইন। এবার এরি ভিত্তিতে আপনি অন্যান্য বিষয়গুলো অনুমান করতে পারেন।

৫. আপনি প্রশ্ন করেছেন, অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন শৃংখলার কাজে সমান অংশীদার হতে পারবে কিনা? যেমন পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় হিন্দুরা অংশ গ্রহণ করতে পারবে কিনা? যদি না পারে, তবে আপনারা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে মুসলমানদের জন্যে সে অবস্থা মেনে নেবেন কি, ইসলামী রাষ্ট্রে যে মর্যাদা আপনারা হিন্দুদের প্রদান করবেন? আমার মতে আপনার এ প্রশ্নের ভিত্তি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ এখানে আপনি একদিকে 'আদর্শিক অজাতীয়তা ভিত্তিক রাষ্ট্রের' [Idiological non-National State] সঠিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখেননি। অপরদিকে এ প্রশ্নের মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেনের মানসিকতা পরিস্ফুট বলে মনে হচ্ছে।

পহেলা নম্বর জবাবেও আমি একথা বলেছি যে, একটি আদর্শিক রাষ্ট্র পরিচালনা এবং তার নিরাপত্তার দায়িত্ব কেবল সেসব লোকেরাই বহন করতে পারে, যারা সেই আদর্শের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী। তারাই তো এ আদর্শের মূল স্পিরিট অনুধাবন করতে পারবে। এদের থেকেই তো এ আশা করা যেতে পারে যে, পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে নিজেদের দীনী ও ঈমানী দায়িত্ব মনে করে তারা এ রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করবে এবং একে টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজনে লড়াইয়ের ময়দানে নিজেদের জীবন কুরবাণী করবে।

যারা এ আদর্শে বিশ্বাসী নয়, তাদেরকে যদি এ রাষ্ট্র পরিচালনা এবং এর নিরাপত্তার দায়িত্বে অংশীদার করাও হয়, তবে তারা এ আদর্শিক এবং নৈতিক স্পিরিট অনুধাবন

---

১. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার' শিরোনামে এ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। –সম্পাদক

করতে সক্ষম হবেনা। সে অনুযায়ী তারা কাজ করতেও সক্ষম হবেনা। আর এ আদর্শের জন্যে তাদের সেরূপ আন্তরিকতা সৃষ্টি হবেনা যার ওপর রাষ্ট্রীয় অট্টালিকার ভিত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা যদি বেসামরিক বিভাগে কাজ করে, তবে তাদের থেকে কেবল কর্মচারী সুলভ মানসিকতার প্রকাশ পাবে এবং উপার্জনের জন্যেই তারা নিজেদের সময় ও যাবতীয় যোগ্যতা বিক্রি করবে। আর যদি তাদেরকে সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে তাদের অবস্থা হবে ভাড়াটে সৈনিকের [Meucenaries] মতো। তারা নৈতিক চরিত্রের সেই দাবীও পূর্ণ করতে পারবেনা ইসলামী রাষ্ট্র তার মুজাহিদদের থেকে যা আশা করে থাকে।

এজন্যে আদর্শিক ও নৈতিক কারণে ইসলামী রাষ্ট্র তার সামরিক বাহিনীতে যিম্মীদের কোনো খিদমত গ্রহণ করেনা। পক্ষান্তরে যাবতীয় সামরিক নিরাপত্তার দায়িত্ব মুলসমানরা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নেয় এবং অমুসলিম নাগরিকদের থেকে শুধু একটা প্রতিরক্ষা কর গ্রহণ করাকেই যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু কর এবং সামরিক সেবা এ উভয়টাই একত্রে অমুসলিম নাগরিকদের থেকে নেয়া যেতে পারেনা। যদি অমুসলিম নাগরিকরা স্বয়ং নিজেদেরকে সামরিক সেবার জন্যে পেশ করে তবে তা গ্রহণ করা হবে এবং এমতাবস্থায় তাদের থেকে প্রতিরক্ষা কর গ্রহণ করা হবেনা।

বেসামরিক বিভাগের key Post গুলো তো সামরিক বিভাগ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ এগুলো নীতি নির্ধারণী কাজের সাথে সম্পর্কিত। এগুলোতে কোনো অবস্থাতেই অমুসলিম নাগরিকদের নিয়োগ করা যেতে পারেনা। অবশ্য কর্মচারী হিসেবে তাদের খিদমত নিতে কোনো দোষ নেই। এমনি করে রাষ্ট্রীয় পরামর্শ সভায় [মজলিসে শূরা] অমুসলিমদের কোনো সদস্য নেয়া হবেনা। অবশ্য অমুসলিমদের ভিন্ন কাউন্সিল বানিয়ে দেয়া হবে। এ পরিষদ তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দেখাশুনা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করবে। তাদের প্রয়োজন, অভিযোগ এবং প্রস্তাবাবলী পেশ করবে। রাষ্ট্রীয় মজলিসে শূরা [Assembly] এগুলো যথোপযুক্তভাবে বিবেচনা করবে।

সোজা কথা হচ্ছে এই যে, 'ইসলামী রাষ্ট্র' কোনো জাতির ইজারাকৃত সম্পত্তি নয়। যে কেউ তার আদর্শ গ্রহণ করবে, সে তার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে, চাই সে কোনো হিন্দুর পুত্র হোক কিংবা কোনো শিখের। কিন্তু যে এ রাষ্ট্রের আদর্শকে গ্রহণ করবেনা, মুসলমানের পুত্র হোক না কেন, সে এ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে বটে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেনা।

আপনি প্রশ্ন করেছেন, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে কি মুসলমানরা সে অবস্থা গ্রহণ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে হিন্দুদেরকে যে পজিশন দেয়া হবে? এ প্রশ্ন আসলে মুসলিমলীগ নেতাদের কাছে করাই উচিত ছিলো। কারণ লেনদেনের কথা তো তারাই বলতে পারে। আমাদের নিকট জানতে চাইলে আমরা তো নিরেট আদর্শিক জবাবই দেবো।

যেখানে হিন্দুরা রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার লাভ করবে, সেখানে আপনারা মূলত দুই ধরনের রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ঃ

হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, কিংবা ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেও প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

প্রথমোক্ত অবস্থায় আপনাদের মধ্যে এ প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া উচিত হবেনা যে, ইসলামী রাষ্ট্রে হিন্দুদের যতোটুকু অধিকার দেয়া হবে, আমরা "রামরাজ্যে"ও মুসলমানদেরকে ততোটুকু অধিকারই দেবো। বরঞ্চ এ বিষয়ে হিন্দু ধর্মে যদি কোনো দিক নির্দেশনা থাকে তবে কোনো প্রকার রদবদল ছাড়া হুবহু সেটাই কার্যকর করুন। নিজেদের ধর্মীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে এ বিষয়ে অন্যদের অনুসরণ করা ঠিক হবেনা। আপনাদের বিধান যদি আমাদের বিধানের চেয়ে উন্নততর হয় তবে নৈতিক ময়দানে আপনারাই বিজয়ী হবেন এবং এমনও হতে পারে যে, আমাদের ইসলামী রাষ্ট্র আপনাদের রামরাজ্যে পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর প্রকৃত ব্যাপার যদি এর বিপরীত হয়, তবে দেরীতে হোক কিংবা সত্ত্বর পরিণতি এর বিপরীতই হবে।

আর যদি শেষোক্ত নীতি গ্রহণ করেন, অর্থাৎ ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, তবে এ অবস্থায় আপনাদেরকে দু'টির যে কোনো একটি পথ গ্রহণ করতে হবে। হয়তো গণতান্ত্রিক [Democratic] নীতি অবলম্বন করতে হবে এবং মুসলমানদেরকে তাদের সংখ্যার ভিত্তিতে অংশ নিতে হবে। নয়তো একথা পরিষ্কারভাবে বলে দিতে হবে যে, এটা হিন্দু জাতির রাষ্ট্র এবং মুসলমানদেরকে এখানে বিজিত জাতি [Subject nation] হিসেবে থাকতে হবে।

এ দু'টি পন্থার যেটির ভিত্তিতে ইচ্ছা আপনারা মুসলমানদের সাথে আচরণ করতে পারেন। সর্বাবস্থায় আপনাদের নীতি ও আচরণ দেখে ইসলামী রাষ্ট্র তার সেসব নীতিতে বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন সাধন করবেনা, অমুসলমানদের ব্যাপারে কুরআন হাদীসে যেগুলো নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আপনারা যদি আপনাদের রাজ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা অভিযানও চালান এমনকি একটি মুসলমান শিশুকেও যদি জীবিত না রাখেন, তবু ইসলামী রাষ্ট্র এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তার অমুসলিম নাগরিকদের একটি কেশাগ্রও বাঁকা করবেনা। পক্ষান্তরে আপনারা যদি প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সেনাপতি ইত্যাদি পদে মুসলমান নাগরিক মনোনীত করেন, সে অবস্থায়ও ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের সে একই মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করা হবে যা কুরআন ও হাদীস নির্ধারিত করে দিয়েছে। [তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাওয়াল ১৩৬৩ হিঃ জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪ইং]

উপরোক্ত বিষয়ের অতিরিক্ত ব্যাখ্যা

প্রশ্ন ঃ আপনার রচিত সবগুলো গ্রন্থ এবং পূর্বের চিঠিটা পড়ার পর আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আপনি নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। আর এ ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মী এবং আহলে কিতাবের লোকদের পজিশন হবে ঠিক তেমনি, যেমনি হিন্দুদের মধ্যে আছ্যুতদের পরিজশন।

আপনি লিখেছেন, "হিন্দুদের উপাসনালয়সমূহের সংরক্ষণ করা হবে এবং তাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের অধিকার দেয়া হবে।" কিন্তু হিন্দুদেরকে তাদের ধর্ম প্রচারের সুযোগ দেয়া হবে কিনা সেকথা তো লিখেননি? আপনি আরো লিখেছেন ঃ "যে কেউ এ

রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করবে, সে এর পরিচালনা কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে, চাই সে হিন্দুর পুত্র হোক কিংবা শিখের।" মেহেরবাণী করে একথাটারও ব্যাখ্যা দিন যে, হিন্দু হিন্দু থেকেও কি আপনাদের রাষ্ট্রের নীতিমালার প্রতি ঈমান এনে তা পরিচালনার কাজে শরীক হতে পারবে?

আপনি লিখেছেন আহলে কিতাবের মহিলাদেরকে মুসলমানরা বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু আহলে কিতাব মুসলিম মহিলাদের বিয়ে করতে পারবে কিনা সেকথা পরিষ্কার করেননি। এ প্রশ্নের জবাব যদি না সূচক হয়, তবে এ [Superiority complex] সম্পর্কে আরো ভালোভাবে আলোকপাত করবেন কি? এর যথার্থতার জন্যে আপনি যদি ইসলামের প্রতি ঈমান আনার যিম্মাদারী নেন, তবে কি আপনি একথা মানতে প্রস্তুত আছেন যে, বর্তমানকার তথাকথিত মুসলমান আপনার বক্তব্য অনুযায়ী এসব ইসলামী নীতিমালার মানদন্ডে টিকে যাবে? বর্তমানকালের মুসলমানদের কথা বাদই দিলাম, আপনি কি একথা স্বীকার করবেননা যে, খিলাফতে রাশেদার আমলে যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলো তাদের অধিকাংশই রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভিলাষী ছিলো? আপনি যদি একথা স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত হন, তবে বলুন তো সেই ইসলামী রাষ্ট্রটি কেন মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর টিকেছিলো? হযরত আলীর মতো বিচক্ষণ মুজাহিদের এতো বিরোধিতা কেন হয়েছিলো এবং তাঁর বিরোধীদের মধ্যে হযরত আয়েশা পর্যন্ত কেন ছিলেন?

ইসলামী রাষ্ট্রের অভিলাষী হয়েও আপনি পাকিস্তানের বিরোধিতা করছেন। কোনো রাষ্ট্রীয় সীমা ছাড়াই কি আপনি আপনার হুকুমতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন? অবশ্যই নয়। তবে তো আপনার হুকুমতে ইলাহিয়ার জন্যে সে ভূখন্ডটিই উপযুক্ত মিঃ জিন্নাহ এবং তার সংগী সাথীরা যেখানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। পাকিস্তান না চেয়ে সারা ভারতেই কেন আপনি হুকুমতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন? এমন একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে অতি উচ্চমানের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী একদল লোক আপনি কোথা থেকে সৃষ্টি করবেন? যেখানে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর এবং হযরত ওসমানের মতো তুলনাহীন মনীষীদের হাতে ঐ রাষ্ট্রটি মাত্র কয়েক বছরের বেশী টিকেনি। আজ চৌদ্দশ' বছর পরে এমন কোন উপযুক্ত পরিবেশ আপনি লক্ষ্য করছেন, যার ভিত্তিতে আপনার দূরদৃষ্টি হুকুমতে ইলাহিয়া বাস্তবসম্মত মনে করছে? একথা সত্য যে, আপনার পয়গাম সব মত ও পথের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ও দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানদের সাথে আমার যতো মেশার সুযোগ হয়েছে, তাতে আমি দেখেছি তারা আপনার চিন্তার প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা বলছেঃ আপনি যা কিছু বলেছেন সেটাই প্রকৃত ইসলাম। কিন্তু প্রত্যেকের মনে সে একই প্রশ্ন যা আমি আপনার সামনে পেশ করলাম। অর্থাৎ খিলাফতে রাশেদার সে আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে সেরূপ উচ্চমানের লোক আপনি কোথায় পাবেন? তাছাড়া সে তুলনাহীন উচ্চমানের লোকেরাই যখন ঐ রাষ্ট্রটিকে অর্ধ শতাব্দীও সাফল্যের সাথে চালাতে পারেনি, তখন এ যুগে সে ধরনের রাষ্ট্রের চিন্তা একটি অবাস্তব আশা ছাড়া আর কি হতে পারে?

এছাড়া আরেকটি কথাও নিবেদন করতে চাই। কিছুকাল পূর্বে আমার ধারণা ছিলো, আমরা হিন্দুরা এমন একটি জাতি যাদের সম্মুখে কোনো একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্তমান নেই। অথচ মুসলমানদের সামষ্টিক ও সংঘবদ্ধ জীবন রয়েছে এবং তাদের সম্মুখে রয়েছে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু এখন ইসলামী রাজনীতির গভীর অধ্যয়নের ফলে জানতে পারলাম যে, ওখানকার অবস্থা আমাদের চেয়েও করুণ। বাস্তব অবস্থা আপনার নিকট গোপন নয়। একজন সত্যসন্ধানী হিসেবে আমি বিভিন্ন ধ্যান ধারণার মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিকট তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে কতিপয় বিষয়ের জবাব চেয়ে পাঠাই। তাদের জবাব আমার হাতে পৌঁছার পর আমার পূর্ব ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ হয়েছে। এখন আমি জানতে পারলাম, মুসলমানদের মধ্যেও কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যের ব্যাপারে সাংঘাতিক মতবিরোধ রয়েছে। [প্রশ্নকারী এখানে জামায়াতে ইসলামীর সাথে মতবিরোধ রাখেন এমন কতিপয় ব্যক্তির লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করেন।]

দেখলেন তো আপনাদের একই আকীদা বিশ্বাসের নেতাগণ কতো কঠিন মতবিরোধে নিমজ্জিত। এসব বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করে কোনো কিছু কেবল বইয়ের পৃষ্ঠায় মতাদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা এক জিনিস আর সেটার বাস্তবায়ন একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। রাজনীতি একটা বাস্তব সত্য ব্যাপার। এটাকে কোনো অবস্থাতেই অস্বীকার করা যেতে পারেনা। আমার এ গোটা নিবেদনকে সামনে রেখে আপনি আপনার কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করাবেন কি?

জবাব ঃ আপনার প্রশ্নাবলীর মূল টারগেট এখনো আমার কাছে পৌঁছায়নি। এ কারণে যে জবাব দিচ্ছি সেগুলো থেকে আপনার আরো এমন কিছু প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে, যেগুলো সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ আমার কাছে নেই। আপনি যদি মৌলিক বিষয় থেকে প্রশ্ন আরম্ভ করেন, অতপর শাখা প্রশাখা এবং সমসাময়িক রাজনীতির [Current politics] দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, তবে আপনি আমার জবাবের সাথে পূর্ণ একমত না হলেও অন্ততপক্ষে আমাকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন। এখন তো আমার মনে হয়, আমার পজিশন আপনার নিকট পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।

আপনি লিখেছেন ঃ আপনি যে ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছেন, তাতে "যিম্মী এবং আহলে কিতাবের পজিশন তাই হবে, যা নাকি হিন্দুদের মধ্যে অচ্ছ্যুতদের।" বাক্যটি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমি স্পষ্টভাবে লেখার পরও আপনি হয়তো ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের পজিশন সম্পর্কে বুঝতে পারেননি। নয়তো হিন্দু সমাজে অচ্ছ্যুতদের পজিশন সম্পর্কে আপনি ওয়াকিফহাল নন। প্রথম কথা, অচ্ছ্যুতদের যে পজিশন মনুর ধর্মশাস্ত্র থেকে জানা যায়, তার সাথে ঐ সকল অধিকার ও সুযোগ সুবিধার কোনো সম্পর্ক নেই, ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে যা যিম্মীদের প্রদান করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এ অস্পৃশ্যবাদের ভিত্তি হচ্ছে বংশগত তারতম্য। পক্ষান্তরে যিম্মীর ভিত্তি হচ্ছে আদর্শ ও বিশ্বাস। কোনো যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি আমাদের নেতা এবং রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত হতে পারেন। কিন্তু শুদ্র তার বিশ্বাস এবং মত ও পথ পরিবর্তনের পরও কি অরুণ আশ্রমের বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত হতে পারে?

আপনি প্রশ্ন করেছেন ঃ "কোনো হিন্দু কি হিন্দু থেকেও আপনাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি ঈমান এনে তা পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে?" -আপনার এ প্রশ্ন খুবই বিস্ময়কর। সম্ভবত আপনি চিন্তা করে দেখেননি যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি ঈমান আনার পর হিন্দু আর হিন্দু থাকবেনা, বরঞ্চ সে মুসলমান হয়ে যাবে। এ দেশের কোটি কোটি মুসলমান তো আসলে হিন্দুরই সন্তান। ইসলামী আদর্শের প্রতি ঈমান আনার ফলেই তারা মুসলমান হয়েছে। এমনি করে ভবিষ্যতেও যেসব হিন্দুর সন্তান এ আদর্শ গ্রহণ করবে, তারাও মুসলমান হয়ে যাবে। আর তারা যখন মুসলমান হয়ে যাবে, তখন অবশ্যি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা আমাদের সংগে সমান অংশীদার হবে।

'ইসলামী রাষ্ট্রে হিন্দুরা তাদের ধর্ম প্রচারের সুযোগ পাবে কি? আপনার এ প্রশ্নটি যতোটা সংক্ষিপ্ত তার জবাব ততোটা সংক্ষিপ্ত নয়। প্রচার কাজ কয়েক প্রকারের হতে পারে। এক প্রকার হচ্ছে এই যে, কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী তার ভবিষ্যত বংশধর এবং নিজ জনগণকে নিজস্ব ধর্মের শিক্ষা প্রদান করবে। সকল প্রকার যিম্মীরাই এমনটি করার অধিকার লাভ করবে। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় লেখনী কিংবা বক্তৃতার মাধ্যমে নিজ ধর্মকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট পেশ করবে এবং ইসলামসহ অন্য সকল ধর্মের সাথে তাদের মতভেদের কারণ জ্ঞানের যুক্তিতে পেশ করবে। এর অনুমতিও যিম্মীদের প্রদান করা হবে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী থাকা অবস্থায় আমরা কোনো মুসলমানকে নিজের ধর্ম পরিবর্তনের অনুমতি দেবোনা। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে, কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় নিজেদের ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে এ উদ্দেশ্যে কোনো সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলবে যে বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে ইসলামী আদর্শের পরিবর্তে তার নিজের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে এরূপ প্রচার কার্যের অধিকার কাউকেও প্রদান করবোনা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত আমার প্রবন্ধ 'ইসলামে মুরতাদ হত্যার নির্দেশ' দেখে নিন।[১]

মুসলমানদের জন্যে আহলে কিতাবের নারীদের বিয়ে করা বৈধ হওয়া এবং আহলে কিতাবের জন্যে মুসলিম নারীদের বিয়ে অবৈধ হওয়ার ভিত্তি এক নিগূঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পুরুষরা সাধারণত প্রভাবিত হয় কম এবং প্রভাব বিস্তার করে অধিক। আর নারীরা সাধারণত প্রভাবিত হয় বেশী এবং প্রভাব বিস্তার করে কম। একজন অমুসলিম নারী যদি কোনো মুসলমানের সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে তার দ্বারা এ মুসলমান ব্যক্তিকে অমুসলিম বানানোর আশংকা খুবই কম, বরঞ্চ তারই মুসলমান হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু একজন মুসলিম নারী কোনো অমুসলিম ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তার অমুসলিম হয়ে যাবার আশংকাই বেশী এবং তার স্বামী ও সন্তানদের মুসলমান বানাতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম। এজন্যে নিজ কন্যাদের

---

১. প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

অমুসলিমদের নিকট বিয়ে দেবার অনুমতি মুসলমানদের দেয়া হয়নি। অবশ্য আহলে কিতাবের কোনো ব্যক্তি নিজ কন্যাকে কোনো মুসলানের নিকট বিয়ে দিতে রাজী হলে সে তাকে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু কুরআনের যে স্থানে এ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে সেখানে এ ধমকও দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি অমুসলিম স্ত্রীদের প্রেমে বিগলিত হয়ে নিজেদের দীন খুইয়ে ফেলো তবে তোমাদের সমস্ত সৎকর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকবে। তাছাড়া এ অনুমতি কেবল বিশেষ প্রয়োজনের সময়ই কার্যকর করা যাবে। এটা কোনো সাধারণ অনুমতি নয় এবং পছন্দনীয় কাজও নয়। বরঞ্চ কোনো কোনো অবস্থায় তো একাজ করতে নিষেধও করা হয়েছে, যাতে মুসলিম সোসাইটিতে অমুসলিম লোকদের আনাগোনার ফলে কোনো অনাকাংখিত নৈতিক ও ধ্যান ধারণার বিকাশ ও লালন হতে না পারে।

ইসলামী রাষ্ট্র কেন মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের বেশী টিকেনি আপনার এ প্রশ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। আপনি যদি খুব মনোযোগের সাথে ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তবে এর কারণসমূহ অনুধাবন করা আপনার জন্যে কোনো কঠিন ব্যাপার হবেনা। কোনো আদর্শের পতাকাবাহী দল যে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে তা তার পরিপূর্ণ মর্যাদার সাথে পরিচালিত হওয়া এবং টিকে থাকার জন্যে প্রয়োজন এর নেতৃত্ব এমন বাছাইকৃত লোকদের হাতে থাকা যারা হবে সে আদর্শের প্রকৃত ও পরিপূর্ণ অনুসারী। আর এধরনের লোকদের হাতে নেতৃত্ব কেবল সে অবস্থায়ই থাকতে পারে, যখন সাধারণ লোকদের উপর এদের প্রভাব বজায় থাকবে এবং সাধারণ নাগরিকদের একদল বিরাট সংখ্যক লোক এতোটা শিক্ষা দীক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে, যাতে করে এ আদর্শের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা ঐসব লোকদের কথা শুনতে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হয়ে যায়, যারা তাদেরকে তাদের এ নির্দিষ্ট আদর্শের বিপরীত অন্য কোনো পথে চালাতে উদ্যত হয়। একথা ভালোভাবে বুঝে নেয়ার জন্য ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একটি সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যে নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তার বুনিয়াদী কথা এ ছিলো যে, আরব ভূখন্ডে এক প্রকার নৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সৎ লোকদের যে ছোট দলটি তৈরী হয়েছিলো, গোটা আরববাসী তাঁর নেতৃত্ব কবুল করে নিয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে খিলাফতে রাশেদার যুগে যখন দেশের পর দেশ জয় হতে লাগলো, তখন যতোটা দ্রুত ইসলামী রাজ্যের চৌহদ্দী বিস্তৃত হতে থাকলো, আদর্শিক মজবুতি ততোটা দ্রুততার সাথে এগুনো সম্ভব হয়নি। সেযুগে যেহেতু প্রচার প্রকাশনা এবং প্রচার ও প্রশিক্ষণের ব্যাপক কোনো মাধ্যম ছিলোনা, যেমনটি রয়েছে বর্তমানে, সেযুগে বর্তমানকালের মতো যানবাহনও যেহেতু ছিলোনা, এসব কারণে তখন যেসব লোক দলে দলে ইসলামী সমাজে প্রবেশ করছিলো নৈতিক, মানসিক এবং আমলী দিক থেকে তাদের পূর্ণাংগভাবে ইসলামী

আন্দোলনের ছাঁচে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে সাধারণ মুসলমান বাসিন্দাদের মধ্যে খাঁটি ধরনের মুসলমানদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে একেবারে কম হয়ে যায় এবং কাঁচা ধরনের মুসলমানদের আনুপাতিক হার বিপুল সংখ্যায় বেড়ে যায়। কিন্তু আদর্শিক দিক দিয়ে মুসলমানদের ক্ষমতা, অধিকার এবং মর্যাদা খাঁটি ধরনের মুসলমানদের তুলনায় ভিন্নতর হওয়া মোটেই সম্ভব ছিলোনা। এ কারণে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খিলাফতামলে যখন প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনসমূহের[১] [Reactionary Movements] ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়, তখন সাধারণ মুসলমানদের এক বিরাট অংশ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং যারা বিশুদ্ধ ইসলামী পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা রাখতেন তাদের হাত থেকে নেতৃত্ব ছুটে যায়। এ ঐতিহাসিক নিগূঢ় সত্যকে উপলব্ধি করার পর খালিস ইসলামী রাষ্ট্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের বেশী টিকে ছিলোনা সে প্রশ্ন জাগ্রত হবার কোনো অবকাশই থাকেনা।

আজো যদি আমরা সৎ লোকদের এমন একটি দলকে সুসংগঠিত করতে পারি, যাদের ধ্যান ধারণা ও মানসিকতা এবং সীরাত ও নৈতিক চরিত্র হবে ইসলামের বাস্তব নমুনা, তবে আমি আশা রাখি আধুনিক উপায় উপকরণ ব্যবহার করে আমরা শুধু আমাদের দেশেই নয়, বরঞ্চ অন্যান্য দেশেও একটি নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করতে সক্ষম হবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, এমন লোকদের একটি শক্তিশালী সংগঠন কায়েম হয়ে যাবার পর সাধারণ মানুষের নেতৃত্ব তাদের ছাড়া অন্য কোনো পার্টির হাতে যেতে পারেনা। মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা থেকে আপনি যে মত প্রতিষ্ঠা করেছেন, ঐ উজ্জ্বল অবস্থার সংগে তার তুলনা হতে পারেনা যা আমাদের সম্মুখে রয়েছে।

বিশুদ্ধ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী লোকেরা বাস্তব ময়দানে নেমে এলে শুধু মুসলমান জনসাধারণই নয়, বরঞ্চ হিন্দু, খৃষ্টান, পারসিক, শিখ সকলেই তাদের ভক্ত অনুরক্ত হয়ে যাবে এবং নিজেদের ধর্মীয় নেতাদের ত্যাগ করে এদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে যাবে। শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে সুসংগঠিত করার মাধ্যমে এমন একদল লোক তৈরী করার কাজই এখন আমি হাতে নিয়েছি। আমি আল্লাহ্‌র নিকট বিনয়াবনত হয়ে দোয়া করছি, তিনি যেনো এ কাজে আমাকে সাহায্য করেন।

খ. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার

প্রশ্ন ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কি মুসলমানদের মতো যাবতীয় অধিকার ভোগ করতে পারবে? আজকাল পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশে যেভাবে এসব সম্প্রদায়ের লোকেরা অবাধে ধর্ম প্রচারে লিপ্ত, ইসলামী রাষ্ট্রেও কি তারা তেমনিভাবে নিজ নিজ ধর্ম প্রচার করতে পারবে?

১. অর্থাৎ যেসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিলো ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন করে কোনো না কোনো জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যাওয়া।

মুক্তিফৌজ [Salvation Army], ক্যাথড্রাল, কনভেন্ট, সেন্ট জন, সেন্ট ফ্রান্সিস ইত্যাকার ধর্মীয় অথবা আধা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কি আইন প্রয়োগ করে বন্ধ করে দেয়া হবে? [সম্প্রতি শ্রীলংকায় অথবা অন্যান্য দু'একটি দেশে যেমন হয়েছে।] অথবা, মুসলমান শিশুদের কি ঐসব প্রতিষ্ঠানে অবাধে আধুনিক শিক্ষা লাভের অনুমতি দেয়া হবে? এই শতাব্দীতেও এসব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করা সমীচীন হবে কি [বিশ্ব মানবাধিকার সনদের আলোকে বিবেচ্য]? বিশেষত তারা যখন সেনাবাহিনী ও সরকারী চাকরীতে নিয়োজিত এবং সরকারের অনুগত?

জবাব ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো সকল নাগরিক অধিকার [Civil rights] মুসলমানদের মতোই ভোগ করবে। তবে রাজনৈতিক অধিকারে [Political Rights] তারা মুসলানদের সমকক্ষ হতে পারেনা। কারণ ইসলামে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন চালানো মুসলমানদের দায়িত্ব। মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেখানেই তারা শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবে, সেখানে যেনো তারা কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা মুতাবিক সরকারী প্রশাসন চালায়। যেহেতু অমুসলিমরা কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাও মানেনা, তার প্রেরণা ও চেতনা অনুসারে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করতে ও সক্ষম নয়, তাই তাদেরকে এ দায়িত্বে অংশীদার করা চলেনা। তবে প্রশাসনে এমন পদ তাদেরকে দেয়া যেতে পারে, যা নীতিনির্ধারক পদ নয়। এ ব্যাপারে অমুসলিম সরকারগুলোর আচরণ হয়ে থাকে মুনাফিকী ও ভন্ডামীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু ইসলামী সরকারের আচরণ হয়ে থাকে নিরেট সততার প্রতীক। মুসলমানরা তাদের এ নীতি খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দেয়া এবং এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের বেলায় আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সর্বোচ্চ উদারতা ও ভদ্রতার আচরণ করে থাকে। আর অমুসলিমরা বাহ্যত লিখিতভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে [National minorities] যাবতীয় অধিকার প্রদান করে বটে, কিন্তু বাস্তবে মানবিক অধিকারও দেয়না। এতে যদি কারো সংশয় থাকে, তবে সে যেনো আমেরিকায় নিগ্রোদের সাথে, রাশিয়ায় অকম্যুনিষ্টদের সাথে এবং চীন ও ভারতের মুসলমানদের সাথে কি আচরণ করা হচ্ছে তা দেখে নেয়। অনর্থক অন্যদের সামনে লজ্জাবোধ করে আমাদের নিজস্ব নীতি খোলাখুলি বর্ণনা না করা এবং সে অনুসারে দ্বিধাহীন চিত্তে কাজ না করার কি কারণ থাকতে পারে তা আমার বুঝে আসেনা।

অমুসলিমদের ধর্মপ্রচারের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। এটা আমাদের ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, আমরা যদি একেবারে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত না হই, তাহলে আমাদের দেশে অমুসলিমদের ধর্মপ্রচারের অনুমতি দিয়ে শক্তিশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গড়ে উঠতে দেয়ার মতো নির্বুদ্ধিতার কাজ করা সংগত হবেনা। বিদেশী পুঁজির দুধ কলা খেয়ে ও বিদেশী সরকারে আস্কারা পেয়ে সংখ্যালঘুরা লালিত পালিত হোক এবং

শক্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফুলে ফেঁপে উঠে তুরস্কের মতো সংখ্যালঘু খৃষ্টানরা আমাদেরকেও সংকটে ফেলে দিক, এটা কিছুতেই হতে দেয়া হবেনা।

খৃষ্টান মিশনারীদের এখানে বিদ্যালয় ও হাসপাতাল চালু রেখে মুসলমানদের ঈমান খরীদ করার এবং মুসলমানদের নতুন বংশধরগণকে আপন জাতীয় ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার [De-nationalise] অবাধ অনুমতি দেয়াও আমার মতে জাতীয় আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের শাসকরা এ ব্যাপারে চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। নিকটবর্তী উপকারিতা তো তাদের বেশ চোখে পড়ে কিন্তু সুদূরপ্রসারী কুফল তারা দেখতে পায়না।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয় কেবল তখনই, যখন তারা বিজিত হয় অথবা কোনো চুক্তির ভিত্তিতে জিযিয়া দেয়ার সুস্পষ্ট শর্ত অনুসারে তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দেয়া হয়। পাকিস্তানে যেহেতু এই দুই অবস্থার কোনোটাই দেখা দেয়নি, তাই এখানে অমুসলিমদের ওপর জিযিয়া আরোপ করা শরীয়তের বিধান অনুসারে জরুরী নয় বলে আমি মনে করি। [তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৬১]

৫. আরো কয়েকটি বিষয়

ক. সংবিধান ব্যাখ্যার অধিকার

প্রশ্ন ঃ সংবিধান ব্যাখ্যার অধিকার কার থাকা উচিত? আইনসভার না আদালতের? আমাদের দেশে পূর্বে এ অধিকার আদালতের ছিলো, বর্তমান সংবিধানে এ অধিকার আদালতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আইনসভাকে দেয়া হয়েছে। এতে আপত্তি উঠেছে যে, বিচার বিভাগের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এ অধিকার বিচার বিভাগের হাতে বহাল রাখার দাবী উঠেছে। এ সম্পর্কে এক ভদ্রলোক বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে আদালতের কাজ ছিলো শুধু বিরোধ মীমাংসা করা। আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অধিকার আদালতের ছিলোনা। আইন শুদ্ধ না ভুল, সেটা বলার এখতিয়ার আদালতের ছিলোনা। এই বক্তব্য কতোখানি সঠিক?[১]

জবাব ঃ বর্তমান যুগের আইনগত ও সাংবিধানিক সমস্যাবলীতে ইসলামের প্রাথমিক যুগের নযীর প্রয়োগ করার প্রবণতা আজকাল খুবই বেড়ে গেছে। কিন্তু যারা এ ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করেন, তারা তৎকালীন সমাজের সাথে এ যুগের সমাজের এবং তৎকালীন শাসকদের সাথে এ যুগের শাসকদের আকাশ পাতাল ব্যবধানের দিকটা লক্ষ্য করেননা।

খিলাফতে রাশেদার যুগে খলীফা স্বয়ং কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে একজন মস্ত বড় আলেম হতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে খোদাভীতির প্রাবল্যের কারণে জনগণ তাঁর প্রতি আস্থাশীল থাকতো যে, জীবনের কোনো ব্যাপারে তিনি যদি নিজস্ব চিন্তা গবেষণা ও বিচার বিবেচনার [ইজতিহাদ] ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নেন, তবে তা কখনো ইসলামের আদর্শ বিরোধী সিদ্ধান্ত হবেনা। তখন মজলিসে শূরার [পরামর্শ পরিষদ] সদস্যদের সকলেই ব্যতিক্রমহীনভাবে ইসলামের সর্বোত্তম পারদর্শী ও জ্ঞানী ব্যক্তি বিবেচিত হওয়ার কারণেই সদস্যপদের মর্যাদা লাভ করতেন। ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী নয়, স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে ইসলামকে বিকৃত করে, অথবা তার দ্বারা কোনো বিদয়াতী কার্যকলাপ কিংবা অনৈসলামিক প্রবণতার আশংকা থাকে, এমন কোনো ব্যক্তি তাদের দলে স্থান পেতোনা। সমাজের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশের জীবনে তখন ইসলামী ভাবধারার ছাপ বিদ্যমান ছিলো। সেখানে এমন পরিবেশ বিরাজ করতো যে, ইসলামের বিধান ও তার আদর্শগত চেতনার পরিপন্থী কোনো নির্দেশ বা আইনবিধি জারী করার

---

১. উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সময়ে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে এবং সংবিধানের ব্যাখ্যার অধিকার বিচার বিভাগকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যই কেউ দেখাতে পারতোনা। তৎকালীন আদালতের মানও ছিলো একই রকম উন্নত। বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হতেন তারাই, যারা কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে গভীর দক্ষতার অধিকারী হতেন, সর্বোচ্চ মানের মুত্তাকী ও পরহেজগার হতেন এবং আল্লাহ্‌র আইনকে চুল পরিমাণও লংঘন করতে প্রস্তুত ছিলেননা। এ পরিস্থিতিতে আইনসভা ও বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের ধরন যেমন হওয়ার কথা, তেমনই ছিলো। সকল বিচারক মামলার বিচার সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুসারে করতেন, আর যেসব ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় ইজতিহাদ করার প্রয়োজন দেখা দিতো, সে ক্ষেত্রে তারা সাধারণত নিজেরাই ইজতিহাদ করতেন। যেখানে বিচার্য বিষয় এমন ধরনের হতো যে, বিচারকের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ দ্বারা ফায়সালা করার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরীয়তের বিধান কি, সেটা খলীফার মজলিসে শূরা কর্তৃক নির্ণীত হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হতো, সে ক্ষেত্রে সামষ্টিক ইজতিহাদ দ্বারা ইসলামের মূলনীতিসমূহের সাথে অধিকতর সঙ্গতিশীল একটা বিধি তৈরী করা হতো। এরূপ কর্মপদ্ধতি যেখানে অনুসৃত হতো, সেখানে বিচারকদের মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা রদবদলের অধিকার থাকার কোনো কারণ ছিলোনা। কেননা তারা যদি কোনো আইন রদ করার অধিকারী হতেন তবে কেবল এজন্যই হতে পারতেন যে, সে আইন আসল সংবিধানের [অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী]। অথচ যে ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, সে ব্যাপারে তখন আদৌ আইন প্রণয়ন করাই হতোনা। আইন প্রণয়নের প্রয়োজন শুধু সে ক্ষেত্রেই দেখা দিতো, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ না থাকা হেতু কুরআন ও সুন্নাহর সাধারণ নীতিমালা ও ভাবধারার ভিত্তিতে চিন্তা গবেষণা চালিয়ে উপযুক্ত নীতি ও বিধি উদ্ভাবন [অর্থাৎ ইজতিহাদ] অপরিহার্য হয়ে দেখা দিতো। আর এটা সুবিদিত যে, এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইজতিহাদের তুলনায় সামষ্টিক ইজতিহাদই অধিকতর নির্ভরযোগ্য হতো। কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইজতিহাদ এই সামষ্টিক ইজতিহাদ থেকে ভিন্নতর হলেও তাতে কিছু আসে যায়না।

সেকালের এই সাংবিধানিক দৃষ্টান্ত আজকের পরিস্থিতিতে কোনোক্রমেই লাগসই হতে পারেনা। আজকের শাসকবৃন্দের এবং আইনসভার সদস্যদের যেমন খুলাফায়ে রাশেদীন ও তাদের মজলিশে শূরার সদস্যদের সাথে কোনো তুলনা হয়না তেমনি আজকের বিচারকরাও তৎকালীন বিচারকদের মতো নয়। আর আজকের আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াতেও তৎকালীন আইন প্রণয়ন কার্যক্রমের শর্তাবলী ও মান অনুসৃত হয়না। এমতাবস্থায় আমাদের গ্রহণযোগ্য কর্মপন্থা হলো, আমাদের সাংবিধানিক বিধিমালা সমসাময়িক পরিস্থিতির আলোকে প্রণয়ন করতে হবে। খিলাফতে রাশেদার দৃষ্টান্তসমূহ প্রয়াগ করার আগে তৎকালীন সে পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে, যার পটভূমিতে ঐ দৃষ্টান্তগুলোর কার্যত উদ্ভব হয়েছিলো। বর্তমান পরিস্থিতিতে শরীয়ত সংক্রান্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার প্রশানকেও অর্পণ করা যায়না, আইনসভার হাতেও ন্যস্ত করা যায়না, বিচার বিভাগ কিংবা উপদেষ্টা পরিষদের হাতেও ছেড়ে দেয়া যায়না। এসব প্রতিষ্ঠানের একটিও এমন নয় যে, শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের ওপর

মুসলমান জনগণ পূর্ণমাত্রায় আস্থা স্থাপন করতে পারে। যে ইজতিহাদ শরীয়তকে বিকৃত করে, তা থেকে নিরাপদে থাকার জন্য মুসলিম জনমতকে জাগ্রত করা এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতিকে এ ধরনের যে কোনো ইজতিহাদের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। যেসব শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে শরীয়ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক কোনো বিধান দেয়না, সে ক্ষেত্রে আইনসভাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া বর্তমান অবস্থায় নিরাপদ নয়। এজন্য একটা নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার। আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে সাংবিধানিক সীমা লংঘন করছে কিনা, সেটা পর্যবেক্ষণ করাই হবে ঐ নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানটির কাজ। বিচার বিভাগ ছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠান যে এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়, সেকথা বলাই বাহুল্য। [তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৬২]

খ. ইসলাম ও গণতন্ত্র

প্রশ্ন ঃ গণতন্ত্রকে আজকাল উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কেও এরূপ ধারণাই পোষণ করা হয়ে থাকে যে, তা বহুলাংশে গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে গণতন্ত্রে বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে। আমি জানতে চাই যে, ইসলাম ঐ ত্রুটিগুলো কিভাবে শুধরাতে পারে। ত্রুটিগুলো হলো ঃ

১. অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার মতো গণতন্ত্রেও শাসন ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত জনগণের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কার্যত গুটিকয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয় এবং বিবেক বেচা কেনার প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়। এভাবে ধনিক শ্রেণীর শাসন [Plutocracy বা Oligrachy] প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপক্রম হয়। এ সমস্যার সমাধানের উপায় কি?

২. জনসাধারণের রকমারি ও পরস্পরবিরোধী স্বার্থ একই সাথে রক্ষা করা মনস্তাত্ত্বিকভাবে খুবই দুরূহ কাজ। সর্বস্তরের মানুষের এ দায়িত্ব পালনে গণতন্ত্র কিভাবে সফল হতে পারে?

৩. জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিরক্ষর, সরল, অনুভূতিহীন এবং ব্যক্তিপূজারী। স্বার্থপর লোকেরা অনবরত তাদেরকে বিপথগামী করে থাকে। এমতাবস্থায় প্রতিনিধিত্বমূলক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করা খুবই কঠিন।

৪. জনগণের ভোটে যেসব নির্বাচিত ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তার সদস্য সংখ্যা খুব বেশী হয়ে থাকে। তাদের পারস্পরিক বিতর্ক ও পরামর্শক্রমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুবই জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

আপনার ধারণামতে ইসলাম স্বীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসব ত্রুটি থেকে কিভাবে রক্ষা করবে, এটা বুঝতে আমাকে সাহায্য করবেন।

জবাব ঃ আপনি গণতন্ত্রের যে ক'টি ত্রুটি তুলে ধরেছেন, তার সব কয়টিই যথার্থ। কিন্তু এ ব্যাপারে চূড়ান্ত মত স্থির করার আগে আরো কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা জরুরী।

পয়লা বিবেচ্য বিষয় হলো, মানুষের সামষ্টিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য নীতিগতভাবে কোন্ পদ্ধতিটা সঠিক? এর দু'টো পদ্ধতি হতে পারে। প্রথমটা এই যে, যাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হবে তাদের মর্জি অনুসারে শাসক বা পরিচালক নিয়োগ করতে হবে। সে পরিচালক তাদের ইচ্ছা ও পরামর্শক্রমে কর্মকান্ড পরিচালনা করবে এবং যতক্ষণ তাদের আস্থা ঐ পরিচালকের ওপর থাকবে, কেবল ততক্ষণই সে পরিচালক বা শাসক হিসেবে বহাল থাকবে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেই শাসক বা পরিচালক হয়ে জেঁকে বসবে, নিজের ইচ্ছা মতোই সব কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং যাদের কর্মকান্ড সে পরিচালনা করে, তাদের নিয়োগ, কার্যনির্বাহ ও পদচ্যুতিতে তাদের বলার বা করার কিছু থাকবেনা। এ দু'টো পদ্ধতির মধ্যে প্রথম পদ্ধতিটাই যদি সঠিক ও ন্যায়সংগত হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় পদ্ধতির দিকে যাওয়ার পথ শুরুতেই বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত এবং প্রথম পদ্ধতিটা বাস্তবায়নের সর্বোত্তম উপায় কি হতে পারে সেটাই হওয়া উচিত একমাত্র আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো, গণতন্ত্রের মৌল আদর্শ বাস্তবায়নের যে রকমারি কর্মপন্থা বিভিন্ন যুগে অবলম্বন করা হয়েছে অথবা উদ্ভাবন করা হয়েছে, তার বিশদ বিবরণে না গিয়েও সেগুলোকে যদি শুধু এ দিক দিয়ে বিচার করা হয় যে, গণতন্ত্রের মৌল আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে তা কতোখানি সফল হয়েছে, তাহলে তার ব্যর্থতার তিনটি প্রধান কারণ দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রথম কারণটি হলো, জনগণকে সার্বভৌম [Sovereign] ও সর্বাত্মক শাসক ধরে নেয়া হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ স্বয়ং মানুষ যখন এ বিশ্ব চরাচরে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নয়, তখন বহু মানুষের সমষ্টি জনগণ কেমন করে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হতে পারে? এ কারণেই স্বেচ্ছাচার সর্বস্ব গণতন্ত্র শেষ পর্যন্ত যে বিন্দুতে গিয়ে দাঁড়ায়, তা জনগণের ওপর কতিপয় ব্যক্তির বাস্তব সার্বভৌমত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলাম শুরুতেই এ গলদ শুধরে দেয়। সে গণতন্ত্রকে এমন একটা মৌলিক আইনের অধীন করে দেয়, যা বিশ্ব জাহানের আসল সার্বভৌম শাসকের রচিত। জনগণ এবং তাদের শাসকবৃন্দ এ আইনের আনুগত্য করতে বাধ্য। এজন্য যে স্বৈরাচার শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা আদৌ সৃষ্টি হওয়ারই অবকাশ পায়না।

দ্বিতীয়ত, জনগণের মধ্যে যতক্ষণ গণতন্ত্রের দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত চেতনা ও চরিত্র সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ গণতন্ত্র সাফল্যের সাথে চলতেই পারেনা। ইসলাম এজন্যই এক একজন করে প্রত্যেক সাধারণ মুসলমানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ওপর জোর দেয়। ইসলাম কামনা করে যে, প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে ঈমানদারী, দায়িত্ব সচেতনতা এবং ইসলামের মৌলিক বিধানের আনুগত্য ও অনুসরণের দৃঢ় সংকল্প জন্ম নিক। এ জিনিসটা যতো কম হবে, গণতন্ত্রের সাফল্যের সম্ভাবনা ততোই কম হবে। আর এটা যতো বেশী হবে, তার সাফল্যের সম্ভাবনা ততোই উজ্জ্বল হবে।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে সদাজাগ্রত ও অনমনীয় জনমতের ওপর। সমাজ যখন সৎ লোকদের দ্বারা গঠিত হবে, এই সৎ লোকদেরকে সত্য ও ন্যায়ের

ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করা হবে এবং সে সংঘবদ্ধ সমাজ এতোটা শক্তিশালী হবে যে, অসততা ও অসৎ লোক সেখানে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবেনা এবং শুধুমাত্র সততা ও সৎ লোকই উন্নতি ও বিকাশ লাভের সুযোগ পাবে। ইসলাম এজন্য আমাদেরকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়ে দিয়েছে।

উল্লিখিত তিনটি উপকরণ যদি সংগৃহীত হয়ে যায় তাহলে গণতন্ত্রের বাস্তবায়নকারী সংস্থার রূপকাঠামো, যেরকমই হোক না কেন, গণতন্ত্র সাফল্যের সাথে চলতে পারবে। আর এই সংস্থার কোথাও কোনো অসুবিধা অনুভূত হলে তা সংশোধন করে আরো ভালো সংস্থা গড়ে তোলাও সম্ভব হবে। এরপর গণতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাওয়াই অধিকতর উন্নতি ও পরিশুদ্ধি লাভের জন্য যথেষ্ট। অভিজ্ঞতার সাহায্যে ক্রমান্বয়ে একটা ত্রুটিপূর্ণ অবকাঠোমো উৎকৃষ্টতর ও পূর্ণাংগ হয়ে গড়ে উঠতে থাকবে। [তরজমানুল কুরআন, জুন ১৯৬৩]

গ. রাষ্ট্রপ্রধানের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা

প্রশ্ন ঃ কিছুদিন যাবত পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে 'খলিফাতুল মুসলিমীন' বা 'আমীরুল মুমিনীন' সূচক সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করা হোক। এই প্রস্তাবকে আরো জোরদার করার উদ্দেশ্যে একথাও বলা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রপ্রধানকে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতাও দেয়া উচিত। কেননা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বড় বড় সাহাবীদের মুকাবিলায় ভেটো প্রয়োগ করেছেন। যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিলো এবং যারা নবূয়্যতের দাবী করেছিলো, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দিয়ে তিনি সাহাবায়ে কিরামের অভিমত রদ করেন। এই যুক্তির বলে ভেটোর মতো একটা ধান্ধাবাজীপূর্ণ আইনকে শরীয়তের ভিত্তিতে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে।

এ পরিস্থিতির আলোকে আপনার কাছে কয়েকটা প্রশ্ন রাখছি। আশা করি আপনি সুস্পষ্ট জবাব দিয়ে আশ্বস্ত করবেন।

১. হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কি আজকের যুগের প্রচলিত অর্থেই ভেটো প্রয়োগ করেছিলেন?
২. যদি তাই করে থাকেন তবে এজন্য তাঁর কাছে কোনো শরীয়তসম্মত যুক্তিপ্রমাণ ছিলো কি?

জবাব ঃ খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসন ব্যবস্থা এবং বর্তমান যুগের রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। যারা ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞ, তারা ছাড়া আর কেউ এ দু'টোকে এক বলতে পারেনা। আমি এ গ্রন্থে সপ্তম অধ্যায়ের ৩য় অনুচ্ছেদে এ পার্থক্য সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছি। সেটি পড়ে দেখবেন। ঐ আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাবে যে, খিলাফতে রাশেদার শাসন ব্যবস্থায় যে জিনিসটাকে "ভেটো" ক্ষমতা বলে অভিহিত করা হয়, তা বর্তমান যুগের সাংবিধানিক পরিভাষা থেকে ভিন্ন জিনিস ছিলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাত্র দু'টো সিদ্ধান্তকে এ ক্ষেত্রে যুক্তির ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে। একটি হলো, উসামার নেতৃত্বে যে সেনাদলকে মিথ্যা নবূয়্যতের দাবীদারদেরকে

দমন করার জন্য অভিযানে যাওয়ার নির্দেশ স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছিলেন, কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের দরুণ অভিযান স্থগিত ছিলো, সেটা পুনরায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়টি হলো, যারা ইসলাম পরিত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছিলো, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ। এই দু'টো ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু শুধু নিজের ব্যক্তি মতে সিদ্ধান্ত নেননি। বরং নিজের মতের সপক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণ পেশ করেছিলেন। উসামার সেনাদল সম্পর্কে তাঁর যুক্তি ছিলো, যে কাজের ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই জীবদ্দশায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেটিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা হিসেবে সমাধান করাই আমার দায়িত্ব। সে ফায়সালা পরিবর্তনের অধিকার আমার নেই। ইসলাম পরিত্যাগকারীদের ব্যাপারে তাঁর যুক্তি ছিলো, যেব্যক্তি বা গোষ্ঠী নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে এবং বলে যে, আমি নামায পড়বো কিন্তু যাকাত দেবোনা, সে ইসলাম বহির্ভূত, তাকে মুসলমান মনে করাই ভুল। সুতরাং যারা বলে ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে তরবারি উত্তোলন করা যাবে? তাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।' হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই যুক্তির কারণেই সকল সাহাবী তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন। এটা যদি 'ভেটো' হয়ে থাকে তবে তা আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহর 'ভেটো', রাষ্ট্র প্রধানের ভেটো নয়।

আসলে এটাকে ভেটো বলাই ভুল। কেননা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর যুক্তি মেনে নেয়ার পর ভিন্নমত পোষণকারী সাহাবায়ে কিরাম খলীফার মতকেই সঠিক বলে স্বীকার করেছিলেন এবং নিজেদের পূবের্র মত প্রত্যাহার করেছিলেন। [তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৬৩]

ইসলামী শাসনের মূলনীতি

- মৌলিক মানবাধিকার
- অমুসলিমদের অধিকার
- ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার
- ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার পথনির্দেশক মূলনীতি

দ্বাদশ অধ্যায়

- মৌলিক মানবাধিকার

দীর্ঘদিন থেকে কিছু লোকের মনমগযে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে যে, ইসলাম মৌলিক মানবাধিকারের আদৌ কোনো গ্যারান্টি দিয়েছে কি? যারা কেবল পাশ্চাত্যের ইতিহাস এবং রাজনৈতিক উন্নতির ব্যাপারেই ওয়াকিফহাল, অজ্ঞতাবশত এসব লোকের ধারণা হলো, মানবাধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি কেবল পাশ্চাত্য দেশগুলোতেই উন্নতি সাধিত হয়েছে। অথচ এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। ইসলামতো ঐ সময়ই মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণের গ্যারান্টি দিয়েছে এবং বাস্তবেও মানবতা তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ভোগ করেছে, যখন অন্যদের মধ্যে মানবাধিকারের ধারণাই জন্মায়নি। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মুওদুদী লাহোর রোটারী ক্লাবের আহ্বানে মৌলিক মানবাধিকারের ওপর বক্তব্য পেশ করেন এবং খলীল হামেদী সাহেব তা লিপিবদ্ধ করেন। এখানে প্রসংগক্রমে সে ভাষাটি উল্লেখ করে দেয়া হলো।

মানবাধিকার একদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, অপরদিকে ইসলামে যাবতীয় নীতিমালার জন্যে অগ্রগণ্য মূলনীতির মর্যাদা সম্পন্ন। গ্রন্থের তৃতীয় খন্ড এসব অধিকারের বর্ণনা দিয়ে আরম্ভ করা হলো ।

– সংকলক

মৌলিক মানবাধিকার

[এটা মূলত একটা বক্তৃতা। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী [রহঃ] লাহোরের রোটারী ক্লাবে এই বক্তৃতা দেন। মাওলানা খলীল আহ্মদ হামেদী তা লিপিবদ্ধ করেন।]

মৌলিক অধিকার কোনো নতুন ধারণা নয়

আমাদের মুসলমানদের সম্পর্কে বলা যায়, 'মৌলিক মানবাধিকার' মতবাদ আমাদের জন্য কোনো নতুন জিনিস নয়। হতে পারে অন্যদের দৃষ্টিতে এই অধিকারের ইতিহাস সম্মিলিত জাতিসংঘের মহাসনদ থেকে, অথবা ইংল্যান্ডের ম্যাগনা কারটা [Magna Carta] থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু আমাদের মতে এই মতবাদের সূচনা অনেক পূর্বে হয়েছে। এখানে আমি মানুষের মৌলিক অধিকারের ওপর আলোকপাত করার পূর্বে "মানবীয় অধিকার" মতবাদের সূচনা কি করে হলো তা সংক্ষেপে বলে দেয়া জরুরী মনে করি।

মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন উঠছে কেন?

দুনিয়াতে মানুষই এমন এক জীব যার সম্পর্কে স্বয়ং মানুষের মধ্যেই বারবার প্রশ্ন উঠছে যে, তার মৌলিক অধিকার কি? বাস্তবিকপক্ষে এ এক আশ্চর্য ধরনের কথা। মানবজাতি ছাড়া দুনিয়ায় বসবাসরত অন্যান্য মাখলূকাতের অধিকার স্বয়ং প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং তারা তা ভোগ করে যাচ্ছে। এজন্য তাদের কোনোরূপ চিন্তা ভাবনা করতে হয়না। কিন্তু মানুষই এমন মাখলূক যার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে যে, তার অধিকারসমূহ কি? এবং তাদের এ অধিকার নির্ধারণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

অনুরূপভাবে এটাও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, বিশ্বে এমন কোনো প্রকার সৃষ্টি নেই যে তার নিজস্ব শ্রেণীভুক্ত অপর সদস্যের সাথে সেই ব্যবহার করছে যা মানুষ তার সমগোত্রের সাথে করছে। বরং আমরা তো দেখছি প্রাণীদের কোনো শ্রেণী এমন নেই যা অপর শ্রেণীর ওপর নিছক আনন্দ উপভোগ অথবা প্রভুত্ব করার জন্য আক্রমণ করছে।

প্রাকৃতিক বিধান যদিও এক ধরনের জীবকে অপর ধরনের জীবের খাদ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে, কিন্তু তা কেবল খাদ্যের সীমা পর্যন্ত। এমন কোনো হিংস্র জন্তু নেই যে খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া অথবা এই প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাওয়ার পর বিনা কারণে অন্যান্য প্রাণী হত্যা করে যাচ্ছে। মানুষ তার সমগোত্রীয়দের সাথে যে আচরণ করছে জীব জন্তুর মধ্যে কোনো প্রাণীই তার সমগোত্রীয়দের সাথে তদ্রূপ আচরণ করেনা। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন এটা খুব সম্ভব তারই ফল।

মানুষ দুনিয়াতে যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে তা আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক তাদেরকে প্রদত্ত জ্ঞান ও আবিষ্কার শক্তিরই চমৎকারিত্ব।

বাঘেরা আজ পর্যন্ত কোনো সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেনি। কোনো কুকুর আজ পর্যন্ত অন্যান্য কুকুরগুলোকে গোলামে পরিণত করেনি। কোনো ব্যাঙ আজ পর্যন্ত অন্য ব্যাঙদের বাকশক্তি হরণ করেনি। কেবল মানুষই যখন আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ উপেক্ষা করে তাঁর দেয়া শক্তিকে কাজে লাগাতে শুরু করে, তখন নিজের সগোত্রীয়দের ওপরই যুলুম শুরু করে দেয়। দুনিয়াতে মানব জাতির গোড়াপত্তন হওয়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমস্ত পশুরা এতো মানুষ হত্যা করেনি যতোগুলো মানুষের জীবন কেবল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মানুষে ছিনিয়ে নিয়েছে। এতে প্রমাণ হয় যে, বাস্তবিকপক্ষে মানুষ অন্য মানুষের অধিকারের কোনো তোয়াক্কা করেনা। এ ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ্ তায়ালাই মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁর নবী রসূলদের মাধ্যমে মানবীয় অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করেছেন। মানবজাতির অধিকার নির্ধারণকারী মূলত মানুষের স্রষ্টাই হতে পারেন। সুতরাং মহান স্রষ্টাই মানুষের অধিকারসমূহ বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছেন।

আধুনিক যুগে মানবাধিকার চেতনার ক্রমবিকাশ

মানবাধিকারের ইসলামী মেনিফেস্টোর দফাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে বর্তমান যুগে মানবাধিকার চেতনার ক্রমবিকাশ ইতিহাসের ওপর সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত হবে।

১. ইংল্যান্ডের রাজা জন ১২১৫ খৃষ্টাব্দে যে ম্যাগনা কারটা জারি করেন তা মূলত ছিলো তার পারিষদবর্গের নির্যাতনের ফল। রাজা এবং পারিষদবর্গের মধ্যে এর মর্যাদা ছিলো একটি চুক্তিপত্রের সমতুল্য। অধিকন্তু তা পারিষদবর্গের স্বার্থ রক্ষার জন্যই প্রণয়ন করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষের অধিকারের কোনো প্রশ্ন এখানে ছিলোনা। পরবর্তীকালে লোকেরা এর মধ্যে আবিষ্কার করে যে, তা এই সনদ প্রণয়নকারীদের সামনে পাঠ করা হলে তারা হয়রান হয়ে যেতো। সপ্তদশ শতকের পেশাদার আইনবিদরা তার মধ্যে আবিষ্কার করলো যে, বিচার বিভাগের অযথা কয়েদ করার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা এবং কর আরোপ করার ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার অধিকার ইংল্যান্ডের অধিবাসীদের এই সনদের মধ্যে দেয়া হয়েছে।

২. টম পেনের [Paine Thomas-1737-1809] মানবাধিকার [Right of man] নামক পুস্তিকা পাশ্চাত্যবাসীদের চিন্তাধারায় ব্যাপক বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করে। তার এই পুস্তিকা [১৭৯১] পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে মানবাধিকারের ধারণাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়। এই ব্যক্তি আসমানী কোনো ধর্মের সমর্থক ছিলেননা। আর তার যুগটাও ছিলো আসমানী ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যুগ। এজন্য পাশ্চাত্যের জনগণ মনে করে বসলো আসমানী ধর্মগুলোতে মানবাধিকার সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই।

৩. ফরাসী বিপ্লবের ঘটনাবলীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে "মানবাধিকার ঘোষণা" [Declaration of the Rights of man] যা ১৭৮৯ সালে প্রকাশ পায়। এটা অষ্টাদশ শতকের সমাজদর্শন এবং বিশেষ করে রুশোর "সামাজিক আচরণ

তন্ত্রের" [Social contact theory] ফল। এতে জাতীয় সরকার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং মালিকানার স্বাভাবিক অধিকার সমর্থন করা হয়েছে। এতে ভোট দানের অধিকার, আইন প্রণয়ন এবং কর আরোপ করার এখতিয়ারের ওপর জনমতের নিয়ন্ত্রণ, বিচার বিভাগ কর্তৃক অপরাধের কারণ অনুসন্ধান [Trail by Jury] ও পর্যালোচনা ইত্যাদির সমর্থন করা হয়েছে।

ফ্রান্সের আইন পরিষদ বিপ্লব যুগে মানবাধিকারের উক্ত ঘোষণাপত্র এই উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করেছিল যে, যখন সংবিধান প্রণয়ন করা হবে তখন এটা তার ভূমিকায় সংযোজন করা হবে এবং গোটা সংবিধানে এর ভাবধারা ও প্রাণসত্তাকে উজ্জীবিত রাখা হবে।

৪. মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের [USA] সংবিধানের দশটি সংশোধনীতে বৃটিশ গণতান্ত্রিক দর্শনের ওপর ভিত্তিশীল মানবাধিকারের প্রায় সবগুলো ধারাই গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. যুক্তরাষ্ট্রের স্টেটগুলো ১৯৪৮ সালে বেগোটা সম্মেলনে 'মানুষের অধিকার ও কর্তব্য' সম্পর্কিত যে ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে তাও যথেষ্ট গুরুত্বের অধিকারী।

৬. জাতিসংঘ [UNO] গণতান্ত্রিক দর্শনের অধীনে পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো ইতিবাচক ও সংরক্ষণমূলক অধিকার সম্পর্কে প্রস্তাব পাশ করে। পরিশেষে তা "মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র" নামে সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি প্রস্তাব পাশ করে। এতে গণহত্যা বা অন্য যে কোনো উপায়ে জাতি বা সম্প্রদায়ের বিনাশ সাধনের [Genocide] চেষ্টাকে আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে চরম অপরাধ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

পুনরায় ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে গণহত্যার প্রতিরোধ এবং শাস্তি প্রদানের জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করা হয় এবং ১৯৫১ সালের ১২ জানুয়ারী তা কার্যকর হয়। তাতে গণহত্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ কোনো জাতি, সম্প্রদায়, ধর্মীয় সম্প্রাদয় অথবা এর কোনো একটি অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য নিম্নে উল্লেখিত যে কোনো পন্থা অবলম্বন করা ঃ

ক. এই ধরনের কোনো সম্প্রদায়ের লোকদের হত্যা করা।

খ. তাদেরকে কঠোর দৈহিক অথবা মানসিক শাস্তি দেয়া।

গ. উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ ধরনের কোনো সম্প্রাদায়ের জীবনযাত্রায় এমন পরিস্থিতি চাপিয়ে দেয়া যা তাদের দৈহিক অস্তিত্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে ধ্বংসকর হবে।

ঘ. এই সম্প্রদায়ের বংশধারা রোধ করার জন্য স্বৈরাচারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঙ. জবরদস্তীমূলকভাবে এই সম্প্রদায়ের সন্তানদের অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থানান্তর করা।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর যে "মানবাধিকারের মহাসনদ" পাশ করা হয় তার ভূমিকায় অন্যান্য সংকল্পের সাথে মোটামুটিভাবে এও প্রকাশ করা হয় যে, "মৌলিক

মানবাধিকারের ক্ষেত্রে মানবজাতির মান সম্মান ও গুরুত্বের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীদের সমঅধিকারের ধর্মীয় বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য।"

অনন্তর উক্ত ভূমিকায় জাতিসংঘের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, "মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য এবং জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে মৌলিক স্বাধিকার প্রদানের কাজে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভ।"

অনুরূপভাবে উক্ত সনদের ৫৫ ধারায় জাতিসংঘের এই ঘোষণাপত্র বলছে ঃ "জাতিসংঘ পরিষদ মানবাধিকার এবং সবার জন্য মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বব্যাপী সম্মান এবং এর সংরক্ষণে ব্যাপকতা আনয়ন করে।"

এই ঘোষণাপত্রের কোনো একটি অংশ নিয়েও কোনো দেশের প্রতিনিধিই দ্বিমত পোষণ করেননি। দ্বিমত পোষণ না করার কারণ ছিলো এই যে, এটা ছিলো সাধারণ মূলনীতিসমূহের ঘোষণা এবং প্রকাশ মাত্র। কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা কারো ওপর আরোপ করা হয়নি। এটা এমন কোনো চুক্তি নয় যার ভিত্তিতে স্বাক্ষর দানকারী রাষ্ট্রগুলো এর আনুগত্য করতে বাধ্য হয় এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তাদের ওপর আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ হতে পারে। তাতে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, এটা একটা মানদন্ড যে পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা করা উচিত। উপরন্তু কোনো কোনো দেশ এর সপক্ষে অথবা বিপক্ষে ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকে।

এখন দেখুন এই ঘোষণাপত্রের ছত্রছায়ায় সারা দুনিয়াব্যাপী মানবতার একেবারে প্রাথমিক অধিকারসমূহের নির্বিচার হত্যা চলছে। স্বয়ং সভ্যতার চরম শিখরে উন্নীত হওয়ার দাবীদার এবং দুনিয়ার নেতৃত্বদানকারী দেশগুলোর অভ্যন্তরে মানবাধিকারের নির্বিচার গণহত্যা চলছে। অথচ তারাই এ সনদ পাশ করিয়েছিলেন।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, [এক] পশ্চিমা জগতের কাছে মানবাধিকার ধারণা সংক্রান্ত দুই তিন শতাব্দী পূর্বের কোনো ইতিহাস নেই। [দুই] আজ যদিও এসব অধিকারের উল্লেখ করা হচ্ছে, কিন্তু তার পিছনে কোনো সনদ [Sanction] এবং কোনো কার্যকরকারী শক্তি [Authority] নেই। বরং এটা শুধু চিত্তাকর্ষক অভিলাষ মাত্র। এর বিপরীতে ইসলাম কুরআন মজীদে মানবাধিকারের যে ঘোষণাপত্র দিয়েছে এবং যার সংক্ষিপ্তসার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের মহাসম্মেলনে ঘোষণা করেছেন তা উল্লেখিত সনদগুলোর তুলনায় অধিক প্রাচীন এবং ঈমান, নৈতিকতা ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা অনুসরণ করতে মুসলিম উম্মাহ একান্তই বাধ্য। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন বাস্তবে তা কার্যকর করে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইসলাম মানুষকে যেসব অধিকার দান করেছে এখন আমি তা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

১. জীবনের মর্যাদা এবং বাঁচার অধিকার

কুরআন মজীদে দুনিয়ার সর্বপ্রথম হত্যাকান্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা ছিলো মানবজাতির ইতিহাসের সর্বপ্রথম দুর্ঘটনা এতে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জীবন সংহার করেছে। এ সময় প্রথম বারের মতো মানুষকে তাদের জীবনের প্রতি

মর্যাদাবোধের শিক্ষা দেয়ার এবং প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলার প্রয়োজন দেখা দিলো। কুরআনে এই ঘটনার উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ

"যে ব্যক্তি হত্যার অপরাধ কিংবা বিশ্বে বিপর্যয় সৃষ্টির অপরাধ ছাড়া অপর ব্যক্তিকে হত্যা করলো, সে যেনো গোটা মানব জাতিকে হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখলো সে যেনো গোটা মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রাখলো।" [সূরা মায়েদা ঃ ৩২]

কুরআন মজীদ উল্লেখিত আয়াতে একটি মাত্র মানুষকে হত্যা করার অপরাধকে গোটা মানব জগতকে হত্যা করার সমতুল্য অপরাধ গণ্য করেছে এবং এর বিপরীতে একজন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখাকে গোটা মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার সমান গণ্য করেছে। 'আহ্ইয়া' শব্দের অর্থ হচ্ছে জীবিত করা। অন্য কথায় বলা যায়, যে ব্যক্তি মানুষের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করলো সে তাকে জীবন্ত করার কাজ করলো। এই প্রচেষ্টাকে সমগ্র মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার সমতুল্য সৎকাজ বলে গণ্য করা হয়েছে।

এই মূলনীতি থেকে দু'টি বিষয়কে ব্যতিক্রম করা হয়েছে ঃ

এক. যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে তাকে কিসাসের আওতায় মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে।

দুই. কোনো ব্যক্তি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করলে তাকেও মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। এসব অবস্থা ছাড়া মানুষের জীবনকে ধ্বংস করা যেতে পারেনা।

মানুষের জীবনের নিরাপত্তার এই নীতিমালা মানবেতিহাসের সূচনা লগ্নেই আল্লাহ্ তায়ালা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। মানব জাতি সম্পর্কে এ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল যে অন্ধকারের মধ্যেই তার যাত্রা শুরু হয়েছে এবং নিজের সমজাতীয় প্রাণীদের হত্যা করতে করতে কোনো এক পর্যায়ে সে চিন্তা করলো মানুষ খুন করা উচিত নয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং আল্লাহ্ তায়ালা সম্পর্কে সংশয়ের ওপর ভিত্তিশীল। কুরআন আমাদের বলছে, আল্লাহ্ তায়ালা মানব জাতির গোড়াপত্তন থেকেই তাদের পথপ্রদর্শন করে আসছেন। তিনি মানুষকে মানুষের অধিকারের সাথেও যে পরিচয় করিয়েছেন, তাও এই পথপ্রদর্শনের মধ্যে শামিল রয়েছে।

২. অক্ষম ও দুর্বলদের নিরাপত্তা

দ্বিতীয় যে কথা কুরআন থেকে জানা যায় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে তা হচ্ছে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, আহত এবং রুগ্নদের ওপর কোনো অবস্থাতেই হাত উঠানো বৈধ নয়। চাই সে নিজের জাতির হোক অথবা শত্রু পক্ষের। তবে এদের মধ্যে যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তাদের কথা স্বতন্ত্র। অন্যথায় তাদের ওপর অন্য কোনো অবস্থায় হাত তোলা নিষেধ। এই মূলনীতি কেবল নিজের জাতির জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির সাথেই এই নীতি অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে ব্যাপক পথনির্দেশ দান করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের অবস্থা ছিলো এই যে, তাঁরা যখন

শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে সেনাবাহিনী পাঠাতেন তখন তাঁরা গোটা বাহিনীকে পরিষ্কারভাবে বলে দিতেন ঃ শত্রুদের ওপর আক্রমণকালীন অবস্থায় কোনো নারী, শিশু, বৃদ্ধ, আহত এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের ওপর হাত তোলা যাবেনা।

৩. মহিলাদের মান সম্ভ্রমের হিফাযত

কুরআন থেকে আমরা আরো একটি মূলনীতি জানতে পারি এবং হাদীসেও তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। তা হচ্ছে ঃ যে কোনো অবস্থায় নারীদের সতীত্ব, পবিত্রতা ও মান সম্ভ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ যুদ্ধের মাঠে যদি শত্রু পক্ষের কোনো নারী সামনে এসে যায় তাহলে কোনো মুসলিম সৈনিকের জন্য তাকে স্পর্শ জায়েয নয়। কুরআনের দৃষ্টিতে যেনা ব্যভিচার সাধারণত হারাম তা যে কোনো মহিলার সাথেই করা হোক, চাই সে নারী মুসলমান হোক অথবা অমুসলিম, নিজ সম্প্রদায়ের হোক অথবা ভিন্ন সম্প্রদায়ের, মিত্র রাষ্ট্রের হোক অথবা শত্রু রাষ্ট্রের।

৪. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

একটি মৌলনীতি হচ্ছে এই যে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে যে কোনো অবস্থায় খাদ্য দান করতে হবে। উলংগ ব্যক্তিকে যে কোনো অবস্থায় বস্ত্র দিতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তির জন্য যে কোনো অবস্থায় চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে হবে, চাই তারা শত্রু হোক অথবা বন্ধু। এটা চিরন্তন [Universal] অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। দুশমনদের সাথেও আমরা এই ব্যবহার করবো। শত্রু পক্ষের কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের কাছে চলে আসে, তাহলে তাকে ক্ষুধার্ত, উলংগ না রাখা আমাদের জন্য ফরয। যদি সে আহত অথবা রুগ্ন হয় তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

৫. সুবিচার

কুরআন করীমের স্থায়ী নীতি হলো, মানুষের সাথে আদল ও সুবিচার করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

> "কোনো বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদের যেনো এতোটা উত্তেজিত না করে [যার ফলে] তোমরা সুবিচার ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায়বিচার করো। বস্তুত খোদাভীতির সাথে এর গভীর নৈকট্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে।" [সূরা মায়েদা ঃ ৮]

এ আয়াতে ইসলাম এই নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, মানুষকে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি নির্বিশেষে সবার সাথে যে কোনো অবস্থায় সুবিচার করতে হবে। আমরা বন্ধুদের সাথে সুবিচার করবো আর শত্রুদের ক্ষেত্রে এই নীতি বিসর্জন দেবো ইসলামে তা চূড়ান্তভাবেই নিষিদ্ধ।

৬. সৎ কাজে সহযোগিতা অসৎ কাজে অসহযোগিতা

কুরআন মজীদের নির্ধারিত আরেকটি মূলনীতি হচ্ছে ঃ সৎ কাজে এবং অধিকার পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকের সাথে সহযোগিতা করতে হবে আর খারাপ কাজ ও যুলুমের ক্ষেত্রে কারোরই সহযোগিতা করা যাবেনা। নিজের ভাইও যদি খারাপ কাজ করে তবে আমরা তার সহযোগিতা করবোনা। আর ভাল কাজ যদি দুশমনরাও করে তাহলে তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবো। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"ন্যায় ও খোদাভীতিমূলক কাজে সবাইর সহযোগিতা করো এবং যা সীমালংঘনমূলক ও গুনাহের কাজ তাতে কারো সহযোগিতা করোনা।" [সূরা মায়েদা ঃ ২]

আয়াতে সৎ, ন্যায় ও ভালো কাজ বুঝাবার জন্যে 'বির' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এ 'বির' শব্দের অর্থ কেবল সৎকাজই নয় বরং আরবী ভাষার এ শব্দ 'অধিকার পৌঁছে দেয়ার' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ অন্যের প্রাপ্য অধিকার প্রদান, তাকওয়া ও খোদাভীতির কাজে আমরা প্রত্যেকেরই সহযোগিতা করবো। এটা কুরআনের স্থায়ী মূলনীতি।

৭. সমতার অধিকার

আরো একটি মূলনীতি যা কুরআন মজীদ জোরেসোরে বর্ণনা করেছে। তা হচ্ছে সব মানুষ সমান। যদি কারো প্রধান্য থেকে থাকে তাহলে এটা নির্ধারিত হবে চরিত্র ও নৈতিকতার মাপকাঠিতে। এ ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে ঃ

"হে মানুষ! আমরা তোমাদের একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে এজন্য বিভক্ত করেছি যেনো তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাধিক খোদাভীরু সেই আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক সম্মানিত।" [সূরা হুজরত ঃ ১৩]

এ আয়াতে প্রথম কথা বলা হয়েছে, গোটা মানব জাতি একই মূল থেকে উৎসারিত। বংশ, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির পার্থক্য মানব জাতিকে বিভক্ত করার জন্য মূলত কোনো যুক্তিযুক্ত কারণই নয়।

দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে, আমরা এই জাতিগত বন্টন কেবল পরিচয় লাভের জন্য করেছি। অন্য কথায় এক গোষ্ঠী, এক গোত্রের এবং এক জাতির লোকদের অন্যদের ওপর এমন কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই যে তারা নিজেদের অধিকারের তালিকা দীর্ঘায়িত করবে এবং অন্যদের তালিকা সংকুচিত করবে। আল্লাহ্ তায়ালা এই যে পার্থক্য করেছেন, পরস্পরের দৈহিক কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন বানিয়েছেন, ভাষায় প্রার্থক্য রেখেছেন, এসব কিছু গৌরব ও অহংকারের জন্য নয় বরং পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করার জন্যই তা করেছেন। যদি সমস্ত মানুষ একই রকম হতো তাহলে পার্থক্য করা যেতো না। এদিক থেকে এই বিভক্তি প্রকৃতিগত, কিন্তু অন্যদের অধিকার আত্মসাত করা এবং অনর্থক স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। সম্মান ও গৌরবের ভিত্তি নৈতিক অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ভিন্ন পন্থায় বর্ণনা করেছেন।

"কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোনো আরবের ওপরও কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কিন্তু তাকওয়ার ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে। বংশের ভিত্তিতেও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"

অর্থাৎ দীনদারী, সততা ও তাকওয়ার ভিত্তিতেই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণিত হয়। এমন তো নয় যে, কোনো ব্যক্তিকে রূপা দিয়ে, কোনো ব্যক্তিকে পাথর দিয়ে আর কোনো ব্যক্তিকে মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, বরং সমস্ত মানুষ এক।[১]

৮. পাপাচার থেকে বাঁচার অধিকার

আরেকটি মূলনীতি হচ্ছে, কোনো ব্যক্তিকে পাপের কাজ করার নির্দেশ দেয়া যাবেনা এবং কোনো ব্যক্তিকে যদি খারাপ কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয় তাহলে এই নির্দেশ পালন করা তার জন্য বাধ্যতামূলকও নয় এবং বৈধও নয়। যদি কোনো অফিসার তার অধীনস্থ কর্মচারীকে নাজায়েয কাজ করার নির্দেশ দেয়, অথবা কারো ওপর হাত তোলার নির্দেশ দেয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী অধীনস্থ কর্মচারীর জন্য তার উর্ধতন কর্মকর্তার নির্দেশ পালন করা বা তার আনুগত্য করা মোটেই জায়েয নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্রষ্টা যেসব জিনিসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং অপরাধ বলে সাব্যস্ত করেছেন সেগুলো করার জন্য কেউ কাউকে নির্দেশ দেয়ার অধিকার রাখেনা। কোনো নির্দেশদাতার জন্যও এরূপ কাজের নির্দেশ দেয়া বৈধ নয় এবং এ ধরনের নির্দেশ পালন করাও কারো পক্ষে বৈধ নয়।

৯. যালিমের অনুগত্য করতে অস্বীকার করার অধিকার

ইসলামের একটি মহান নীতি হলো, কোনো যালিমের আনুগত্য দাবী করার অধিকার নেই। কুরআনে করীমে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালা ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে নেতৃত্বেরপদে নিয়োগ করে বললেনঃ "আমি তোমাকে মানুষের নেতা নিযুক্ত করেছি।" তখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্র কাছে আরয করলেন, "আমার বংশধরদের জন্যও কি এই ওয়াদা?" আল্লাহ্ তায়ালা জবাবে বললেনঃ "যালিমদের ক্ষেত্রে আমার এ ধরনের ওয়াদা নেই।"[২] ইংরেজী ভাষায় Letter of Appointiment -এর যে অর্থ এখানে 'আহদুন' শব্দটি সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলায় এর অর্থ নিয়োগপত্র। এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, 'যালিমদের এরূপ কোনো নিয়োগপত্র দেয়া হয়নি যার ভিত্তিতে সে অন্যদের আনুগত্য দাবী করতে পারে।[৩]

---

১. ফেরউনী ব্যাবস্থাকে কুরআন মজীদ যেসব কারণে বাতিল সাব্যস্ত করেছে তার একটি এই যে ঃ "নিশ্চয়ই ফেরাউন যমীনের বুকে দুর্বিনীত হয়ে পড়েছিলো এবং দেশের জনগণকে দলে উপদলে বিভক্ত করে দিয়েছিল। তাদের একদলকে (বনী ইসরাঈল) সে এতোটা দুর্বল করে দিয়েছিল যে....।" (সূরা কাসাস ঃ ৪)
অর্থাৎ ইসলাম এই নীতির পোষকতা করেনা যে, কোন সমাজে মানুষকে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণী অথবা শাসক ও শাসিত শ্রেণীতে বিভক্ত করে রাখা হবে।

২. [সূরা বাকারা ঃ ১২৪]

৩. আরো ব্যাখ্যার জন্য এই আয়াতগুলো সামনে রাখুন। অর্থাৎ
ক. "যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে সেই লাগামহীন লোকদের আনুগত্য করোনা।" (সূরা শুয়ারা ঃ ১৫১) খ. "যে ব্যক্তির দিলকে আমার স্মরণশূন্য করে দিয়েছি তার আনুগত্য করোনা।" (সূরা

ইমাম আবু হানীফা [রহঃ] বলেন, কোনো যালিম ব্যক্তির মুসলমানদের নেতা হওয়ার অধিকার নেই। যদি এরূপ ব্যক্তি নেতা হয়ে যায় তাহলে তার আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়। তাকে শুধু সহ্য করা যেতে পারে মাত্র।[৪]

১০. রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকার

মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে একটি বড় অধিকার ইসলাম এই নির্দিষ্ট করেছে যে, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি জাতীয় সরকারের অংশীদার। সবার পরামর্শক্রমে সরকার গঠন হতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে

"আল্লাহ্ তায়ালা তাদের (অর্থাৎ ঈমানদারদের) পৃথিবীর বুকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করবেন।" [সূরা নূর ঃ ৫৫]

এখানে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, আমরা কতিপয় লোককে নয় বরং গোটা জাতিকে খিলাফত দান করবো। রাষ্ট্র কোনো এক ব্যক্তির বা এক বংশের বা এক শ্রেণীর নয়, বরং গোটা জাতির এবং সমগ্র জনগণের পরামর্শ অনুযায়ী সরকার গঠিত হবে।

কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"এই রাষ্ট্র পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে চলবে।" [সূরা শূ'রা ঃ ৩৮]

এ ব্যাপারে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরিষ্কার বক্তব্য মওজূদ রয়েছেঃ "মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করা ব্যতিরেকে তাদের শাসন করার অধিকার কারো নেই। তারা যদি সম্মত হয় তাহলে তাদের ওপর শাসন পরিচালনা করা যাবে। আর যদি রাযী না হয় তাহলে তা করা যাবেনা। এই নির্দেশের আলোকে ইসলাম একটি 'গণতান্ত্রিক সংসদীয় সরকারী ব্যবস্থার নীতি' নির্ধারণ করে। এটা ভিন্ন ব্যাপার যে, আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী আমাদের ওপর রাজতন্ত্র চেপে রয়েছিল। ইসলাম আমাদের এ ধরনের রাজতন্ত্রের অনুমতি দেয়নি। বরং এটা ছিলো আমাদের আহাম্মকির ফল।

১১. ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ

ইসলামের একটি মূলনীতি এই যে, সুবিচার ব্যতিরেকে কারো ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা যাবেনা। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন "ইসলামের নীতি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া গ্রেফতার করা যাবেনা।" এর পরিপ্রেক্ষিতে আদ্‌ল ও ইনসাফের সেই দর্শনই কায়েম হয়, যাকে আধুনিক পরিভাষায় Judicial process of law [বিচার বিভাগীয় কার্যপ্রণালী] বলা হয়। অর্থাৎ কারো ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করতে হলে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন, প্রকাশ্য আদালতে তার বিচারকার্য পরিচালনা এবং তাকে আত্মপক্ষ

কাহ্‌ফ ঃ ২৮) গ. "তাগুতের বন্দেগী থেকে দূরে থাক।" (সূরা নাহল ঃ ৩৬) ঘ. "এবং সেই আদ জাতি যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাঁর রসূলদের অগ্রাহ্য করেছিল এবং তারা প্রত্যেকে অবাধ্য স্বৈরাচারীর নির্দেশের অনুসরণ করেছিল।" (সূরা হূদ ঃ ৫৯)

৪ এ পর্যায়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্যে গ্রন্থকারের খিলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সমর্থন করার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া কোনো কার্যক্রমের ওপর সুবিচারের বৈশিষ্ট্য আরোপ করা যায়না। এতো সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার যে, অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না দিয়ে বন্দী করে রাখা ইসলাম অনুমোদন করেনি। ইসলামী রাষ্ট্র, সরকার এবং বিচার বিভাগের জন্য ইনসাফের দাবী পূর্ণ করা কুরআন অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছে।

১২. ব্যক্তি মালিকানা সংরক্ষণ

ইসলাম ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দেয়। কুরআন আমাদের সামনে ব্যক্তি মালিকানার চিত্র তুলে ধরেছে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ

"তোমরা বাতিল পন্থায় একে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করোনা।" [সূরা বাকারা ঃ ১৮৮]

কুরআন, হাদীস এবং ফিক্হ অধ্যয়নে জানা যায়, অপরের সম্পদ ভোগ করার কোন্ কোন্ পন্থা ভ্রান্ত। ইসলাম এসব পন্থা অস্পষ্ট রাখেনি। এই মূলনীতির আলোকে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে অবৈধ পন্থায় মাল হস্তগত করা যাবেনা। কোনো ব্যক্তি বা সরকারের এ অধিকার নেই যে, সে আইন ভঙ্গ করে এবং ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত পন্থাসমূহ ব্যতিরেকে কারো মালিকানার ওপর হস্তক্ষেপ করবে।

১৩. মানসম্ভ্রমের হিফাযত

মান সম্মান ও ইজ্জত আব্রুর হিফাযত করার মৌলিক অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে। সূরা হুজুরাতে এই অধিকারের বিস্তারিত বর্ণনা মওজূদ রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

"তোমাদের কেউ অপরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবেনা।"

"তোমরা একে অপরকে নিকৃষ্ট উপাধিতে ডেকোনা।"

"একে অপরের দোষ চর্চা করোনা।" [আয়াত ঃ ১১, ১২]

অর্থাৎ মানুষের মান সম্মানের প্রতি আঘাত করার যতোগুলো পন্থা রয়েছে তা সবই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে কোনো ব্যক্তি চাই উপস্থিত থাক বা না থাক, তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা যাবেনা, তাকে নিকৃষ্ট উপাধি দেয়া যাবেনা। তার ক্ষতি করা যাবেনা এবং তার দোষ চর্চা [গীবত] করা যাবেনা। প্রত্যেক ব্যক্তির আইনগত অধিকার রয়েছে যে, কেউ তার ইজ্জতের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবেনা এবং হাতের দ্বারা অথবা যবানের দ্বারা তার ওপর কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করতে পারবেনা।

১৪. গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার

ইসলামের মৌলিক অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি লোক ব্যক্তিগত জীবনের গোপণীয়তা রক্ষা করার অধিকার রাখে। এ ব্যাপারে সূরা নূরে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে ঃ

"নিজের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করোনা।" (আয়াত ঃ ২৭)

সূরা হুজুরাতে বলা হয়েছে ঃ

"গোয়েন্দাগিরি করোনা" [আয়াত ঃ ২৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ 'অন্যের ঘরে উকি মারার অধিকার কোনো ব্যক্তির নেই।' যে কোনো ব্যক্তির আইনগত অধিকার রয়েছে যে, সে তার নিজের ঘরে অপরের শোরগোল, উকিঝুকি এবং অনুপ্রবেশ থেকে নিরাপদ থাকবে। তার সংসারের শান্তি শৃংখলা ও পর্দাপুশিদা রক্ষা করার অধিকার তার রয়েছে। এমনকি কোনো ব্যক্তির চিঠিপত্রের ওপরও অন্য ব্যক্তির দৃষ্টি নিক্ষেপ করার অধিকার নেই, পড়া তো দূরের কথা। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত গোপণীয়তার পূর্ণ হিফাযত করে এবং পরিষ্কারভাবে নিষেধ করে দেয় যে, অন্যের ঘরের মধ্যে উকিঝুকিমারা যাবেনা। কারো ডাক বা চিঠিপত্র দেখা যাবেনা। কিন্তু কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যদি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, সে ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িত আছে তাহলে স্বতন্ত্র কথা। অন্যথায় কারো পিছনে অযথা গোয়েন্দাগিরি করা ইসলামী শরীয়তে জায়েয নেই।

১৫. যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার

ইসলাম প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটি হলো, যে কোনো ব্যক্তি যুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার অধিকার রাখে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

"মানুষ খারাপ কথা বলুক তা আল্লাহ পছন্দ করেননা। তবে কারো প্রতি যুলুম করা হয়ে থাকলে ভিন্ন কথা।" [সূরা নিসা ঃ ১৪৮]

অর্থাৎ যালিমের বিরুদ্ধে মযলুমের সোচ্চার হওয়ার অধিকার রয়েছে।

১৬. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাকে বর্তমান যুগে মত প্রকাশের স্বাধীনতা [Freedom of Expression] বলা হয়, কুরআন তা অন্য পরিভাষায় বর্ণনা করে। কিন্তু দেখুন, তুলনামূলকভাবে কুরআনের দর্শন কতো উন্নত। কুরআনের বাণী হচ্ছে "সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা" এবং "অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ" করা কেবল মানুষের অধিকারই নয় বরং অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

"তোমরাই হচ্ছো সর্বোত্তম উম্মাহ্ যাদেরকে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা ন্যায় কাজের নির্দেশ দাও, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখো।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০]

কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকেও এবং হাদীসের পথনির্দেশ মুতাবিকও মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সে লোকদের ভালো কাজ করার কথা বলবে এবং খারাপ কাজ থেকে তাদের প্রতিরোধ করবে। যদি কোনো খারাপ কাজ সংঘটিত হয় তাহলে এর বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলেই দায়িত্ব শেষ হয়না। বরং এর মূলোচ্ছেদ করার চেষ্টা করা ফরয। যদি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর না হয় এবং মূলোৎপাটনের চিন্তা ভাবনা না করা হয় তাহলে উল্টা গুনাহ হবে। ইসলামী সমাজকে পাক পবিত্র রাখা মুসলমানদের উপর ফরয। এ ক্ষেত্রে যদি মুসলমানদের কণ্ঠরোধ করা হয়, তাহলে এর চেয়ে বড় আর যুলুম হতে পারেনা। যদি কেউ ভালো কাজের প্রতিরোধ করে তাহলে সে কেবল একটি মৌলিক অধিকারই হরণ করেনি বরং একটি ফরয আদায় করতে বাধা দিচ্ছে। সমাজের স্বাস্থ্য

অটুট রাখতে হলে মানুষের সব সময় এ অধিকার থাকতে হবে। কুরআন মজীদ বনী ইসরাঈল জাতির অধপতনের কারণসমূহ বর্ণনা করেছে। তার মধ্যে একটি কারণ এই বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

"তারা একে অপরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতোনা।" [সূরা মায়েদা ঃ ৭৯]

অর্থাৎ যদি কোনো জাতির মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তাদের মধ্যে দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে আওয়ায তোলার মতো কোনো লোক নেই তাহলে শেষ পর্যন্ত গোটা জাতির মধ্যে ক্রমান্বয়ে দুষ্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে। পরিশেষে তা একটি শূন্য ঝুড়ির মতো হয়ে যায় যা তুলে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করা হয়। এই রকম জাতি আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত হওয়ার আর কোনো ঘাটতিই অবশিষ্ট থাকেনা।

১৭. বিবেক ও আকীদা বিশ্বাসের স্বাধীনতা

ইসলাম মানব জাতিকে "দীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই" [সূরা বাকারা ঃ ২৫৬] এই মূলনীতি দান করেছে। এর অধীনে সে প্রতিটি মানুষকে কুফর অথবা ঈমান, এর যে কোনো একটি পথ অবলম্বন করার ইখতিয়ার দিয়েছে। ইসলামে যদি শক্তির প্রয়োগ থেকে থাকে তাহলে দু'টি প্রয়োজনে। এক. ইসলামী ব্যবস্থা, সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখা এবং দুষ্কৃতি ও বিচ্ছিন্নতার মূলোৎপাটনের জন্য বিচার বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ।

লক্ষ্য ও আকীদা বিশ্বাসের স্বাধীনতাই ছিলো মূল্যবান অধিকার যা অর্জন করার জন্য মক্কার তের বছরের বিপদ সংকূল যুগে মুসলমানরা মার খেয়ে খেয়ে সত্যের কালেমা সমুন্নত করেছে। অবশেষে তারা এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেই ছেড়েছে। মুসলমানরা তাদের এ অধিকার যেভাবে অর্জন করেছে, অনুরূপভাবে অন্যদের জন্যও এর পূর্ণ স্বীকৃতি দান করেছে। মুসলমানরা নিজেদের অমুসলিম প্রজাদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করছে, অথবা কোনো জাতিকে নির্যাতন করে কালেমা পড়তে বাধ্য করেছে ইসলামের ইতিহাসে এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

১৮. ধর্মীয় মানসিক নির্যাতন থেকে সংরক্ষণ

ইসলাম এটা কখনো সমর্থন করেনা যে, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় একে অপরের বিরুদ্ধে কটুবাক্য ব্যবহার করবে, একে অপরের ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি করবে। কুরআন মজীদে প্রতিটি ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস এবং তার ধর্মীয় নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

"এসব লোক আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া যাদের মা'বূদ বানিয়ে ডাকে তোমরা তাদের গালাগালি করোনা।" [সূরা আনয়াম ঃ ১০৮]

অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্ম ও আকীদা বিশ্বাসের ওপর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা, যুক্তিরপন্থায় সমালোচনা করা অথবা মতভেদ ব্যক্ত করা তো বাক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মনে কষ্ট দেয়ার জন্য অভদ্র ভাষায় কথা বলা মোটেও সমীচীন নয়।

১৯. সভা সংগঠন করার অধিকার

বাক স্বাধীনতার দার্শনিক ফলশ্রুতিতেই সভা সমিতি করার অধিকারের সূত্রপাত হয়। মতবৈষম্যকে মানব জীবনের একটি বাস্তব সত্য হিসেবে কুরআন বারবার ঘোষণা

করেছে। তাহলে মতভেদ সৃষ্টি হওয়াকে কিভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব? সব লোক একই মত পোষণ করে কিভাবে একত্রিত হতে পারে? একই মূলনীতি এবং দৃষ্টিভংগির অধিকারী একটি জাতির মধ্যেও বিভিন্ন মাযহাব [School of thoughts] হতে পারে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অবশ্য পরস্পরের কাছাকাছিই থাকবে। কুরআনের বাণী ঃ

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে।" [সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪]

কর্মময় জীবনে যখন 'কল্যাণ' 'ন্যায়' এবং 'অন্যায়' এর ব্যাপক ধারণার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় তখন জাতির মৌলিক অখন্ডতা অটুট রেখেও তার মধ্যে বিভিন্ন চৈন্তিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়ে থাকে। একথা কাংখিত মানের যতো নিচেই হোক দল উপদলের আত্মপ্রকাশ ঘটছেই। সুতরাং আমাদের এখানে কথাবার্তায়, ফিক্‌হ ও আইন কানুন এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগির ক্ষেত্রেও মতবিরোধ হয়েছে এবং সাথে সাথে বিভিন্ন দল উপদল অস্তিত্ব লাভ করেছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামী সংবিধান এবং মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের দৃষ্টিতে বিভিন্ন দল উপদলগুলোর সভা সমিতি করার অধিকার আছে কি? এই প্রশ্ন সর্বপ্রথম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সামনে খারিজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশের পর উঠেছিল। তিনি তাদের সংগঠন ও সভা সমিতি করার অধিকার স্বীকার করে নেন। তিনি খারিজীদের বলেন, "তোমরা যতক্ষণ তরবারির সাহায্যে নিজেদের মতবাদ অন্যের ওপর চাপাতে চেষ্টা না করবে তোমরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে।"

২০. একের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করা যাবেনা।

ইসলামে যে কোনো ব্যক্তিকে কেবল নিজের কার্যকলাপ এবং নিজের অপরাধের জন্যই জবাবদিহি করতে হয়। অপরের কার্যকলাপ ও অপরাধের জন্য তাকে গ্রেফতার করা যায়না। কুরআন এই নীতি নির্ধারণ করেছে যেঃ

"কোনো ভার বহনকারীই অপর কারো ভার বহন করতে বাধ্য নয়।" [সূরা আনয়াম ঃ ১৬৪]

অপরাধ করবে দাড়িওয়ালা আর গ্রেফতার হবে গোঁওয়ালা ইসলামী আইনে এই ধরনের কোনো সুযোগ নেই।

২১. সন্দেহের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়া যাবেনা।

ইসলামে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মরক্ষার এ অধিকার রয়েছে যে, তদন্ত ও অনুসন্ধান ছাড়া তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়া যাবেনা। এ ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, কারো বিরুদ্ধে কিছু অবগত হলে তদন্ত করে নাও। এরূপ যেনো না হতে পারে যে, কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অজ্ঞাতসারে কোনো পদক্ষেপ নিয়ে বসো। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"হে ঈমানদারগণ! কোনো ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে এলে তার সত্যতা যাচাই করে নিও। এমন যেনো না হয় যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে

কোনো মানব গোষ্ঠীর ক্ষতি সাধন করে বসবে, আর পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।" [সূরা হুজুরাত ঃ ৬]

উপরন্তু কুরআনে এ হিদায়াতও দান করা হয়েছে ঃ

"খুব বেশী খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকো।" [সূরা হুজুরাত ১২]

সংক্ষেপে এই হচ্ছে সেই সব মৌলিক অধিকার ইসলাম যা মানব জাতিকে দান করেছে। এর দর্শন সম্পূর্ণ পরিষ্কার এবং পরিপূর্ণ যা মানুষকে তার জীবনের সূচনাতেই বলে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বর্তমান সময়েও দুনিয়াতে মানবাধিকারের যে ঘোষণা [Declaration of Human Rights] প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার না আছে কোনো প্রকারের স্বীকৃতি আর না আছে কার্যকর হওয়ার শক্তি। ব্যস একটি উন্নত মনদন্ড পেশ করা হয়েছে, কিন্তু এই মানদন্ড অনুযায়ী কাজ করতে কোনো জাতিই বাধ্য নয়। এটা এমন কোনো সর্বজন গ্রাহ্য চুক্তিপত্রও নয় যা সকল জাতির কাছ থেকে এসব অধিকার আদায় করে দিতে পারে। কিন্তু মুসলনমানদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন, তারা আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর রসূলের হিদায়াতের আনুগত্যকারী আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল মৌলিক অধিকারসমূহের পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যে রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র হতে চায় তাকে এ অধিকারগুলো অবশ্যই লোকদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মুসলনমানদেরও এ অধিকার দিতে হবে এবং অমুসলমানদেরও। এ ক্ষেত্রে এমন কোনো চুক্তিপত্রের প্রয়োজন নেই যে, অমুক জাতি আমাদের যদি এই এই অধিকার দেয়, তাহলে আমরাও তাদের দেব। বরং মুসলমানরা এ অধিকার দিতে বাধ্য শত্রুকেও মিত্রকেও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

- অমুসলিমদের অধিকার

শাসনতান্ত্রিক সমস্যাগুলোর মধ্যে সংখ্যালঘু সংক্রান্ত সমস্যা সবচেয়ে জটিল। এ ব্যাপারে অনেক ভুল বুঝাবুঝি পরিক্ষিত হয় এবং সেজন্য মানসিক দ্বন্দ্ব ব্যাপক আকার ধারণ করছে। মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন এবং এর সকল দিক বিশ্লেষণ করে বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার কী কী ? মাওলানা সাহেবের সে নিবন্ধটাই তিনি স্বয়ং সম্পাদনা করে দেয়ার পর প্রকাশ করা হচ্ছে। এটি ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসের তরজমানুল কুরআন থেকে নেয়া হয়েছে। এতে একদিকে অমুসলিমদের সাংবিদানিক অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজের দায়িত্বসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলিই হচ্ছে অমুসলিমদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের আচরণের দিক নির্দেশক মূলনীতি।

সংকলক।

অমুসলিমদের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করার আগে এ কথা বুঝে নেয়া দরকার যে, ইসলামী রাষ্ট্র আসলে একটা আর্দশবাদী (Ideological) রাষ্ট্র এবং তার ধারণ ও প্রকৃতি একটা জাতীয় গণতান্ত্রিক (National Democratic) রাষ্ট্র থেকে একেবারেই ভিন্ন। এই উভয় ধরনের রাষ্ট্রের উক্ত প্রকৃতিগত পার্থক্যের দরুন আলোচ্য বিষয়ের ওপর কিরূপ প্রভাব পড়ে, সেটা নিম্নোক্ত বক্তব্যসমূহ দ্বারা ভালোভাবে বুঝা যাবে।

১. যে আর্দশ ও মূলনীতির ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাকে কে মানে আর কে মানেনা, সে হিসেবেই ইসলামী রাষ্ট্র স্বীয় নাগরিকদের বিভক্ত করে থাকে । ইসলামী পরিভাষায় উক্ত দুই ধরনের জনগোষ্ঠীকে যথাক্রমে মুসলিম ও অমুসলিম বলা হয়ে থাকে।

২. ইসলামী রাষ্ট্র চালানো আসলে তার আদর্শ ও মূলনীতিতে যারা বিশ্বাসী তাদের কাজ। এ রাষ্ট্র স্বীয় প্রশাসনে অমুসলিমদের সেবা গ্রহণ করতে পারে বটে, তবে নীতি নির্ধারক ও প্রশাসনের পদ তাদের পদ তাদের দিতে পারেনা।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতিই এমন যে, সে মুসলিম ও অমুসলিমদের সুস্পষ্টভাবে দু'ভাগে বিভক্ত করতে বাধ্য। অমুসলিমদের কি কি অধিকার দিতে পারবে আর কি কি অধিকার দিতে পারবেনা তা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

১. যে জাতি মূলত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, কারা সেই জাতির বংশোদ্ভূত আর কারা তা নয়, তার ভিত্তিতেই একটা জাতীয় রাষ্ট্র স্বীয় নাগরিকদেরকে বিভক্ত করে ফেলে। আধুনিক পরিভাষায় উক্ত দু'ধরনের জনগোষ্ঠীকে যথাক্রমে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু বলা হয়ে থাকে।

২. জাতীয় রাষ্ট্র স্বীয় নীতি নির্ধারণ প্রশাসনের কাজে শুধু আপন জাতির লোকদের ওপরই নির্ভর করে। অন্যান্য সংখ্যালঘু নাগরিকদেরকে এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়না। এ কথাটা স্পষ্ট করে বলা না হলেও কার্যত এটাই হয়ে থাকে। সংখ্যালঘুদের কোনো ব্যক্তিকে যদি কখনো কোনো শীর্ষ স্থানীয় পদ দেয়াও হয়, তবে তা নিছক লোক দেখানো ব্যাপার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে তার কোনোই ভূমিকা থাকেনা।

৩. জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ দ্বিমূখী আচরণ করা নিতান্তই সহজ কাজ যে, সে দেশের সকল অধিবাসীকে নীতিগতভাবে এক জাতি আখ্যায়িত করে কাগজে কলমে সকলকে সমান অধিকার দিয়ে দেবে। কিন্তু কার্যত সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর ভেদাভেদ পুরোপুরি বহাল রাখবে এবং সংখ্যালঘুদের বাস্তবিক পক্ষে কোনো অধিকারই দেবেনা।

৪. ইসলামী রাষ্ট্র স্বীয় প্রশাসনে অমুসলিমের উপস্থিতি জটিলতার সমাধান এভাবে করে যে, তাদেরকে সুনির্দিষ্ট অঙ্গিকারের কার্যকর নিশ্চয়তা [Guarantee] দিয়ে সন্তুষ্ট করে দেয়। নিজেদের নীতিনির্ধারণী ব্যবস্থাপনায় তাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করে এবং তাদের জন্য সব সময় এ ব্যাপারে দরজা খোলা রাখে যে, ইসলামী আদর্শ যদি তাদের ভালো লেগে যায় তাহলে তারা তা গ্রহণ করে শাসক দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে।

৫. ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম সংখ্যালঘু নাগরিকদেরকে শরীয়ত প্রদত্ত অধিকারগুলো দিতে বাধ্য। এসব অধিকার কেড়ে নেয়া বা কমবেশী করার এখতিয়ার কারো নেই। এসব অধিকার ছাড়া অতিরিক্ত কিছু অধিকার যদি মুসলমানরা দিতে চায় তবে ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী না হলে তা দিতে পারে।

৪. একটি জাতীয় রাষ্ট্র স্বীয় রাষ্ট্রকাঠামোতে বিজাতীয় লোকদের উপস্থিতিজনিত জটিলতার সমাধান তিন উপায় করে। প্রথমত, তাদের স্বতন্ত্র জাতি সত্তাকে ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত করে নিজেদের জাতি সত্তায় বিলীন করে নেয়। দ্বিতীয়তঃ তাদের জাতি সত্তাকে নির্মূল করার জন্য হত্যা, লুটতরাজ ও দেশান্তরীকরণের নিপীড়ন মূলক কর্মপন্থা অবলম্বন করে। তৃতীয়তঃ তাদেরকে নিজেদের ভেতরে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে রেখে দেয়। দুনিয়ার জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে এই তিনটে কর্মপন্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে এবং এখনও গৃহীত হয়ে চলেছে। আজকের ভারতে খোদ মুসলমানদেরকে এ সব নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

৫. জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদেরকে যে অধিককারই দেয়া হয় তা সংখ্যাগুরুর দেয়া অধিকার। সংখ্যাগুরুরা ওসব অধিকার যেমন দিতে পারে তেমনি তাতে কমবেশী করা বা একেবারে ছিনিয়ে নেয়ারও অধিকার রাখে। এ ধরনের রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা পূরোপূরিভাবে সংখ্যাগুরুর করুনার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। তাদের জন্য মৌলিক মানবাধিকারের পর্যন্ত কোনো স্থায়ী নিশ্চয়তা থাকেনা।

উল্লিখিত মৌলিক পার্থক্যগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের আচরণ এবং সংখ্যালঘু জাতিসত্তার সাথে জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আচরণে কি আকাশ পাতাল ব্যবধান। এ ব্যবধানকে বিবেচনায় না আনলে মানুষ এই ভুল বুঝাবুঝি থেকে মুক্ত হবেনা যে, আধুনিক যুগের জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো সংখ্যালঘুদেরকে সমানাধিকার দেয় আর ইসলাম এ ব্যাপারে সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়।

এই অত্যাবশ্যকীয় বিশ্লেষণের পর আমি মূল আলোচ্য বিষয়ে ফিরে যেতে চাই।

১. অমুসলিম নাগরিকরা কতো প্রকারের?

ইসলামী আইন স্বীয় অমুসলিম নাগরিকদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে ঃ

এক যারা কোনো সন্ধিপত্র বা চুক্তি বলে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হয়েছে।

দুই যারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

তিন যারা যুদ্ধ কিংবা সন্ধি ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

যদিও উক্ত তিন প্রকারের নাগরিকরাই সংখ্যালঘু অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত সাধারণ অধিকারগুলোতে সমভাবে অংশীদার, কিন্তু প্রথমোক্ত দুই শ্রেণী সংক্রান্ত বিধিতে সামান্য কিছু পার্থক্যও রয়েছে। তাই অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার বিশদভাবে বর্ণনা করার আগে আমি এই বিশেষ দুটি শ্রেণীর আলাদা আলাদা বিধান বর্ণনা করবো।

চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিক

যারা যুদ্ধ ছাড়া অথবা যুদ্ধ চলাকালে বশ্যতা স্বীকার করতে সম্মত হয়ে যায় এবং ইসলামী সরকারের সাথে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী স্থির করে সন্ধিবদ্ধ হয় তাদের জন্য ইসলামের বিধান এই যে, তাদের সাথে সকল আচরণ তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী করা হবে। আজকালকার সভ্য জাতিগুলো এরূপ রাজনৈতিক ধড়িবাজীতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, শত্রু পক্ষকে বশ্যতা স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কিছু উদার শর্ত নির্ধারণ করে নেয়। তারপর যেই তারা পুরোপুরি আয়ত্তে এসে যায় অমনি শুরু হয়ে যায় ভিন্ন ধরনের আচরণ। কিন্তু ইসলাম এটাকে হারাম ও মহাপাপ গণ্য করে। কোনো জাতির সাথে যখন কিছু শর্ত স্থির করা হয়ে যায় (চাই তা মনোপুত হোক বা না হোক) এখন তাতে চুল পরিমাণও হেরফের করা যাবেনা। চাই উভয় পক্ষের আপেক্ষিক অবস্থান, শক্তি ও ক্ষমতায় (Relative position) যতোই পরিবর্তন এসে থাকনা কেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

"যদি তোমরা কোনো জাতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও, বিজয়ী হও এবং সেই জাতি নিজেদের ও নিজেদের সন্তানদের প্রাণ রক্ষার্থে তোমাদের মুক্তিপণ দিতে রাযী হয় (অপর বর্ণনায় আছে যে, তোমাদের সাথে কোনো সন্ধিপত্র সম্পাদন করে) তাহলে পরবর্তী সময়ে ঐ নির্ধারিত মুক্তিপণের চেয়ে কণা পরিমাণও বেশী নিওনা। কেননা সেটা তোমাদের জন্য বৈধ হবেনা।" (আবুদাউদ, কিতাবুল জিহাদ)

অপর হাদীসে আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের ওপর যুলুম করবে কিংবা তার প্রাপ্য অধিকার থেকে তাকে কম দেবে, তার সামর্থের চেয়ে বেশী বোঝা তার ওপর চাপাবে, অথবা তার কাছ থেকে কোনো জিনিস তার সম্মতি ছাড়া আদায় করবে, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি নিজেই ফরিয়াদী হবো।" [আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ]

উক্ত উভয় হাদীসের ভাষা ব্যাপক অর্থবোধক। তাই ঐ হাদীস দুটি থেকে এই সাধারণ বিধি প্রণয়ন করা হয় যে, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সন্ধিপত্রে যেসব শর্ত নির্ধারিত হবে, তাতে কোনো রকম কমবেশী করা কোনোক্রমেই জায়েয হবেনা। তাদের ওপর কর খাজনাও বাড়ানো যাবেনা। তাদের জমিজমাও দখল করা যাবেনা, তাদের ঘরবাড়ী দালান কোঠাও কেড়ে নেয়া যাবেনা। তাদের ওপর কড়া ফৌজদারী দন্ডবিধিও চালু করা যাবেনা, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করা যাবেনা। তাদের ইজ্জত সম্মানেরও ক্ষতি করা যাবেনা এবং তাদের সাথে এমন কোনো আচরণ করা যাবেনা, যা যুলুম, অধিকারহরণ, সামর্থের মাত্রারিক্ত বোঝা চাপানো অথবা সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পতি হস্তগত করার পর্যায়ে পড়ে। এই নির্দেশাবলীর কারণেই ফকীহগণ সন্ধি বলে বিজিত জাতিগুলো সম্পর্কে কোনো আইন প্রণয়ন করেনি। বরং শুধুমাত্র একটি সাধারণ সংক্ষিপ্ত বিধি প্রণয়ন করেই ক্ষান্ত থেকেছেন। সেটি এই যে, তাদের সাথে আমাদের আচরণ হুবহু সন্ধির শর্ত অনুসারে পরিচালিত হবে। ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন ঃ

"তাদের সন্ধিপত্রে যা নেয়া স্থির হয়েছে, তাদের কাছ থেকে শুধু তাই নেয়া হবে। তাদের সাথে সম্পাদিত সন্ধির শর্ত পুরণ করা হবে। কোনো কিছু বাড়ানো হবেনা।" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠাঃ ৩৫]

যুদ্ধে বিজিত অমুসলিম নাগরিক

দ্বিতীয় প্রকারে অমুসলিম নাগরিক হচ্ছে যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে লড়াই করেছে এবং ইসলামী বাহিনী যখন তাদের সকল প্রতিরোধ ভেংগে তাদের আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করেছে, কেবল তখনই অস্ত্র সংবরণ করেছে। এ ধরনের বিজিতদেরকে যখন "সংরক্ষিত নাগরিকে" (যিম্মী) পরিণত করা হয়, তখন তাদের কয়েকটি বিশেষ অধিকার দেয়া হয়। ফিকাহ্ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। নিম্নে এই সকল বিধির একটা সংক্ষিপ্ত সার দেয়া হচ্ছে। এ থেকে এই শ্রেণীর অমুসলিম নাগরিকদের সাংবিধানিক মর্যাদা ও অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যাবে ঃ

১. মুসলমানদের সরকার তাদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা মাত্রই তাদের সাথে সংরক্ষণ চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবে এবং তাদের জান ও মালের হিফাযত করা মুসলমানদের জন্য ফরয হয়ে যাবে। কেননা জিযিয়া গ্রহণ করা মাত্রই প্রমাণিত হয় যে, জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। (বাদায়েউস্ সানায়ে, ৭ম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা)

এরপর মুসলিম সরকারের বা সাধারণ মুসলমানদের এ অধিকার থাকেনা যে তাদের সম্পত্তি দখল করবে বা তাদেরকে দাসদাসী বানাবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত আবু উবায়দাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছিলেন ঃ

"যখন তুমি তাদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করবে, তখন তোমার আর তাদের ওপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবেনা।" (কিতাবুল খারাজ পৃষ্ঠা ৮২)

২. "সংরক্ষিত নাগরিকে" (যিম্মী) পরিণত হয়ে যাওয়ার পর তাদের জমির মালিক তারাই হবে। সেই জমির মালিকানা উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হবে এবং তারা নিজেদের সম্পত্তি বেচা, কেনা, দান করা ও বন্ধক রাখা ইত্যাদির নিরংকুশ অধিকারী হবে। ইসলামী সরকার তাদেরকে বেদখল করতে পারবেনা। (ফাতুহুল কাদীর ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ঃ ৩৫৯)

৩. জিযিয়ার পরিমাণ তাদের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। যারা ধনী, তাদের কাছ থেকে বেশী, যারা মধ্যবিত্ত তাদের কাছ থেকে কিছু কম এবং যারা দরিদ্র তাদের কাছ থেকে অনেক কম নেয়া হবে। আর যার কোনো উপার্জনের ব্যবস্থা নেই, অথবা যে অন্যের দান দক্ষিণার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, তার জিযিয়া মাফ করে দেয়া হবে। জিযিয়ার জন্য যদিও কোনো বিশেষ পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। তবে তা অবশ্যই এ ভাবে নির্ধারিত হওয়া চাই যাতে তা দেয়া তাদের পক্ষে সহজ হয়। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু ধনীদের ওপর মাসিক এক টাকা, মধ্যবিত্তদের ওপর মাসিক ৫০ পয়সা এবং গরীব লোকদের ওপর মাসিক ২৫ পয়সা জিযিয়া আরোপ করেছিলেন। (কিতাবুল খারাজ পৃষ্ঠা ঃ ৩৬)

৪. জিযিয়া শুধুমাত্র যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদের ওপর আরোপ করা হবে। যারা যুদ্ধ করতে সমর্থ নয়, যথা শিশু, নারী, পাগল, অন্ধ, পংগু, উপাসনালয়ের সেবক, সন্যাসী, ভিক্ষু, খুনখুনে বৃদ্ধ। বছরের উল্লেখযোগ্য সময় রোগে কেটে যায় এমন রোগী, এবং দাস দাসী ইত্যাদিকে জিযিয়া দিতে হবেনা। (বাদায়ে ৭ম খন্ড পৃষ্ঠা ঃ ১১১-১১৩, ফাতহুল কাদীর ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ঃ ৭৩, ৩৭২, কিতাবুল খারাজ পৃষ্ঠা ৭৩)

৫. যুদ্ধের মাধ্যমে দখলীকৃত জনপদের উপাসনালয় দখল করার অধিকার মুসলমানদের রয়েছে। তবে সৌজন্য বশত এই অধিকার ভোগ করা থেকে বিরত থাকা এবং উপাসনালয়গুলোকে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় বহাল রাখা উত্তম। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে যতো দেশ বিজিত হয়েছে তার কোথাও কোনো উপাসনালয় ভাঙ্গা হয়নি বা তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা হয়নি। ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন ঃ

"সেগুলোকে যেমন ছিলো তেমনভাবেই রাখা হয়েছে। ভাঙ্গা হয়নি বা তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা হয়নি।" (কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ঃ ৮৩)

তবে প্রাচীন উপাসনালয়গুলোকে ধ্বংস করা কোনো অবস্থায়ই বৈধ নয়। (বাদায়ে, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১৪)

২. অমুসলিম নাগরিকদের সাধারণ অধিকার

এবার আমি অমুসলিম নাগরিকদের সাধারণ অধিকারগুলো বর্ণনা করবো। উল্লিখিত তিন শ্রেণীর নাগরিকের সকলেই এ অধিকারগুলোতে অংশীদার।

প্রাণের নিরাপত্তা

অমুসলিম নাগরিকের রক্তের মূল্য মুসলমানদের রক্তের মূল্যের সমান। কোনো মুসলমান যদি অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, তাহলে একজন মুসলমান নাগরিককে হত্যা করলে যেমন তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হতো ঠিক তেমনি মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে জনৈক মুসলমান জনৈক অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি খুনীকে মৃত্যুদন্ড দেন। তিনি বলেন ঃ

> "যে নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই।"[১]

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তি জনৈক হীরাবাসী অমুসলিম যিম্মীকে হত্যা করে। তিনি খুনীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পণের আদেশ দেন। অতঃপর তাকে উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পণ করা হলে তারা তাকে হত্যা করে। (বুরহান শরহে মাওয়াহিবুর রহমান ঃ ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৮৭)

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে হযরত ওমরের ছেলে উবায়দুল্লাহ্কে হত্যার পক্ষে ফতুয়া দেয়া হয়। কেননা তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হত্যার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে হরমুযান ও আবু লুলুর মেয়েকে হত্যা করেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে জনৈক মুসলমান জনৈক অমুসলিমের হত্যার দায়ে গ্রেফতার হয়। যথারীতি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তিনি মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেন। এই সময় নিহত ব্যক্তির ভাই এসে বললো, "আমি মাফ করে দিয়েছি।" কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন ঃ ওরা বোধ হয় তোমাকে ভয় দেখিয়েছে।" সে বললো! "না, আমি রক্তপণ পেয়েছি এবং আমি বুঝতে পারছি যে, ওকে হত্যা করলে আমার ভাই ফিরে আসবেনা।" তখন তিনি খুনীকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন ঃ

> "আমাদের অধীনস্থ অমুসলিম নাগরিকদের রক্ত আমাদের রক্তের মতোই এবং তাদের রক্তপণ আমাদের রক্তপণের মতোই।"[২]

অপর এক বর্ণনা মুতাবিক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছিলেন ঃ

> "তারা আমাদের নাগরিক হতে রাযী হয়েছেই এই শর্তে যে, তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো এবং তাদের রক্ত আমাদের মতো মর্যাদাসম্পন্ন হবে।"

এ কারণেই ফকীহগণ এই বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, কোনো অমুসলিম নাগরিক কোনো মুসলমানের হাতে ভুলক্রমে নিহত হলে তাকেও অবিকল সেই রক্তপণ দিতে হবে, যা কোনো মুসলমানের নিহত হবার ক্ষেত্রে দিতে হয়। (দুর্‌রে মুখতার, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২০৩)

---

১. ইনায়া শরহে হিদায়া ৮ম খন্ড ২৫৬ পৃষ্ঠা।
২. বুরহান ২য় খন্ড ২৮২ পৃষ্ঠা।

ফৌজদারী দন্ডবিধি

ফৌজদারী দন্ডবিধি মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য সমান। অপরাধের যে সাজা মুসলমানকে দেয়া হয়, অমুসলিম নাগরিককেও তাই দেয়া হবে। অমুসলিমের জিনিস যদি মুসলমান চুরি করে কিংবা মুসলমানের জিনিস যদি অমুসলিম চুরি করে, তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই চোরের হাত কেটে ফেলা হবে। কারো ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে অপবাদ আরোপকারী মুসলমানই হোক আর অমুসলমানই হোক উভয়কে একই শাস্তি দেয়া হবে। অনুরূপভাবে ব্যভিচারের শাস্তিও মুসলিম ও অমুসলিমের জন্য একই রকম। তবে মদের বেলায় অমুসলিমদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।[১]

দেওয়ানী আইন

দেওয়ানী আইনেও মুসলমান ও অমুসলমান সমান। "তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো" হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, মুসলমানের সম্পত্তি যেভাবে হিফাযত করা হয় অমুসলিমের সম্পত্তির হিফাযতও তদ্রূপ করা হবে এবং আমাদের ও তাদের দেওয়ানী অধিকার সমান ও অভিন্ন হবে। এই সাম্যের অনিবার্য দাবী অনুসারে দেওয়ানী আইনের আলোকে মুসলমানের ওপর যে সব দায় দায়িত্ব অর্পিত হয় অমুসলিমের ওপরও তাই অর্পিত হবে।

ব্যবসায়ের যেসব পন্থা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তাদের জন্যও নিষিদ্ধ। তবে অমুসলিমরা শুধুমাত্র শুয়রের বেচাকেনা খাওয়া এবং মদ বানানো, পান ও কেনাবেচা করতে পারবে। (আল মাবসূত, ১৩শ খন্ড, পৃঃ ৩৭-৩৮)

কোনো মুসলমান কোনো অমুসলিমের মদ বা শুয়রের ক্ষতি সাধন করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। দুররে মুখতারে আছে ঃ

> "মুসলমান যদি মদ ও শুয়রের ক্ষতি করে তবে তার মূল্য দিতে বাধ্য থাকবে।" (৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩)

সম্মানের হিফাযত

কোনো মুসলমানকে জিহ্বা বা হাত পা দিয়ে কষ্ট দেয়া, গালি দেয়া, মারপিট করা, বা গীবত করা যেমন অবৈধ, তেমনি এসব কাজ অমুসলিমের বেলায়ও অবৈধ। দুররে মুখতারে আছেঃ

> "তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং তার গীবত করা মুসলমানের গীবত করার মতোই হারাম।" [৩য় খন্ড, পৃঃ ২৭৩-২৭৪]

---

১. কিতাবুল খারাজ পৃঃ ২০৮, ২০৯, আল মাবসূত, ৯ম খন্ড, পৃঃ ৫৭-৫৮, ইমাম মালেকের মতে অমুসলিমকে মদের ন্যায় ব্যভিচারের শাস্তি থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ইমাম মালেকের অভিমতের উৎস হলো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই সিদ্ধান্ত যে, অমুসলিম নাগরিক ব্যভিচার করলে তার ব্যাপারটা তাদের সম্প্রদায়ের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ তাদের ধর্মীয় বা পারিবারিক আইন অনুসারে কাজ করতে হবে।

অমুসলিমদের চিরস্থায়ী নিরাপত্তা

অমুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চুক্তি মুসলমানদের জন্য চিরস্থায়ীভাবে বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ এই চুক্তি করার পর তারা তা ভাংতে পারেনা। অপরদিকে অমুসলিমদের এখতিয়ার আছে যে, তারা যতোদিন খুশী তা বহাল রাখতে পারে এবং যখন ইচ্ছা ভেংগে দিতে পারে। 'বাদায়ে' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"অমুসলিমদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দানের চুক্তি আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। মুসলমানরা কোনো অবস্থাতেই তা ভাংতে পারেনা। পক্ষান্তরে অমুসলিমদের পক্ষে তা বাধ্যতামূলক নয়। [অর্থাৎ তারা যদি আমাদের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে চায় তবে তা করতে পারে।।" [দুররে মুখতার, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১২]

অমুসলিম নাগরিক যতো বড় অপরাধই করুক, তাদের রাষ্ট্রীয় রক্ষাকবচ সম্বলিত নাগরিকত্ব বাতিল হয়না। এমনকি জিযিয়া বন্ধ করে দিলে, কোনো মুসলমানকে হত্যা করলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেয়াদবী করলে অথবা কোনো মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করলেও তার নিরাপত্তার গ্যারান্টিযুক্ত নাগরিকত্ব বাতিল হয়না। এসব কাজের জন্য তাকে অপরাধী হিসেবে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু বিদ্রোহী আখ্যায়িত করে নাগরিকত্বহীন করা হবেনা। তবে শুধু দুই অবস্থায় একজন অমুসলিম নাগরিকত্বহীন হয়ে যায়। এক যদি সে মুসলমানদের দেশ ছেড়ে গিয়ে শত্রুদের সাথে মিলিত হয়। দুই যদি সে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহে লিপ্ত হ'য়ে অরাজকতার সৃষ্টি করে। [বাদায়ে, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৩, ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৮১-৩৮২]

ঘরোয়া কর্মকান্ড

অমুসলিমদের ঘরোয়া কর্মকান্ড তাদের নিজস্ব পারিবারিক আইন (Personal law) অনুসারে স্থির করা হবে। তাদের ওপর ইসলামী আইন কার্যকর করা হবেনা। আমাদের ঘরোয়া জীবনে যেসব জিনিস অবৈধ, তা যদি তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় আইনে বৈধ হয়, তাহলে ইসলামী আদালত তাদের আইন অনুসারেই ফায়সালা করবে। উদাহরণ স্বরূপ, সাক্ষী ছাড়া বিয়ে, মুহর ছাড়া বিয়ে, ইদ্দতের মধ্যে পুনরায় বিয়ে অথবা ইসলামে যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ তাদের সাথে বিয়ে যদি তাদের আইনে বৈধ থেকে থাকে, তাহলে তাদের জন্য এসব কাজ বৈধ বলে মেনে নেয়া হবে। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাদের পরবর্তী সকল যুগে ইসলামী সরকারগুলো এই নীতিই অনুসরণ করেছে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয এ ব্যাপারে হযরত হাসান বসৃরীর কাছে নিম্নরূপ প্রশ্ন করেছিলেন ঃ

"খোলাফায়ে রাশেদীন অমুসলিম নাগরিকদেরকে নিষিদ্ধ মেয়েদের সাথে বিয়ে, মদ ও শুয়রের ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দিলেন কিভাবে?"

জবাবে হযরত হাসান লিখলেন ঃ

"তারা জিযিয়া দিতে তো এজন্যই সম্মত হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের আকীদা বিশ্বাস অনুসারে জীবন যাপন করার স্বাধীনতা দিতে হবে। আপনার কর্তব্য পূর্ববর্তীদের পদ্ধতি অনুসরণ করা, নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা নয়।"

তবে কোনো ক্ষেত্রে যদি বিবদমান উভয় পক্ষ স্বয়ং ইসলামী আদালতে আবেদন জানায় যে, ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক তাদের বিবাদের ফায়সালা করা হোক, তবে আদালত তাদের ওপর শরীয়তের বিধান কার্যকর করবে। তাছাড়া পারিবারিক আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিবাদে যদি একপক্ষ মুসলমান হয়, তাহলে ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক ফায়সালা হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন খৃষ্টান মহিলা কোনো মুসলমানের স্ত্রী ছিলো এবং তার স্বামী মারা গেলো। এমতাবস্থায় এই মহিলাকে শরীয়ত মুতাবিক স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত পুরোপুরী পালন করতে হবে। ইদ্দতের ভেতরে সে বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল হবে। [আল মাবসূত ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮-৪১]

ধর্মীয় অনুষ্ঠান

অমুসলিমদের ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদি প্রকাশ্যভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে উদযাপন করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান এই যে, অমুসলিমরা তাদের নিজস্ব জনপদে এটা অবাধে করতে পারবে। তবে নির্ভেজাল ইসলামী জনপদগুলোতে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ইচ্ছা করলে তাদেরকে এ ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতাও দিতে পারবে। আবার কোনো ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করতে চাইলে তাও করতে পারবে।[১] বাদায়ে গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

> "যেসব জনপদ বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ নয়, সেখানে অমুসলিমদেরকে মদ ও শুকর বিক্রি, ক্রুশ বহন করা ও শংখ ধ্বনি বাজানোতে বাধা দেয়া হবেনা। চাই সেখানে মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা যতোই বেশী হোকনা কেনো। তবে বিধিবদ্ধ ইসলামী অঞ্চলে এ সব কাজ পছন্দনীয় নয়। অর্থাৎ যেসব জনপদকে জুময়া, ঈদ ও ফৌজদারী দন্ডবিধি প্রচলনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।....... তবে যে সমস্ত পাপ কাজকে তারাও নিষিদ্ধ মনে করে যেমন ব্যভিচার ও অন্যান্য অশ্লীল কাজ, যা তাদের ধর্মেও নিষিদ্ধ সেসব কাজ প্রকাশ্যে করতে তাদেরকে সর্বাবস্থায়ই বাঁধা দেয়া হবে। চাই সেটা মুসলমানদের জনপদে হোক কিংবা তাদের জনপদে হোক।"[২]

কিন্তু বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদগুলোতেও তাদেরকে শুধুমাত্র ক্রুশ ও প্রতিমাবাহী শোভাযাত্রা বের করতে এবং প্রকাশ্যে ঢাকঢোল বাজাতে বাজাতে বাজারে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে প্রাচীন উপাসনালয়গুলোর অভ্যন্তরে তারা সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করবেনা। [শরূহে সিয়ারুল কবীর, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৫১]

---

১. নির্ভেজাল ইসলামী জনপদ শরীয়তের পরিভাষায় "আমসারুল মুসলিমীন" (বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ) আখ্যায়িত অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে সব অঞ্চলের ভূসম্পত্তি মুসলমানদের মালিকানাভুক্ত এবং যে সব অঞ্চলকে মুসলমানরা ইসলামী অনুষ্ঠানাদি ও উদযাপনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে।

২. বাদায়ে, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৩

উপাসনালয়

নির্ভেজাল মুসলিম জনপদগুলোতে অমুসলিমদের যেসব প্রাচীন উপাসনালয় থাকবে, তাতে হস্তক্ষেপ করা যাবেনা। উপাসনালয় যদি ভেংগে যায়, তবে তা একই জায়গায় পুর্ননির্মাণের অধিকারও তাদের আছে। তবে নতুন উপাসনালয় বানানোর অধিকার নেই। [বাদায়ে, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১৪,শরহে সিয়ারুল কবীর, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৫১]

তবে যেগুলো নির্ভেজাল মুসলিম জনপদ নয়, তাতে অমুসলিমদের নতুন উপাসনালয় নির্মাণের অবাধ অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে যেসব এলাকা এখন আর বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ নেই, সরকার সেখানে জুম্‌য়া, ঈদ ও ফৌজদারী দন্ডবিধির প্রচলন বন্ধ করে দিয়েছে, সেখানেও অমুসলিমদের নতুন উপাসনালয় নির্মাণ নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অধিকার রয়েছে। (বাদায়ে, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১১৪, শরহে সিয়ারুল কবীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২৫৭)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফতুয়া নিম্নরূপ ঃ

"যেসব জনপদকে মুসলমানরা বাসযোগ্য বানিয়েছে, সেখানে অমুসলিমদের নতুন মন্দির, গীর্জা ও উপাসনালয় বানানো, বাদ্য বাজানো এবং প্রকাশ্যে শুয়রের গোস্ত ও মদ বিক্রি করার অধিকার নেই। আর অনারবদের হাতে আবাদকৃত, পরে মুসলমানদের হাতে বিজিত এবং মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকারকারী জনপদে অমুসলিমদের অধিকার তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তঅনুসারে চিহ্নিত হবে। মুসলমানরা তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।"

জিযিয়া ও কর আদায়ে সুবিধা দান

জিযিয়া ও কর আদায়ে অমুসলিম নাগরিকদের ওপর কঠোরতা প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। তাদের সাথে নম্র ও কোমল ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। তারা বহন করতে পারেনা এমন বোঝা তাদের ওপর চাপাতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত ওমরের নির্দেশ ছিলো, "যে পরিমাণ সম্পদ রাষ্ট্রকে প্রদান করা তাদের সামর্থের বাইরে তা দিতে তাদেরকে বাধ্য করা চলবেনা।" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ঃ ৮, ৮২]

জিযিয়ার বদলায় তাদের ধনসম্পদ নীলামে চড়ানো যাবেনা। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তার জনৈক কর্মচারীকে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে ঃ

"কর খাজনা বাবদে তাদের গরু, গাধা, কাপড় চোপড় বিক্রী করোনা।" [ফাতহুল বায়ান, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৩]

অপর এক ঘটনায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বীয় কর্মচারীকে পাঠানোর সময় বলে দেনঃ "তাদের শীত গ্রীষ্মের কাপড়, খাবারের উপকরণ ও কৃষি কাজের পশু খাজনা আদায়ের জন্য বিক্রি করবেনা, প্রহার করবেনা, দাঁড়িয়ে রেখে শাস্তি দেবেনা এবং খাজনার বদলায় কোনো জিনিস নীলামে চড়াবেনা। কেননা আমরা তাদের শাসক হয়েছি বলে নরম ব্যবহারের মাধ্যমে আদায় করাই আমাদের কাজ। তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে আল্লাহ্ আমার পরিবর্তে তোমাকে পাকড়াও করবেন। আর আমি

যদি জানতে পারি যে, তুমি আমার আদেশের বিপরীত কাজ করছো, তাহলে আমি তোমাকে পদচ্যুত করবো। [কতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৯]

জিযিয়া আদায়ে যে কোনো ধরনের কঠোরতা প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু গভর্নর হযরত আবু উবায়দাকে যে ফরমান পাঠিয়েছিলেন তাতে অন্যান্য নির্দেশের পাশাপাশি এ নির্দেশও ছিলো ঃ

"মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের ওপর যুলুম করা, কষ্ট দেয়া এবং অন্যায়ভাবে তাদের সম্পত্তি ভোগ দখল করা থেকে বিরত রাখো।" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৮২]

সিরিয়া সফরকালে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দেখলেন, সরকারী কর্মচারীরা জিযিয়া আদায় করার জন্য অমুসলিম নাগরিকদের শাস্তি দিচ্ছে। তিনি তাদের বললেন, "ওদের কষ্ট দিওনা। তোমরা যদি ওদের কষ্ট দাও তবে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের শাস্তি দেবেন।" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৭১]

হিশাম ইব্‌নে হাকাম দেখলেন, জনৈক সরকারী কর্মচারী জিযিয়া আদায় করার জন্য জনৈক কিবতীকে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখছে। তিনি তাকে তিরস্কার করলেন এবং বললেন যে, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

"যারা দুনিয়ায় মানুষকে শাস্তি দিতো, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন।" [আবু দাউদ]

মুসলিম ফিকাহ্ শাস্ত্রকারগণ জিযিয়া দেয় অস্বীকারকারীদের বড়জোর বিনাশ্রম কারাদন্ড দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, "তবে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা হবে এবং প্রাপ্য জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত আটক করে রাখা হবে।" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৭০]

যেসব অমুসলিম নাগরিক দারিদ্রের শিকার ও পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে যায়, তাদের জিযিয়া তো মাফ করা হবেই, উপরন্তু ইসলামী কোষাগার থেকে তাদের জন্য নিয়মিত সাহায্যও বরাদ্দ করা হবে। হযরত খালিদ হীরাবাসীদের যে লিখিত নিরাপত্তা সনদ দিয়েছিলেন, তাতে এ কথাও লেখা ছিলো যে ঃ

"আমি হীরাবাসী অমুসলিমদের জন্য এ অধিকারও সংরক্ষণ করলাম যে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বার্ধক্যের দরুণ কর্মক্ষমতা হারিয়ে বসেছে, যার ওপর কোনো দুর্যোগ নেমে এসেছে, অথবা যে পূর্বে ধনী ছিলো, পরে দরিদ্র হ'য়ে গেছে, ফলে তার স্বধর্মের লোকেরাই তাকে দান দক্ষিণা দিতে শুরু করেছে, তার জিযিয়া মাফ করে দেয়া হবে এবং তাকে ও তার পরিবার পরিজন ও সন্তানদের বাইতুল মাল থেকে ভরণ পোষণ করা হবে।" [কতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৮৫]

একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জনৈক বৃদ্ধ লোককে ভিক্ষা করতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, "কী আর করবো বাপু, জিযিয়া দেয়ার জন্য ভিক্ষে করছি।" এ কথা শুনে তিনি তৎক্ষনাত তার জিযিয়া মাফ ও তার ভরণ পোষণের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি কোষাগারের কর্মকর্তাকে লিখলেন, "আল্লাহ্‌র কসম, এটা কখনো ইনসাফ নয় যে, আমরা যৌবনে তার দ্বারা

উপকৃত হবো, আর বার্ধক্যে তাকে অপমান করবো।" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৭২, ফাতহুল কাদীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৩]

দামেস্ক সফরের সময়ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু অক্ষম অমুসলিম নাগরিকদের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করার আদেশ জারী করেছিলেন। [বালাযুরী ঃ ফতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা ১২৯]

কোনো অমুসলিম নাগরিক মারা গেলে তার কাছে প্রাপ্য বকেয়া জিযিয়া তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আদায় করা হবেনা এবং তার উত্তরাধিকারীদের ওপরও এর দায়ভার চাপানো হবেনা। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন ঃ

"কোনো অমুসলিম নাগরিক তার কাছে প্রাপ্য জিযিয়া পূরো অথবা আংশিক দেয়ার আগেই মারা গেলে তা তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে বা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আদায় করা হবেনা।" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ৭০, আল মাবসূত ১০ম খন্ড, পৃঃ ৮১]

বাণিজ্য কর

মুসলিম ব্যবসায়ীদের মতো অমুসলিম ব্যবসায়ীদেরও বাণিজ্য পণ্যের ওপর কর আরোপ করা হবে যদি তাদের মূলধন ২০০ দিরহাম পর্যন্ত পৌছে অথবা তারা ২০ মিসকাল স্বর্ণের মালিক হ'য়ে যায়।[১] এ কথা সত্য যে, ফিকাহ শাস্ত্রকারগণ অমুসলিম ব্যবসায়ীদের ওপর বাণিজ্যের শতকরা ৫ ভাগ এবং মুসলিম ব্যবসায়ীদের ওপর আড়াই ভাগ আরোপ করেছিলেন। তবে এ কাজটা কুরআন বা হাদীসের কোনো সুস্পষ্ট বাণীর আলোকে করা হয়নি। এটা তাদের ইজতিহাদ বা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত ছিলো। এটা সমকালীন পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে করা হয়েছিল। সে সময় মুসলমানগণের অধিকাংশই দেশরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং সমস্ত ব্যবসায় বাণিজ্য অমুসলিমদের হাতে চলে গিয়েছিল। এজন্য মুসলিম ব্যবসায়ীদের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং তাদের ব্যবসায়ের সংরক্ষণের জন্য তাদের ওপর কর কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

সামরিক চাকুরী থেকে অব্যাহতি

অমুসলিমগণ সামরিক দায়িত্বমুক্ত। শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা এককভাবে শুধু মুসলমানদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কারণ একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেবল তারাই উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে, যারা ঐ আদর্শকে সঠিক বলে মানে। তাছাড়া লড়াইতে নিজেদের আদর্শ ও মূলনীতি মেনে চলাও তাদের পক্ষেই সম্ভব। অন্যেরা দেশ রক্ষার জন্য লড়াই করলে ভাড়াটে সৈন্যের মতো লড়বে এবং ইসলামের নির্ধারিত নৈতিক সীমা রক্ষা করে চলতে পারবেনা। এজন্য ইসলাম অমুসলিমদের সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং কেবলমাত্র দেশ রক্ষার কাজের ব্যয় নির্বাহে নিজেদের অংশ প্রদানকে তাদের কর্তব্য বলে চিহ্নিত করেছে। এটাই জিযিয়ার আসল তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য । এটা শুধু যে আনুগত্যের প্রতীক তা নয়

---

১. কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৭০, তবে আজও কর আরোপের জন্য অবিকল এই পরিমাণ নিসাব নির্ধারণ করা জরুরী নয়। এটা সেই সময়কার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়েছিল।

বরং সামরিক কর্মকান্ড থেকে অব্যাহতি লাভ ও দেশ রক্ষার বিনিময়ও বটে। এজন্য জিযিয়া শুধুমাত্র যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষদের ওপরই আরোপ করা হয়। আর কখনো যদি মুসলমানরা অমুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অক্ষম হয়, তাহলে জিযিয়ার টাকা ফেরত দেয়া হয়।[১] ইয়ারমুকের যুদ্ধে যখন রোমকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশাল সমাবেশ ঘটালো এবং মুসলমানরা সিরিয়ার সকল বিজিত এলাকা পরিত্যাগ করে একটি কেন্দ্রে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হলো, তখন হযরত আবু উবাইদা নিজের অধীনস্থ সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা যেসব জিযিয়া ও খাজনা অমুসলিমদের কাছ থেকে আদায় করেছিলে তা তাদের ফিরিয়ে দাও এবং বলো যে, "এখন আমরা তোমাদের রক্ষা করতে অক্ষম, তাই যে অর্থ তোমাদের রক্ষা করার বিনিময়ে আদায় করেছিলাম তা ফেরত দিচ্ছি" [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ১১১]

এই নির্দেশ মুতাবিক সকল সেনাপতি আদায় করা অর্থ ফেরত দিলেন। এ সময় অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে ঐতিহাসিক বালাযুরী লিখেছেন, মুসলমান সেনাপতিগণ যখন সিরিয়ার হিম্স নগরীতে জিযিয়ার অর্থ ফেরত দেন, তখন সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ সমস্বরে বলে ওঠে, "ইতিপূর্বে যে যুলুম অত্যাচারে আমরা নিষ্পেষিত হচ্ছিলাম, তার তুলনায় তোমাদের শাসন ও ন্যায়বিচারকে আমরা বেশী পছন্দ করি। এখন আমরা যুদ্ধ করে পরাজিত হওয়া ছাড়া কোনো মতেই হিরাক্লিয়াসের কর্মচারীদেরকে আমাদের শহরে ঢুকতে দেবোনা।" [ফতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা ১৩৭]

৩. মুসলিম ফকীহদের সমর্থন

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে যে আইন প্রণীত হয়েছিল, ওপরের আলোচনার তার কিছু বিশদ বিবরণ দেয়া হলো। পরবর্তী আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে আমি এ কথাও উল্লেখ করতে চাই যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী রাজতন্ত্রের যুগে যখনই অমুসলিমদের সাথে অবিচার করা হয়েছে, তখন মুসলিম ফকীহগণই সর্বাগ্রে মযলূম অমুসলিমদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, উমাইয়া শাসক ওলীদ বিন আব্দুল মালেক দামেস্কের ইউহান্না গীর্জাকে জোরপূর্বক খৃষ্টানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। হযরত ওমর

---

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য দেখুন আলমাবসূত, ১০ম খন্ড, পৃঃ ৭৮-৭৯; হিদায়া, কিতাবুল সিয়ার; ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩২৭-৩২৮, এবং ৩৬৯-৩৭০, কোনো বহিশত্রুর আক্রমণের সময় দেশের অমুসলিম নাগরিকরা যদি দেশ রক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করে, তবে আমরা তাদেরকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে পারি। তবে সে ক্ষেত্রে তাদের জিযিয়া রহিত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, জিযিয়ার নাম শুনতেই অমুসলিমদের মনে যে আতংক জন্মে, সেটা শুধুমাত্র ইসলামের শত্রুদের দীর্ঘকাল ব্যাপী অপপ্রচারের ফল। অন্যথায় এই আতংকের কোনো ভিত্তি নেই। জিযিয়া মূলতঃ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা যে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন যাপনের সুযোগ পায় তারই বিনিময়। শুধুমাত্র সক্ষম ও প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের কাছ থেকে এটা নেয়া হয়। এটাকে যদি ইসলাম গ্রহণ না করার জরিমানা বলা হয়, তাহলে যাকাতকে কি বলা হবে? যাকাত তো শুধু প্রত্যেক সক্ষম পুরুষই নয় বরং সক্ষম নারীর কাছ থেকেও আদায় করা হয়। ওটা কি তাহলে ইসলাম গ্রহণের জরিমানা?

বিন আব্দুল আযীয ক্ষমতায় এলে খৃষ্টানরা এ ব্যাপারে তাঁর কাছে অভিযোগ দায়ের করলো। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে লিখে পাঠালেন, মসজিদের যে টুকুই অংশ গীর্জার জায়গার ওপর নির্মাণ করা হয়েছে তা ভেংগে খৃষ্টানদের হাতে সোপর্দ করে দাও।"

ওলীদ বিন এযীদ রোমক আক্রমণের ভয়ে সাইপ্রাসের অমুসলিম অধিবাসীদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে সিরিয়ায় পুনর্বাসিত করেন। এতে মুসলিম ফকীহগণ ও সাধারণ মুসলমানরা ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয় এবং তারা একে একটা মস্তবড় গুনাহর কাজ বলে আখ্যায়িত করেন। এরপর যখন ওলীদ বিন এযীদ পুনরায় তাদের সাইপ্রাসে নিয়ে পুর্নবাসিত করলেন, তখন তার প্রশংসা করা হয় এবং বলা হয়, এটাই ইনসাফের দাবী। ইসমাঈল বিন আইয়াশ বলেন ঃ

"মুসলমানরা তার এ কাজে কঠোর অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং ফকীহগণ একে গুনাহর কাজ মনে করেন। অতঃপর যখন এযীদ বিন ওলীদ খলীফা হলেন এবং তাদের আবার সাইপ্রাসে ফেরত পাঠালেন, তখন মুসলমানরা এ কাজ পছন্দ করেন এবং একে ন্যায়বিচার আখ্যায়িত করেন।" [ফতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা ১৫৬]

ঐতিহাসিক বালাযুরী বর্ণনা করেন, একবার লেবাননের পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের মধ্য থেকে একটি গোষ্ঠী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সালেহ বিন আব্দুল্লাহ তাদের দমন করার জন্য একটি সেনাদল পাঠান। এই সেনাদল উক্ত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সকল সশস্ত্র পুরুষদের হত্যা করে এবং বাদবাকীদের একদলকে দেশান্তরিত করে ও অপর দলকে যথাস্থানে বহাল রাখে। ইমাম আওযায়ী তখন জীবিত ছিলেন। তিনি সালেহকে এই যুলুমের জন্য তিরস্কার করেন এবং একটা দীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রটির অংশ বিশেষ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

"লেবানন পর্বতের অধিবাসীদের বহিষ্কারের ঘটনাটা তোমার অজানা নয়। তাদের ভেতরে এমনও অনেকে আছে, যারা বিদ্রোহীদের সাথে মোটেই অংশ গ্রহণ করেনি। তথাপি তুমি তাদের কতককে হত্যা করলে এবং কতককে তাদের বাসস্থানে ফেরত পাঠিয়ে দিলে। আমি বুঝিনা, কতিপয় বিশেষ অপরাধীর অপরাধমূলক কর্মকান্ডের শাস্তি সাধারণ মানুষকে কিভাবে দেয়া যায় এবং তাদের সহায় সম্পত্তি থেকে তাদের কিভাবে উৎখাত করা যায়? অথচ আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট নির্দেশ এই যে, "একজনের পাপের বোঝা আরেকজন বহন করবেনা।" এটা একটা অবশ্য করণীয় নির্দেশ। তোমার জন্য আমার সর্বোত্তম উপদেশ হলো, তুমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথাটা মনে রেখো যে, "যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের ওপর যুলুম করবে এবং তাদের সামর্থের চেয়ে বেশী তার ওপর বোঝা চাপাবে , তার বিরুদ্ধে আমি নিজেই ফরীয়াদী হবো।" [ফতুহুল বুলদান পৃষ্ঠা ১৬৯]

ইতিহাসে এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ সব দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা যায় যে, মুসলিম আলেম সমাজ চিরদিনই অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণে সোচ্চার থেকেছেন। কখনো কোনো রাজা বা শাসক তাদের ওপর যুলুম ও বাড়াবাড়ি যদি

করেও থাকে, তবে তৎকালে ইসলামী আইনের যেসব রক্ষক বেঁচে ছিলেন, তারা কখনো সেই যালিমকে তিরস্কার না করে ছাড়েননি।

৪. অমুসলিমদের যে সব বাড়তি অধিকার দেয়া যায়

উপরে আমরা অমুসলিমদের যে সব অধিকারের উল্লেখ করেছি, সেগুলো তাদের জন্য শরীয়তে সুনির্দিষ্ট এবং সেগুলো যে কোনো ইসলামী শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

এক্ষনে আমি সংক্ষেপে বলবো যে, বর্তমান যুগে একটি ইসলামী রাষ্ট্র তার অমুসলিম নাগরিকদেরকে ইসলামী মূলনীতির আলোকে কী কী অতিরিক্ত অধিকার দিতে পারে।

রাষ্ট্র প্রধানের পদ

সর্ব প্রথম রাষ্ট্র প্রধানের প্রশ্নে আসা যাক। যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র একটা আদর্শবাদী রাষ্ট্র, তাই ধর্মহীন জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলো সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার সম্পর্কে যে প্রতারণার আশ্রয় নেয়, ইসলামী রাষ্ট্র তার আশ্রয় নিতে পারেনা। ইসলামে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব হলো ইসলামের মূলনীতি অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। সুতরাং যারা ইসলামের মূলনীতিকেই মানেনা, সে আর যাই হোক রাষ্ট্র প্রধানের পদে কোনোক্রমেই অভিষিক্ত হতে পারেনা।

মজলিশে শূরা বা আইন সভা

এরপর আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মজলিশে শূরা বা পার্লামেন্ট তথা আইন সভা। এই আইন সভাকে যদি শতকরা একশো ভাগ খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলামী আদর্শ মুতাবিক গঠন করতে হয়, তাহলে এখানেও অমুসলিম প্রতিনিধিত্ব শুদ্ধ নয়। তবে বর্তমান যুগের পরিস্থিতির আলোকে এর অবকাশ এই শর্তে সৃষ্টি করা যেতে পারে যে, দেশের সংবিধানে এই মর্মে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নিশ্চয়তা দিতে হবে যে ঃ

ক. আইন সভা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারবেনা এবং এই সীমা লংঘনকারী যে কোনো সিদ্ধান্ত আইনের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হবে।

খ. দেশের আইনের সর্ব প্রধান উৎস হবে কুরআন ও সুন্নাহ।

গ. আইনের চূড়ান্ত অনুমোদনের কাজটি যে ব্যক্তি করবেন তিনি মুসলমান হবেন।

এরূপ একটি পদ্ধতিও অবলম্বন করা যেতে পারে যে, অমুসলিমদের দেশের আইন সভার অন্তর্ভুক্ত করার পরিবর্তে তাদের জন্য একটা আলাদা প্রতিনিধি পরিষদ বা আইন সভা গঠন করে দেয়া হবে। এই পরিষদ দ্বারা তারা নিজেদের সামষ্টিক প্রয়োজনও মেটাতে পারবে এবং দেশের প্রশাসন সংক্রান্ত ব্যাপারেও নিজেদের দৃষ্টিভংগি তুলে ধরতে পারবে। এই পরিষদের সদস্যপদ এবং ভোটাধিকার শুধুমাত্র অমুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এবং এখানে তাদের মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। এই পরিষদের মাধ্যমে তারা নিম্ন লিখিত কাজগুলো সমাধা করতে পারবে।

১. তারা নিজেদের পারিবারিক ও ধর্মীয় বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও আগে থেকে প্রচলিত সকল আইনের খসড়া রাষ্ট্র প্রধানের অনুমোদনক্রমে আইনে পরিণত হতে পারে।

২. তারা সরকারের প্রশাসনিক কর্মকান্ড ও মজলিশে শূরার সিদ্ধান্ত সমূহ সম্পর্কে নিজেদের অভিযোগ, পরামর্শ ও প্রস্তাব অবাধে পেশ করতে পারবে এবং সরকার ইনসাফ সহকারে তার পর্যালোচনা করবে।

৩. তারা আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও দেশের অন্যান্য ব্যাপারে প্রশ্নও করতে পারবে। সরকারের একজন প্রতিনিধি তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যও উপস্থিত থাকবে।

উপরোক্ত তিনটি পন্থার যে কোনো একটি পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করা যেতে পারে।

পৌরসভা ও স্থানীয় সরকারের স্তরগুলোতে (Local bodies) অমুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব ও ভোট দানের পূর্ণ অধিকার দেয়া যেতে পারে।

বাক স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা ইত্যাদি

ইসলামী রাষ্ট্রে একজন মুসলমান যেমন বাক স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা এবং মতামত ও বিবেকের স্বাধীনতা ভোগ করে, অমুসলিমরাও অবিকল সেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করবে। এ ব্যাপারে যেসব আইনগত বিধিনিষেধ মুসলমানদের ওপর থাকবে, তা তাদের ওপরও থাকবে।

আইন সংগতভাবে তারা সরকার, সরকারী আমলা এবং স্বয়ং সরকার প্রধানেরও সমালোচনা করতে পারবে।

ধর্মীয় আলোচনা ও গবেষণার যে স্বাধীনতা মুসলমানদের রয়েছে, তা আইন সংগতভাবে তাদেরও থাকবে।

তারা নিজেদের ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং একজন অমুসলিম যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করলে তাতে সরকারের কোনো আপত্তি থাকবেনা। তবে কোনো মুসলমান ইসলামী রাষ্ট্রের চৌহদ্দীতে থাকা অবস্থায় আপন ধর্ম পরিবর্তন করতে পারবেনা। তবে এরূপ ধর্মত্যাগী মুসলমানকে আপন ধর্মত্যাগের ব্যাপারে যে জবাবদিহীর সম্মুখীন হতে হবে, সেটা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যে অমুসলিম ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে ইসলাম ত্যাগ করেছে, তাকে এজন্য আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবেনা।

তাদেরকে তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কোনো চিন্তা ও কর্ম অবলম্বনে বাধ্য করা যাবেনা। দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী নয় এমন যে কোনো কাজ তারা আপন বিবেকের দাবী অনুসারে করতে পারবে।

শিক্ষা

ইসলামী রাষ্ট্র গোটা দেশের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবে, তাদেরকে সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ইসলামের ধর্মীয় পুস্তকাদি পড়তে তাদেরকে বাধ্য করা যাবেনা। দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা নিজেদের বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপন ধর্ম শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থা করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের থাকবে।

চাকুরী

কতিপয় সংরক্ষিত পদ ছাড়া সকল চাকুরীতে তাদের প্রবেশাধিকার থাকবে এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে কোনো বৈষম্য করা চলবেনা। মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের যোগ্যতার একই মাপকাঠি হবে এবং যোগ্য লোকদেরকে ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে নির্বাচন করা হবে।

সংরক্ষিত পদসমূহ বলতে ইসলামের আদর্শগত ব্যবস্থায় মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন পদসমূহকে বুঝানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একটি দলের সাহায্যে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনার পর এই পদগুলোর তালিকা তৈরী করা যেতে পারে। আমি একটা দিক নির্দেশক মূলনীতি হিসেবে শুধু এই কথা বলতে পারি যে, যেসব পদ নীতি নির্ধারণ ও বিভিন্ন বিভাগের দিক নির্দেশনার সাথে জড়িত, সেগুলো মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন পদ। একটা আদর্শবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এইসব পদ কেবল সংশ্লিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসীদেরকেই দেয়া যেতে পারে। এই পদগুলো বাদ দেয়ার পর বাদবাকী সমগ্র প্রশাসনের বড় বড় পদেও যোগ্যতা সাপেক্ষে অমুসলিমদেরকে নিয়োগ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, রাষ্ট্রের মহা হিসাব রক্ষক, মহা প্রকৌশলী কিংবা পোস্ট মাস্টার জেনারেলের ন্যায় পদে সুযোগ্য অমুসলিম ব্যক্তিদের নিয়োগে কোনো বাঁধা নেই।

অনুরূপভাবে সেনাবাহিনীতেও শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ যুদ্ধ সংক্রান্ত দায়িত্ব সংরক্ষিত দায়িত্ব বলে গণ্য হবে। এ ছাড়া অন্যান্য সামরিক বিভাগ যার কোনো সম্পর্ক সরাসরি যুদ্ধের সাথে নেই, অমুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও পেশা

শিল্প, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি ও অন্য সকল পেশার দুয়ার অমুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এসব ক্ষেত্রে মুসলমানরা যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে, তা অমুসলমানরাও ভোগ করবে এবং মুসলমানদের ওপর আরোপ করা হয়না এমন কোনো বিধিনিষেধ, অমুসলিমদের ওপরও আরোপ করা যাবেনা। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের অর্থনৈতিক ময়দানে তৎপরতা চালানোর সমান অধিকার থাকবে।

অমুসলিমদের নিরাপত্তার একমাত্র উপায়

একটি ইসলামী রাষ্ট্র আপন অমুসলিম নাগরিকদেরকে যে অধিকারই দেবে, তা পার্শ্ববর্তী কোন্ অমুসলিম রাষ্ট্রে তার মুসলিম নাগরিকদেরকে কী কী অধিকার দিয়ে থাকে, বা আদৌ দেয়না, তার পরোয়া না করেই দেবে। আমরা একথা মানিনা যে, মুসলমানরা অমুসলিমদের দেখাদেখি আপন কর্মপন্থা নির্ণয় করবে। তারা ইনসাফ করলে এরাও ইনসাফ করবে আর তারা যুলুম করলে এরাও যুলুম করবে, এটা হতে পারেনা। আমরা মুসলমান হিসেবে একটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শের অনুসারী। আমাদের যতোদূর সাধ্যে কুলায়, নিজস্ব নীতি ও আদর্শ অনুসারেই কাজ করতে হবে। আমরা যা দেবো তা আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্য নিয়েই দেবো এবং তা শুধু কাগজে কলমে নয় বরং বাস্তবেই দেবো। যে দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করবো তা পূর্ণ ইনসাফ ও সততার সাথে পালন করবো।

এরপর একথা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে অমুসলিমদের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা এই রাষ্ট্রগুলোকে পরিপূর্ণ ও

নির্ভেজাল ইসলামে রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা ছাড়া আর কোনোভাবে দেয়া সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্য বশত গোটা এই উপমহাদেশ জুড়ে যুলুম ও নিপীড়নের যে পৈশাচিক বিভীষিকা চল্ছে, তাকে প্রশমিত করার এটাই একমাত্র অব্যর্থ উপায়। শুধুমাত্র এই পন্থা অবলম্বনেই পাকিস্তানও হতে পারে ইনসাফের আবাসভূমি আর ভারত এবং অন্যান্য দেশও ইনসাফের পথ খুঁজে পেতে পারে। পরিতাপের বিষয় হলো, অমুসলিমরা দীর্ঘকালব্যাপী ইসলামের কেবল অপব্যাখ্যাই শুনে ও দেখে আসছে। তাই তারা ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী শাসনের কথা শুনলেই আতংকিত হয়। আর তাদের কেউ কেউ দাবী জানাতে থাকে যে, আমাদের এখানেও ভারতের ন্যায় ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র কায়েম হওয়া উচিত। বাস্তবিক পক্ষে ভারতের ধমনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে কি এমন কোনো আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যার প্রত্যাশা করা যেতে পারে? তার পরিবর্তে এমন একটি ব্যবস্থার পরীক্ষা করা কি ভালো নয় যার ভিত্তি খোদভীতি, সততা এবং শাশ্বত সুন্দর আদর্শের অনুসরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত?

চতুর্দশ অধ্যায়

● ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো সামাজিক সুবিচার ও জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজের সীমার মধ্যে অবস্থান করে প্রতিটি মানুষের জন্যে সম্মানজনক জীবন যাপনের ব্যবস্থাকে সহজতর করা। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় অনুষ্ঠিত মু'তামারে আলমে ইসলামীর সম্মেলনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এখানে সে প্রবন্ধটি সংকলিত হলো। এতে ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক নীতিমালার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

- সংকলক

ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার

[১৩৮১ হিজরী মুতাবেক ১৯৬২ ঈসায়ীতে হজ্জ উপলক্ষ্যে মুতামারে আলমে ইসলামীর উদ্যোগে মক্কা মুয়াজ্জামায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এই প্রবন্ধ পাঠ করা হয়]

আধুনিক কালের কতিপয় প্রতারণা

আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে যে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে রয়েছে একটি বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব। সে সুস্পষ্ট ফিতনা ফাসাদ ও প্রকাশ্য বিপর্যয় বিশৃংখলার দিকে খুব কমই ঝুঁকে পড়ে। এজন্য শয়তান তার নিজের ফিতনা ফাসাদকে কোনো না কোনো ভাবে সংস্কার সংশোধন ও কল্যাণের ছদ্মবরণে মানুষের সামনে তুলে ধরে। শয়তান যদি বেহেশতে আদম আলাইহিস সালামকে একথা বলতো, "আমি তোমাদের দ্বারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করাতে চাই এবং এর ফলে তোমাদের বেহেশ্‌ত থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হবে" তাহলে সে কখনোও তাঁদেরকে ধোঁকা দিতে পারতোনা। বরং তাঁদের সে এই বলে ধোঁকা দিলো ঃ

"তোমাকে সেই গাছটি দেখিয়ে দেবো কি যার মাধ্যমে চিরন্তন জীবন ও অক্ষয় রাজত্ব লাভ করা যায়?" (সূরা ত্বাহা ঃ ১২০)

মানুষের প্রকৃতি আজ পর্যন্ত এ পথেরই অনুগামী হয়েছে। আজও শয়তান তাকে যতো প্রকার বিভ্রান্তি ও নির্বুদ্ধিতায় নিক্ষেপ করেছে তার সবই কোনো না কোনো বিভ্রান্তিকর শ্লোগান এবং মিথ্যার ছত্রছায়ায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে।

উল্লেখিত প্রতারণাসমূহের মধ্যে একটি মারাত্মক প্রতারণা হচ্ছে, সেই প্রতারণা যা বর্তমানে সামাজিক সুবিচারের (Social Justice) নামে মানবজাতির সাথে করা হচ্ছে। প্রথমে শয়তান একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুনিয়াকে ব্যক্তি স্বাধীনতা (Individual liberty) এবং উদার নীতির (Liberalism) নামে ধোঁকা দিতে থাকে এবং এরই ভিত্তিতে সে অষ্টাদশ শতকে পুঁজিবাদ ও ধর্মহীন (Secular) গণতন্ত্র কায়েম করায়। এক সময় এই ব্যবস্থার এতোই প্রভাব ছিলো যে, দুনিয়াতে মানবজাতির উন্নতির জন্য এটাকে চূড়ান্ত হাতিয়ার মনে করা হতো এবং প্রত্যেক ব্যক্তি, যে নিজেকে প্রগতিবাদী এবং প্রগতিশীল বলে পরিচয় করাতে পছন্দ করতো সে স্বাধীনচেতা ও উদারপন্থী হওয়ার শ্লোগান দিতে বাধ্য ছিলো। লোকেরা মনে করতো, মানব জীবনের জন্য যদি কোনো ব্যবস্থা থেকে থাকে তাহলে কেবল এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং এই ধর্মহীন গণতন্ত্রই আছে যা পাশ্চাত্যে কায়েম হয়েছে। কিন্তু দেখতে দেখতে সেই সময় এসে গেলো যখন গোটা বিশ্ব অনুভব করতে লাগলো যে, এই শয়তানী ব্যবস্থা পৃথিবীকে যুলুম ও স্বৈরাচারে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। এরপর অভিশপ্ত

ইবলীসের পক্ষে এই শ্লোগানের দ্বারা মানুষকে আর অধিক সময় ধোঁকা দেয়া সম্ভব ছিলোনা।

অতপর খুব বেশী সময় অতিবাহিত হতে পারেনি, এর মধ্যেই শয়তান সামাজিক সুবিচার ও সমাজতন্ত্রের নামে আরেকটি প্রতারণার জন্ম দেয়। এখন সে এই মিথ্যার ছদ্মবরণে অন্য একটি ব্যবস্থা কায়েম করাচ্ছে। এই নতুন ব্যবস্থা বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে এতো মারাত্মক যুলুম নির্যাতন ও স্বৈরাচারে প্লাবিত করে দিয়েছে যার দৃষ্টান্ত মানব জাতির ইতিহাসে কখনো পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই প্রতারণাপূর্ণ মতবাদটি এতোই শক্তিশালী যে, আরো কিছু সংখ্যক দেশ এটাকে উন্নতির সর্বশেষ উপায় মনে করে তা গ্রহণ করার জন্য তৈরী হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এই প্রতারণার মুখোশ পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয়নি।[১]

মুসলমানদের অবস্থা এই যে, তাদের কাছে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাহ্ বর্তমান রয়েছে। এর মধ্যে তাদের জন্য চিরস্থায়ী জীবন বিধান মওজূদ রয়েছে। তা তাদেরকে শয়তানের ধোঁকা সম্পর্কে সতর্ক করা এবং জীবনের সার্বিক ব্যাপারে পথনির্দেশ দেয়ার ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এই ভিক্ষুকেরা নিজেদের দীন সম্পর্কে চরম অজ্ঞ এবং সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণে নিকৃষ্টরূপে পরাজিত। এজন্য দুনিয়ার জাতিগুলোর শিবির থেকে যে শ্লোগানই উত্থিত হয় তা এখান থেকেও ত্বরিত প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করে। যে যুগে ফরাসী বিপ্লব থেকে উত্থিত চিন্তা দর্শনের জোর ছিলো, মুসলিম দেশসমূহের প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তি এখানে সেখানে এই চিন্তা দর্শনের প্রকাশ এবং তারই আলোকে নিজেকে গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক মনে করতো। তারা মনে করতো এটা ছাড়া সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেনা এবং তাদেরকে পশ্চাদপন্থী মনে করা হবে। এই যুগটা যখন শেষ হলো, আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কেবলাও পরিবর্তন হতে শুরু করলো। নতুন যুগের সূচনা হতেই আমাদের মাঝে সামাজিক সুবিচার এবং সমাজতন্ত্রের শ্লোগান উচ্চারণকারীদের আবির্ভাব হতে থাকলো। এ পর্যন্ত পৌঁছেও ধৈর্য ধরার মতো ছিলো। কিন্তু পরিতাপের ব্যাপার হলো, আমাদের মাঝে এমন একটি দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো যারা নিজেদের কেবলা পরিবর্তন করার সাথে সাথে চাইতো যে, ইসলামও তার কেবলা পরিবর্তন করুক। মনে হয় বেচারারা যেনো ইসলাম ছাড়া বাঁচতে পারছেনা। তাদের সাথে ইসলামেরও থাকা দরকার আছে। কিন্তু তাদের খাহেশ হচ্ছে, তারা যার অনুসরণ করে উন্নতি করতে চায়, ইসলামও যদি তার অনুসরণ করে তাহলে সেও সম্মানিত হবে এবং 'সেকেলে ধর্ম' হওয়ার অপবাদ থেকেও বেঁচে যাবে। এই কারণে প্রথমে ব্যক্তি স্বাধীনতা, উদার নৈতিকতা, পুঁজিবাদ ও ধর্মহীন গণতন্ত্রের পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগিকে অবিকল ইসলামী প্রমাণ করার চেষ্টা করা হতো। আর আজ এরই ভিত্তিতে প্রমাণ হচ্ছে যে, ইসলামেও সমাজতান্ত্রিক দর্শনের সামাজিক সুবিচার বর্তমান রয়েছে। এটা সেই স্তর

---

১. এটি ১৯৬২ সালের বক্তৃতা। ইতোমধ্যেই মুখোশ উন্মোচিত হয়ে এ প্রতারণা একেবারে নগ্ন হয়ে পড়েছে। - আ. শ. ন.

যেখানে পৌঁছে আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর মানসিক গোলামী এবং তাদের চরম অজ্ঞতার প্লাবন অপমানের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

সামাজিক সুবিচারের তাৎপর্য

আমি এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বলতে চাই যে, আসলে সামাজিক সুবিচার বলতে বুঝায় এবং এর প্রতিষ্ঠার সঠিক পন্থাই বা কি? যদিও এটা খুব কমই আশা করা যায় যে, যেসব লোক সমাজতন্ত্রকে 'সামাজিক সুবিচার' প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা মনে করে তা বাস্তবায়িত করার জন্য লেগে আছে তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেবে এবং তা থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। কেননা মূর্খ যতক্ষণ মূর্খ থাকে ততোক্ষণ তার সংশোধনের কিছু সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে । কিন্তু যখন সে শাসন দন্ড হাতে পায় তখন "মা আলিমতু লাকুম মিন ইলাহিন গাইরী- আমি তো নিজেকে ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো খোদাকে জানিনা" (সূরা কাসাসঃ ৩৮) এই অহমিকা তাকে কোনো বুদ্ধিমান মানুষের কথা হৃদয়ংগম করার যোগ্যও রাখেনা। কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে সাধারণ মানুষের অবস্থা ভিন্নরকম। যুক্তিযুক্ত পন্থায় তাদেরকে কথা বুঝিয়ে দিতে পারলে তারা শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে সর্তক হতে পারে। এই সাধারণ লোকদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ধোঁকা দিয়ে পথভ্রষ্ট লোকেরা নিজেদের ভ্রান্তির প্রসার ঘটায়। এজন্য সাধারণ লোকদের সামনে প্রকৃত সত্য তুলে ধরাই মূলত আমার এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

কেবল ইসলামেই রয়েছে সামাজিক সুবিচার

এ প্রসংগে আমি আমার মুসলমান ভাইদের সর্বপ্রথম যে কথা বলতে চাই তা হলো, যেসব লোক "ইসলামেও সামাজিক সুবিচার মওজূদ রয়েছে"-এই শ্লোগানে মূখর, তারা সম্পূর্ণ একটি ভুল কথা বলে। বরং সঠিক কথা হলো, "কেবলমাত্র ইসলামেই সামাজিক সুবিচার রয়েছে।" ইসলাম সেই সত্য জীবন ব্যবস্থা যা বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মানবজাতির পথ পদর্শনের জন্য নাযিল করেছেন। মানবজাতির মধ্যে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের জন্য কোন্‌টি ন্যায় ইনসাফ এবং কোন্‌টি ন্যায় ইনসাফ নয় তা নির্ণয় করা মানবজাতির সৃষ্টিকর্তারই কাজ। অন্য কেউ ন্যায় ইনসাফ ও যুলুমের মানদন্ড নির্ধারণের অধিকার রাখেনা এবং তাদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে ইনসাফ কায়েম করার যোগ্যতাও নেই। মানুষ নিজেই নিজের মালিক এবং কর্তা নয় যে, সে নিজের জন্য নিজেই সুবিচারের মানদন্ড নির্ধারণের ক্ষমতা রাখে। বিশ্বে তার মর্যাদা হচ্ছে খোদার প্রজা বা অধীনস্থ হিসেবে। এজন্য সুবিচারের মানদন্ড নিরূপণ করা তার কাজ নয়, তার মালিক এবং শাসকের কাজ। তাছাড়া মানুষ যতো উন্নত মর্যাদা সম্পন্নই হোক না কেন, এক ব্যক্তির পরিবর্তে উচ্চ মর্যাদা ও যোগ্যতা সম্পন্ন অসংখ্য লোক একত্রিত হয়ে নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি খরচ করুক না কেন মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, এর ত্রুটি, অনিপুণতা ও অপূর্ণাংগতা এবং মানবীয় জ্ঞানের উপর প্রবৃত্তি ও গোঁড়ামির প্রভাব এসব কিছু থেকে মুক্ত হওয়া কোনো অবস্থায়ই সম্ভব নয়। এজন্যই ন্যায় ইনসাফের উপর ভিত্তিশীল কোনো জীবন বিধান নিজেদের জন্য রচনা করা মানুষের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। মানুষের বিধান ব্যবস্থা আপাত প্রকাশ্যত যতোই ন্যায়ানুগ বলে দৃষ্টিগোচর হোক, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা খুব দ্রুত প্রমাণ করে দেয় যে, মূলত এর মধ্যে কোনো ন্যায়

ইনসাফ নেই। এজন্য মানব মস্তিষ্ক প্রসূত প্রতিটি ব্যবস্থা কিছুকাল চলার পর তা অকেজো প্রমাণ হয় এবং মানুষ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় একটি নির্বুদ্ধিতা প্রসূত পরীক্ষা নীরিক্ষার দিকে ধাবিত হয়। প্রকৃত সুবিচার কেবল সেই ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে যা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত জ্ঞানের অধিকারী মহাপ্রশংসিত ও মহাপবিত্র এক মহান সত্তা তৈরী করেছেন।

সুবিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় কথা যা প্রথমেই বুঝে নেয়া দরকার তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি "ইসলামে সুবিচার আছে" বলে, সে বাস্তব ঘটনা থেকে কম বলে। বাস্তব কথা এই যে, সুবিচার হচ্ছে ইসলামের লক্ষ্য। আর সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামের আগমন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

> "আমি আমার রসূলদের উজ্জ্বল নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মীযান (মানদন্ড) নাযিল করেছি- যেনো লোকেরা সুবিচারের উপর কায়েম হয়ে যায়। আর আমরা লৌহ নাযিল করেছি। এর মধ্যে রয়েছে অসীম শক্তি এবং মানুষের জন্য কল্যাণ। আল্লাহ্ জানতে চান কে না দেখেই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের সহযোগী হয়। নিশ্চিতই আল্লাহ্ মহাশক্তির অধিকারী এবং পরাক্রমশালী।" (সূরা আল হাদীদঃ ২৫)

এই দুটি কথা সম্পর্কে যদি কোনো মুসলমান অমনোযোগী না হয় তাহলে সে সামাজিক সুবিচারের খোঁজে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে ছেড়ে অন্য কোনো উৎসের দিকে ধাবিত হওয়ার ভ্রান্তিতে লিপ্ত হতে পারেনা। যে মুহূর্তে তার সুবিচারের প্রয়োজনীতা অনুভূত হবে তৎক্ষণাতই সে জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কারো কাছে সুবিচার নেই এবং থাকতেও পারেনা। সে এও জানতে পারবে যে, আদল কায়েম করার জন্য এছাড়া আর কিছুই করার নেই যে, ইসলাম, পূরাপূরি ইসলাম, এবং যোগ বিয়োগ ছাড়াই ইসলাম কায়েম করতে হবে। সুবিচার ইসলাম থেকে স্বতন্ত্র কোনো জিনিসের নাম নয়, স্বয়ং ইসলামই হচ্ছে সুবিচার। ইসলাম কায়েম হওয়া এবং সুবিচার কায়েম হওয়া একই জিনিস।

সামাজিক সুবিচার কি?

এখন আমাদের দেখতে হবে মূলত কোন্ জিনিসটির নাম সামাজিক সুবিচার এবং তা কায়েম করার সঠিক পন্থাই বা কি?

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

প্রতিটি মানব সমাজ হাজার হাজার লাখ লাখ এবং কোটি কোটি মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এই মিশ্র সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি সজীব, বুদ্ধিমান এবং সচেতন হয়ে থাকে। প্রতিটি সদস্যই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীন সত্তার অধিকারী। এর বিকাশ এবং ফলে ফুলে সুশোভিত হওয়ার জন্য সুযোগের প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিটি সদস্যেরই একটি ব্যক্তিগত ঝোঁক প্রবণতা রয়েছে। তার নিজের কিছু আকর্ষণ ও কামনা বাসনা রয়েছে। তার দেহ ও সত্ত্বার কিছু প্রয়োজন রয়েছে। সমাজের এই সদস্যদের অবস্থা কোনো প্রাণহীন যন্ত্রের খুচরা অংশের মতো নয় যে, মূল জিনিস হচ্ছে মেশিন আর খুচরা

অংশগুলো তারই প্রয়োজনে তৈরী করা হয়েছে এবং এই অংশগুলোর নিজস্ব কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। বরং মানব সমাজ জীবন্ত এবং জাগ্রত মানুষের একটি সমষ্টি। এই ব্যক্তিগণ এই সমষ্টি বা সংগঠনের জন্য নয় বরং সংগঠনই এই ব্যক্তিদের জন্য। ব্যক্তিগণ একত্র হয়ে এই সমষ্টি বা সংগঠন এজন্যই কায়েম করে যে, পরস্পরের সহায়তায় তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস অর্জন এবং দেহ ও আত্মার দাবি পূর্ণ করার সুযোগ পাবে।

ব্যক্তিগত জবাবদিহি

তাছাড়া সমস্ত মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তিকে এই দুনিয়ায় একটি নির্দিষ্ট সময় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে (যা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারিত) অতিবাহিত করার পর আল্লাহ্‌র দরবারে জবাবদিহির জন্য হাযির হতে হবে। তাকে এই পৃথিবীতে যে শক্তি, যোগ্যতা ও উপায় উপকরণ দান করা হয়েছিল তা কাজে লাগিয়ে সে নিজের জন্য কি ধরনের ব্যক্তিত্ব গঠন করে নিয়ে এসেছে এজন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ্‌র দরবারে মানবজাতির এই জবাবদিহি সম্মিলিতভাবে নয় বরং ব্যক্তিগতভাবে হবে। সেখানে বংশ, গোত্র, জাতি একত্রে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করবেনা বরং দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করে আল্লাহ্ তায়ালা প্রতিটি ব্যক্তিকে পৃথক ভাবে নিজের আদালতে হাযির করবেন এবং প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি করে এসেছো এবং কি হয়ে এসেছো?

ব্যক্তি স্বাধীনতা

এই দুটি ব্যাপারে অর্থাৎ পৃথিবীতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং আখিরাতে মানুষের জবাবদিহির দাবী হচ্ছে পৃথিবীতে সে স্বাধীনতার অধিকার লাভ করবে। কোনো সমাজে যদি ব্যক্তিকে তার পছন্দমতো নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকশের সুযোগ না দেয়া হয় তাহলে তার মধ্যে মানবতা শবদেহের মতো নির্জীব হয়ে যায়, তার দম বন্ধ হয়ে যেতে থাকে, তার শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতা চাপা পড়ে যায়। সে নিজেকে অবরুদ্ধ ও বন্দিদশায় দেখতে পেয়ে জড়তা ও অকর্মন্যতার শিকার হয়ে পড়ে। আখিরাতে এ ধরনের অবরুদ্ধ ও পরাধীন ব্যক্তির দোষ ক্রটি বেশীর ভাগ দায় দায়িত্ব এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থা গঠনকারী ও পরিচালনাকরীদের ঘাড়ে চাপবে। তাদের কাছ থেকে কেবল তাদের ব্যক্তিগত কার্যকলাপের হিসাব নিকাশই নেয়া হবেনা; বরং তারা যে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম করে অসংখ্য মানুষকে নিজেদের মর্জির বিরুদ্ধে এবং তাদের মর্জিমত ক্রটিপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে বাধ্য করেছে এজন্যও তাদের জবাবদিহি করতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, কোনো ঈমানদার ব্যক্তি এ ধরনের ভারি বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়ে আখিরাতে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হওয়ার কল্পনাও করতে পারেনা। সে যদি আল্লাহ্‌ভীরু মানুষ হয়ে থাকে তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র বান্দাদের অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা প্রদানের দিকেই ঝুঁকে পড়বে যেনো প্রতিটি ব্যক্তি যা হবার নিজের দায়িত্বেই হতে পারে। সে যদি নিজেকে ক্রটিপূর্ণ ও ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব হিসেবে গঠন করে তাহলে এ দায়িত্ব তখন আর সমাজের পরিচালকদের উপর চাপবেনা।

সামাজিক সংস্থা এবং এর কর্তৃত্ব

এতো গেলো ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপার। অপরদিকে সমাজকে দেখুন যা পরিবার, বংশ গোত্র, জাতি এবং গোটা মানবতার আকারে পর্যায়ক্রমিকভাবে কায়েম আছে। একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক ও তাদের সন্তানদের নিয়ে এই সমাজের সূচনা হয়। এদের দ্বারা একটি পরিবার গঠিত হয়। পরিবারের সমন্বয়ে বংশ, গোত্র ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে। তাদের সমন্বয়ে একটি জাতি অস্তিত্ব লাভ করে এবং জাতি তার সামষ্টিক ইচ্ছা আকাংখার বাস্তবায়নের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম করে। বিভিন্ন আকৃতিতে এই সামাজিক সংস্থাগুলো আসলে যে উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজন তা হচ্ছে এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে ও এর সহায়তায় ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ লাভ করবে, যা তার একার প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। কিন্তু এ মৌলিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে উল্লেখিত প্রতিটি সংস্থার হাতে ব্যক্তিদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার থাকতে হবে, যাতে এই সংস্থাগুলো এমন ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিরোধ করতে পারে যা অন্যদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং ব্যক্তিদের কাছ থেকে এমন খিদমত ও সহযোগিতা লাভ করতে পারে যা সমাগ্রিকভাবে গোটা মানব সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য প্রয়োজন।

এই সেই স্থান যেখানে পৌঁছে সামাজিক সুবিচারের প্রশ্ন দেখা দেয় এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির পরস্পর বিরোধী দাবিসমূহ একটি গ্রন্থির আকার ধারণ করে। একদিকে মানব কল্যাণের দাবি হচ্ছে হলো, সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকতে হবে যেনো সে নিজের যোগ্যতা ও পছন্দ মাফিক নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে। অনুরূপভাবে পরিবার, বংশ, গোত্র, ভ্রাতৃবন্ধন এবং অন্যান্য সংস্থা যেনো নিজেদের চেয়ে বৃহত্তর পরিধির মধ্যে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে যা তাদের কর্মক্ষেত্রের সীমার মধ্যে তাদের অর্জিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অপর দিকে মানব কল্যাণেরই দাবি হচ্ছে ব্যক্তির উপর পরিবারের, পরিবারের উপর বংশের, ভ্রাতৃবন্ধনের এবং সমস্ত লোকের ও ছোট সংস্থার উপর বড় সংস্থার এবং বৃহৎ পরিসরে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকতে হবে, যেনো কেউ নিজের সীমা অতিক্রম করে অন্যদের উপর যুলুম নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি করতে না পারে। আরো সামনে অগ্রসর হয়ে গোটা মানব জাতির ক্ষেত্রেও এই একই প্রশ্ন দেখা দেয়। একদিকে প্রতিটি জাতি এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বজায় থাকার প্রয়োজন রয়েছে, অপরদিকে কোনো উচ্চতর ক্ষমতা সম্পন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার বর্তমান থাকারও প্রয়োজন রয়েছে যাতে কোনো জাতি বা রাষ্ট্র সীমা লংঘন করতে না পারে।

এখন সামাজিক সুবিচার যে জিনিসের নাম তা হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, বংশ, ভ্রাতৃসমাজ এবং জাতির মধ্যে প্রত্যেকের যুক্তিসংগত পরিমাণ স্বাধীনতাও থাকতে হবে এবং সাথে সাথে যুলুম, শত্রুতা ও সীমা লংঘনকে প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাসমূহের হাতে ব্যক্তিদের উপর এবং একে অপরের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারও থাকতে হবে। যাতে করে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার কাছ থেকে জনকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় সেবাও আদায় করা যেতে পারে।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের ত্রুটি

এই সত্যকে যে ব্যক্তি ভালোভাবে হৃদয়ংগম করে নেবে সে প্রথম দৃষ্টিতেই জানতে পারবে যে, ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি স্বাধীনতা, উদার নৈতিকতা, পুঁজিবাদ এবং ধর্মহীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে ভাবে সামাজিক সুবিচারের পরিপন্থী ছিলো ঠিক তদ্রূপ বরং তার চেয়েও অধিক পরিমাণে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সামাজিক সুবিচারের সম্পূর্ণ বিরোধী, যা কার্লমার্কস এবং এঞ্জেলসের দর্শনের অনুসরণে গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রথমোক্ত ব্যবস্থার ত্রুটি হচ্ছে হলো, সে ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত সীমার অধিক স্বাধীনতা দান করে পরিবার, বংশ, প্রতিবেশী, সমাজ এবং জাতির উপর বাড়াবাড়ি করার অবাধ সুযোগ দিয়ে দিয়েছে এবং তার কাছ থেকে সামাজিক কল্যাণের জন্য সেবা গ্রহণ করার জন্য সমাজের নিয়ন্ত্রক শক্তিকে খুবই ঢিলা করে দিয়েছে। আর দ্বিতীয় ব্যবস্থাটির ত্রুটি হচ্ছে এই যে, তা রাষ্ট্রকে সীমাতিরিক্ত শক্তিশালী করে ব্যক্তি, পরিবার, বংশ ও ভ্রাতৃবন্ধনের স্বাধীনতার প্রায় সবটুকুই হরণ করে নেয় এবং ব্যক্তির কাছ থেকে সমষ্টির জন্য সেবা আদায় করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে এতো অধিক ক্ষমতা দেয় যে, ব্যক্তি প্রাণবন্ত মানুষ হওয়ার পরিবর্তে একটি মেশিনের প্রাণহীন অংশে পরিণত হয়। কেউ যদি বলে এই মতবাদের মাধ্যমে সামাজিক সুবিচার কায়েম হতে পারে, সে ডাহা মিথ্যা কথা বলে।

সামাজিক নির্যাতনের নিকৃষ্টমত রূপ সমাজতন্ত্র

এটা মূলত সামাজিক যুলুম ও নির্যাতনের সেই নিকৃষ্টতম রূপ যা কখনো কোনো নমরূদ, কোনো ফিরাউন এবং কোনো চেংগিজ খানের যুগেও ছিলোনা। শেষ পর্যন্ত এই জিনিসিটিকে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি "সামাজিক সুবিচার" নামে ব্যাখ্যা করতে পারে যে, এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তি বসে নিজেদের একটি সামাজিক দর্শন রচনা করে নেবে, অতপর রাষ্ট্রের সীমাহীন ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে এই দর্শনকে জোরপূর্বক পূরা দেশের কোটি কোটি নাগরিকের উপর চাপিয়ে দেবে? জনগণের সম্পদ আত্মসাত করবে, জমাজম দখল করে নেবে, শিল্প কারখানা জাতীয় মালিকানায় নিয়ে নেবে এবং গোটা দেশটাকে এমন একটি জেলখানায় পরিণত করবে যার মধ্যে সমালোচনা, ফরিয়াদ, অভিযোগ ও সাহায্য প্রার্থনা করার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে ? দেশের মধ্যে কোনো দল থাকবেনা, কোনো সংগঠন থাকবেনা, কোনো প্লাটফরম থাকবেনা যেখানে লোকেরা মুখ খুলতে পারবে, কোনো প্রেস থাকবেনা যেখানে লোকেরা মত প্রকাশের সুযোগ পাবে এবং কোনো বিচারালয় থাকবেনা ইনসাফ পাবার আশায় যার দরজার কড়া নাড়া যাবে। গোয়েন্দাগিরির জাল ব্যাপকভাবে বিস্তার করে দেয়া হবে যাতে প্রতিটি ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ভয় করবে যে, হয়তো এও গোয়েন্দা বিভাগের লোক। এমনকি নিজের ঘরের মধ্যেও মুখ খোলার সময় কোনো ব্যক্তি চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেবে যে, কোনো কান তার কথা শুনার জন্য এবং কোনো জবান তার কথা সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য নিকটে কোথাও লুকিয়ে নেই তো? তাছাড়া গণতন্ত্রের ধোঁকা দেয়ার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করানো হবে, কিন্তু সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়োজিত হবে যাতে এই দর্শন রচনাকারীদের সাথে দ্বিমত পোষণকারী এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে না

পারে এবং এমন কোনো ব্যক্তিও যেনো তাতে প্রবেশ করতে না পারে যার স্বতন্ত্র মত রয়েছে এবং যে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিক্রি করতে প্রস্তুত নয়।

যদি ধরেও নেয়া যায় যে, এই পন্থায় আর্থিক সমবন্টন হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আজ পর্যন্ত কোনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তা করতে সক্ষম হয়নি। তারপরও কি আর্থিক সমতার নামই কেবল সামাজিক সুবিচার? আমি এ প্রশ্ন তুলছি না যে, এই ব্যবস্থায় শাসক এবং শাসিতের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য আছে কি না? আমি এ প্রশ্নও তুলছি না যে, এই ব্যবস্থায় ডিকটেটর এবং তার অধীন একজন কৃষকের জীবন যাত্রার মধ্যে সমতা আছে কি না? আমি কেবল এই প্রশ্ন করছি যে, বাস্তবিকই যদি তাদের মধ্যে পূর্ণ আর্থিক সমতা কায়েম হয়েও থাকে তাহলে এরই নাম কি সামাজিক সুবিচার হবে? এটা কি ধরনের সামাজিক সুবিচার যে, এক ডিকটেটর ও তার সাংগপাংগরা যে দর্শন রচনা করেছে তা পুলিশ বাহিনী, সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা ব্যবস্থার সহায়তায় জাতির ঘাড়ে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে এবং জাতির কোনো ব্যক্তির এই দর্শনের উপর, অথবা তা কার্যকর করার কোনো ক্ষুদ্রতর পদক্ষেপের বিরুদ্ধেও মুখ দিয়ে একটি বাক্যও বের করার স্বাধীনতা থাকবেনা? এটা কি ধরনের সামাজিক সুবিচার যে, এ ডিকটেটর ও তার মুষ্টিমেয় সাথী নিজেদের দর্শনের প্রচার ও প্রসারের জন্য গোটা দেশের উপায় উপকরণ ব্যবহার এবং যে কোনো ধরনের সংগঠন ও সংস্থা কায়েম করার অধিকার ভোগ করবে, কিন্তু তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণকারী দুই ব্যক্তিও একত্র হয়ে কোনো সংগঠন কায়েম করতে পারবেনা, কোনো জনসমাবেশে ভাষণ দিতে পারবেনা এবং কোনো প্রচার মাধ্যমে একটি শব্দও প্রচার করতে পারবেনা? এর নাম কি সামাজিক সুবিচার যে, গোটা দেশের জমির এবং কলকারখানার মালিকদের বেদখল করে দিয়ে একজন মাত্র জমিদার এবং একজন মাত্র শিল্পপতি থাকবে যার নাম হচ্ছে রাষ্ট্র? আর সেই রাষ্ট্র থাকবে হাতে গোনা কয়েক ব্যক্তির কব্জায় এবং এই লোকগুলো এমন সব কর্মপন্থা গ্রহণ করবে যার ফলে গোটা জাতি সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়বে এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব তাদের দখল থেকে অন্যদের হাতে চলে যাওয়াটা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে যাবে? শুধু পেটের নাম যদি মানুষ না হয়ে থাকে এবং মানবজীবন শুধু অর্থনীতি পর্যন্ত সীমিত না হয়ে থাকে তাহলে কেবল আর্থিক সমতাকে কি করে সুবিচার বলা যেতে পারে? জীবনের প্রতিটি বিভাগে যুলুম নির্যাতন কায়েম করে, মানবতার প্রতিটি গতিকে প্রতিহত করে শুধু আর্থিক সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে জনগণকে যদি এক সমান করেও দেয়া হয় এবং স্বয়ং ডিকটেটর এবং তার সাংগপাংগরাও নিজেদের জীবনযাত্রায় জনগণের সমপর্যায়ে নেমে আসে তবুও এই বিরাট যুলুমের মাধ্যমে এই সমতা প্রতিষ্ঠা করা সামাজিক সুবিচার বলে আখ্যায়িত হতে পারেনা। বরং এটা আমি পূর্বেও যেমন বলে এসেছি সেই নিকৃষ্টতম সামাজিক নির্যাতন যার সাথে মানবেতিহাস ইতিপূর্বে কখনো সাক্ষাত লাভ করেনি।

ইসলামে সামাজিক সুবিচারের ধারণা

এবার আমি আপনাদের বলবো, 'ইসলাম' যার অপর নাম 'সুবিচার' তা কি? কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মানব জীবনের জন্য ন্যায় ইনসাফের কোনো দর্শন রচনা

করবে, তার প্রতিষ্ঠার জন্য বসে বসে কোনো পন্থা উদ্ভাবন করবে, জোরপূর্বক জনগণের উপর তা চাপিয়ে দেবে আর যে কোনো প্রতিবাদকারীর কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেবে এরূপ করার কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তো দূরের কথা স্বয়ং মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও এরূপ করার কোনো অধিকার ছিলোনা। কেবল আল্লাহ্ তায়ালারই এই অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে যে, মানুষ বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর সামনে মস্তক অবনত করে দেবে। স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর হুকুমের অধীন ছিলেন। তাঁর (নবীর) নির্দেশের আনুগত্য করা কেবল এজন্য ফরয ছিলো যে, তিনি খোদার পক্ষ থেকেই নির্দেশ দিতেন, মাআযাল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে কোনো দর্শন রচনা করে নিয়ে আসতেননা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং রসূলের খলীফাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেবল শরীয়তে ইলাহিয়াই সমালোচনার উর্ধ্বে ছিলো। এরপর প্রতিটি ব্যক্তিরই যে কোনো ব্যাপারে মুখ খোলার পূর্ণ অধিকার ছিলো।

ব্যক্তি স্বাধীনতার সীমা

আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই ইসলামে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য কোন্ কাজ হারাম যা থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে এবং কোন্ কোন্ জিনিস ফরয যা তাকে অবশ্যই পালন করতে হবে, তা আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অন্যদের উপর তার কি কি অধিকার রয়েছে এবং তার উপর অন্যদের কি কি অধিকার রয়েছে, কি উপায় উপকরণের মাধ্যমে কোন্ সম্পদের মালিকানা তার হস্তগত হওয়া জায়েয এবং এমন কি কি উপায় উপাদান রয়েছে যার মাধ্যমে কোনো সম্পদের মালিকানা হস্তগত হলে তা জায়েয হবেনা, ব্যক্তির কল্যাণের জন্য সমষ্টির এবং সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যক্তির কি দায়িত্ব রয়েছে, ব্যক্তির উন্নতির জন্য বংশ, পরিবার, গোত্র এবং গোটা জাতির উপর কি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যায় এবং কি করা অত্যাবশ্যকীয় করে দেয়া যায়, এসব কিছুই কিতাব ও সুন্নাহ্র চিরস্থায়ী সংবিধানে বর্তমান রয়েছে যার উপর হস্তক্ষেপ করার এবং যাতে সংযোজন ও সংকোচন করার অধিকার কারো নেই। এই সংবিধানের আলোকে কোনো লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে গন্ডি নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে তা হরণ করে নেয়ার অধিকার কারো নেই। আয় উপার্জনের যেসব উপায় এবং তা ব্যয়ের যেসব পন্থা হারাম করা হয়েছে সে তার কাছেও ঘেঁষতে পারবেনা। যদি সে ঐ নিষিদ্ধ পথে পা বাড়ায় তাহলে ইসলামী আইন তাকে শাস্তির যোগ্য মনে করে। কিন্তু যেসব উপায় ও পন্থা বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে তার মাধ্যমে অর্জিত মালিকানার উপর তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকবে এবং ব্যয়ের যেসব খাত বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে তা থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারবেনা। অনুরূপভাবে সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যক্তির উপর যেসব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা পালন করতে সে বাধ্য। কিন্তু এর অধিক বোঝা তার উপর চাপানো যাবেনা। তবে সে যদি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত কিছু করতে চায় তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। সমষ্টি এবং রাষ্ট্রের অবস্থাও তদ্রূপ। তার উপর ব্যক্তির যে

অধিকার রয়েছে তা ব্যক্তিকে পৌঁছিয়ে দেয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক, যেভাবে সমষ্টি এবং রাষ্ট্র নিজ নিজ অধিকার তার কাছ থেকে আদায় করে নেয়ার এখতিয়ার রাখে। এই চিরস্থায়ী সংবিধানকে যদি কার্যত বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে বাঞ্ছিত সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যার পর আর কোনো জিনিসের দাবি অবশিষ্ট থাকেনা। এই সংবিধান যতক্ষণ বর্তমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি যতোই চেষ্টা করুক না কেন মুসলমানদের কখনো এই ধোঁকায় ফেলতে পারবেনা যে, সে কোথাও থেকে যে সমাজতন্ত্র ধার করে নিয়ে এসেছে সেটাই খাঁটি ইসলাম।

ইসলামের এই চিরস্থায়ী সংবিধানে ব্যক্তি এবং সমষ্টির মধ্যে এমন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যাতে সমষ্টির স্বার্থ ক্ষুন্ন করার কোনো অধিকার ব্যক্তিকে দেয়া হয়নি এবং সমষ্টিকেও এমন কোনো এখতিয়ার দেয়া হয়নি যার মাধ্যমে সে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন ও এর পরিপোষণের জন্য তার প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা হরণ করতে পারে।

সম্পদ হস্তান্তরের শর্তসমূহ

ইসলাম কোনো ব্যক্তির হাতে সম্পদ আসার মাত্র তিনটি পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। উত্তরাধিকার, দান এবং উপার্জন। কোনো সম্পদের বৈধ মালিকের কাছ থেকে ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক কোনো ওয়ারিস যে সম্পদ লাভ করে থাকে কেবল এই ধরনের উত্তরাধিকারই গ্রহণযোগ্য। কোনো সম্পদের বৈধ মালিক শরীয়তের সীমার মধ্যে যে দান বা উপঢৌকন দিয়ে থাকে কেবল তাই বিবেচনাযোগ্য। এই দান যদি কোনো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে এটা কেবল এমন অবস্থাই জায়েয হবে যখন তা কোনো বিশেষ খিদমতের জন্য অথবা সমষ্টির স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানা থেকে ন্যায়ানুগ পন্থায় দেয়া হয়। অনন্তর এই ধরনের দান করার অধিকার কেবল এমন রাষ্ট্রেরই রয়েছে যা শরীয়ত ভিত্তিক সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় পন্থায় পরিচালিত হয় এবং যার কাছে কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার জনগণের রয়েছে। এখন থাকলো উপার্জনের ব্যাপার, যে উপার্জন হারাম পন্থায় হয়নি ইসলাম কেবল তারই স্বীকৃতি দেয়। চুরি, আত্মসাত, ওজনে কম বেশী, আমানত আত্মসাত, ঘুষ, বেশ্যাবৃত্তি, মজুতদারী (নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য মজুত করে রাখা) সূদ, জুয়া, প্রতারণাপূর্ণ কারবার, নেশা জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা এবং নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা বিস্তারকারী ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন করা ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। এসব সীমারেখা বজায় রেখে কারো হাতে যে সম্পদ এসে যায় সে তার বৈধ মালিক, চাই তা বেশী হোক অথবা কম। এ ধরনের মালিকানার জন্য কোনো নিম্নতম সীমাও নির্ধারণ করা যেতে পারেনা, আর না উচ্চতম সীমা। পরিমাণ এই সীমার কম হওয়াতে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে এনে তা বৃদ্ধি করে দেয়াও জায়েয নয়, আর নির্দিষ্ট সীমার অধিক পরিমাণ হয়ে গেলে তা জোরপূর্বক ছিনিয়েও নেয়া যাবেনা। অবশ্য এই বৈধ সীমা অতিক্রম করে যে সম্পদ অর্জিত হয়েছে তার সম্পর্কে মুসলমানদের এই প্রশ্ন তোলার অধিকার রয়েছে, "মিন আইনা লাকা হাযা" এ সম্পদ তুমি কোথায় পেলে? এই ধরনের সম্পদের ক্ষেত্রে প্রথমে আইনানুগ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। অতপর যদি প্রমাণ

হয়ে যায় যে, তা বৈধ পন্থায় উপার্জিত হয়নি তাহলে এটা বাজেয়াপ্ত করার পূর্ণ অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের রয়েছে।

সম্পদ ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ

বৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিকে অবাধ সুযোগ দেয়া হয়নি। বরং এখানেও কিছু আইনগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। যাতে কোনো ব্যক্তি এমন পথে তা ব্যয় করতে না পারে যা সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, অথবা তার মধ্যে স্বয়ং সম্পদের মালিকের দীনি এবং নৈতিক ক্ষতি বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামে কোনো ব্যক্তি নিজের ধন সম্পদ পাপ কাজে ব্যয় করতে পারেনা। মদপান এবং জুয়া খেলার দরজা তার জন্য বন্ধ। যেনা ব্যভিচারের দরজাও তার জন্য রুদ্ধ। ইসলাম স্বাধীন মানুষকে ধরে নিয়ে গোলাম বাঁদীতে পরিণত করা এবং তার ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার কাউকে দেয়না এবং তাদের ক্রয় করে সম্পদশালী লোকদের ঘর বোঝাই করার অধিকারও দেয়না। অপচয় এবং সীমাতিরিক্ত ভোগ বিলাসের উপরও ইসলাম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ব্যক্তির ভোগ বিলাসের উপরও ইসলাম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। নিজে ভোগ বিলাসে ডুবে থাকবে আর প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটাবে ইসলাম তা মোটেই জায়েয রাখেনি। ইসলাম ব্যক্তিকে কেবল শরীয়ত সম্মত এবং ন্যায়ানুগ পন্থায়ই সম্পদের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার অধিকার দান করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের মাধ্যমে যদি কেউ আরো অধিক সম্পদ আয় করার জন্য তা ব্যবহার করতে চায় তাহলে সে সম্পদ অর্জনের বৈধ পন্থাই অবলম্বন করতে বাধ্য। উপার্জনের শরীয়ত সম্মত পন্থার বাইরে সে যেতে পারেনা।

সামাজিক সেবা

যে ব্যক্তির কাছে নেসাবের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে, সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে ইসলাম তার উপর যাকাত ধার্য করে। অনন্তর সে ব্যবসায়িক পণ্য, জমির ফসল, গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু এবং আরো অন্যান্য সম্পদের উপর নির্দিষ্ট হারে যাকাত ধার্য করে। আপনি দুনিয়ার কোনো একটি দেশ বেছে নিন এবং হিসেব করে দেখুন, সেখানে যদি শরীয়তের নীতি অনুযায়ী নিয়মিত যাকাত আদায় করা হয় এবং কুরআন নির্ধারিত খাতসমূহে তা বন্টন করা হয় তাহলে কয়েক বছর পরই সেখানে আর এমন কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবেনা যে জীবন ধারণের উপকরণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে।

এরপরও কোনো ব্যক্তির কাছে যে সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকে তার মৃত্যুর সাথে সাথে ইসলাম তা তার ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করে দেয়। যাতে সম্পদের এই স্তূপ একটি স্থায়ী স্তূপে পরিণত হয়ে থাকতে না পারে।

যুলুমের মূলোৎপাটন

তাছাড়া ইসলাম যদিও এটাই পছন্দ করে যে, জমির মালিক এবং শ্রমিক অথবা কারখানার মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যকার ব্যাপারগুলো সন্তোষের ভিত্তিতে ন্যায়ানুগ পন্থায় সমাধান হোক এবং আইনের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন না হোক, কিন্তু যেখানেই এই ব্যাপারে যুলুম চলছে, সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকার রাখে এবং আইনের মাধ্যমে ইনসাফের সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারে।

জনস্বার্থের জন্য জাতীয় মালিকানার সীমা

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা ইসলাম হারাম করেনি। যদি কোনো শিল্প অথবা ব্যবসা এমন হয় যে, তা জনস্বার্থের জন্য জরুরী বটে কিন্তু ব্যক্তি মালিকানায় তা পরিচালনা করতে কেউ প্রস্তুত নয় অথবা ব্যক্তি মালিকানায় তা পরিচালিত হওয়াটা সমষ্টিগত স্বার্থের পরিপন্থী, তাহলে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা যেতে পারে। তাছাড়া কোনো শিল্প অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি কতিপয় ব্যক্তির মালিকানায় এমন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় যা সমষ্টিগত স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর, এক্ষেত্রে সরকার মালিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে তা নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারে এবং অন্য কোনো পন্থায় তা পরিচালনার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু ইসলাম এটাকে একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেনা যে, সম্পদ সৃষ্টির যাবতীয় উপায় উপকরণ সরকারী মালিকানায় থাকবে এবং রাষ্ট্রই হবে একক শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং একচ্ছত্র মালিক।

বাইতুলমাল ব্যয়ের শর্তাবলী

বাইতুলমাল (ট্রেজারী) সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, তা আল্লাহ্ এবং মুসলিম জনগণের সম্পদ এবং তা ব্যয় করার মালিকানা স্বত্ব কারো নেই। মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়ের মতো বাইতুল মালের ব্যবস্থাপনাও জাতি অথবা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরামর্শ অনুযায়ী হতে হবে। যার কাছ থেকেই কিছু নেয়া হবে এবং যে খাতেই সম্পদ ব্যয় করা হবে তা অবশ্যই শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় হতে হবে এবং এ সম্পর্কে হিসেব চাওয়ার পূর্ণ অধিকার জনগণের থাকবে।

একটি প্রশ্ন

এই আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমি প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তির সামনে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই। কেবল 'অর্থনৈতিক সুবিচারের' নামই যদি 'সামাজিক সুবিচার' হয়ে থাকে, তাহলে ইসলাম যে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে তা কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? এরপরও কি এমন কোনো প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে যার জন্য সমগ্র জাতির স্বাধীনতা হরণ করা, তাদের ধন সম্পদ হরণ করা এবং গোটা জাতিকে মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির গোলামে পরিণত করাই অপরিহার্য হয়ে পড়বে? আমরা মুসলমানরা আমাদের দেশসমূহে ইসলামী সংবিধান অনুযায়ী শরীয়ত ভিত্তিক খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবো এবং সেখানে কাটছাট ব্যতিরেকেই আল্লাহ্‌র দেয়া শরীয়তকে কোনো সংযোজন সংকোচন ছাড়াই কার্যকর করবো এ পথে আমাদের জন্য শেষ পর্যন্ত কি প্রতিবন্ধক থাকতে পারে? যেদিনই আমরা এটা করতে পারবো, সেদিন কেবল সমাজতন্ত্র থেকে ফয়েয গ্রহণ করার প্রয়োজনীতাই শেষ হয়ে যাবেনা বরং সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের জনগণ আমাদের জীবন ব্যবস্থা দেখে অনুভব করতে থাকবে, যে আলোর অভাবে তারা অন্ধকারে সাঁতার কাটছে তা তাদের চোখের সামনেই বর্তমান রয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান নীতিমালা
(কুরআনের আলোকে)

১ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

২ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি

৩ পরামর্শ বা শূরা

৪ আদল ও ইহসান

৫ নেতৃত্ব নির্বাচনের মূলনীতি

৬ প্রতিরক্ষা এবং যুদ্ধ ও সন্ধির মূলনীতি

৭ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষানীতির সাধারণ মূলনীতি

৮ নাগরিকত্ব ও পররাষ্ট্রনীতি

এ খন্ডের শেষ নিবন্ধটির শিরোনাম হলো "ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান নীতিমালা"। এ বিষয়টি সংকলিত হয়েছে মাওলানার বিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে প্রদত্ত বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যামূলক টীকার সমন্বয়ে। মাওলানার এ তাফসীর আধুনিককালের ইসলামী সাহিত্য সম্ভারের শিরমনি। প্রথম খন্ডে আমরা এ তাফসীরের টীকা দিয়েই 'ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন' অংশটি উপস্থাপন করেছি। এখন সে তাফসীরের টীকা দিয়েই ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যব্যবস্থা ও তার পলিসির প্রধান প্রধান নীতিমালা উপস্থাপন করছি। এখানে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সর্বাংগিনতার সাথে সেই সব নীতিমালা উল্লেখ হয়েছে, যেগুলোর ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র আর্থ রাজনৈতিক এবং শিক্ষা ও সামাজিক পলিসি প্রণয়ন করবে। এখানে উল্লেখিত প্রতিটি মূলনীতিই স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিকারী। এগুলো কার্যকর করার মাধ্যমে সুন্দরতম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, আর এটাই ইসলামের কাম্য। যাতে করে মানুষ পৃথিবীতে এমনভাবে জীবন-যাপন করতে সক্ষম হয় যে, এ পৃথিবীতেও থাকবে তারা শান্তিতে ও নিরাপদে আর পরকালের জীবনেও থাকবে অতীব সুখে।

আয়াতগুলোর অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা স্বয়ং মাওলানার লিখিত। বক্তব্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার জন্যেই কেবল সংকলক মাঝে মাঝে দু'একটি বাক্য সংযোজন করে দিয়েছেন। — **সংকলক**

১. রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

কুরআনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো, সততা, সুবিচার ও আল্লাহ্‌র আইনের প্রতিষ্ঠা ঃ

ক. "এরা হলো সেসব লোক, যাদেরকে আমরা পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত পরিশোধ করবে, সৎ কর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কর্মে বাঁধা দেবে। সকল কাজের পরিণতি আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারভুক্ত।" (সূরা আল হজ্জ ঃ ৪১)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী এবং তাঁর সাহায্য ও সহায়তা লাভের অধিকারী লোকদের গুণাবলী হচ্ছে এই যে, যদি দুনিয়ায় তাদের রাষ্ট্র ও শাসন ক্ষমতা দান করা হয় তাহলে তারা ব্যক্তিগত জীবনে ফাসেকী, দুষ্কৃতি, অহংকার ও আত্মম্ভরিতার শিকার হবার পরিবর্তে নামাজ কায়েম করবে। তাদের ধন সম্পদ বিলাসিতা ও প্রবৃত্তি পূজার পরিবর্তে যাকাত দানে ব্যায়িত হবে। তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র সৎকাজকে দাবিয়ে দেবার পরিবর্তে তাকে বিকশিত ও সম্প্রসারিত করার দায়িত্ব পালন করবে। তাদের শক্তি অসৎকাজকে ছড়াবার পরিবর্তে দমন করার কাজে ব্যবহৃত হবে। একটি বাক্যের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য এবং তার কর্মী ও কর্মকর্তাদের বৈশিষ্টের নির্যাস বের করে দেয়া হয়েছে। কেউ যদি বুঝতে চায় ইসলামী রাষ্ট্র আসলে কোন্ জিনিসের নাম, তাহলে এ একটি বাক্য থেকেই তা বুঝে নিতে পারে।

এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব হলো এই যে, তাদেরকে গোটা মানবতার জন্য সত্য কল্যাণ ও ন্যায়ের আহবায়ক বানানো হয়েছে। তাকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে হবেঃ

খ. "আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি 'মধ্যপন্থী' উম্মতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের ওপর সাক্ষী হতে পারো এবং রসূল হতে পারেন তোমাদের ওপর সাক্ষী। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩)

এটি হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের নেতৃত্বের ঘোষণাবাণী। 'এভাবেই' শব্দটির সাহায্যে দুদিকে ইংগিত করা হয়েছে। একঃ আল্লাহ্‌র পথ প্রদর্শনের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। যার ফলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যকারীরা সত্য সরল পথের সন্ধান পেয়েছে এবং তারা উন্নতি করতে করতে এমন একটি মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে যেখানে তাদেরকে 'মধ্যপন্থী' উম্মত গণ্য করা হয়েছে। দুইঃ এ সাথে কিব্‌লাহ পরিবর্তনের দিকেও ইংগিত করা হয়েছে।

অর্থাৎ নির্বোধরা একদিক থেকে আর এদিকে মুখ ফিরানো মনে করছে। অথচ বাইতুল মাকদিস থেকে কাবার দিকে মুখ ফিরানোর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলকে বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব পদ থেকে যথা নিয়মে হটিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে সে পদে বসিয়ে দিলেন।

'মধ্যপন্থী উম্মত' শব্দটি অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্যের অধিকারী। এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটি উৎকৃষ্ট ও উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন দল, যারা নিজেরা ইনসাফ, ন্যায় নিষ্ঠা ও ভারসাম্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, দুনিয়ার জাতিদের মধ্যে যারা কেন্দ্রীয় আসন লাভের যোগ্যতা রাখে, সত্য ও সততার ভিত্তিতে সবার সাথে যাদের সম্পর্ক সমান এবং কারোর সাথে যাদের কোনো অবৈধ ও অন্যায় সম্পর্ক নেই।

বলা হয়েছে, তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মতে পরিণত করার কারণ হচ্ছে, "তোমরা লোকদের ওপর সাক্ষী হবে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন।" এ বক্তব্যের অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে আখিরাতে যখন সমগ্র জাতিকে একত্র করে তাদের হিসেব নেয়া হবে, তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য দেবেন যে, সুস্থ ও সঠিক চিন্তা এবং সৎ কাজ ও সুবিচারের যে শিক্ষা দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল তা তিনি তোমাদের কাছে হুবহু এবং পূরোপূরি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন আর বাস্তবে সেই অনুযায়ী নিজে কাজ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে সাধারণ মানুষেদের ব্যাপারে তোমাদের এই মর্মে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রসূল তোমাদের কাছে যা কিছু পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন তা তোমরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছো। আর তিনি যা কিছু কার্যকর করে দেখিয়ে ছিলেন তা তাদের কাছে কার্যকর করে দেখাবার ব্যাপারে তোমরা মোটেই গড়িমসি করোনি।

এভাবে কোনো ব্যক্তি বা দলের এ দুনিয়ায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দানের দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়াটাই মূলত তাকে নেতৃত্বের মর্যাদার অভিষিক্ত করার নামান্তর। এর মধ্যে যেমন একদিকে মর্যদা ও সম্মান বৃদ্ধির প্রশ্ন রয়েছে তেমনি অন্যদিকে রয়েছে দায়িত্বের বিরাট বোঝা। এর সোজা অর্থ হচ্ছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্ ভীতি, সত্য সঠিক পথ অবলম্বন, সুবিচার, ন্যায় নিষ্ঠা ও সত্য প্রীতির জীবন্ত সাক্ষী হয়েছেন, তেমনিভাবে এ উম্মতকেও বিশ্ববাসীর জন্য জীবন্ত সাক্ষীতে পরিণত হতে হবে। এমন কি তাদের কথা, কর্ম, আচরণ ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয় দেখে দুনিয়াবাসী আল্লাহ্ ভীতি, সততা, ন্যায় নিষ্ঠা ও সত্য প্রীতির শিক্ষা গ্রহণ করবে। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্র হিদায়াত আমাদের কাছে পৌছাবার ব্যাপারে যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব ছিলো বড়ই কঠিন, এমনকি এ ব্যাপারে সামান্য ত্রুটি বা গাফলতি হলে আল্লাহ্র দরবারে তিনি পাকড়াও হতেন, অনুরূপভাবে এ হিদায়াতকে দুনিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবার ব্যাপারেও আমাদের ওপর কঠিন দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। যদি আমরা আল্লাহ্র আদালতে যথার্থই এ সাক্ষ্য দিতে ব্যর্থ হই যে, "তোমার রসূলের মাধ্যমে

তোমার যে হিদায়াত আমরা পেয়েছিলাম তা তোমার বান্দাদের কাছে পৌঁছাবার ব্যাপারে আমরা কোনো প্রকার ক্রটি করিনি" তাহলে আমরা সেদিন মারাত্মকভাবে পাকড়াও হয়ে যাবো। সেদিন এ নেতৃত্বের অহংকার সেখানে আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাড়াবে। আমাদের নেতৃত্বের যুগে আমাদের যথার্থ ক্রটির কারণে মানুষের চিন্তায় ও কর্মে যে সমস্ত গলদ দেখা দেবে, তার ফলে দুনিয়ায় যেসব গোমরাহী ছড়িয়ে পড়বে এবং যতো বিপর্যয় ও বিশৃংখলার রাজত্ব বিস্তৃত হবে, সেসবের জন্য অসৎ নেতৃবর্গ এবং মানুষ ও জিন শয়তানদের সাথে সাথে আমরাও পাকড়াও হবো। আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে পৃথিবীতে যখন যুলুম নির্যাতন, অন্যায়, অত্যাচার, পাপ ও ভ্রষ্টতার রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল তখন তোমরা কোথায় ছিলে?

গ. "এখন তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম দল তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য। তোমরা নেকীর হুকুম দিয়ে থাকো, দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনো।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

ইতোপূর্বে সূরা বাকারার ১৭ রুকুতে যে কথা বলা হয়েছিল এখানেও সেই একই বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের বলা হচ্ছে, নিজেদের অযোগ্যতার কারণে বনী ইসরাঈলকে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও পথ প্রদর্শনের যে আসন থেকে বিচ্যুত করা হয়েছে সেখানে এখন তোমাদেরকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ নৈতিক চরিত্র ও কার্যকলাপের দিক দিয়ে এখন তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম মানব গোষ্ঠী। সৎ ও ন্যায় নিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য যেসব গুণাবলীর প্রয়োজন সেগুলো তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে ন্যায় ও সৎবৃত্তির প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসৎবৃত্তির মূলোৎপাটন করার মনোভাব ও কর্ম স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর এই সংগে তোমরা এক ও লা শরীক আল্লাহ্‌কেও বিশ্বাসগত দিক দিয়ে এবং কার্যতও নিজেদের ইলাহ, রব ও সর্বময় প্রভু বলে স্বীকার করে নিয়েছো। কাজেই এ কাজের দায়িত্ব এখন তোমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করো এবং তোমাদের পূর্ববর্তীরা যেসব ভুল করে গেছে তা থেকে নিজেদের দূরে রাখো।

ঘ. "বনী ইসরাঈল জাতির মধ্য থেকে যারা কুফরির পথ অবলম্বন করেছে তাদের ওপর দাউদ ও মরিয়মের পুত্র ঈসার মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কারণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেছিল, তারা পরস্পরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল, তাদের গৃহীত সেই কর্মপদ্ধতি ছিলো বড়ই জঘন্য।" (সূরা মায়েদাহ ঃ ৭৮-৭৯)

প্রত্যেক জাতির বিকৃতি শুরু হয় কয়েক ব্যক্তি থেকে। জাতির সামগ্রিক বিবেক জাগ্রত থাকলে সাধারণ জনমত ঐ বিপথগামী লোকদের দমিয়ে রাখে এবং জাতি সামগ্রিকভাবে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু জাতি যদি ঐ ব্যক্তিগুলোর ব্যাপারে উপেক্ষা অবহেলা ও উদাসীনতার নীতি অবলম্বন করে এবং দুষ্কৃতকারীদের তিরস্কার ও নিন্দা করার পরিবর্তে তাদেরকে সমাজে খারাপ কাজ করার জন্য

স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়, তাহলে যে বিকৃতি প্রথমে কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো তা ধীরে ধীরে সমগ্র জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বনী ইসরাঈল জাতির বিকৃতি এভাবেই হয়েছে।

৬. "এবং তাঁর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা করো সম্ভবত তোমরা সফলকাম হতে পারবে।" (সূরা মায়েদাহ ঃ ৩৫)

এখানে 'জাহিদু' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। নিছক 'প্রচেষ্টা ও সাধনা' শব্দ দুটির মাধ্যম এর অর্থের সবটুকু প্রকাশ হয়না। আর 'মুজাহাদা' শব্দটির মধ্যে মুকাবিলার অর্থ পাওয়া যায়। এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, যেসব শক্তি আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা তোমাদের আল্লাহ্‌র মর্জি অনুসারে চলতে বাধা দেয় এবং তাঁর পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, যারা তোমাদের পুরোপুরি আল্লাহ্‌র বান্দা হিসেবে জীবন যাপন করতে দেয়না এবং নিজের বা আল্লাহ্‌র ছাড়া আর কারোর বান্দা হবার জন্য তোমাদের বাধ্য করে, তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাও। এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ওপর তোমাদের সাফল্য এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ নির্ভর করছে।

এভাবে এ আয়াতটি মুমিন বান্দাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে চতুর্থমুখী ও সর্বাত্মক লড়াই করার নির্দেশ দেয়। একদিকে আছে অভিশপ্ত ইবলীস এবং তার শয়তানী সেনাদল। অন্যদিকে আছে মানুষের নিজের নফ্‌স ও তার বিদ্রোহী প্রবৃত্তি। তৃতীয় দিকে আছে এমন এক আল্লাহ্‌ বিমুখ মানব গোষ্ঠী যাদের সাথে মানুষ সব ধরনের সামাজিক, তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সূত্রে বাঁধা। চতুর্থ দিকে আছে এমন ভ্রান্ত ধর্মীয় তামাদ্দুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যার ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ওপর এবং সত্যের আনুগত্য করার পরিবর্তে মিথ্যার আনুগত্য করতে মানুষকে বাধ্য করে। এদের সবার কৌশল বিভিন্ন কিন্তু সবার চেষ্টা একমুখী। এরা সবাই মানুষকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে নিজের অনুগত করতে চায়। বিপরীত পক্ষে, মানুষের পুরোপুরি আল্লাহ্‌র অনুগত হওয়া এবং ভিতর থেকে বাহির পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহ্‌র নির্ভেজাল বান্দায় পরিণত হয়ে যাওয়ার ওপরই তার উন্নতি ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মর্যাদায় উন্নীত হওয়া নির্ভর করে। কাজেই এ সমস্ত প্রতিবন্ধক ও সংঘর্ষশীল শক্তির বিরুদ্ধে একই সাথে সংগ্রাম মুখর হয়ে, সবসময় ও সব অবস্থায় তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থেকে এবং এ সমস্ত প্রতিবন্ধককে বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত করে আল্লাহ্‌র পথে অগ্রসর না হলে নিজের অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছানো তার পক্ষ্যে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি

ইসলামী রাষ্ট্রের রয়েছে একটি বিশিষ্ট স্বভাব প্রকৃতি। এ রাষ্ট্র একজন আহবায়ক ও সংস্কারকের ভূমিকা রাখে। এ রাষ্ট্র তার ক্ষমতার সীমার মধ্যে দীনকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা চালায়, আর বাকী বিশ্বের সকল জাতির কাছে ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছে দেয়। এ রাষ্ট্রের মর্যাদা হলো একজন প্রচারক, শিক্ষক ও সংস্কারকের মর্যাদা। এর সমস্ত কাজ ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, পরামর্শ, সহানুভূতি ও মমতার ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়া হয়, আর এটাই এ রাষ্ট্রের বিশিষ্ট স্বভাব প্রকৃতি।

ক. "যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো, তাহলে (তিনি নিজেই এমন ব্যবস্থা করতে পারতেন যাতে) এরা শির্‌ক করতোনা। তোমাকে এদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত করিনি এবং তুমি এদের অভিভাবকও নও। আর (হে ঈমানদারগণ) এরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তোমরা তাদের গালি দিয়োনা। কেননা, এরা শির্‌ক থেকে আরো খানিকটা অগ্রসর হয়ে অজ্ঞতাবশত যেনো আল্লাহ্‌কে গালি দিয়ে না বসে।" (সূরা আনয়াম ঃ ১০৭- ১০৮)

এর অর্থ হচ্ছে, তোমাকে আহবায়ক ও প্রচারকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কোতোয়ালের দায়িত্ব নয়। লোকদের সামনে এ আলোকবর্তিকাটি তুলে ধরা এবং সত্যের পূর্ণ প্রকাশের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার ত্রুটি না রাখাই তোমার কাজ। এখন কেউ এ সত্যটি গ্রহণ না করতে চাইলে না করুক। লোকদেরকে সত্যপন্থী বানিয়েই ছাড়তে হবে, এ দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়নি। তোমার নবূওয়তের প্রভাবাধীন এলাকার মধ্যে মিথ্যার অনুসারী কোনো এক ব্যক্তিও থাকতে পারবেনা, একথাটিকে তোমার দায়িত্ব ও জবাবদিহির অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কাজেই অন্ধদেরকে কিভাবে চক্ষুমান করা যায় এবং যারা চোখ খুলে দেখতে চায়না তাদেরকে কিভাবে দেখানো যায়? -এ চিন্তায় তুমি খামখা নিজের মন মস্তিষ্ককে পেরেশান করোনা। দুনিয়ায় একজনও বাতিলপন্থী থাকতে না দেয়াটা যদি যথার্থই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হতো তাহলে এ কাজটি তোমাদের মাধ্যমে করাবার আল্লাহ্‌র কি প্রয়োজন ছিলো? তার একটি মাত্র প্রাকৃতিক ইংগিতই কি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে সত্যপন্থী করার জন্য যথেষ্ট ছিলোনা। কিন্তু সেখানে এটা আদতে উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্তই নয়। সেখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের জন্য সত্য ও মিথ্যার মধ্য থেকে কোনো একটি বাছাই করে নেবার স্বাধীনতা বজায় রাখা, তারপর সত্যের আলো তার সামনে তুলে ধরে উভয়ের মধ্য থেকে কোনটিকে সে গ্রহণ করে তার পরীক্ষা করা। কাজেই যে আলো তোমাকে দেখানো

হয়েছে তার উজ্জ্বল আভায় তুমি নিজে সত্য সরল পথে চলতে থাকো এবং অন্যদেরকে সে পথে চলার জন্য আহবান জানাও। এটিই হচ্ছে তোমার জন্য সঠিক কর্মপদ্ধতি। যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরো এবং দুনিয়ার দৃষ্টিতে তারা যতোই নগন্য হোক না কেন তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরো এবং দুনিয়ার দৃষ্টিতে তারা যতোই নগণ্য হোক না কেন তাদেরকে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন করোনা। আর যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করেনি তাদের পেছনে লেগে থেকোনা। তারা যে অশুভ পরিণামের দিকে নিজেরাই চলে যেতে চায় এবং যাবার জন্য অতি মাত্রায় উদগ্রীব, সেদিকে তাদেরকে যেতে দাও।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদেরকে এ উপদেশ দেয়া হয়েছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিল, নিজেদের ইসলাম প্রচারের আবেগে তারা যেনো এমনই লাগামহীন ও বেসামাল হয়ে না পড়ে যার ফলে তর্ক বিতর্ক ও বিরোধের ব্যাপারে এগিয়ে যেতে যেতে তারা অমুসলিমদের আকীদা বিশ্বাসের কঠোর সমালোচনা করতে গিয়ে তাদের নেতৃবৃন্দ ও উপাস্যদেরকে গালিগালাজ করে না বসে। কারণ, এগুলো তাদেরকে সত্যের নিকটবর্তী করার পরিবর্তে তা থেকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

খ. "(হে নবী) এটা আল্লাহ্‌র বড়ই অনুগ্রহ যে, তোমার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়ই কোমল। নয়তো যদি তুমি রুক্ষ স্বভাবের বা কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা সবাই তোমার চারপাশ থেকে সরে যেতো। তাদের ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো এবং দীনের ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। তারপর যখন কোনো মতের ভিত্তিতে তোমরা স্থির সংকল্প হবে তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো। আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাঁর উপর ভরসা করে কাজ করে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

গ. "আর উত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করোনা। তবে তাদের মধ্যে যারা যালিম।" (সূরা আনকাবূত ঃ ৪৬)

অর্থাৎ বিতর্ক ও আলাপ আলোচনা উপযুক্ত যুক্তি প্রমাণ সহকারে, ভদ্র ও শালীন ভাষায় বুঝবার ও বুঝাবার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করতে হবে। এর ফলে যার সাথে আলোচনা হয় তার চিন্তার সংশোধন হবে। প্রচারকের চিন্তা করা উচিত, তিনি শ্রোতার হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত করে সত্য কথা তার মধ্যে বসিয়ে দেবেন এবং তাকে সঠিক পথে আনবেন। একজন পাহ্‌লোয়ানের মতো তার সাথে লড়াই করা উচিত নয়, যার উদ্দেশ্যই হয় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেয়া। বরং একজন ডাক্তারের মতো তাকে সবসময় উদ্বিগ্ন থাকতে হবে, যিনি তার রোগীর চিকিৎসা করার সময় একথাকে গুরুত্ব দেন যে, তাঁর নিজের কোনো ভুলের দরুন রোগীর রোগ যেনো আরো বেশী বেড়ে না যায় এবং সর্বাধিক কম কষ্ট সহ্য করে যাতে তাঁর রোগীর নিরাময় হওয়া সম্ভব হয় এজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আহলি কিতাবের সাথে বিতর্ক আলোচনা করার ব্যাপারে এ নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু এটা কেবলমাত্র বিশেষভাবে আহ্‌লি কিতাবদের জন্য নয় বরং দীনের প্রচারের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ নির্দেশ। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন ঃ

"আহবান করো নিজের রবের পথের দিকে প্রজ্ঞা ও উৎকৃষ্ট উপদেশের মাধ্যমে এবং লোকদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক আলোচনা করো।" (সূরা আননাহল ঃ ১২৫)

"সুকৃতি ও দুষ্কৃতি সমান নয়। (বিরোধীদের আক্রমণ) প্রতিরোধ করো উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে । তুমি দেখবে এমন এক ব্যক্তি যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিলো সে এমন হয়ে গেছে যেমন তোমার অন্তরংগ বন্ধু।" (সূরা হা-মীম আস্সাজদাহ ঃ ৩৪)

"তুমি উত্তম পদ্ধতিতে দুষ্কৃতি নির্মূল করো। আমি জানি (তোমার বিরুদ্ধে) তারা যেসব কিছু তৈরী করে।" (সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৯৬)

"ক্ষমার পথ অবলম্বন করো, ভালো কাজ করার নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলো। আর যদি (মুখে মুখে জবাব দেবার জন্য) শয়তান তোমাকে উস্কানী দেয় তাহলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাও।" (সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৯৯-২০০)

অর্থাৎ যারা যুলুমের নীতি অবলম্বন করে তাদের সাথে তাদের যুলুমের প্রকৃতি বিবেচনা করে ভিন্ন নীতিও অবলম্বন করা যেতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে, সবসময় সব অবস্থায় সব ধরনের লোকদের মুকাবিলায় নরম ও সুমিষ্ট স্বভাবের হয়ে থাকলে চলবেনা। যেনো মানুষ সত্যের আহবানের ভদ্রতাকে দুর্বলতা ও অসহায়তা মনে না করে বসে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অবশ্যই ভদ্রতা, বিনয়, শালীনতা ও যুক্তিবাদীতার শিক্ষা দেয়, কিন্তু হীনতা ও দীনতার শিক্ষা দেয়না। তাদেরকে প্রত্যেক যালিমের যুলুমের সহজ শিকারে পরিণত হবার শিক্ষা দেয়না।

ঘ. "প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ফেরাউন পৃথিবীতে বিদ্রোহ করে এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়।" (সূরা কাসাস ঃ ৪)

অর্থাৎ তার রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী আইনের চোখে দেশের সকল অধিবাসী সমান থাকেনি এবং সবাইকে সমান অধিকার দেয়াও হয়নি। বরং সে সভ্যতা সংস্কৃতি ও রাজনীতির এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যার মাধ্যমে রাজ্যের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়া হয়। একদলকে সুযোগ সুবিধা ও বিশেষ অধিকার দিয়ে শাসক দলে পরিণত করা হয় এবং অন্যদলকে অধীনে করে পদানত, পর্যুদস্ত, নিষ্পেষিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়।

এখানে কারো এ ধরনের সন্দেহ করার অবকাশ নেই যে, ইসলামী রাষ্ট্রেও তো মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে ফারাক করা হয় এবং তাদের অধিকার ও ক্ষমতাও সকল দিক দিয়ে সমান রাখা হয়নি। এ সন্দেহ এজন্য সঠিক নয় যে, ফেরাউনী বিধানে যেমন বংশ,বর্ণ, ভাষা বা শ্রেণীগত বিভেদের ওপর বৈষম্যের ভিত রাখা হয়েছে ইসলামী বিধানে ঠিক তেমনটি নয়। বরং ইসলামী বিধানে নীতি ও মতবাদের ওপর এর ভিত রাখা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অমুসলিম ও মুসলমানের মধ্যে আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রে মোটেই কোনো ফারাক নেই। সকল পার্থক্য একমাত্র রাজনৈতিক

অধিকারের ক্ষেত্রে। আর এ পার্থক্যের কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, একটি আদর্শিক রাষ্ট্রে শাসকদল একমাত্র তারাই হতে পারে যারা হবে রাষ্ট্রের মূলনীতির সমর্থক। এদলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি শামিল হতে পারে যে এ মূলনীতি মেনে নেবেনা। এ পার্থক্য ও ফেরাউনী ধরনের পার্থক্যের কোনো মিল নেই। কারণ, ফেরাউনী পার্থক্যের ভিত্তিতে পরাধীন প্রজন্মের কোনো ব্যক্তি কখনো শাসক দলে শামিল হতে পারেনা। যেখানে পরাধীন প্রজন্মের কোনো ব্যক্তি কখনো শাসক দলে শামিল হতে পারেনা। যেখানে পরাধীন প্রজন্মের লোকেরা রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার তো দূরের কথা মৌলিক মানবিক অধিকারও লাভ করেনা। এমন কি জীবিত থাকার অধিকারও তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। সেখানে কখনো পরাধীনদের জন্য কোনো অধিকারের জামানত দেয়া হয়না। সব ধরনের স্বার্থ, মুনাফা, সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদা একমাত্র শাসক সমাজের জন্য নির্দিষ্ট থাকে এবং এ বিশেষ অধিকার একমাত্র শাসক জাতির মধ্যে জন্মলাভকারী ব্যক্তিই লাভ করে।

ঙ. "হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় করো। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। তারপর তাদের দু'জনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।" (সূরা নিসা ঃ ১)

যেহেতু সামনের দিকের আয়াতগুলোতে মানুষের পারস্পারিক অধিকারের কথা আলোচনা করা হবে, বিশেষ করে পারিবারিক ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও সুগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন কানুন বর্ণনা করা হবে, তাই এভাবে ভূমিকা ফাঁদা হয়েছে, একদিকে আল্লাহ্‌কে ভয় করার ও তাঁর অসন্তোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য জোর তাকীদ করা হয়েছে এবং অন্যদিকে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয়েছে যে, একজন মানুষ থেকে সমস্ত মানুষের উৎপত্তি এবং রক্ত-মাংস ও শারীরিক উপাদানের দিক দিয়ে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অংশ।

"তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" অর্থাৎ প্রথমে এক ব্যক্তি থেকে মানব জাতির সৃষ্টি করেন। অন্যত্র কুরআন নিজেই এর ব্যাখ্যা করে বলেছে যে, সেই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। তাঁর থেকেই এ দুনিয়ায় মানব বংশ বিস্তার লাভ করে।

"সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া।" এ বিষয়টির বিস্তারিত জ্ঞান আমাদের কাছে নেই। সাধারণ ভাবে কুরআনের তাফসীরকারগণ যা বর্ণনা করেন এবং বাইবেলে যা বিবৃত হয়েছে তা হচ্ছে নিম্নরূপ, আদমের পাঁজর থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তালমুদে আর একটু বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে, ডান দিকের ত্রয়োদশ হাড় থেকে সষ্টি হয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদ এ ব্যাপারে নীরব। আর এর সপক্ষে যে হাদীসটি পেশ করা হয় তার অর্থ লোকেরা যা মনে করে নিয়েছে তা নয়। কাজেই

কথাটিকে আল্লাহ্ যেভাবে সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট রেখেছেন তেমনি রেখে এর বিস্তারিত অবস্থা জানার জন্য সময় নষ্ট না করাই ভালো।

চ. "দীনের ব্যপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬)

এখানে দীন বলতে পূর্ববর্তী আয়াত আয়াতুল কুরসীতে বর্ণিত আল্লাহ্ সম্পর্কিত আকীদা ও সেই আকীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, "ইসলাম" এর এই আকীদাগত এবং নৈতিক ও কর্মগত ব্যবস্থা কারো ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া যেতে পারেনা। যেমন কাউকে ধরে তার মাথায় জোর করে একটা বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়, এটা তেমন নয়।

উপরে উল্লোখিত আয়াত ও সেগুলোর ব্যাখ্যা থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষ ধরনের স্বভাব প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র এ প্রকৃতির অনন্য রাষ্ট্র, যে তার সর্বোচ্চ ক্ষমতাকেও দয়া, মমতা ও বন্ধুতার সাথে প্রয়োগ করে। বল প্রয়োগ এর প্রকৃতিতে নেই। কঠোরতার সাথে এর সম্পর্ক নেই। এটা হলো সেই রাষ্ট্র, যা মানবতার জন্য রহমত হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করাও এর বিশিষ্ট প্রকৃতিরই এক অনিবার্য দাবি।

৩. পরামর্শ বা শূরা

আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা ঃ

"এবং তারা নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায়।" (সূরা শূরা ঃ ৩৮)

এ বিষয়টিকে এখানে ঈমানদারদের সর্বোত্তম গুণাবলীর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে এবং সূরা আল ইমারানে (আয়াত ১৫৯) এর জন্য আদেশ করা হয়েছে। এ কারণে পরামর্শ ইসলামী জীবন প্রণালীর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। পরামর্শ ছাড়া সামষ্টিক কাজ পরিচালনা করা শুধু জাহেলী পন্থাই নয়, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। ইসলামে পরামর্শকে এই গুরুত্ব কেন দেয়া হয়েছে? এর কারণসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করলে আমাদের সামনে তিনটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় ঃ

এক. যে বিষয়টি দুই বা আরো বেশী লোকের স্বার্থের সাথে জড়িত সে ক্ষেত্রে কোনো এক ব্যক্তির নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তিদের উপেক্ষা করা যুলুম। যৌথ ব্যাপারে কারো যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার নেই। ইনসাফের দাবী হচ্ছে, কোনো বিষয়ে যতো লোকের স্বার্থ জড়িত সে ব্যাপারে তাদের সবার মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং তাতে যদি বিপুল সংখ্যক লোকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে তাদের আস্থাভাজন প্রতিনিধিদেরকে পরামর্শের মধ্যে শামিল করতে হবে।

দুই. যৌথ ব্যাপারে মানুষ স্বেচ্ছাচারিতা করার চেষ্টা করে অন্যদের অধিকার নস্যাত করে নিজের ব্যক্তি স্বার্থ লাভ করার জন্য, অথবা এর কারণ হয় সে নিজেকে বড় একটা কিছু এবং অন্যদের নগণ্য মনে করে। নৈতিক বিচারে এই দুটি জিনিসই সমপর্যায়ের হীন। মু'মিনের মধ্যে এ দুটির কোনোটিই পাওয়া যেতে পারেনা। মু'মিন কখনো স্বার্থপর হয়না। তাই সে অন্যদের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করে নিজে অন্যায় ফায়দা চাইতে পারেনা এবং অহংকারী বা আত্মপ্রশংসিতও হতে পারেনা যে নিজেকেই শুধু মহাজ্ঞানী ও সবজান্তা মনে করবে।

তিন. যেসব বিষয় অন্যদের অধিকার ও স্বার্থের সাথে জড়িত সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটা বড় দায়িত্ব। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং একথা জানে যে এর জন্য তাকে তার প্রভুর কাছে কতো কঠিন জবাবদিহি করতে হবে সে কখনো একা এই

গুরুভার নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেবার দুঃসাহস করতে পারেনা । এ ধরনের দুঃসাহস কেবল তারাই করে যারা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে নির্ভিক এবং আখিরাত সম্পর্কে চিন্তাহীন । খোদাভীরু ও আখিরাতের জবাবদিহির অনুভূতি সম্পন্ন লোক কোনো যৌথ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কিংবা তাদের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিদেরকে পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই শরীক করার চেষ্টা করবে যাতে সর্বাধিক মাত্রায় সঠিক, নিরপেক্ষ এবং ইনসাফ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এ ক্ষেত্রে যদি অজ্ঞাতসারে কোনো ত্রুটি হয়েও যায় তাহলে কোনো এক ব্যক্তির ঘাড়ে তার দায়দায়িত্ব এসে পড়বেনা।

এ তিনটি কারণ এমন, যদি তা নিয়ে কেউ গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে তাহলে অতি সহজেই সে একথা উপলব্ধি করতে পারবে যে, ইসলাম যে নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয় পরামর্শ তার অনিবার্য দাবী এবং তা এড়িয়ে চলা একটি অতি বড় চরিত্রহীনতার কাজ। ইসলাম কখনো এ ধরনের কাজের অনুমতি দিতে পারেনা। ইসলামী জীবন পদ্ধতি সমাজের ছোট বড় প্রতিটি ব্যাপারেই পরামর্শের নীতি কার্যকরী হোক তা চায়। পারিবারিক ব্যাপার হলে সে ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী পরামর্শ করে কাজ করবে এবং ছেলেমেয়ে বড় হলে তাদেরকেও পরামর্শে শরীক করতে হবে। খান্দান বা গোষ্ঠীর ব্যাপার হলে সে ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর সমস্ত বুদ্ধিমান ও বয়প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করতে হবে। যদি একটি গোত্র বা জাতিগোষ্ঠী কিংবা জনপদের বিষয়াদি হয় এবং তাতে সব মানুষের অংশগ্রহণ সম্ভব না হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পঞ্চায়েত বা সভা পালন করবে যেখানে কোনো সর্বসম্মত পন্থা অনুসারে সংশ্লিষ্ট আস্থাভাজন প্রতিনিধিরা শরীক হবে। গোটা জাতির ব্যাপার হলে তা পরিচালনার জন্য সবার ইচ্ছানুসারে তাদের নেতা নিযুক্ত হবে জাতীয় বিষয়গুলোকে সে এমন সব ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ অনুসারে পরিচালনা করবে জাতি যাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করে এবং সে ততক্ষণ পর্যন্ত নেতা থাকবে যতক্ষণ জাতি তাকে নেতা বানিয়ে রাখতে চাইবে। কোনো ঈমানদার ব্যক্তি জোরপূর্বক জাতির নেতা হওয়ার বা হয়ে থাকার আকাংখা কিংবা চেষ্টা করতে পারেনা। প্রথমে জোরপূর্বক জাতির ঘাড়ে চেপে বসা এবং পরে জবরদস্তি করে মানুষের সম্মতি আদায় করা, এমন প্রতারণাও সে করতে পারেনা। তাকে পরামর্শ দানের জন্য মানুষ স্বাধীন ইচ্ছানুসারে নিজেদের মনোনীত প্রতিনিধি নয় বরং এমন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করবে যে তার মর্জি মুতাবিক মতামত প্রকাশ করবে, এমন চক্রান্তও সে করতে পারেনা। এমন আকাংখা কেবল সে মানুষের মধ্যেই সৃষ্টি হতে পারে যার মন অসৎ উদ্দেশ্য দ্বারা কলুষিত। এই আকাংখার সাথে এর বাহ্যিক কাঠামো নির্মাণ এবং তার বাস্তব প্রাণসত্তাকে নিঃশেষ করে দেয়ার প্রচেষ্টা শুধু সে ব্যক্তিই চালাতে পারে যে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর সৃষ্টিকে ধোঁকা দিতে ভয় করেনা। অথচ না আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দেয়া সম্ভব না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষ এমন অন্ধ হতে পারে যে, প্রকাশ্য দিবালোকে কেউ ডাকাতি করছে আর মানুষ তা দেখে সরল মনে ভাবতে থাকবে যে, সে ডাকাত নয়, মানুষের সেবা করছে।

এর নিয়মটি প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে পাঁচটি জিনিস দাবী করে ঃ

এক. যৌথ বিষয়সমূহ যাদের অধিকার ও স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত তাদের মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে এবং কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারগুলো কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে বিষয়ে তাদের অবহিত রাখতে হবে। তারা যদি তাদের ব্যাপারগুলোর নেতৃত্বে কোনো ত্রুটি, অপরিপক্কতা বা দুর্বলতা দেখে তাহলে তা তুলে ধরার ও তার প্রতিবাদ করার এবং সংশোধিত হতে না দেখলে পরিচালক ও ব্যবস্থাপকদের পরিবর্তন করার অধিকার থাকতে হবে। মানুষের মুখ বন্ধ করে, হাত পা বেঁধে এবং তাদেরকে অনবহিত রেখে তাদের সামষ্টিক ব্যাপারসমূহ পরিচালনা করা সুস্পষ্ট প্রবঞ্চনা। কেউই এ কাজকে নীতির অনুসরণ বলে মানতে পারেনা।

দুই. যৌথ বিষয়সমূহ পরিচালনার দায়িত্ব যাকেই দেয়া হবে তাকে যেনো এ দায়িত্ব সবার স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে দান করা হয়। জবরদস্তি ও ভয়ভীতি দ্বারা অর্জিত কিংবা লোভ লালসা দিয়ে খরিদকৃত অথবা ধোঁকা প্রতারণা ও চক্রান্তের মাধ্যমে লুণ্ঠিত সম্মতি প্রকৃতপক্ষে কোনো সম্মতি নয়। যে সম্ভাব্য সব রকম পন্থা কাজে লাগিয়ে কোনো জাতির নেতা হয় সে সত্যিকার নেতা নয়। সত্যিকার নেতা সেই যাকে মানুষ নিজেদের পছন্দানুসারে সানন্দ চিত্তে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে।

তিন. নেতাকে পরামর্শ দানের জন্যও এমন সব লোক নিয়োগ করতে হবে যাদের প্রতি জাতির আস্থা আছে। এটা সর্বজনবিদিত যে, যারা চাপ সৃষ্টি করে কিংবা অর্থ দ্বারা খরিদ করে অথবা মিথ্যা ও চক্রান্তের সাহায্যে বা মানুষকে বিভ্রান্ত করে প্রতিনিধিত্বের স্থানটি দখল করে তাদেরকে সঠিক অর্থে আস্থাভাজন বলা যায়না।

চার. পরামর্শদাতাগণ নিজেদের জ্ঞান, ঈমান ও বিবেক অনুসারে পরামর্শ দান করবে এবং এভাবে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে। এ দিকগুলো যেখানে থাকবেনা, যেখানে পরামর্শদাতা কোনো প্রকার লোভ লালসা বা ভীতির কারণে অথবা কোনো দলাদলির মারপ্যাঁচের কারণে নিজের জ্ঞান ও বিবেকের বিরুদ্ধে মতামত পেশ করে সেখানে প্রকৃতপক্ষে হবে খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা এর অনুসরণ নয়।

পাঁচ. পরামর্শদাতাদের 'ইজমা'র (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) ভিত্তিতে যে পরামর্শ দেয়া হবে, অথবা যে সিদ্ধান্ত তাদের অধিকাংশের সমর্থন লাভ করবে তা মেনে নিতে হবে। কেননা সবার মতামত জানার পরও যদি এক ব্যক্তি অথবা একটি ছোট্ট গ্রুপকে স্বেচ্ছাচার চালানোর সুযোগ দেয়া হয় তাহলে পরামর্শ অর্থহীন হয়ে যায়। আল্লাহ্ একথা বলছেননা যে, "তাদের ব্যাপার তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়" বরং বলছেন, "তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে চলে।" শুধু পরামর্শ করলেই এ নির্দেশ পালন করা হয়না। তাই পরামর্শের ক্ষেত্রে সর্বসম্মত অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজকর্ম পরিচালনা প্রয়োজন।

ইসলামের পরামর্শ ভিত্তিক কাজ পরিচালনা নীতির এই ব্যাখ্যার সাথে সাথে এই মৌলিক কথাটির প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মুসলমানদের পারস্পরিক বিষয়সমূহ পরিচালনায় এই শূরা স্বেচ্ছাচারী এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নয়, বরং অবশ্যই সেই দীনের বিধি বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ আল্লাহ্ নিজেই যার জন্য বিধান রচনা করেছেন। সাথে সাথে তা সেই মূল নীতিরও আনুগত্য করতে বাধ্য, যাতে বলা হয়েছে "যে ব্যাপারেই তোমাদের মধ্যে মতভেদ হবে তার ফায়সালা করবেন আল্লাহ্।" এবং "তোমাদের মধ্যে যে বিরোধই বাঁধুক না কেনো সে জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরে যাও।" এই সাধারণ সূত্র অনুসারে মুসলমানরা শর'য়ী বিষয়ে মূল গ্রন্থের কোন্ অংশের কি অর্থ এবং কিভাবে তা কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করতে পারে যাতে তার মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয়। কিন্তু যে ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সে ব্যাপারে তারা নিজেরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এ উদ্দেশ্যে কোনো পরামর্শ করতে পারেনা।

৪. আদল ও ইহ্সান

"আল্লাহ্ আদল, ইহ্সান ও আত্মীয় স্বজনকে দান করার হুকুম দেন এবং অশ্লীলতা নির্লজ্জতা ও দুষ্কৃতি এবং অত্যাচার বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন।" (সূরা আননহল ঃ ৯০)

এ ছোট্ট বাক্যটিতে এমন তিনটি জিনিসের হুকুম দেয়া হয়েছে যেগুলোর ওপর সমগ্র মানব সমাজের সঠিক অবকাঠামোতে ও যথার্থ চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকা নির্ভরশীল।

প্রথম জিনিসটি হচ্ছে আদল। দু'টি স্থায়ী সত্যের সমন্বয়ে এর ধারণাটি গঠিত। এক. লোকদের মধ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সুষমতা থাকতে হবে। দুই. প্রত্যেককে নির্দ্বিধায় তার অধিকার দিতে হবে। আমাদের ভাষায় এ অর্থ প্রকাশ করার জন্য "ইনসাফ" শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ শব্দটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এ থেকে অনর্থক এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, দু' ব্যক্তির মধ্যে "নিস্ফ" "নিস্ফ" বা আধাআধির ভিত্তিতে অধিকার বন্টিত হতে হবে। তারপর এ থেকেই আদল ও ইনসাফের অর্থ মনে করা হয়েছে সাম্য ও সমান সমান ভিত্তিতে অধিকার বন্টন। এটি সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরোধী। আসলে "আদল" সমতা বা সাম্য নয়, বরং ভারসাম্য ও সমন্বয় দাবী করে। কোনো কোনো দিক দিয়ে "আদল" অবশ্যই সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাম্য চায়। যেমন নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে। কিন্তু আবার কোনো কোনো দিক দিয়ে সাম্য সম্পূর্ণ "আদল" বিরোধী। যেমন পিতা মাতা ও সন্তানদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক সাম্য এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মজীবী ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মজীবীদের মধ্যে বেতনের সাম্য। কাজেই আল্লাহ্ যে জিনিসের হুকুম দিয়েছেন তা অধিকারের মধ্যে সাম্য নয় বরং ভারসাম্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা। এ হুকুমের দাবী হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে প্রদান করতে হবে।

দ্বিতীয় জিনিসটি হচ্ছে ইহ্সান। এর অর্থ হলো, পরোপকার তথা সদাচার, ঔদার্যপূর্ণ ব্যবহার, সহানুভূতিশীল আচরণ, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, পারস্পরিক সুযোগ সুবিধা দান, একজন অপর জনের মর্যাদা রক্ষা করা, অন্যকে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দেয়া এবং নিজের অধিকার আদায়ের বেলায় কিছু কমে রাযী হয়ে যাওয়া। এ হচ্ছে আদলের অতিরিক্ত এমন একটি জিনিস যার গুরুত্ব সামষ্টিক জীবনে আদলের চাইতেও বেশী। আদল যদি হয় সমাজের বুনিয়াদ তাহলে ইহ্সান হচ্ছে তার সৌন্দর্য ও পূর্ণতা। আদল যদি সমাজকে কটুতা ও তিক্ততা থেকে বাঁচায় তাহলে ইহ্সান তার মধ্যে সমাবেশ ঘটায় মিষ্ট মধুর স্বাদের। কোনো সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বক্ষণ তার

অধিকার কড়ায় গন্ডায় মেপে মেপে আদায় করতে থাকবে এবং তারপর ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অধিকার আদায় করে নিয়েই তবে ক্ষান্ত হবে, আবার অন্যদিকে অন্যদের অধিকারের পরিমাণ কি তা জেনে নিয়ে কেবলমাত্র যতোটুকু প্রাপ্য ততোটুকুই আদায় করে দেবে, এরূপ কট্টর নীতির ভিত্তিতে আসলে কোনো সমাজ টিকে থাকতে পারেনা। এমনি ধরনের একটি শীতল ও কাঠখোট্টা সমাজে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থাকবেনা ঠিকই কিন্তু ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা, ঔদার্য, ত্যাগ, আন্তরিকতা, মহানুভবতা ও মঙ্গলাকাংখার মতো জীবনের উন্নত মূল্যবোধগুলোর সৌন্দর্য সুষমা থেকে সে বঞ্চিত থেকে যাবে। আর এগুলোই মূলত এমন সব মূল্যবোধ যা জীবনে সুন্দর আবহ ও মধুর আমেজ সৃষ্টি করে এবং সামষ্টিক মানবীয় গুণাবলীকে বিকশিত করে।

তৃতীয় যে জিনিসটির এ আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে আত্মীয় স্বজনকে দান করা এবং তাদের সাথে সদাচার করা। এটি আত্মীয় স্বজনদের সাথে ইহ্সান করার একটি বিশেষ ধরন নির্ধারণ করে। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, মানুষ নিজের আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দুঃখে ও আনন্দে তাদের সাথে শরীক হবে এবং বৈধ সীমানার মধ্যে তাদের সাহায্যকারী ও সহায়ক হবে। বরং এও এর অর্থের অন্তরভুক্ত যে, প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তি নিজের ধন সম্পদের ওপর শুধুমাত্র নিজের ও নিজের সন্তান সন্ততির অধিকার আছে বলে মনে করবেনা বরং একই সংগে নিজের আত্মীয় স্বজনদের অধিকারও স্বীকার করবে। আল্লাহ্‌র শরীয়ত প্রত্যেক পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছে যে, তাদের পরিবারের অভাবী লোকেরা যেনো অভুক্ত ও বস্ত্রহীন না থাকে। তার দৃষ্টিতে কোনো সমাজের এর চেয়ে বড় দুর্গতি আর হতেই পারেনা যে, তার মধ্যে বসবাসকারী এক ব্যক্তি প্রাচুর্যের মধ্যে অবস্থান করে বিলাসী জীবন যাপন করবে এবং তারই পরিবারের সদস্য তার নিজের জ্ঞাতি ভাইয়েরা ভাত কাপড়ের অভাবে মানবেতার জীবন যাপন করতে থাকবে। ইসলাম পরিবারকে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গণ্য করে এবং এ ক্ষেত্রে এ মূলনীতি পেশ করে যে, প্রত্যেক পরিবারের গরীব ব্যক্তিবর্গের প্রথম অধিকার বর্তায় তাদের পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর, তারপর অন্যদের ওপর তাদের অধিকার আরোপিত হয়। আর প্রত্যেক পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর প্রথম অধিকার আরোপিত হয় তাদের গরীব আত্মীয় স্বজনদের, তারপর অন্যদের অধিকার তাদের ওপর আরোপিত হয়। এ কথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাই বিভিন্ন হাদীসে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, মানুষের ওপর সর্বপ্রথম অধিকার তার পিতামাতার, তারপর স্ত্রী সন্তানদের, তারপর ভাই বোনদের, তারপর যারা তাদের পরে নিকটতর এবং তারপর যারা তাদের পরে নিকটতর। এ নীতির ভিত্তিতেই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একটি ইয়াতীম শিশুর চাচাত ভাইদেরকে তার লালন পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি অন্য একজন ইয়াতীমের পক্ষে ফায়সালা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, যদি এর কোনো দূরতম আত্মীয়ও থাকতো তাহলে আমি তার ওপর এর লালন পালনের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিতাম। অনুমান করা যেতে পারে, যে সমাজের প্রতিটি পরিবার ও ব্যক্তি (Unit) এভাবে নিজেদের

ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব নিজেরাই নিয়ে নেয় সেখানে কতোখানি অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, কেমন ধরনের সামাজিক মাধুর্য এবং কেমনতর নৈতিক ও চারিত্রিক পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

ওপরে তিনটি সৎ কাজের মুকাবিলায় আল্লাহ্ তিনটি অসৎ কাজ করতে নিষেধ করেন। এ অসৎকাজগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সমাষ্টিক পর্যায়ে সমগ্র সমাজ পরিবেশকে খারাপ করে দেয়।

প্রথম জিনিসটি হচ্ছে অশ্লীলতা নির্লজ্জতা। সব রকমের অশালীন, কদর্য ও নির্লজ্জ কাজ এর অন্তরভুক্ত। এমন প্রত্যেকটি খারাপ কাজ যা স্বভাবতই কুৎসিত, নোংরা, ঘৃণ্য ও লজ্জাকর। তাকেই বলা হয় অশ্লীলতা। যেমন কৃপণতা, ব্যভিচার, উলংগতা, সমকামিতা, মাহরাম আত্মীয়কে বিয়ে করা, চুরি, শরাব পান, ভিক্ষাবৃত্তি, গালাগালি করা, কটু কথা বলা ইত্যাদি। এভাবে সর্ব সমক্ষে বেহায়াপনা ও খারাপ কাজ করা এবং খারাপ কাজকে ছড়িয়ে দেয়াও অশ্লীলতা নির্লজ্জতার অন্তরভুক্ত। যেমন মিথ্যা প্রচারণা, মিথ্যা দোষারোপ, গোপন অপরাধ জনসমক্ষে বলে বেড়ানো, অসৎকাজের প্ররোচক গল্প, নাটক ও চলচ্চিত্র, উলংগ চিত্র, মেয়েদের সাজগোজ করে জনসমক্ষে আসা, নারী পুরুষ প্রকাশ্যে মেলামেশা এবং মঞ্চে মেয়েদের নাচগান করা ও তাদের শারীরিক অংগভংগির প্রদর্শনী করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে দুষ্কৃতি। এর অর্থ হচ্ছে এমন সব অসৎ কাজ যেগুলোকে মানুষ সাধারণভাবে খারাপ মনে করে থাকে, চিরকাল বলে আসছে এবং আল্লাহ্র সকল শরীয়ত যে কাজ করতে নিষেধ করেছে।

তৃতীয় জিনিসটি যুলুম বাড়াবাড়ি। এর মানে হচ্ছে, নিজের সীমা অতিক্রম করা এবং অন্যের অধিকার তা আল্লাহ্র হোক বা বান্দার হোক লংঘন করা ও তার ওপর হস্তক্ষেপ করা।

৫. নেতৃত্ব নির্বাচনের মূলনীতি

ইসলামী রাষ্ট্রে নেতৃত্ব নির্বাচনের নীতিও অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে ভিন্নতর। এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা, আল্লাহ্‌ভীতি ও উত্তম আচরণঃ

ক. "হে মুসলিমগণ! আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদের হাতে ফেরত দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফায়সালা করার সময় 'আদল' ও ন্যায়নীতি সহকারে ফায়সালা করো। আল্লাহ্ তোমাদের বড়ই উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করেন। আর অবশ্যি আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।" (সূরা আননিসা ঃ ৫৮)

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলরা যেসব খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে তোমরা সেগুলো থেকে দূরে থেকো। বনী ইসরাঈলদের একটি মৌলিক দোষ ছিলো এই যে, তারা নিজেদের পতনের যুগে আমানতসমূহ অর্থাৎ দায়িত্বপূর্ণ পদ, ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ পদসমূহ (Positions of trust) এমন সব লোকদের দেয়া শুরু করেছিল যারা ছিলো অযোগ্য, সংকীর্ণমনা, দুশ্চরিত্র, দুর্নীতিপরায়ণ, খিয়ানতকারী ও ব্যভিচারী। ফলে অসৎ লোকদের নেতৃত্বে সমগ্র জাতি অনাচারে লিপ্ত হয়ে গেছে। মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তোমরা এই বনী ইসরাঈলদের মতো আচরণ করোনা। বরং তোমরা যোগ্য লোকদেরকে আমানত সোপর্দ করো। অর্থাৎ আমানতের বোঝা বহন করার ক্ষমতা·যাদের আছে কেবল তাদের হাতে আমানত তুলে দিয়ো। বনী ইসরাঈলদের দ্বিতীয় বড় দুর্বলতা এই ছিলো যে, তাদের মধ্যে সুবিচার ও ন্যায়নীতির প্রাণশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থে তারা নির্দ্বিধায় ঈমান বিরোধী কাজ করে চলতো। সত্যকে জেনেও সুস্পষ্ট হঠধর্মীতায় লিপ্ত হতো। ইনসাফের গলায় ছুরি চালাতে কখনো একটুও কুণ্ঠাবোধ করতোনা। সে যুগের মুসলমানরা তাদের বেইনসাফীর তিক্ত অভিজ্ঞতা হাতে কলমে লাভ করে চলছিল। একদিকে তাদের সামনে ছিলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদের পূতপবিত্র জীবনধারা। অন্যদিকে ছিলো এমন এক জনগোষ্ঠীর জীবন যারা মূর্তিপূজা করে চলছিল। তারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো। বিমাতাদেরকেও বিয়ে করতো। উলংগ অবস্থায় কাবাঘরের চারদিকে তওয়াফ করতো। এই তথাকথিত আহ্‌লি কিতাবরা এদের মধ্য থেকে প্রথম দলটির ওপর দ্বিতীয় দলটিকে প্রাধান্য দিতো। তারা একথা বলতে একটুও লজ্জা অনুভব করতোনা যে, প্রথম দলটির তুলনায় দ্বিতীয় দলটি অধিকতর সঠিক পথে চলছে। মহান আল্লাহ্ তাদের

এই বেইনসাফির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর এবার মুসলমানদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা ওদের মতো অবিচারক হয়োনা। কারো সাথে বন্ধুতা বা শত্রুতা যাই হোক না কেন সব অবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির কথা বলবে এবং ইনসাফ ও সুবিচার সহকারে ফায়সালা করবে।

খ. "যেসব লাগামহীন লোক পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং কোনো সংস্কার সাধন করেনা তাদের আনুগত্য করোনা।" (সূরা শুয়ারা ঃ ১৫১-১৫২)

অর্থাৎ তোমাদের যেসব রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং শাসকদের নেতৃত্বে এ ভ্রান্ত বিকৃত জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে তাদের আনুগত্য পরিহার করো। এরা সব লাগাম ছাড়া। নৈতিকতার সমস্ত সীমা লংঘন করে এরা লাগামহীন পশুতে পরিণত হয়েছে। এদের দ্বারা সমাজ সভ্যতার কোনো সংস্কার হতে পারেনা। এরা যে ব্যবস্থা পরিচালনা করবে তার মধ্যে বিকৃতিই ছড়িয়ে পড়বে। তোমাদের জন্য কল্যাণের কোনো পথ যদি থাকে তাহলে তা কেবলমাত্র এই একটিই। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি করো এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আনুগত্য পরিহার করে আমার আনুগত্য করো। কারণ আমি আল্লাহ্‌র রসূল। আমার আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তোমরা পূর্ব থেকেই অবগত আছো। আমি একজন নিস্বার্থ ব্যক্তি। নিজের কোনো ব্যক্তিগত লাভের জন্য আমি এ সংস্কারমূলক কাজে হাত দেইনি। এ ছিলো হযরত স্বালেহ আলাইহিস্ সালামের ঘোষণাপত্রের সংক্ষিপ্তসার। নিজের জাতির সামনে তিনি এটি পেশ করেছিলেন। এর মধ্যে শুধু ধর্মীয় প্রচারণাই ছিলোনা বরং একই সংগে তামাদ্দুনিক ও নৈতিক সংস্কার এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের দাওয়াতও ছিলো।

গ. "এমন কোনো লোকের আনুগত্য করোনা যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির কামনা বাসনার অনুসরণ করেছে এবং যার কর্মপদ্ধতি কখনো উগ্র, কখনো উদাসীন।" (সূরা আল কাহফ ঃ ২৮)

অর্থাৎ তার কথা মেনোনা, তার সামনে মাথা নতো করোনা, তার ইচ্ছা পূর্ণ করোনা এবং তার কথায় চলোনা। এখানে আনুগত্য শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. প্রতিরক্ষা এবং যুদ্ধ ও সন্ধির মূলনীতি

ইসলামী রাষ্ট্রের একটি বুনিয়াদী পলিসি হলো, তা সর্বদিক থেকে হবে মজবুত, সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সামরিক দিক থেকেও, অর্থনৈতিক দিক থেকেও। সে যে মহান দায়িত্ব পালন করবে তা প্রবল প্রতিরক্ষা শক্তির প্রস্তুতি ছাড়া কিছুতেই পালন করা সম্ভব নয় ঃ

ক. "আর তোমরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি ও সদাপ্রস্তুত ঘোড়া তাদের মুকাবিলার জন্য যোগাড় করে রাখো। এর মাধ্যমে তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, নিজের শত্রুকে এবং অন্য এমন সব শত্রুকে যাদের তোমরা চিনোনা। কিন্তু আল্লাহ্ চিনেন।" (সূরা আল আনফাল ঃ ৬০)

এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কাছে যুদ্ধোপকরণ ও একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী (Standing Army) সর্বক্ষণ তৈরী থাকতে হবে। তাহলে প্রয়োজনের সময় সংগে সংগেই সামরিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভবপর হবে। এমন যেনো না হয়, বিপদ মাথার ওপর এসে পরার পর হতবুদ্ধি হয়ে তাড়াতাড়ি স্বেচ্ছাসেবক, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রসদপত্র যোগাড় করার চেষ্টা হবে এবং এভাবে প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন হতে হতেই শত্রু তার কাজ শেষ করে ফেলবে।

খ. "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলিবিদ্ধ করা হবে বা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে। অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় তাদের জন্য এ অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত রয়েছে আর আখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য এর চাইতেও বড় শাস্তি।" (সূরা মায়িদা ঃ ৩৩)

পৃথিবী বলতে এখানে পৃথিবীর সেই অংশ ও অঞ্চল বুঝাচ্ছে যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়েম করার দায়িত্ব ইসলামী সরকার গ্রহণ করেছে। আর আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে লড়াই করার অর্থ হচ্ছে, ইসলামী সরকার দেশে যে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন করেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা। পৃথিবীতে একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং এ জন্য তিনি নিজের রসূল পাঠিয়েছিলেন। সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে পৃথিবীতে অবস্থানকারী মানুষ, পশু, বৃক্ষ ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টি শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে, মানবতা তার প্রকৃতির কাংখিত পূর্ণতায় পৌঁছতে সক্ষম

হবে এবং পৃথিবীর সমুদয় উপায় উপকরণ এমনভাবে ব্যবহৃত হবে যার ফলে সেগুলো মানবতার ধ্বংস ও বিলুপ্তির নয় বরং তার উন্নতির সহায়ক হবে। এ ধরনের ব্যবস্থা কোনো ভূখন্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তাকে নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালানো, বা ক্ষুদ্র পরিসরে হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানি, ডাকাতি ইত্যাদির পর্যায়ে চালানো হোক অথবা আরো বড় আকারে, এ সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবস্থাকে উৎখাত করে তার জায়গায় কোনো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেই চালানো হোক না কেন, তা আসলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবেই বিবেচিত হবে। এটা ঠিক তেমনি যেমন ভারতীয় দন্ডবিধিতে কোনো ব্যক্তির ভারতে বৃটিশ সরকারের ক্ষমতা উচ্ছেদের প্রচেষ্টাকে "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" (Waging war against the king) করার অপরাধে অভিযুক্ত গণ্য করা হয়েছে- সে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোনো একজন মামূলী সিপাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু করলেও এবং সম্রাট তার নাগালের বহু দূরে অবস্থান করলেও তার অপরাধের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়না।

বিভিন্ন ধরনের শাস্তির কথা এখানে সংক্ষেপে বলে দেয়া হয়েছে, যাতে করে কাযী বা সমকালীন ইসলামী শাসক নিজের ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রত্যেক অপরাধীকে তার অপরাধের ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা প্রকাশ করা যে, ইসলামী হুকুমতের আওতায় বাস করে কোনো ব্যক্তির ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা চালানো নিকৃষ্ট ধরনের অপরাধ এবং এ জন্য তাকে উল্লেখিত চরম শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে কোন্ শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

গ. "আহলি কিতাবদের যারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান আনেনা, যা কিছু আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হারাম গণ্য করেছেন তাকে হারাম করেনা এবং সত্য দীনকে নিজেদের দীনে পরিণত করেনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের হাতে জিযিয়া দেয় ও পদানত হয়ে থাকে।" (সূরা তওবা ঃ ২৯)

আল্লাহ্ তাঁর রসূলের মাধ্যমে যে শরীয়ত নাযিল করেছেন তাকে যারা নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করেনা, এখানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

তারা ঈমান আনবে ও আল্লাহ্র সত্য দীনের অনুসারী হয়ে যাবে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য লক্ষ্য তা নয়। বরং যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছেঃ তাদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য খতম হয়ে যাবে। তারা পৃথিবীতে শাসন ও কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবেনা। বরং পৃথিবীতে মানুষের জীবন ব্যবস্থার লাগাম এবং মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করা ও তাদের নেতৃত্ব দান করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সত্যের অনুসারীদের হাতে থাকবে এবং তারা এ সত্যের অনুসারীদের অধীনে অনুগত জীবন যাপন করবে।

যিম্মীদেরকে ইসলামী শাসনের আওতায় যে নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ দান করা হবে তার বিনিময়কে জিযিয়া বলা হয়। তাছাড়া তারা যে হুকুম মেনে চলতে এবং ইসলামী শাসনের আওতাধীন বসবাস করতে রাযী হয়েছে, এটা তার একটা আলামত হিসেবেও

চিহ্নিত হবে। "নিজের হাতে জিযিয়া দেয়"-এর অর্থ হচ্ছে, সহজ সরল আনুগত্যের ভংগিতে জিযিয়া আদায় করা। আর "পদানত হয়ে থাকে" এর অর্থ, পৃথিবীতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের নয় বরং যে মুমিন ও মুসলিমরা আল্লাহ্‌র খিলাফত ও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করছে তাদের হাতে থাকবে।

প্রথম দিকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মাজূসীদের (অগ্নিউপাসক) থেকে জিযিয়া আদায় করে তাদেরকে যিম্মী করেন। এরপর সাহাবায়ে কিরাম সর্বসম্মতিক্রমে আরবের বাইরের সব জাতির ওপর সাধারণভাবে এ আদেশ প্রয়োগ করেন।

উনিশ শতকে মুসলিম মিল্লাতের পতন ও অবনতির যুগে এ 'জিযিয়া' সম্পর্কে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বড় বড় সাফাই পেশ করা হতো। সে রকম কিছু লোক এখনো রয়েছে এবং তারা এখনো এ ব্যাপারে সাফাই গেয়ে চলেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র দীন এসবের অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহের ভূমিকায় অবতীর্ণ, তাদের কাছে কৈফিয়ত দান ও ওযর পেশ করার কোনো প্রয়োজন তার নেই। পরিষ্কার ও সোজা কথায়, যারা আল্লাহ্‌র দীনকে গ্রহণ করেনা এবং নিজেদের বা অন্যের উদ্ভাবিত ভুল পথে চলে, তারা বড় জোর এতোটুকু স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার রাখে যে, নিজেরা ভুল পথে চলতে চাইলে চলতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌র যমীনে কোনো একটি জায়গায়ও মানুষের ওপর শাসন চালাবার এবং নিজেদের ভ্রান্তনীতি অনুযায়ী মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত করার আদৌ কোনো অধিকার তাদের নেই। দুনিয়ার যেখানেই তারা এ জিনিসটি লাভ করবে সেখানেই বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। তাদেরকে এ অবস্থান থেকে সরিয়ে দিয়ে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ জীবন বিধানের অনুগত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোই হবে মুমিনদের কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, এ জিযিয়া কিসের বিনিময়ে দেয়? এর জবাব হচ্ছে, ইসলামী শাসন কর্তৃত্বের আওতাধীনে নিজেদের গোমরাহীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য অমুসলিমদের যে স্বাধীনতা দান করা হয় এটা তারই মূল্য। আর যে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তাদের এ স্বাধীনতাকে কাজে লাগাবার অনুমতি দেয় এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে তার শাসন ও আইন শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনায় এ অর্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত। এর সবচেয়ে বড় ফায়দা হচ্ছে এই যে, জিযিয়া আদায় করার সময় প্রতি বছর যিম্মীদের মধ্যে একটি অনুভূতি জাগতে থাকবে। প্রতি বছর তারা মনে করতে থাকবে, তারা আল্লাহ্‌র পথে যাকাত দেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত আর এর পরিবর্তে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাদের মূল্য দিতে হচ্ছে। এটা তাদের কত বড় দুর্ভাগ্য। এ দুর্ভাগ্যের কারাগারে তারা বন্দী।

ঘ. "তবে যারা তোমাদের হাতে ধরা পড়ার আগেই তওবা করে তাদের জন্য নয়। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।" (সূরা মায়িদা ঃ ৩৪)

অর্থাৎ যদি তারা বিপর্যয় সৃষ্টির প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়, সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন ও তাকে ছিন্নভিন্ন করার অপচেষ্টা পরিহার করে এবং তাদের পরবর্তী কর্মনীতি একথা প্রমাণ করে যে, তারা শান্তিপ্রিয়, আইনের অনুগত ও সদাচারী হয়ে গেছে আর তারপর যদি তাদের আগের অপরাধের কথা জানা যায়, তাহলে ওপরে বর্ণিত শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে কোনো শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবেনা। তবে যদি তারা মানুষের অধিকারের ওপর কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করে থাকে, তাহলে তার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে মুক্ত করা যাবেনা। যেমন তারা যদি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে থাকে অথবা কারোর সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করে থাকে বা অন্য কোনো অপরাধ করে থাকে, তবে এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে ঐ বিশেষ অপরাধ সংক্রান্ত ফৌজদারী মামলা চালানো হবে। কিন্তু বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা বা আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সম্পর্কিত কোনো মামলা তাদের বিরুদ্ধে চালানো হবেনা।

৭. সমাজনীতি রাজনীতি ও শিক্ষানীতির সাধারণ মূলনীতি

"তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন ঃ

১. তোমরা কারোর ইবাদত করোনা, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো!

২. পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোনো একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে "উহ" পর্যন্তও বলোনা এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়োনা বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দোয়া করতে থাকো এই বলেঃ হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতাসহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। তোমাদের রব খুব ভালো করেই জানেন তোমাদের মনে কি আছে। যদি তোমরা সৎকর্মশীল হয়ে জীবন যাপন করো তাহলে তিনি এমন লোকদের প্রতি ক্ষমাশীল যারা নিজেদের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে বন্দেগীর নীতি অবলম্বন করার দিকে ফিরে আসে।

৩. আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও তাদের অধিকার দাও।

৪. বাজে খরচ করোনা। যারা বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

৫. যদি তাদের থেকে (অর্থাৎ অভাবী, আত্মীয় স্বজন মিসকীন ও মুসাফির থেকে) তোমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় এ জন্য যে, এখনো তুমি আল্লাহ্‌র প্রত্যাশিত রহমতের সন্ধান করে ফিরছো, তাহলে তাদেরকে নরম জবাব দাও।

৬. নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখোনা এবং তাকে একবারে খোলাও ছেড়ে দিয়োনা, তাহলে তুমি নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে যাবে। তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন আবার যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। তিনি নিজের বান্দাদের অবস্থা জানেন এবং তাদেরকে দেখছেন।

৭. দারিদ্রের আশংকায় নিজেরদের সন্তান হত্যা করোনা। আমি তাদেরকেও রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। আসলে তাদেরকে হত্যা করা একটি মহাপাপ।

৮. যিনার কাছেও যেয়োনা, ওটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং খুবই জঘন্য পথ।

৯. আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন, সত্য ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করোনা। আর যে ব্যক্তি মযলূম অবস্থায় নিহত হয়েছে তার অভিভাবককে আমি

কিসাস দাবী করার অধিকার দান করেছি। কাজেই হত্যার ব্যাপারে তার সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়, তাকে সাহায্য করা হবে।

১০. এতীমের সম্পত্তির ধারে কাছে যেয়োনা, তবে হ্যাঁ সদুপায়ে, যে পর্যন্ত না সে বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যায়।

১১. প্রতিশ্রুতি পালন করো, অবশ্যই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

১২. মেপে দেবার সময় পরিমাপ পাত্র ভরে দাও এবং ওজন করে দেবার সময় সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। এটিই ভালো পদ্ধতি এবং পরিণামের দিক দিয়েও এটিই উত্তম।

১৩. এমন কোনো জিনিসের পেছনে লেগে যেয়োনা যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চিতভাবেই চোখ, কান ও দিল সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

১৪. যমীনে দম্ভভরে চলোনা। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারবে।

এ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটির খারাপ দিক তোমার রবের কাছে অপছন্দনীয়। তোমার রব তোমাকে অহীর মাধ্যমে যে হিকমতের কথাগুলো বলেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৯)

এখানে এমন সব বড় বড় মূলনীতি ধারাবাহিকভাবে পেশ করা হয়েছে যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবন ব্যবস্থার ইমারত গড়ে তুলতে চায়। একে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আন্দোলনের ঘোষণাপত্র বলা যায়। মক্কী যুগের শেষে এবং আসন্ন মাদানী যুগের প্রারম্ভ লগ্নে এ ঘোষণাপত্র পেশ করা হয়। এভাবে এ নতুন ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের বুনিয়াদ কোন্ ধরনের চিন্তামূলক, নৈতিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত মূলনীতির ওপর রাখা হবে তা সারা দুনিয়ার মানুষ জানতে পারবে। এ প্রসংগে সূরা আন'য়ামের ১৯ রুকূ' এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট টীকার ওপরও একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ভালো হয়।

ধারা ১ ঃ এর অর্থ কেবল এতোটুকুই নয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো পূজা উপাসনা করোনা বরং এ সংগে এর অর্থ হচ্ছে, বন্দেগী, গোলামী ও দ্বিধাহীন আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্‌রই করতে হবে। একমাত্র তাঁরই হুকুমকে হুকুম এবং তাঁরই আইনকে আইন বলে মেনে নাও এবং তাঁর ছাড়া আর কারো সার্বভৌম কর্তৃক স্বীকার করোনা। এটি কেবলমাত্র একটি ধর্ম বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত কর্মধারার জন্য একটি পথনির্দেশনাই নয়। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা তাইয়েবায় পৌঁছে কার্যত যে রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন এটি হচ্ছে সেই সমগ্র ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তরও। এ ইমারতের বুনিয়াদ রাখা হয়েছিল এ মতাদর্শের ভিত্তিতে যে, মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহ্‌ই সমগ্র বিশ্বলোকের মালিক ও বাদশাহ এবং তাঁরই শরীয়ত এ রাজ্যের আইন।

ধারা ২ ঃ এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র পরে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হক ও অগ্রাধিকার হচ্ছে পিতামাতার! সন্তানকে পিতামাতার অনুগত, সেবা পরায়ণ ও

মর্যাদাবোধসম্পন্ন হতে হবে। সমাজের সামষ্টিক নৈতিক বৃত্তি এমন পর্যায়ের হতে হবে, যার ফলে সন্তানরা বাপমায়ের মুখাপেক্ষাহীন হয়ে পড়বেনা। বরং তারা নিজেদেরকে বাপমায়ের অনুগৃহীত মনে করবে এবং বুড়ো বয়সে তাদেকে ঠিক তেমনিভাবে বাপমায়েরে খিদমত করা শেখাবে যেমনিভাবে বাপমা শিশুকালে তাতে পরিচর্যা ও লালন পালন এবং মান অভিমান বরদাশ্‌ত করে এসেছে। এ আয়াতটিও নিছক একটি নৈতিক সুপারিশ নয় বরং এরি ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে বাপমায়ের জন্য এমনসব শর'য়ী অধিকার ও ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়েছে যেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীসে ও ফিকাহর কিতাবগুলোতে পাই। তাছাড়া ইসলামী সমাজের মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং মুসলমানদের সাংস্কৃতিক শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে বাপমায়ের প্রতি আচরণ ও আনুগত্য এবং তাদের অধিকারে রক্ষণাবেক্ষণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ জিনিসগুলো চিরকালের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র নিজের আইন কানুন, ব্যবস্থাপনামূলক বিধান ও শিক্ষানীতির মাধ্যমে পরিবার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও সংরক্ষিত করার চেষ্টা করবে, দুর্বল করবেনা।

ধারা ৩-৫ ঃ এ তিনটি ধারার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ নিজের উপার্জন ও ধন দৌলত শুধুমাত্র নিজের জন্যই নির্ধারিত করে নেবেনা বরং ন্যায়সংগতভাবে ও ভারসাম্য সহকারে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর নিজের আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য অভাবী লোকদের অধিকারও আদায় করবে। সমাজ জীবনে সাহায্য সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং অন্যের অধিকার জানা ও তা আদায় করা প্রবণতা সক্রিয় ও সঞ্চারিত থাকবে। প্রত্যেক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের সাহায্যকারী এবং প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তি নিজের আশপাশের অভাবী মানুষদের সাহায্যকারী হবে। একজন মুসাফির যে জনপদেই যাবে নিজেকে অতিথি বৎসর লোকদের মধ্যেই দেখতে পাবে। সমাজে অধিকারে ধারণা এতো বেশী ব্যাপক হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যাদের মধ্যে অবস্থান করে নিজের ব্যক্তি সত্তা ও ধন সম্পদের ওপর তাদের সবার অধিকার অনুভব করবে। তাদের খিদমত করার সময় এ ধারণা নিয়েই খিদমত করবে যে সে তাদের অধিকার আদায় করছে, তাদেরকে অনুগ্রহ পাশে আবদ্ধ করছেনা। কারোর খিদমত করতে অক্ষম হলে তার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের খিদমত করার যোগ্যতা লাভ করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে।

ইসলামের ঘোষণাপত্রের এ ধারাগুলোও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নৈতিকতার শিক্ষাই ছিলোনা বরং পরবর্তী সময়ে মদীনা তাইয়েবার সমাজে ও রাষ্ট্রে এগুলোর ভিত্তিতেই ওয়াজিব ও নফল সদ্‌কার বিধানসমূহ প্রদত্ত হয়, অসিয়ত, মীরাস ও ওয়াক্‌ফের পদ্ধতি নির্ধারিত হয়, এতিমের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাবস্থা করা হয়, প্রত্যেক জনবসতির ওপর মুসাফিরের কমপক্ষে তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারী করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং সংগে সমাজের নৈতিক ব্যবস্থা কার্যত এমন পর্যায়ে উন্নীত করা হয় যার ফলে সমগ্র সামাজিক পরিবেশে দানশীলতা, সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব সঞ্চারিত হয়ে যায়। এমনকি লোকেরা স্বতস্ফূর্তভাবে আইনগত অধিকারসমূহ দেয়া ছাড়াও

আইনের জোরে যেসব নৈতিক অধিকার চাওয়া ও প্রদান করা যায়না সেগুলোও উপলব্ধি ও আদায় করতে থাকে।

ধারা ৬ ঃ "হাত বাঁধা" একটি রূপক কথা। কৃপণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর "হাত খোলা ছেড়ে দেয়ার মানে হচ্ছে, বাজে খরচ করা। ৪র্থ ধারার সাথে ৬ষ্ঠ ধারাটির এ বাক্যাংশটি মিলিয়ে পড়লে এর পরিষ্কার অর্থ এই মনে হয় যে, লোকদের মধ্যে এতোটুকু ভারসাম্য হতে হবে যাতে তারা কৃপণ হয়ে অর্থের আবর্তন রুখে না দেয় এবং অপব্যয়ী হয়ে নিজের অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস না করে ফেলে। এর বিপরীত পক্ষে তাদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন সঠিক অনুভূতি থাকতে হবে যার ফলে তারা যথার্থ ব্যয় থেকে বিরত হবেনা আবার অযথা ব্যয়জনিত ক্ষতিরও শিকার হবেনা। অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছামূলক এবং লোক দেখানো খরচ, বিলাসিতা, ফাসেকী ও অশ্লীল কাজে ব্যয় এবং এমন যাবতীয় ব্যয় যা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনেও কল্যাণমূলক কাজে লাগার পরিবর্তে ধন সম্পদ ভুল পথে নিয়োজিত করে, তা আসলে আল্লাহ্‌র নিয়ামত অস্বীকার ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা এভাবে নিজেদের ধন দৌলত খরচ করে তারা শয়তানের ভাই।

এ ধারাগুলোও নিছক নৈতিক শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত হিদায়ত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। বরং এদিকে পরিষ্কার ইংগিত করছে যে, একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজকে নৈতিক অনুশীলন, সামষ্টিক চাপ প্রয়োগ ও আইনগত বাঁধা নিষেধ আরোপের মাধ্যমে অযথা অর্থ ব্যয় থেকে বিরত রাখা উচিত। এ কারণেই পরবর্তীকালে মদীনা রাষ্ট্রে বিভিন্ন কার্যকর পদ্ধতিতে এ উভয় ধারা নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা হয়। প্রথমত অপব্যয় ও বিলাসিতার বহু নীতি প্রথাকে আইনগতভাবে হারাম করা হয়। দ্বিতীয়ত পরোক্ষভাবে আইনগত কৌশল অবলম্বন করে অযথা অর্থব্যয়ের পথ বন্ধ করা হয়। তৃতীয়ত সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে এমন বহু রসম রেওয়াজের বিলোপ সাধন করা হয় যেগুলোতে অপব্যয় করা হতো। তারপর রাষ্ট্রকে বিশেষ ক্ষমতা বলে এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা বিধান জারী করে সুস্পষ্ট অপব্যয়ের ক্ষেত্রে বাঁধা দেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হয়। এভাবে যাকাত ও সদ্‌কার বিধানের মাধ্যমে কৃপণতার শক্তিকে গুড়িয়ে দেয়া হয় এবং লোকেরা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে অর্থের আবর্তনের পথ বন্ধ করে দেবে এ সম্ভাবনাও নির্মূল করে দেয়া হয়। এসব কৌশল অবলম্বন করার সাথে সাথে সমাজে এমন একটি সাধারণ জনমত সৃষ্টি করা হয়, যা দানশীলতা ও অপব্যয়ের মধ্যকার পার্থক্য সঠিকভাবে জানতো এবং কৃপণতা ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যয়ের মধ্যে ভালোভাবেই ফারাক করতে পারতো। এ জনমত কৃপণদেরকে লাঞ্ছিত করে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষাকারীদেরকে মর্যাদাশীল করে, অপব্যয়কারীদের নিন্দা করে এবং দানশীলদেরকে সমগ্র সমাজের খোশবুদার ফুল হিসেবে কদর করে। সে সময়ের নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের প্রভাব আজো মুসলিম সমাজ রয়েছে। আজো দুনিয়ার সব দেশেই মুসলমানরা কৃপণ ও সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদেরকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে এবং দানশীলরা আজো তাদের চোখে সম্মানার্হ ও মর্যাদা সম্পন্ন।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ নিজের বান্দাদের মধ্যে রিযিক কমবেশী করার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রেখেছেন তার উপযোগিতা বুঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই রিযিক বন্টনের যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রয়েছে কৃত্রিম মানবিক কৌশলের মাধ্যমে তার মধ্যে হস্তক্ষেপ না করা উচিত। প্রাকৃতিক অসাম্যকে কৃত্রিম সাম্যে পরিবর্তিত করা অথবা এ অসাম্যকে প্রাকৃতিক সীমার চৌহদ্দী পার করিয়ে বেইনসাফির সীমানায় পৌঁছিয়ে দেয়া উভয়টিই সমান ভুল। একটি সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবস্থান আল্লাহ্ নির্ধারিত রিযিক বন্টন পদ্ধতির নিকটতরই হয়ে থাকে।

এ বাক্যে প্রাকৃতিক আইনের যে নিয়মটির দিকে পথনির্দেশ করা হয়েছিল তার কারণে মদীনা সংস্কার কর্মসূচীতে এ ধারণাটি আদতে কোনো ঠাঁই করে নিতে পারেনি যে, রিযিক ও রিযিকের উপায় উপকরণগুলোর মধ্যে পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আসলে এমন কোনো অকল্যাণকর বিষয় নয়, যাকে বিলুপ্ত করা এবং একটি শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা কোন্ পর্যায়ে কাংখিত হতে পারে। পক্ষান্তরে সৎকর্মশীলতা ও সদাচারের ভিত্তিতে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ কায়েম করার জন্য মদীনা তাইয়েবায় এক বিশেষ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সে কর্মপদ্ধতি ছিলো এই যে, আল্লাহ্র দেয়া প্রকৃতি মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য করে রেখেছে তাকে আসল প্রাকৃতিক অবস্থায় অপরিবর্তিত রাখতে হবে এবং ওপরে প্রদত্ত পথনির্দেশনা অনুযায়ী সমাজের নৈতিকতা আচার আচরণ ও কর্মবিধানসমূহ এমনভাবে সংশোধন করে দিতে হবে, যার ফলে জীবিকার পার্থক্য ও ব্যবধান কোনো যুলুম ও বেইনসাফির বাহনে পরিণত হবার পরিবর্তে এমন অসংখ্য নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও তামাদ্দুনিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বাহনে পরিণত হবে, যে জন্য মূলত বিশ্বজাহানের স্রষ্টা তাঁর বান্দাদের মধ্যে এ পার্থক্য ও ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছেন।

ধারা ৭ ঃ যেসব অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন আন্দোলন দানা বেঁধেছে, এ আয়াতটি তার ভিত পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দিয়েছে। প্রাচীন যুগে দারিদ্রভীতি শিশু হত্যাও গর্ভপাতের কারণ হতো। আর আজ তা দুনিয়াবাসীকে তৃতীয় আর একটি কৌশল অর্থাৎ গর্ভনিরোধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু ইসলামের ঘোষণাপত্রের এ ধারাটি তাকে অন্নগ্রহণকারীদের সংখ্যা কমাবার ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা ত্যাগ করে এমনসব গঠনমূলক কাজে নিজের শক্তি ও যোগ্যতা নিয়োগ করার নির্দেশ দিচ্ছে যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্র তৈরী প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী রিযিক বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এ ধারাটির দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উপায় উপকরণের স্বল্পতার আশংকায় মানুষের বারবার সন্তান উৎপাদনের সিলসিলা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হওয়া তার বৃহত্তম ভুলগুলোর অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ ধারাটি মানুষকে এ বলে সাবধান করে দিচ্ছে যে, রিযিক পৌছাবার ব্যবস্থাপনা তোমার আয়ত্বাধীন নয় বরং এটি এমন এক আল্লাহ্র আয়ত্বাধীন যিনি তোমাকে এ যমীনে আবাদ করেছেন। পূর্বে আগমনকারীদেরকে তিনি যেভাবে রুযি দিয়ে এসেছেন তেমনিভাবে তোমাদেরকেও দেবেন। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও একথাই বলে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা যতোই বৃদ্ধি হতে থেকেছে ঠিক সেই পরিমাণে বরং বহুসময় তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে

অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ বেড়ে গিয়েছে। কাজেই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ব্যবস্থাপনায় মানুষের অযথা হস্তক্ষেপ নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ শিক্ষার ফলেই কুরআন নাযিলের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো যুগে মুসলমানদের মধ্যে জন্ম শাসনের কোনো ব্যাপক ভাবধারা জন্ম লাভ করতে পারেনি।

ধারা ৮ ঃ "যিনার কাছেও যেয়োনা" এ হুকুম ব্যক্তির জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজের জন্যও। ব্যক্তির জন্য এ হুকুমের মানে হচ্ছে, সে নিছক যিনার কাজ থেকে দূরে থেকেই ক্ষান্ত হবেনা বরং এ পথের দিকে টেনে নিয়ে যায় যিনার এমন সব সূচনাকারী এবং প্রাথমিক উদ্যোগ ও আকর্ষণ সৃষ্টিকারী বিষয় থেকেও দূরে থাকবে। আর সমাজের ব্যাপারে বলা যায়, এ হুকুমের প্রেক্ষিতে সমাজ জীবনে যিনা, যিনার উদ্যোগ আকর্ষণ এবং তার কারণসমূহের পথ বন্ধ করে দেয়া সমাজের জন্য ফরয হয়ে যাবে। এ উদ্দেশ্যে সে আইন প্রণয়ন, শিক্ষা ও অনুশীলন দান, সামাজিক পরিবেশের সংস্কার সাধন, সমাজ জীবনের যথাযোগ্য বিন্যাস এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

এ ধারাটি শেষ পর্যন্ত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি বৃহত্তম অধ্যায়ের বুনিয়াদে পরিণত হয়। এর অভিপ্রায় অনুযায়ী যিনা ও যিনার অপবাদকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করা হয়। পর্দার বিধান জারী করা হয়। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রচার কঠোরভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। মদ্যপান, নাচ, গান ও ছবির (যা যিনার নিকটতম আত্মীয়) ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। আর এ সংগে এমন একটি দাম্পত্য আইন প্রণয়ন করা হয় যার ফলে বিবাহ সহজ হয়ে যায় এবং যিনার সামাজিক কারণসমূহের শিকড় কেটে যায়।

ধারা ৯ ঃ কাউকেও হত্যা করা মানে কেবলমাত্র অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করাই নয়, নিজেকে হত্যা করাও এর অন্তরভুক্ত। কারণ মানুষকে মহান আল্লাহ্ মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন। অন্যের প্রাণের সাথে সাথে মানুষের নিজের প্রাণও এ সংজ্ঞার অন্তরভুক্ত। কাজেই মানুষ হত্যা যতো বড় গুনাহ ও অপরাধ, আত্মহত্যা করাও ঠিক ততো বড় অপরাধ ও গুনাহ। মানুষ নিজেকে নিজের প্রাণের মালিক এবং এ মালিকানাকে নিজ ক্ষমতায় খতম করে দেবার অধিকার রাখে বলে মনে করে, এটা তার একটা বিরাট ভুল ধারণা। অথচ তার এ প্রাণ আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন এবং সে একে খতম করে দেয়া তো দূরের কথা একে কোনো অনুপযোগী কাজে ব্যবহার করার অধিকারও রাখেনা। দুনিয়ার এ পরীক্ষাগৃহে আল্লাহ্ যেভাবেই আমাদের পরীক্ষা নেন না কেন, পরীক্ষার অবস্থা ভালো হোক বা মন্দ হোক, সেভাবেই শেষ সময় পর্যন্ত আমাদের পরীক্ষা দিতে থাকা উচিত। আল্লাহ্‌র দেয়া সময়কে ইচ্ছা করে খতম করে দিয়ে পরীক্ষাগৃহ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার এ পালিয়ে যাবার কাজটিও এমন এক অপরাধের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাকে আল্লাহ্ সুস্পষ্ট ভাষায় হারাম গণ্য করেছেন, এটা তো কোনোক্রমেই গ্রহণীয় হতে পারেনা। অন্য কথায় বলা যায়, দুনিয়ার ছোট ছোট কষ্ট, লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মানুষ বৃহত্তর ও চিরন্তন কষ্ট ও লাঞ্ছনার দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

পরবর্তীকালে ইসলামী আইন 'সত্য সহকারে হত্যাকে শুধুমাত্র পাঁচটি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এক. জেনে বুঝে হত্যাকারী থেকে কিসাস নেয়া। দুই. আল্লাহ্‌র সত্যদীনের পথে বাঁধাদানকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । তিন. ইসলামী রাষ্ট্রে শাসন ব্যবস্থা উৎখাত করার প্রচেষ্টাকারীদের শাস্তি দেয়া। চার. বিবাহিত পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার শাস্তি দেয়া। পাঁচ, মুরতাদকে শাস্তি দেয়া। শুধুমাত্র এ পাঁচটি ক্ষেত্রে মানুষের প্রাণের মর্যাদা তিরোহিত হয় এবং তাকে হত্যা করা বৈধ গণ্য হয়।

মূল শব্দ হচ্ছে, "তার অভিভাবককে আমি সুলতান দান করেছি।" এখানে সুলতান অর্থ হচ্ছে "প্রমাণ" যার ভিত্তিতে সে কিসাস দাবী করতে পারে। এ থেকে ইসলামী আইনের এ মূলনীতি বের হয় যে, হত্যা মুকদ্দমার আসল বাদী সরকার নয়। বরং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণই এর মূল বাদীপক্ষ। তারা হত্যাকারীকে মাফ করে দিতে এবং কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ করতে সম্মত হতে পারে।

হত্যার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সীমা অতিক্রম করা যেতে পারে। এগুলো সবই নিষিদ্ধ। যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে উন্মত্তোর মতো অপরাধী ছাড়া অন্যদেরকেও হত্যা করা অথবা অপরাধীকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলা। কিংবা মেরে ফেলার পর তার লাশের ওপর মনের ঝাল মেটানো। অথবা রক্তপণ নেবার পর আবার তাকে হত্যা করা ইত্যাদি।

যেহেতু সে সময় পর্যন্ত ইসলাসী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই কে তাকে সাহায্য করবে, একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েনি। পরে যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন ফায়সালা করে দেয়া হয় যে, তাকে সাহায্য করা তার গোত্র বা সহযোগী বন্ধু দলের কাজ নয় বরং এটা হচ্ছে ইমলামী রাষ্ট্র এবং তার বিচার ব্যবস্থার কাজ। কোনো ব্যক্তি বা দল নিজস্বভাবে হত্যার প্রতিশোধ নেবার অধিকার রাখেনা। বরং এটা ইসলামী সরকারে দায়িত্ব। ন্যায় বিচার লাভ করার জন্য তার কাছে সাহায্য চাওয়া হবে।

ধারা ১০ ঃ এটিও নিছক একটি নৈতিক নির্দেশনামা ছিলোনা। বরং পরবর্তীকালে যখন ইসলাসী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এতিমদের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য প্রশাসনিক ও আইনগত উভয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় । এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীস ও ফিকাহর কিতাবগুলোতে পাই। তার পর এখান থেকে এ ব্যাপক ভিত্তিক মূলনীতি গ্রহণ করা হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক নিজেরা তাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখেনা রাষ্ট্রই তাদের স্বার্থের সংরক্ষক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যার কোনো অভিভাবক নেই আমিই তার অভিভাবক" এ হাদীসটি এদিকেই ইংগিত করে এবং এ ইসলামী আইনের একটি বিস্তৃত অধ্যায়ের ভূমিকা রচনা করে।

ধারা ১১ ঃ এটিও নিছক ব্যক্তিগত নৈতিকতারই একটি ধারা ছিলোনা বরং যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন একেই সমগ্র জাতির আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতির ভিত্তি গণ্য করা হয়।

ধারা ১২ ঃ এ নির্দেশটাও নিছক ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক লেনদেন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হাট, বাজার ও দোকানগুলোতে মাপজোক ও দাঁড়িপাল্লাগুলো তত্ত্বাবধান করা এবং শক্তি প্রয়োগ করে ওজনে ও মাপে কম দেয়া বন্ধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। তারপর এখান থেকেই এ ব্যাপক মূলনীতি গৃহীত হয় যে, ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সব রকমের বেঈমানী ও অধিকার হরণের পথ রোধ করা সরকারের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত।

ধারা ১৩ ঃ এ ধারাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধারণা ও অনুমানের পরিবর্তে "জ্ঞানের" পেছনে চলবে। ইসলামী সমাজ এ ধারাটির প্রয়োগ ব্যাপকভাবে নৈতিক ব্যবস্থায়, আইনে, রাজনীতিতে, দেশ শাসনে, জ্ঞান বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় তথা জীবনের সকল বিভাগে সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছে। জ্ঞানের পরিবর্তে অনুমানের পেছনে চলার কারণে মানুষের জীবনে যে অসংখ্য দুষ্ট মতের সৃষ্টি হয় তা থেকে চিন্তা ও কর্মকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কুধারণা থেকে দূরে থাকো এবং কোনো ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই কোনো দোষারোপ করোনা। আইনের ক্ষেত্রে এ মর্মে একটি স্থায়ী মূলনীতি স্থির করে দেয়া হয়েছে যে, নিছক সন্দেহ বসত কারো বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবেনা। অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে নীতি নির্দেশ করা হয়েছে। অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার, মারধর বা জেলে আটক করা সম্পূর্ণ অবৈধ। বিজাতিদের সাথে আচার আচরণের ক্ষেত্রে নীতি নিধারণ করা হয়েছে যে, অনুসন্ধান ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেনা এবং নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে কোনো গুজব ছড়ানোও যাবেনা। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেসব তথাকথিত জ্ঞান নিছক আন্দাজ অনুমান এবং দীর্ঘসূত্রীতাময় ধারণা ও কল্পনা নির্ভর, সেগুলোকেও অপছন্দ করা হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধারণা কল্পনা ও কুসংস্কারের মূল উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং ঈমানদারদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ্ ও রসূল প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণিত বিষয় মেনে নেবার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

ধারা ১৪ ঃ এর মানে হচ্ছে, ক্ষমতাগর্বী ও অহংকারীদের মতো আচরণ করোনা। এ নির্দেশটিও ব্যক্তিগত কর্মপদ্ধতি ও জাতীয় আচরণ উভয়ের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য। এ নির্দেশের বদৌলতেই এ ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে মদীনা তাইয়েবায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার শাসকবৃন্দ, গভর্নর ও সিপাহসালারদের জীবনে ক্ষমতাগর্ব ও অহংকারের ছিটোফোটাও ছিলোনা। এমনকি যুদ্ধরত অবস্থায়ও কখনো তাদের মুখ থেকে দ্বন্দ্ব ও অহংকারের কোনো কথাই বের হতোনা। তাদের ওঠা বসা, চাল চলন, পোশাক পরিচ্ছদ, ঘর বাড়ী, সওয়ারী ও সাধারণ আচার আচরণে নম্রতা কোমলতা বরং ফকিরী ও দরবেশীর ছাপ স্পষ্ট দেখা যেতো। যখন তারা বিজয়ীর বেশে কোনো শহরে প্রবেশ করতেন তখনও দর্প ও অহংকার সহকারে নিজেরদের ভীতি মানুষের মনে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করতেননা।

খ. রাষ্ট্রের শিক্ষা নীতির ব্যাপারে কুরআনে এই নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে যে ঃ

"আর মুমিনদের সবার এক সাথে বের হয়ে পড়ার কোনো দরকার ছিলোনা। কিন্তু তাদের জনবসতির প্রত্যেক অংশের কিছু লোক বেরিয়ে এলে ভালো হতো। তারা দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতো এবং ফিরে গিয়ে নিজের এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করতো, যাতে তারা (অমুসলমানী আচরণ থেকে) বিরত থাকতো, এমনটি হলোনা কেন?" (সূরা তওবা ঃ ১২২)

এ আয়াতের অর্থ অনুধাবন করার জন্য এ সূরার ৯৭ আয়াতটি সামনে রাখতে হবে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

"মরুচারী আরবরা কুফরী ও মুনাফিকীতে অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং আল্লাহ্ তাঁর রসূলের প্রতি যে দীন নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশী।"

সেখানে শুধু এতোটুকু বলেই শেষ করা হয়েছিল যে, দারুল ইসলামের গ্রামীণ এলাকার বেশীরভাগ জনবসতি মুনাফিকী রোগে আক্রান্ত। কারণ এসব লোক অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে। জ্ঞানের কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ না থাকা এবং জ্ঞানবানদের সাহচর্য না পাওয়ার ফলে এরা আল্লাহ্র দীনের সীমারেখা জানেনা। আর এখানে বলা হচ্ছে, গ্রামীণ জনবসতিকে এ অবস্থায় থাকতে দেয়া যাবেনা। বরং তাদের অজ্ঞতা দূর এবং তাদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি করার জন্য এখন যথাযথ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এ জন্য গ্রামীণ এলাকার সমস্ত আরব অধিবাসীদের নিজেরদের ঘর বাড়ী ছেড়ে মদীনায় জমায়েত হবার এবং এখানে বসে জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন নেই। বরং এই জন্য প্রয়োজন হচ্ছে প্রত্যেক গ্রাম, পল্লী ও গোত্র থেকে কয়েকজন করে লোক বের হবে। তারা জ্ঞানের কেন্দ্রগুলো যেমন মদীনা ও মক্কা এবং এ ধরনের অন্যান্য জায়গায় আসবে। এখানে এসে তারা দীনের জ্ঞান আহরণ করবে। এখান থেকে তারা নিজেদের জনবসতিতে ফিরে যাবে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দীনী চেতনা ও জাগরণ সৃষ্টিতে তৎপর হবে।

এটি ছিলো একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ নির্দেশ। ইসলামী আন্দোলনকে শক্তিশালী ও মজবূত করার জন্য সঠিক সময়ে এ নির্দেশটি দেয়া হয়েছিলো। শুরুতে ইসলাম যখন আরবে ছিলো একেবারেই নতুন এবং একটি চরম প্রতিকূল পরিবেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিলো তখন এ ধরনের নির্দেশের প্রয়োজন ছিলোনা। কারণ তখন যে ব্যক্তি ইসলামকে পুরোপুরি বুঝে নিতো এবং সব দিক দিয়ে তাকে যাচাই করে নিশ্চিন্ত হতে পারতো একমাত্র সেই ইসলাম গ্রহণ করতো। কিন্তু যখন এ আন্দোলন সাফল্যের পর্যায়ে প্রবেশ করলো এবং পৃথিবীতে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো তখন দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো এবং এলাকার পর এলাকা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকলো। এ সময় খুব কম লোকই ইসলামের যাবতীয় চাহিদা ও দাবী অনুধাবন করে ভালোভাবে জেনে বুঝে ইসলাম গ্রহণ করতো। বেশীর ভাগ লোকই নিছক অচেতনভাবে সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলে আসছিলো। নতুন মুসলিম জনবসতির এ দ্রুত বিস্তার বাহ্যত ইসলামের শক্তিমত্তার কারণ ছিলো। কেননা,

ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা বেড়ে চলছিলো। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের জনবসতিতে ইসলামী চেতনা ছিলোনা এবং এ ব্যবস্থার নৈতিক দাবি পূরণ করতেও তারা প্রস্তুত ছিলোনা। বস্তুত তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় এ ক্ষতি সুস্পষ্ট আকারে সামনে এসে গিয়েছিল। তাই সঠিক সময়ে মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন, ইসলামী আন্দোলনের বিস্তৃতির কাজ যে গতিতে চলছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাকে শক্তিশালী ও মজবুত করার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সে ব্যবস্থাটি হচ্ছে, প্রত্যেক এলাকার লোকদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নিয়ে শিক্ষা ও অনুশীলন দান করতে হবে, তারপর তারা প্রত্যেকে নিজেদের এলাকায় ফিরে গিয়ে সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও অনুশীলনের দায়িত্ব পালন করবে। এভাবে সমগ্র মুমলিম জনবসতিতে ইসলামের চেতনা ও আল্লাহ্‌র বিধানের সীমারেখা সম্পর্কিত জ্ঞান ছড়িয়ে পড়বে।

এ প্রসংগে এতোটুকু কথা অবশ্যি অনুধাবন করতে হবে যে, এ আয়াতে যে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করার হুকুম দেয়া হয়েছে তার আসল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে নিছক সাক্ষরতা সম্পন্ন করা এবং তাদের মধ্যে বইপত্র পড়ার মতো যোগ্যতা সৃষ্টি করা ছিলোনা। বরং লোকদের মধ্যে দীনের বোধ ও জ্ঞান সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে অমুসলিম সুলভ জীবনধারা থেকে রক্ষা করা, সতর্ক ও সজ্ঞান করে তোলা এর আসল উদ্দেশ্য হিসেবে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছিল। এটিই মুসলমানদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ্ নিজেই চিরকালের জন্য এ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করতে হবে। দেখতে হবে এ উদ্দেশ্য সে কতোটুকু পূরণ করতে সক্ষম। এর অর্থ এ নয়, ইসলাম লোকদেরকে লেখা পড়া শেখাতে বই পড়তে সক্ষম করে তুলতে ও পার্থিব জ্ঞান দান করতে চায়না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, ইসলাম লোকদের মধ্যে এমন শিক্ষা বিস্তার করতে চায় যা ওপরে বর্ণিত শিক্ষা লাভের জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত আসল উদ্দেশ্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নয়তো প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তার যুগের আইনষ্টাইন ও ফ্রয়েড হয়ে যায় কিন্তু দীনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা শূণ্যের কোঠায় অবস্থান করে এবং অমুসলিম সুলভ জীবনধারায় বিভ্রান্ত হতে থাকে তাহলে ইসলাম এ ধরনের শিক্ষার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।

এ আয়াতে উল্লেখিত বাক্যাংশটির ফলে পরবর্তীকালে লোকদের মধ্যে আশ্চর্য ধরনের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেছে। মুসলমানরদের ধর্মীয় শিক্ষা বরং তাদের ধর্মীয় জীবনধারার ওপরও এর বিষময় প্রভাব দীর্ঘকাল থেকে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ "তাফাক্কুহ্ ফীদ্ দীন" কে শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিণত করেছিলেন। এর অর্থ হচ্ছে, দীন অনুধাবন করা বা বুঝা, দীনের ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা, তার প্রকৃতি ও প্রাণশক্তির সাথে পরিচিত হওয়া এবং এমন যোগ্যতার অধিকারী হওয়া যার ফলে চিন্তা ও কর্মের সকল দিকে ও জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে কোন্ চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি ইসলামের প্রাণশক্তির অনুসারী তা মানুষ জানতে পারে।

কিন্তু পরবর্তীকালে যে আইন সম্পর্কিত জ্ঞান পারিভাষিক অর্থে ফিক্‌হ নামে পরিচিত হয় এবং যা ধীরে ধীরে ইসলামী জীবনের নিছক বাহ্যিক কাঠামোর (প্রাণশক্তির মুকাবিলায়) বিস্তারিত জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, লোকেরা শাব্দিক অভিন্নতার কারণে তাকেই আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষার চরম ও পরম লক্ষ্য মনে করে বসেছে। অথচ সেটিই সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়। বরং তা ছিলো উদ্দেশ্য লক্ষ্যের একটি অংশ মাত্র। এ বিরাট ভুল ধারণার ফলে দীন ও তার অনুসারীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করতে হলে একটি বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন। কিন্তু এখানে আমরা এ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার জন্য সংক্ষেপে শুধুমাত্র এতোটুকু ইংগিত করছি যে, মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাকে যে জিনিসটি দীনি প্রাণশক্তি বিহীন করে নিছক দীনি কাঠামো ও দীনি আকৃতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে এবং অবশেষে যার বদৌলতে মুসলমানদের জীবনে একটি নিছক প্রাণহীন বাহ্যিকতা দীনদারীর শেষ মন্‌যিলে পরিণত হয়েছে তা বহুলাংশে এ ভুল ধারণারই ফল।

৮. নাগরিকত্ব ও পররাষ্ট্রনীতি

ক. "যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে নিজের জানমালের ঝুঁকি নিয়ে জিহাদ করেছে আর যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, আসলে তারাই পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক। আর যারা ঈমান এনেছে ঠিকই কিন্তু হিজরত করে (দারুল ইসলামে) আসেনি তারা হিজরত করে না আসা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্বের ও অভিভাবকত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে হাঁ, দীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের জন্য ফরয। কিন্তু এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ তা দেখেন।" (সূরা আনফাল ঃ ৭২)

এ আয়াতটি ইসলামের সাংবিধানিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। এখানে একটি মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে, "অভিভাবকত্বের" সম্পর্ক এমন সব মুসলমানদের মধ্যে স্থাপিত হবে যারা দারুল ইসলামের বাসিন্দা অথবা বাইরে থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে এসেছে। আর যেসব মুসলমান ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে বাস করে তাদের সাথে অবশ্যি ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে, কিন্তু "অভিভাবকত্বের" সম্পর্ক থাকবেনা। অনুরূপভাবে যেসব মুসলমান হিজরত করে দারুল ইসলামে আসবেনা বরং দারুল কুফরের প্রজা হিসেবে দারুল ইসলামে আসবে তাদের সাথেও এ সম্পর্ক থাকবেনা। অভিভাবকত্ব শব্দটিকে এখানে মূলে "ওয়ালায়াত" শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। আরবীতে "ওয়ালায়াত" বলতে সাহায্য, সহায়তা, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতা, মৈত্রী, বন্ধুত্ব, নিকট আত্মীয়তা, অভিভাবকত্ব এবং এ সবের সাথে সামঞ্জস্যশীল অর্থ বুঝায়। এ আয়াতের পূর্বাপর আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে এ থেকে এমন ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝানো হয়েছে, যা একটি রাষ্ট্রের তার নাগরিকদের সাথে, নাগরিকদের নিজেদের রাষ্ট্রের সাথে এবং নাগরিকদের নিজেদের মধ্যে বিরাজ করে। কাজেই এ আয়াতটি "সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব"কে ইসলামী রাষ্ট্রের ভূখন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এ সীমানার বাইরের মুসলমানদেরকে এ বিশেষ সম্পর্কের বাইরে রাখে। এ অভিভাবকত্ব না থাকার আইনগত ফলাফল অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। উদাহরণ হিসেবে শুধুমাত্র এতোটুকু ইংগিত করাই যথেষ্ট হবে যে, এ অভিভাবকত্বহীনতার ভিত্তিতে দারুল কুফর ও দারুল ইসলামের মুসলমানরা পরস্পরের উত্তরাধিকারী হতে পারেনা এবং তারা

একজন অন্যজনের আইনানুগ অভিভাবক (Guardian) হতে পারেনা, পরস্পরের মধ্যে বিয়ে শাদী করতে পারেনা এবং দারুল কুফরের সাথে নাগরিকত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করেনি এমন কোনো মুসলমানকে ইসলামী রাষ্ট্র নিজেদের কোনো দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত করতে পারেনা।[১] তাছাড়া এ আয়াতটি ইসলামী রাষ্ট্রের বিদেশ নীতির ওপরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। এর দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যেসব মুসলমান অবস্থান করে তাদের দায়িত্বই ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। বাইরের মুসলমানদের কোনো দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়না। একথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিম্নোক্ত হাদীসে বলেছেন ঃ

"আমার ওপর এমন কোনো মুসলমানের সাহায্য সমর্থন ও হিফাযতের দায়িত্ব নেই যে মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে।"

এভাবে সাধারণত যেসব বিবাদের কারণে আন্তর্জাতিক জটিলতা দেখা দেয়, ইসলামী আইন তার শিকড় কেটে দিয়েছে। কারণ যখনই কোনো সরকার নিজের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে অবস্থানকারী কিছু সংখ্যালঘুর দায়িত্ব নিজের মাথায় নিয়ে নেয় তখনই এর কারণে এমন সব জটিলতা দেখা দেয়, বার বার যুদ্ধের পরও যার কোনো মীমাংসা হয়না।

এ আয়াতে দারুল ইসলামের বাইরে অবস্থানকারী মুসলমানদের "রাজনৈতিক অভিভাবকত্বের" সম্পর্ক মুক্ত গণ্য করা হয়েছিল। এখন এ আয়াতটি বলছে যে, তারা এ সম্পর্কের বাইরে অবস্থান করা সত্ত্বেও "ইসলামী ভ্রাতৃত্বের" সম্পর্কের বাইরে অবস্থান করছেনা। যদি কোথাও তাদের ওপর যুলুম হতে থাকে এবং ইসলামী ভ্রাতৃ সমাজের সাথে সম্পর্কের কারণে তারা দারুল ইসলামের সরকারের ও তার অধিবাসীদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে নিজেদের এ মযলূম ভাইদের সাহায্য করা তাদের জন্য ফরয হয়ে যাবে। কিন্তু এরপর আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, চোখ বন্ধ করে এসব দীনি ভাইয়ের সাহায্য করা যাবেনা। বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরোপিত দায়িত্ব ও নৈতিক সীমারেখার প্রতি নযর রেখেই এ দায়িত্ব পালন করা যাবে। যুলুমকারী জাতির সাথে যদি ইসলামী রাষ্ট্রের চুক্তিমূলক সম্পর্ক থাকে তাহলে এ অবস্থায় এ চুক্তির নৈতিক দায়িত্ব ক্ষুন্ন করে মযলূম মুসলমানদের কোনো সাহায্য করা যাবেনা।

আয়াতে চুক্তির জন্য "মীসাক" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হচ্ছে "ওসূক"। এর মানে আস্থা ও নির্ভরতা। এমন প্রত্যেকটি জিনিসকে "মীসাক" বলা হবে, যার ভিত্তিতে কোনো জাতির সাথে আমাদের সুস্পষ্ট 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি না থাকলেও তারা প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদের ও তাদের মধ্যে কোনো যুদ্ধ নেই এ ব্যাপারে যথার্থ আস্থাশীল হতে পারে।

তারপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে।" এ থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার কোনো অমুসলিম সরকারের সাথে যে

---

১. এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন লেখকের "রাসায়েল ও মাসায়েল" ২য় খন্ডের "দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরে মুসলমানদের মধ্যে উত্তরাধিকার ও বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক নিবন্ধকটি। -অনুবাদক

চুক্তি স্থাপন করে তা শুধুমাত্র দু'টি সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক নয় বরং দু'টি জাতির সম্পর্কও এবং মুসলমান সরকারের সাথে সাথে মুসলিম জাতি ও তার সদস্যরাও এর নৈতিক দায়িত্বের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। মুসলিম সরকার অন্য দেশ বা জাতির সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করে ইসলামী শরীয়ত তার নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুসলিম জাতি বা তার ব্যক্তিবর্গকে মুক্ত থাকাকে আদৌ বৈধ গণ্য করেনা। তবে দারুল ইসলাম সরকারের চুক্তিগুলো মেনে চলার দায়িত্ব একমাত্র তাদের ওপর বর্তাবে যারা এ রাষ্ট্রের কর্মসীমার মধ্যে অবস্থান করবে। এ সীমার বাইরে বসবাসকারী সারা দুনিয়ার মুলসমানরা কোনোক্রমেই এ দায়িত্বে শামিল হবেনা। এ কারণেই হুদাইবিয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কাফিরদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন হযরত আবু বসীর ও আবু জান্দাল এবং অন্যান্য মুসলমানদের ওপর তার কোনো দায়িত্ব অর্পিত হয়নি, যারা মদীনার দারুল ইসলামের প্রজা ছিলেননা।

খ. "আর যদি কখনো কোনো জাতির পক্ষ থেকে তোমাদের খিয়ানতের আশংকা থাকে তাহলে তার চুক্তি প্রকাশ্যে তার সামনে ছুঁড়ে দাও।" (সূরা আনফাল ঃ ৫৮)

এ আয়াতের দৃষ্টিতে যদি কোনো ব্যক্তি, দল বা দেশের সাথে আমাদের চুক্তি থাকে এবং তার কর্মনীতি আমাদের মনে তার বিরুদ্ধে চুক্তি মেনে চলার ব্যাপারে গড়িমসি করার অভিযোগ সৃষ্টি করে অথবা সুযোগ পেলেই সে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এ ধরনের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে আমাদের পক্ষে একতরফাভাবে এমন সিদ্ধান্ত করা কোনোক্রমেই বৈধ নয় যে, আমাদের ও তার মধ্যে কোনো চুক্তি নেই। আর এই সংগে হঠাৎ তার সাথে আমাদের এমন ব্যবহার করা উচিত নয় যা একমাত্র চুক্তি না থাকা অবস্থায় করা যেতে পারে। বরং এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হলে কোনো বিরোধীতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার আগে দ্বিতীয় পক্ষকে স্পষ্টভাষায় একথা জানিয়ে দেবার জন্য আমাদের তাগিদ দেয়া হয়েছে যে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এখন আর কোনো চুক্তি নেই। এভাবে চুক্তি ভংগ করার জ্ঞান আমরা যতটুকু অর্জন করেছি তারাও ততটুকু অর্জন করতে পারবে এবং চুক্তি এখনো অপরিবর্তিত আছে, এ ধরনের ভুল ধারণা তারা পোষণ করবেনা। আল্লাহ্‌র এ ফরমান অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিম্নোক্ত স্থায়ী মূলনীতি ঘোষণা করেছিলেন ঃ

"কোনো জাতির সাথে কারোর কোনো চুক্তি থাকলে মেয়াদ শেষ হবার আগে তার চুক্তি লংঘন করা উচিত নয়। এক পক্ষ চুক্তি ভংগ করলে উভয় পক্ষের সমতার ভিত্তিতে অপর পক্ষ চুক্তি বাতিল করার কথা জানাতে পারে।"

তারপর এ নিয়মকে তিনি আরো একটু ব্যাপকভিত্তিক করে সমস্ত ব্যাপারে এ সাধারণ নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন "যে ব্যক্তি তোমার সাথে খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে খিয়ানত করোনা" এ নীতিটি শুধুমাত্র বক্তৃতা বিবৃতিতে বলার ও বইয়ের পাতার শোভা বর্ধনের জন্য ছিলোনা বরং বাস্তব জীবনে একে পূরাপূরি মেনে চলা হতো। আমীর মু'য়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একবার নিজের রাজত্বকালে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে সেনা সমাবেশ করতে শুরু করেন। তাঁর

উদ্দেশ্য ছিলো চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথেই অতর্কিতে রোমান এলাকায় আক্রমণ চালাবেন। তাঁর এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আমর ইবনে আনবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কঠোর প্রতিবাদ জানান। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীসটি শুনিয়ে চুক্তির মেয়াদের মধ্যেই এ ধরনের শত্রুতামূলক কার্যকলাপকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেন। অবশেষে আমীর মু'য়াবিয়াকে এই নীতির সামনে মাথা নোয়াতে হয় এবং তিনি সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ বন্ধ করে দেন।

একতরফাভাবে চুক্তি ভংগ ও যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া আক্রমণ করার পদ্ধতি প্রাচীন জাহিলী যুগেও ছিলো এবং বর্তমান যুগের সুসভ্য জাহিলিয়াতেও এর প্রচলন আছে। এর নতুনতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ার ওপর জার্মানীর আক্রমণ এবং ইরানের বিরুদ্ধে রাশিয়া ও বৃটেনের সামরিক কার্যক্রম। সাধারণত এ ধরনের কার্যক্রমের সপক্ষে ও ওযর পেশ করা হয় যে, আক্রমণের পূর্বে জানিয়ে দিলে প্রতিপক্ষ সতর্ক হয়ে যায়। এ অবস্থায় কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় অথবা যদি আমরা অগ্রসর হয়ে হস্তক্ষেপ না করতাম তাহলে আমাদের শত্রুরা সুবিধা লাভ করতো। কিন্তু নৈতিক দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য এ ধরনের বাহানাকে যদি যথেষ্ট মনে করা হয় তাহলে দুনিয়ায় আর এমন কোনো অপরাধ থাকেনা যা কোনো না কোনো বাহানায় করা যেতে পারেনা। প্রত্যেক চোর, ডাকাত, ব্যভিচারী, ঘাতক ও জালিয়াত নিজের অপরাধের জন্য এমনি ধরনের কোনো না কোনো কারণ দর্শাতে পারে। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, আন্তর্জাতিক পরিবেশে এরা একটি জাতির জন্য এমন অনেক কাজ বৈধ মনে করে যা জাতীয় পরিবেশে কোনো ব্যক্তি করলে তাদের দৃষ্টিতে অবৈধ বলে গণ্য হয়।

এ প্রসংগে একথা জেনে নেয়ারও প্রয়োজন রয়েছে যে, ইসলামী আইন শুধুমাত্র একটি অবস্থায় পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আক্রমণ করা বৈধ গণ্য করে। সে অবস্থাটি হচ্ছে, দ্বিতীয় পক্ষ যখন ঘোষণা দিয়েই চুক্তি ভংগ করে এবং আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতামূলক কাজ করে। এহেন অবস্থায় উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের পক্ষ থেকে তার কাছে চুক্তি ভংগ করার নোটিশ দেবার প্রয়োজন হয়না। বরং আমরা অঘোষিতভাবে তার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার লাভ করি। বনী খুযায়ার ব্যাপারে কুরাইশরা যখন হুদাইবিয়ার চুক্তি প্রকাশ্যে ভংগ করে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে চুক্তি ভংগ করার নোটিশ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি এবং কোনো প্রকার ঘোষণা না দিয়েই মক্কা আক্রমণ করে বসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কার্যক্রম থেকেই মুসলিম ফকীহগণ এ ব্যতিক্রমধর্মী বিধি রচনা করেছেন। কিন্তু কোনো অবস্থায় যদি আমরা এ ব্যতিক্রমধর্মী নিয়ম থেকে ফায়দা উঠাতে চাই তাহলে অবশ্যি সেই সমস্ত অবস্থা আমাদের সামনে থাকতে হবে যে অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এভাবে তাঁর সমগ্র কার্যক্রমের একটি সুবিধাজনক অংশ মাত্রের অনুসরণ না করে তার

সবটুকুর অনুসরণ করা হবে। হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলো থেকে যা কিছু প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

এক. কুরাইশদের চুক্তি ভংগের ব্যাপারটি এতো বেশী সুস্পষ্ট ছিলো যে, চুক্তি ভংগ করেছে এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার কোনো সুযোগ ছিলোনা। কুরাইশরা এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরা নিজেরাও চুক্তি যথার্থই ভেংগে গেছে বলে স্বীকার করতো। তারা নিজেরাই চুক্তি নবায়ণের জন্য আবু সুফিয়ানকে মদীনায় পাঠিয়েছিল। এর পরিষ্কার অর্থ ছিলো, তাদের দৃষ্টিতেও চুক্তি অক্ষুন্ন ছিলোনা। তবুও চুক্তি ভংগকারী জাতি নিজেই চুক্তি ভংগ করার কথা স্বীকার করবে, এটা জরুরী নয়। তবে চুক্তি ভংগ করার ব্যাপারটি একেবারে সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত হওয়া অবশ্যি জরুরী।

দুই. কুরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভংগ করার পরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে বা ইশারা ইংগিতে এমন কোনো কথা বলেননি যা থেকে এ ইশারা পাওয়া যায় যে, এ চুক্তি ভংগ করা সত্ত্বেও তিনি এখনো তাদেরকে একটি চুক্তিবদ্ধ জাতি মনে করেন এবং এখনো তাদের সাথে তাঁর চুক্তিমূলক সম্পর্ক বজায় রয়েছে বলে মনে করেন। সমস্ত বর্ণনা একযোগে একথা প্রমাণ করে যে, আবু সুফিয়ান যখন মদীনায় এসে চুক্তি নবায়ণের আবেদন করে তখন তিনি তা গ্রহণ করেননি।

তিন. তিনি নিজে কুরাইশদের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করেন এবং প্রকাশ্যে গ্রহণ করেন। তাঁর কার্যক্রমে কোনো প্রকার প্রতারণার সামান্যতম গন্ধও পাওয়া যায়না। তিনি বাহ্যত সন্ধি এবং গোপনে যুদ্ধের পথ অবলম্বন করেননি।

এটিই এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আদর্শ। কাজেই ওপরে উল্লেখিত আয়াতের সাধারণ বিধান থেকে সরে গিয়ে যদি কোনো কার্যক্রম অবলম্বন করা যেতে পারে তাহলে তা এমনি বিশেষ অবস্থায়ই করা যেতে পারে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের সরল সহজ ভদ্রজনোচিত পথে তা করেছিলেন তেমনি পথেই করা যেতে পারে।

তাছাড়া কোনো চুক্তিবদ্ধ জাতির সাথে কোনো বিষয়ে যদি আমাদের কোনো বিবাদ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আমরা দেখি পারস্পরিক আলাপ আলোচনা বা আন্তর্জাতিক শালিশের মাধ্যমে এ বিবাদের মীমাংসা হচ্ছেনা অথবা যদি আমরা দেখি, দ্বিতীয় পক্ষ বল প্রয়োগ করে এর মীমাংসা করতে উঠে পড়ে লেগেছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য বল প্রয়োগ করে এর মীমাংসায় পৌঁছানো সম্পূর্ণরূপে বৈধ হয়ে যাবে। কিন্তু উপরোক্ত আয়াত আমাদের ওপর এ নৈতিক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের এ বল প্রয়োগ পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পর হতে হবে এবং তা হতে হবে প্রকাশ্যে। লুকিয়ে গোপণে এমন ধরনের সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করা যার প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে আমরা প্রস্তুত নই, একটি অসদাচার ছাড় আর কিছুই নয়। ইসলাম এর শিক্ষা আমাদের দেয়নি।

গ. "কাজেই এ লোকদের যদি তোমরা যুদ্ধের মধ্যে পাও তাহলে তাদের এমনভাবে মার দেবে যেনো তাদের পরে অন্য যারা এমনি ধরনের আচরণ করতে চাইবে

তারা দিশা হারিয়ে ফেলে। আশা করা যায়, চুক্তি ভংগকারীদের এ পরিণাম থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।" (সূরা আনফাল ঃ ৫৭)

এর অর্থ হচ্ছে, যদি কোনো জাতির সাথে আমাদের চুক্তি হয়, তারপর তারা নিজেদের চুক্তির দায়িত্ব বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে আমরাও চুক্তির নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবো। এ ক্ষেত্রে আমরাও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ন্যায়সংগত অধিকার লাভ করবো। তাছাড়া যদি কোনো জাতির সাথে আমাদের যুদ্ধ চলতে থাকে এবং আমরা দেখি, শত্রুপক্ষের সাথে এমন এক সম্প্রদায়ের লোকেরাও যুদ্ধে শামিল হয়েছে যাদের সাথে আমাদের চুক্তি রয়েছে তাহলে আমরা তাদেরকে হত্যা করতে এবং তাদের সাথে শত্রুর মতো ব্যবহার করতে একটুও দ্বিধা করবোনা। কারণ তারা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের সম্প্রদায়ের চুক্তি ভংগ করে তাদের ধন প্রাণের নিরাপত্তার প্রশ্নে তাদের সম্প্রদায়ের সাথে আমাদের যে চুক্তি রয়েছে তা লংঘন করেছে। ফলে নিজেদের নিরাপত্তার অধিকার তারা প্রমাণ করতে পারেনি।

ঘ. "আর হে নবী, শত্রু যদি সন্ধি ও শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও সেদিকে ঝুঁকে পড়ো এবং আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করো। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন। যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায় তাহলে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।" (সূরা আনফাল ঃ ৬১-৬২)

অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতে তোমাদের কাপুরুষোচিত নীতি অবলম্বন করা উচিত নয়। বরং আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে নির্ভীক ও সাহসী নীতি অবলম্বন করা উচিত। শত্রু সন্ধির কথা আলোচনা করতে চাইলে নিসংকোচে তার সাথে আলোচনার টেবিলে বসে যাবার জন্য তৈরী থাকা প্রয়োজন। সে সদুদ্দেশ্যে সন্ধি করতে চায়না বরং বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়, এ অজুহাত দেখিয়ে তার সাথে আলোচনায় বসতে অস্বীকার করোনা। কারোর নিয়ত নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভবপর নয়। সে যদি সত্যিই সন্ধি করার নিয়ত করে থাকে তাহলে অনর্থক তার নিয়তের ব্যাপারে সন্ধিহান হয়ে রক্তপাতকে দীর্ঘায়িত করবে কেন? আর যদি বিশ্বাসঘাতকতা করার নিয়ত করে থাকে তাহলে তোমাদের আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে সাহসী হওয়া দরকার। সন্ধির জন্য যে হাত এগিয়ে এসেছে তার জবাবে হাত বাড়িয়ে দাও। এর ফলে তোমাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে। আর যুদ্ধ করার জন্য যে হাত উঠবে নিজের তেজস্বী বাহু দিয়ে তাকে ভেংগে গুঁড়ো করে দাও। এভাবে সমুচিত জবাব দিতে পারলে কোনো বিশ্বাসঘাতক জাতি আর তোমাদের ননীর পুতুল মনে করার দুঃসাহস দেখাবেনা।

উপরোক্ত পৃষ্ঠাগুলোতে যেসব আয়াত এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা কুরআনের রাজনৈতিক দর্শন ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান নীতিমালাকে পরিস্ফুট করে। কুরআন মানব জীবনের এই বিভাগ সম্পর্কে স্পষ্ট পথ নির্দেশনা দান করেছে। মুসলমানদের কর্তব্য হলো, নিজেদের যাবতীয় সামাজিক কার্যক্রম এগুলোর ভিত্তিতে পরিচালনা করা। কেবল এভাবেই তারা নিজেদের দীন ও ঈমানের দাবী পূরণে সক্ষম হবে।

চতুর্থ খন্ড

ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি

ষোড়শ অধ্যায়

অবশেষে আমরা গ্রন্থকারের সেই বিখ্যাত নিবন্ধটি সন্নিহিত করছি, যেটি তিনি ১৯৪০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সমিতির আহবানে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির স্ট্রেচি হলে পাঠ করেন। নিবন্ধের সে অংশটুকু এখানে সংযোজন করা হয়নি, যে অংশটি তখনকার বিশেষ অবস্থান সাথে সম্পর্কিত। ঘনিষ্ঠ প্রাসংগিকতার কারণে তরজমানুল কুরআন থেকে গ্রন্থকার প্রদত্ত কয়েকটি প্রশ্নোত্তরও এখানে সংযোজন করা হলো। -সংকলক

১. ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি

এ নিবন্ধে আমি সেই বিশেষ পদ্ধতির [Process] বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন অনুভব করছি, যার স্বাভাবিক পরিণতিতে ইসলামী রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে।

যে কোনো ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থাই যে কৃত্রিম পন্থায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা, সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুমাত্র জ্ঞান রাখেন, এমন সকলেই তা জানেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থা এক জায়গা থেকে তৈরী করে এনে অন্য জায়গায় স্থাপন করার মতো কোনো বস্তু নয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থা তো কোনো একটি সমাজের মধ্যকার নৈতিক চরিত্র, চিন্তা চেতনা, মন মানসিকতা, সভ্যতা সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ঐতিহ্যগত কার্যকারণের সমন্বিত কর্ম প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে জন্ম লাভ করে থাকে। এর জন্যে কিছুটা প্রাথমিক উপায় উপাদান [Prerequisites], কিছু সামাজিক ও সামষ্টিক চেষ্টা তৎপরতা এবং কিছু আবেগ উদ্দীপনা ও ঝোঁক প্রবণতা বর্তমান থাকা চাই, যেগুলোর সমন্বিত চাপের মুখে স্বাভাবিক পন্থায় রাষ্ট্র ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে থাকে। তর্ক শাস্ত্রে সূত্র বিন্যাসের ভিত্তিতে যেমন সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়, রসায়ন শাস্ত্রে রাসায়নিক বৈশিষ্ট সম্পন্ন উপাদানসমূহকে বিশেষ পন্থায় সংমিশ্রিত করলে যেমন সেগুলোর সমগুণ সম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থই প্রস্তুত হয়; ঠিক একইভাবে, সমাজ বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী, একটি রাষ্ট্র কেবল সেই পরিবেশের দাবির ফলশ্রুতিতেই জন্ম লাভ করে, যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় কোনো সমাজে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে। আর রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি হবে? তাও সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সমাজের সেই পরিবেশ ও দৃষ্টিভংগির উপর, যার চাপের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র জন্ম লাভ করেছে। যেমন, তর্ক শাস্ত্রে এক ধরনের সূত্র বিন্যাসের ফলশ্রুতিতে অন্য ধরনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ হতে পারেনা। যেমন, রসায়ন শাস্ত্রে সমবৈশিষ্ট সম্পন্ন রাসায়নিক উপাদানসমূহের সংমিশ্রণে একটি ভিন্নধর্মী যৌগিক পদার্থ তৈরী হতে পারেনা। যেমন, লেবু গাছ লাগানোর পর তা বড় হয়ে আম ফলাতে পারেনা। ঠিক তেমনি, উপায় উপাদান এবং কার্যকারণ যদি একটি বিশেষ প্রকৃতির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে হয়ে থাকে, আর সেগুলোর সমন্বিত কার্যক্রমও যদি হয় সেই বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রেরই আত্মপ্রকাশের অনুকূলে, তাহলে ক্রমবিকাশের পর্যায়সমূহ পার হয়ে রাষ্ট্র যখন পূর্ণতা লাভের দ্বার প্রান্তে উপনীত হবে, তখন এসব উপায় উপাদান ও কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তা কিছুতেই হতে পারেনা।

এ বক্তব্য থেকে আপনারা আমাকে অদৃষ্টবাদের [Determinism] প্রবক্তা মনে করবেননা। একথাও মনে করবেননা যে, আমি মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধিকারকে

অস্বীকার করছি। নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারণে ব্যক্তি ও সমষ্টির ইচ্ছাশক্তি এবং কার্যক্রমের ভূমিকা বিরাট। কিন্তু আমি আসলে একটি কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করছি। আর তাহলো, যে ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থাই সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য হবে, প্রথম থেকেই ঠিক সে ধরনের রাষ্ট্রের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল উপায় উপাদান সংগ্রহ করা এবং ঠিক সেই লক্ষ্যেই পৌঁছুবার মতো কর্মপন্থা অবলম্বন করা একান্ত অপরিহার্য। আমরা যে বিশেষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, সে প্রকৃতির রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে অবশ্যি ঠিক সেরকম আন্দোলন উত্থিত হতে হবে। সেরকম ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। সেই ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নেতৃত্ব এবং সেইরকম সামাজিক কার্যক্রম ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কারণ, এগুলো এই বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বাভাবিক দাবি। এসব উপায় উপাদান ও কার্যকারণ যখন সমন্বিতভাবে সংগৃহীত ও হস্তগত হয় এবং এক দীর্ঘ প্রাণান্তকর চেষ্টা সংগ্রামের পর সেগুলোর মধ্যে এমন অপ্রতিরোধ্য শক্তি ও বলিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়ে যায়, যার ফলে তাদের গড়া এই সমাজে অন্য কোনো ধরনের বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন এর অপরিহার্য স্বাভাবিক পরিণতিতে সেই বিশেষ রাষ্ট্র ব্যবস্থারই আত্মপ্রকাশ ঘটে, যার জন্যে এই সকল উপায় উপাদান ও কার্যকারণের শক্তি সমন্বিত ও সমষ্টিগতভাবে চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়েছে। যেমন একটি বীজ। তার থেকে অংকুরিত হলো একটি গাছ। তার অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহ তাকে প্রতিপালিত করে পৌঁছে দিলো একটি পর্যায়ে। তখন এ গাছ থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে সেই ফলই ফলতে থাকবে, যা ফলানোর জন্যে তার অভ্যন্তরীণ শক্তি ও উপায় উপাদানসমূহ দীর্ঘদিন ধরে রস সিঞ্চন করে আসছিল। এই নিগুঢ় সত্য বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে আপনাকে একটি কথা স্বীকার করে নিতেই হবে। তাহলো, আন্দোলন, নেতৃত্ব, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক চরিত্র এবং কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশলসহ প্রতিটি উপাদান যেখানে একটি বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সম্পূর্ণ অনুকূল ও উপযোগী তৎপরতায় বলিষ্ঠভাবে সক্রিয়, এই সবের পরিণামে সেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার আশা করাটা মূর্খতা, খামখেয়ালী, অসার অল্পনা এবং অনভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট

আমরা যে রাষ্ট্রকে "ইসলামী রাষ্ট্র" বলে আখ্যায়িত করছি, তার প্রকৃত স্বরূপটা কি? কি তার প্রকৃতি? কি তার ধরন? কি তার বৈশিষ্ট ও আসল পরিচয়? তা আমাদের ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার। ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট হচ্ছে, জাতীয়তাবাদের নামগন্ধও এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ জিনিসটিই ইসলামী রাষ্ট্রকে অন্য সকল প্রকার রাষ্ট্র থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এ হচ্ছে নিছক একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। এ ধরনের রাষ্ট্রকে আমি ইংরেজীতে [IDEOLOGICAL STATE] বলবো। এরূপ আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের সাথে মানুষ সব সময় পরিচিত ছিলোনা। আজও পৃথিবীতে এরূপ কোনো আদর্শিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নেই। প্রাচীনকালে মানুষ বংশীয় বা শ্রেণীগত রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত ছিলো। অতঃপর গোত্রীয় এবং জাতীয় রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত হয়। এমন একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের কথা মানুষ তার সংকীর্ণ মানসিকতায় কখনো স্থান দেয়নি, যার আদর্শ গ্রহণ করে নিলে বংশ, গোত্র, জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশীদার হয়ে যাবে। খৃষ্টবাদ এর একটি অস্পষ্ট নকশা লাভ করেছিলো। কিন্তু সেই পূর্ণাংগ চিন্তা কাঠামো তারা লাভ করেনি, যার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ফরাসী বিপ্লবে আদর্শিক রাষ্ট্রের একটি ক্ষীণ রশ্মি মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিলো বটে, কিন্তু তা অচিরেই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অন্ধ গহবরে তলিয়ে যায়। কমিউনিজম আদর্শিক রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপনেরও কোশেশ করে। এর ফলে বিশ্ববাসীর মনে আদর্শিক রাষ্ট্রের একটি ক্ষীণ ধারণাও জন্ম নিতে থাকে। কিন্তু অবশেষে এর ধমনীতেও ঢুকে পড়লো জাতীয়তাবাদের তীর্যক ভাবধারা। জাতীয়তাবাদ কমিউনিজমের আদর্শিক ধারণাকে ভাসিয়ে নিয়ে ডুবিয়ে দিলো সমুদ্রের তলদেশে। পৃথিবীর প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত একমাত্র ইসলামই হচ্ছে সেই আদর্শ পন্থা, যা জাতীয়তাবাদের যাবতীয় সংকীর্ণ ভাবধারা থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিরেট আদর্শিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। আর একমাত্র ইসলামই হচ্ছে সেই মহান আদর্শ, যা গোটা মানব জাতিকে তার এই আদর্শ গ্রহণ করে অজাতীয়তাবাদী বিশ্বজনীন রাষ্ট্র গঠনের আহবান জানায়।

বর্তমান বিশ্বে যেহেতু এমন একটি রাষ্ট্রের ধারণা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং যেহেতু বিশ্বের সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবস্থা এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই কেবল অমুসলিমরাই নয়, স্বয়ং মুসলমানরা পর্যন্ত এমন রাষ্ট্র এবং এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা

[IMPLICATIONS] অনুধাবন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। যারা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছে বটে, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার ধারণা গ্রহণ করেছে পুরোপুরিভাবে ইউরোপীয় ইতিহাস, রাজনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান [Social Science] থেকে, তাদের মনমস্তিষ্কে এরূপ আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা কিছুতেই স্থান পেতে পারেনা। উপমহাদেশের বাইরেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে, সেসব দেশেও এ ধরনের লোকদের হাতে যখন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এসেছে, জাতীয় রাষ্ট্র [National State] ছাড়া আর কোনো ধরনের রাষ্ট্রের কথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। কারণ, তাদের মনমস্তিষ্ক তো ইসলামের জ্ঞান, চেতনা এবং আদর্শিক রাষ্ট্রের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই উপমহাদেশেও যারা সে ধরনের শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেছে, তারাও এই জটিল সমস্যায় জর্জরিত। ইসলামী রাষ্ট্রের নাম মুখে এরা উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু যে শিক্ষা দীক্ষায় বেচারাদের মস্তিষ্ক গঠিত হয়েছে, তা থেকে ঘুরে ফিরে সেই "জাতীয় রাষ্ট্রের" চিত্রই বার বার তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে। জ্ঞানত কিংবা অজ্ঞতাবশত এরা কেবল জাতি পূজার [Nationalistic Ideology] বেড়াজালেই ফেঁসে যায়। তারা যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচির কথাই চিন্তা করুক না কেন, তা করে থাকে জাতীয়তাবাদেরই ভাবধারার ভিত্তিতে। ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গতানুগতিক ধারণা পোষণ করে। তারা মনে করে, 'মুসলমান' নামের যে 'জাতিটি' রয়েছে, তার হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিংবা অন্তত রাজনৈতিক নেতৃত্ব এলেই তা ইসলামী রাষ্ট্র হবে। আর এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে তারা যতোই চিন্তাভাবনা করে, অন্যান্য জাতির অবলম্বিত কর্মপন্থা ছাড়া নিজেদের সেই জাতিটির জন্যে অন্য কোনো কর্মপন্থা তাদের নযরে পড়েনা। এ ধারণাই তাদের মগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যেসব উপায় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে, তারাও সেসব উপায় উপাদানের সমন্বয়েই তাদের জাতিটিকে গঠন করবে। তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করে দেয়া হবে।[১] তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি করা হবে। জাতীয় গার্ডবাহিনী সংগঠিত করা হবে। গঠন করা হবে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী। যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, সেখানে গণতন্ত্রের স্বীকৃত নীতি 'সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন' [Majority Rule] এর ভিত্তিতে তাদের জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হবে। আর যেখানে তারা সংখ্যালঘু,

১. ১৯৪০ সালে যখন এই বক্তৃতাটি উপস্থাপন করা হয়, তখন এই উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে নিছক একটি জাতি মনে করে তাদেরকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সংগঠিত করার পরিণতি কারো বুঝে আসেনি বটে, কিন্তু ১৯৭১ সালে যখন ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মুসলমান থেকে মুসলমানকে বিভক্ত করে দিলো এবং স্বয়ং মুসলমানের হাতে মুসলমানের ইতিহাসের নযীরবিহীন গণহত্যা অনুষ্ঠিত হলো, তখন বিষয়টি সকলের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো। অতঃপর ১৯৭২ সালে বিশ্ববাসী সিন্ধুর ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চেহারাও দেখে নিলো। এ আন্দোলনের দাবি ছিলো সিন্ধুভাষী সকল মুসলমান অমুসলমান এক জাতি। আর সেখানকার যেসব মুসলমান সিন্ধু ভাষী নয়, তারা ভিন্নজাতি এবং তাদের সিন্ধুতে থাকার অধিকার নেই। (গ্রন্থকার)

সেখানে তাদের "অধিকার" সংরক্ষিত হবে। তারা মনে করে, তাদের স্বাতন্ত্র্য ঠিক সেভাবে সংরক্ষিত হওয়া উচিত, যেভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্রতিটি সংখ্যালঘু জাতি [National Minority] নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চায়। তারা চায়, শিক্ষা, চাকুরী এবং নির্বাচনী সংস্থাসমূহে নিজেদের কোটা নির্ধারিত হবে। নিজেদের প্রতিনিধি নিজেরা নির্বাচন করবে। একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মন্ত্রী সভায় তাদের শরীক করানো হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি জাতীয়তাবাদী চিন্তা তাদের চিন্তাশক্তিকে গ্রাস করে রেখেছে। এসব জাতীয়তাবাদী চিন্তা প্রকাশ করার সময় তারা উম্মাহ, জামায়াত, মিল্লাত, আমীর, ইতায়াত প্রভৃতি ইসলামী পরিভাষাই মুখে উচ্চারণ করে। কিন্তু এই শব্দগুলো তাদের জন্যে জাতীয় ধর্মবাদের জন্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীরই সমার্থক। সৌভাগ্যবশত তারা এ শব্দগুলো পুরানো ভান্ডারে তৈরী করাই পেয়ে গেছে এবং এগুলো দিয়ে তাম্র মুদ্রার উপর স্বর্ণমুদ্রার মোহরাংকিত করার সুবিধা পাচ্ছে।

আপনারা যদি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের সঠিক পরিচয় উপলব্ধি করে নিতে পারেন, তাহলে একথাটি বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হবেনা যে, এরূপ জাতীয়তাবাদী চিন্তাপদ্ধতি, কর্মসূচি এবং আন্দোলন প্রক্রিয়া দ্বারা আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ এ মহান কাজের সূচনাই হতে পারেনা। সত্য কথা বলতে কি, জাতীয়তাবাদের প্রতিটি অংগ একেকটি তীক্ষ্ণধার কুঠারের মতো, যা আদর্শিক রাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাত করে তাকে বিনাশ করে দেয়। আদর্শবাদী রাষ্ট্র যে ধারণা [IDEA] পেশ করে, তার মূল কথাই হচ্ছে, আমাদের সামনে 'জাতি' বা 'জাতীয়তাবাদের' কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের সম্মুখে রয়েছে শুধু মানুষ বা মানব জাতি। তাদের কাছে আমরা এক মহান আদর্শ এ উদ্দেশ্যে পেশ ও প্রচার করবো যে, এই আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্যেই তাদের সকলের কল্যাণ ও সাফল্য নিহিত রয়েছে। এই আদর্শ গ্রহণকারী সকল মানুষ ঐ আদর্শিক রাষ্ট্রটি পরিচালনায় সমান অংশীদার।

এবার একটু চিন্তা করে দেখুন, যে ব্যক্তির মন মগজ, ভাষা বক্তব্য, কাজ কর্ম তৎপরতা প্রভৃতি প্রতিটি জিনিসের উপর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও জাতিপূজার মোহরাংকিত হয়ে আছে, সে কী করে এই মহান বিশ্বজনীন আদর্শিক দৃষ্টিভংগি নিয়ে চলতে সক্ষম হবে? সংকীর্ণ জাতি পূজায় অন্ধ বিভোর হয়ে সে নিজের হাতেই তো বিশ্বমানবতাকে আহবান জানাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। প্রথম কদমেই তো সে নিজের পজিশনকে ভ্রান্তির বেড়াজালে নিমজ্জিত করেছে। বিশ্বের যেসব জাতি জাতীয়তাবাদী বিদ্বেষ অন্ধ হয়ে আছে, জাতি পূজা এবং রাষ্ট্রই যাদের সমস্ত ঝগড়া লড়াইর মূল কারণ, তাদের পক্ষে বিশ্ব মানবতাকে কল্যাণের আদর্শের প্রতি আহবান করা সম্ভব নয়। যারা নিজেদের জাতীয় রাষ্ট্র এবং নিজ জাতির অধিকারের জন্যে ঝগড়ায় নিমজ্জিত, তারা কি বিশ্বমানবতার কল্যাণের কথা চিন্তা করতে পারে?

মানুষকে মামলাবাজী থেকে ফিরানোর আন্দোলন আদালতে মামলা দায়ের করার মাধ্যমে আরম্ভ করা কি যুক্তি সংগত কাজ হতে পারে?

আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক রাষ্ট্র

ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হলো, তার গোটা অট্টালিকা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধারণার মূল কথা[১] হলো, বিশ্ব সাম্রাজ্য আল্লাহ্‌র। তিনিই এ বিশ্বের সার্বভৌম শাসক। কোনো ব্যক্তি, বংশ, শ্রেণী, জাতি, এমনকি গোটা মানব জাতিরও সার্বভৌমত্বের [Sovereignty] বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। আইন প্রণয়ন এবং নির্দেশ দানের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে নির্দিষ্ট। এই রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে, এখানে মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। আর এ প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা মানুষ সঠিকভাবে লাভ করতে পারে মাত্র দুটি পন্থায়। হয়তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সরাসরি কোনো মানুষের নিকট আইন রাষ্ট্রীয় বিধান অবতীর্ণ হবে এবং তিনি তা অনুসরণ ও কার্যকর করবেন। কিংবা মানুষ সেই ব্যক্তির অনুসরণ ও অনুবর্তন করবে, যার নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আইন ও বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। এই খিলাফত পরিচালনার কাজে এমন সকল লোকই অংশীদার হবে, যারা এই আইন ও বিধানের প্রতি ঈমান আনবে এবং তা অনুসরণ ও কার্যকর করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। তাদেরকে এরূপ স্থায়ী অনুভূতির সাথে এ মহান কার্য পরিচালনা করতে হবে যে, সামষ্টিকভাবে আমাদের সকলকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেককে এর জন্যে সেই মহান আল্লাহ্‌ তায়ালার সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে, গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই যার অবগতিতে রয়েছে। যার জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই গোপন থাকতে পারেনা। মৃত্যুর পরও যার কর্তৃত্বের দাপট থেকে কোনো মানুষ রেহাই পাবেনা। এই চিন্তা প্রতিটি মুহূর্ত তাদের এ অনুভূতিকে জাগ্রত রাখবে যে, মানুষের উপর নিজেদের হুকুম ও কর্তৃত্ব চালানোর জন্যে, জনগণকে নিজেদের গোলাম বানানোর জন্যে, তাদেরকে নিজেদের সম্মুখে মাথা নতো করতে বাধ্য করার জন্যে, তাদের থেকে ট্যাক্স আদায় করে নিজেদের জন্যে বিলাসবহুল অট্টালিকা নির্মাণ করার জন্যে, আর স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিলাসিতা, আত্মপূজা এবং হঠকারিতার সামগ্রী পূঞ্জীভূত করার জন্যে আমাদের উপর খিলাফতের এই মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। বরঞ্চ এই বিরাট দায়িত্ব আমাদের উপর এজন্যে অর্পিত হয়েছে, যেনো আমরা আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর তাঁরই দেয়া ন্যায়ভিত্তিক আইন ও বিধান কার্যকর করি এবং নিজেরা নিজেদের জীবনে তা পুরোপুরি অনুসরণ ও কার্যকর করি। এই বিধানের অনুসরণ অনুবর্তন এবং তা কার্যকর করার ব্যাপারে আমরা যদি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করি, এ কাজে যদি অণু পরিমাণ স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বিদ্বেষ, পক্ষপাতিত্ব কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার অনুপবেশ ঘটাই, তাহলে আল্লাহ্‌র আদালতে এর

---

১. এ বিষয়ে গ্রন্থের প্রথম দিকের অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

শাস্তি অবশ্যি আমাদের ভোগ করতে হবে, দুনিয়ার জীবনে শাস্তি ভোগ থেকে যতোই মুক্ত থাকিনা কেন।

এ মহান আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় অট্টালিকা তার মূল ও কান্ড থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর শাখা প্রশাখা পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে ধর্মহীন রাষ্ট্র [Secular States] থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে থাকে। তার গঠন প্রক্রিয়া, স্বভাব প্রকৃতি সবকিছুই সেক্যুলার রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন এক বিশেষ ধরনের মানসিকতা। এক স্বতন্ত্রধর্মী চরিত্র বৈশিষ্ট। এক অনুপম কর্মনৈপূণ্য। এ রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, কোর্ট কাচারী, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আইন কানুন, কর, খাজনা পরিচালনা পদ্ধতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ, সন্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়ই ধর্মহীন রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি ইসলামী রাষ্ট্রের কেরানী, বরঞ্চ চাপরাশী হবারও যোগ্য নয়। সে রাষ্ট্রের পুলিশ ইনেস্পেক্টর জেনারেল ইসলামী রাষ্ট্রের একজন সাধারণ কনষ্টেবল হবারও যোগ্যতা রাখেনা। ধর্মহীন রাষ্ট্রের ফিল্ড মার্শাল এবং জেনারেলরা ইসলামী রাষ্ট্রে সাধারণ সিপাহী পদেও ভর্তি হবার যোগ্যতা রাখেনা। তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো পদ পাওয়া তো দূরের কথা, তার মিথ্যাচার, ধোকাবাজি এবং বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হয়তো কারাগারের নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকেও রক্ষা পাবেনা।

মোট কথা, ধর্মহীন সেক্যুলার রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী করে যেসব লোক তৈরী করা হয়েছে এবং সে ধরনের রাষ্ট্রের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে যাদের নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক, ভোটার, কাউন্সিলার, কর্মকর্তা, সিপাহী, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তা, সেনা প্রধান, রাষ্ট্রদূত, মন্ত্রীবর্গ, মোটকথা নিজেদের সমাজ জীবনের প্রতিটি বিভাগ, পরিচালিকা যন্ত্রের প্রতিটি অংশ সম্পূর্ণ নতুন ভাবে নিজস্ব আদর্শের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে হবে। এ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন এমন সব লোকের, যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহ্‌র ভয়। যারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে নিজেদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে বলে অনুভূতি রাখে। যারা দুনিয়ার উপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের দৃষ্টিতে নৈতিক লাভ ক্ষতি পার্থিব লাভ ক্ষতির চাইতে অনেক মূল্যবান। যারা সর্বাবস্থায় সেসব আইন কানুন, নিয়মনীতি ও কর্মপন্থার অনুসরণ করবে, যা তাদের জন্যে বিশেষভাবে প্রণীত হয়েছে। যাদের যাবতীয় চেষ্টা তৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বার্থের দাসত্ব আর কামনা বাসনার গোলামীর জিঞ্জির থেকে যাদের গর্দান সম্পূর্ণ মুক্ত। হিংসা বিদ্বেষ আর দৃষ্টির সংকীর্ণতা থেকে যাদের মন মানসিকতা সম্পূর্ণ পবিত্র। ধন সম্পদ ও ক্ষমতার নেশায় যারা উম্মাদ হবার নয়। ধন দৌলতের লালসা আর ক্ষমতার লিপ্সায় যারা কাতর নয়। এরূপ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে এমন নৈতিক বলিষ্ঠতার অধিকারী একদল লোক প্রয়োজন, পৃথিবীর ধনভান্ডার হস্তগত হলেও, যারা

নিখাঁদ আমানতদার প্রমাণিত হবে। ক্ষমতা হস্তগত হলে জনগণের কল্যাণ চিন্তায় যারা বিনিদ্র রজনী কাটাবে। আর জনগণ যাদের সুতীব্র দায়িত্বানুভূতিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণাধীনে নিজেদের জানমাল, ইজ্জত আবরুসহ যাবতীয় ব্যাপারে থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন এমন একদল লোকের, যারা কোনো দেশে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলে সেখানকার লোকেরা গণহত্যা, জনপদের ধ্বংসলীলা, যুলুম নির্যাতন, গুন্ডামী বদমায়েশী এবং ব্যভিচারের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হবেনা। বরঞ্চ বিজিত দেশের অধিবাসীরা এদের প্রতিটি সিপাহীকে পাবে তাদের জানমাল, ইজ্জত আবরু ও নারীদের সতীত্বের পূর্ণ হিফাযতকারী। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তারা এতোটা সুখ্যাতি ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে যে, তাদের সততা, সত্যাবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিক ও চারিত্রিক মূলনীতির অনুসরণ এবং প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি পালনের ব্যাপারে গোটা বিশ্ব তাদের উপর আস্থাশীল হবে। এ ধরনের এবং কেবলমাত্র এ ধরনের লোকদের দ্বারাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কেবলমাত্র এরূপ লোকেরই ইসলামী হুকুমত পরিচালিত করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে ঐসব বস্তুবাদী স্বার্থান্বেষী [Utilitarian Mentality] লোকদের দ্বারা এরূপ একটি ইসলামী রাষ্ট্র কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতে পারেনা। বরং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এরূপ লোকদের অস্তিত্ব অট্টালিকার অভ্যন্তরে উইপোকার অস্তিত্বের মতোই বিপজ্জনক। এরা পার্থিব স্বার্থ এবং ব্যক্তি ও জাতির স্বার্থে নিত্য নতুন নীতিমালা তৈরী করে। এদের মগজে না আছে আল্লাহ্‌র ভয়, না পরকালের। বরঞ্চ তাদের সমগ্র চেষ্টা তৎপরতার এবং নিত্য নতুন পলিসির মূলকথা হচ্ছে কেবলমাত্র পার্থিব লাভ লোকসানের 'ধান্দা'।

৩. ইসলামী বিপ্লবের পথ

এতোক্ষণ ইসলামী রাষ্ট্রের যে রূপরেখা অংকন করা হলো, তার পূরো চিত্র স্মরণ রেখে চিন্তা করে দেখুন, এই লক্ষ্যে পৌঁছোবার সত্যিকার কর্মপন্থা কি হতে পারে? আগেই বলেছি, কোনো একটি সমাজের মধ্যকার নৈতিক চরিত্র, চিন্তা চেতনা, মন মানসিকতা, সভ্যতা সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ঐতিহ্যগত কার্যকারণের সমন্বিত কর্ম প্রক্রিয়ার ফলেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নিয়মে ঠিক সে ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে। একটি গাছ অংকুরিত হওয়া থেকে আরম্ভ করে পূর্ণাংগ গাছে পরিণত হওয়া পর্যন্ত যদি তা লেবু গাছ হিসেবে পরিগঠিত হয়ে থাকে, তবে ফল ফলানোর সময় হঠাৎ করে সে গাছ কিছুতেই আম ফলাতে পারেনা। ঠিক তেমনি, ইসলামী রাষ্ট্রেরও অলৌকিকভাবে আবির্ভাব ঘটেনা। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে প্রথমে এমন একটি আন্দোলন উত্থিত হওয়া অপরিহার্য, যার বুনিয়াদ নির্মিত হবে সেই জীবন দর্শন, সেই জীবনোদ্দশ্য, সেই নৈতিক মানদন্ড এবং সেই চারিত্রিক আদর্শের উপর, যা হবে ইসলামের প্রাণশক্তির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কেবল সেসব লোকেরাই ঐ আন্দোলনের নেতা ও কর্মী হবার যোগ্যতা রাখবে, যারা মানবতার এই বিশেষ ছাঁচে ঢেলে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে প্রস্তুত হবে। সেইসাথে সমাজে অনুরূপ মনমানসিকতা ও নৈতিক প্রাণশক্তি প্রচারের জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাবে। অতঃপর এই একই বুনিয়াদের উপর এমন এক নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা ঐ বিশেষ টাইপের লোক তৈরী করবে। যা থেকে সৃষ্টি হবে এমন সব মুসলিম বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ, আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদ, মোটকথা জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় এমনসব বিশেষজ্ঞ তৈরী হবে, যারা নিজেদের মনমানসিকতা, ধ্যানধারণা ও চিন্তা দর্শনের দিক থেকে হবে পূর্ণ মুসলিম। যাদের ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে বাস্তবধর্মী এক পূর্ণাংগ যোগ্যতা। যারা খোদাদ্রোহী চিন্তানায়কদের মুকাবিলায় নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব [Intellectual leadership] কে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার পূর্ণ সামর্থ রাখবে।

এই চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতেই ইসলামী আন্দোলনকে সমাজের বুকে ছড়িয়ে থাকা ভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রামে আন্দালনের নেতৃবৃন্দকে বিপদ মুসীবত ও অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে, ত্যাগ ও কুরবানীর নযরানা পেশ করে, মার খেয়ে খেয়ে এবং জীবন দিয়ে দিয়ে নিজেদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও মজবুত সিদ্ধান্তের প্রমাণ পেশ করতে হবে। পরিক্ষার চুল্লীতে দগ্ধ হয়ে তাদের খাঁটি সোনায় পরিণত হতে হবে। যেনো যে কোনো লোক তাদের নিখাঁদ

খাঁটি [Finest standard] সোনাই দেখতে পায়। সংগ্রামের ময়দানে যে আদর্শের পতাকাবাহী হিসেবে তারা অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের প্রতিটি কথা কাজে সে আদর্শ প্রতিফলিত হতে হবে। তাদের প্রতিটি কথা দ্বারা যেনো দুনিয়ার সামনে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এমন নিষ্কলুষ, নিঃস্বার্থ, সত্যবাদী, পূতচরিত্র, ত্যাগী, নীতিবান ও খোদাভীরু লোকেরা মানবতার কল্যাণের জন্যে যে আদর্শিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহবান জানাচ্ছে, তাতে অবশ্যি মানুষের জন্যে সুবিচার, শান্তি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এ ধরনের চেষ্টা সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজের সেসব লোকই ধীরে ধীরে এই আন্দোলনে শরীক হয়ে যাবে, যাদের প্রকৃতিতে সত্য ও সততার কিছু না কিছু উপাদন বিদ্যমান রয়েছে। এর মুকাবিলায় হীন চরিত্র ও নিকৃষ্ট পথের অনুসারীদের প্রভাব ধীরে ধীরে সমাজ থেকে বিলীন হয়ে যেতে থাকবে। জনগণের চিন্তা চেতনায় সৃষ্টি হবে এক প্রচন্ড বিপ্লব। সমাজ জীবনে উত্থিত হবে সেই বিশেষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার তীব্র দাবি। তখন এই পরিবর্তিত মানসিকতার সমাজে অপর কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু থাকার পথ হয়ে যাবে সম্পূর্ণ রুদ্ধ। অবশেষে, এক অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক পরিণতির ফলে সেই কাংখিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যার জন্যে দীর্ঘদিন থেকে যমীনকে তৈরী করা হয়েছে। এভাবে সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে পূর্বোল্লিখিত শিক্ষা ব্যবস্থার বদৌলতে, তা পরিচালনার জন্যে একেবারে নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী থেকে নিয়ে মন্ত্রী ও গর্ভনর পর্যায় পর্যন্ত শ্রেণীর কর্মচারী ও কর্মকর্তা সেখানে মওজূদ পাওয়া যাবে।

এ হচ্ছে সেই বিপ্লবের চিত্র ও সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক পন্থা, যাকে ইসলামী বিপ্লব ও ইলামী রাষ্ট্র বলা হয়। পৃথিবীর সকল বিপ্লবের ইতিহাস আপনাদের সামনে রয়েছে। একথা আপনাদের অজানা থাকার কথা নয় যে, একটি বিশেষ ধরনের বিপ্লব ঠিক সেই ধরনের আন্দোলন, অনুরূপ নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী, অনুরূপ সামষ্টিক ও সামাজিক চেতনা এবং অনুরূপ সাংস্কৃতিক ও নৈতিক পরিবেশই দাবি করে। ফরাসী বিপ্লবের জন্যে সেই বিশেষ ধরনের নৈতিক ও মানসিক ভিত রচনারই প্রয়োজন ছিলো, যা তৈরী করেছিলেন রুশো, ভল্টেয়ার ও মন্টেস্কোর মতো দার্শনিক। কার্ল মাক্সের দর্শন এবং লেনিন ও ট্রটস্কির নেতৃত্ব আর হাজার হাজার সমাজতান্ত্রিক কর্মীর ত্যাগের বদৌলতেই রুশবিপ্লব সম্ভব হয়েছিল। জার্মানীর জাতীয় সমাজতন্ত্রের পক্ষে সেই বিশেষ নৈতিক, মনস্তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক মাটিতেই শিকড় গাড়া সম্ভব হয়েছিল, যা সৃষ্টি করেছিল হেগেল, ফিস্‌টে, গ্যেটে এবং নিটশের মতো অসংখ্য চিন্তাবিদদের দর্শন ও মতাদর্শ, আর হিটলারের দুর্ধর্ষ নেতৃত্ব। ঠিক তেমনি, ইসলামী বিপ্লবও কেবল তখনি সংঘটিত হতে পারবে, যখন কুরআনী দর্শন ও মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের ভিত্তিতে একটি প্রচন্ড গণআন্দোলন উত্থিত হবে এবং সামাজিক জীবনের মানসিক, নৈতিক, মনস্তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিসমূহকে সংগ্রামের প্রচন্ডতায় আমূল পরিবর্তিত করে দেয়া সম্ভব হবে।

৪. ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা

ইসলামী বিপ্লবের জন্যে সমাজ জীবনের পরিবর্তন এবং তা সম্পূর্ণ নতুনভাবে পরিগঠন করার সঠিক পন্থা কি? এবার আমি সংক্ষিপ্তাকারে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বর্ণনার মাধ্যমে তা আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করতে চাই। তাছাড়া এই সংগ্রামকে সফলতার শিখরে পৌঁছে দেবার যথার্থ কর্মপন্থাই বা কি? তাও পরিষ্কার করতে চাই।

ইসলাম হচ্ছে সেই মহান আন্দোলনের নাম, যা মানব জীবনের গোটা ইমারত নির্মাণ করতে চায় এক আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের দৃষ্টিভংগির উপর। সেই অতি প্রাচীন কাল থেকেই এ আন্দোলন এই একই ভিত্তি ও পন্থায় চলে আসছে। আল্লাহ্র রসূলগণই [প্রতিনিধিগণ] ছিলেন এ আন্দোলনের নেতা। তাই আমাদেরকেও যদি এ আন্দোলন পরিচালনা করতে হয়, তবে তা অবশ্যি এই সকল নেতৃবৃন্দের পদ্ধতিতেই করতে হবে। কারণ, এছাড়া এ বিশেষ ধরনের আন্দোলনের জন্যে অপর কোনো কর্মপন্থা নেই এবং হতে পারেনা।

এ প্রসংগে আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস্ সালামের পদচিহ্ন অনুসন্ধান শুরু করলেই আমাদেরকে একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাহলো, প্রাচীন কাল থেকে যেসব আম্বিয়ায়ে কিরাম অতীত হয়েছেন, তাঁদের কার্যক্রম সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত কিছুই জানতে পারিনা। কুরআনের সংক্ষিপ্ত ইশারা ইংগিত থেকে তাঁদের কার্যক্রম সম্পর্কে সামান্য ধারণা লাভ করা যায় বটে, কিন্তু তা দ্বারা পূর্ণাংগ স্কীম তৈরী করা যেতে পারেনা। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে সাইয়্যেদুনা ঈসা আলাইহিস সালামের কিছু বাণী পাওয়া যায় [যা তাঁর বাণী বলে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়], তা থেকে ইসলামী আন্দোলনের সূচনাকাল সম্পর্কে কিছুটা ইংগিত পাওয়া যায় মাত্র। জানা যায়, একেবারে প্রারম্ভিক অধ্যায়ে এ আন্দোলন কিভাবে পরিচালনা করতে হয় এবং কি কি সমস্যার সম্মখীন তাকে হতে হয়। কিন্তু আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়গুলো সম্পর্কে সেখানে কোনো ইংগিতই পাওয়া যায়না। কারণ, সেসব অধ্যায় ঈসা আলাইহিস্ সালামের জীবনে আসেনি।

এ ব্যাপারে আমরা কেবল এক জায়গা থেকেই পূর্ণাংগ ও সুস্পষ্ট পথ নির্দেশনা পাই। তাহলো, মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিন্দেগী। নিছক ভক্তি ও ভালবাসার কারণেই আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করছিনে, বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষেই এ আন্দোলনের যাবতীয় চড়াই উৎরাই ও বাঁধা বিপত্তির জগদ্দলে ভরা দীর্ঘ পথ কিভাবে

পাড়ি দিতে হবে, তা জানার জন্যে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে আমরা বাধ্য। ইসলামী আন্দোলনের সকল নেতার মধ্যে কেবলমাত্র মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সেই একক নেতা যাঁর জীবনে আমরা ইসলামী আন্দোলনের প্রারম্ভিক দাওয়াতী অধ্যায় থেকে নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাষ্ট্রের ধরন, শাসনতন্ত্র, অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র বিষয়ক পলিসি এবং আইন শৃংখলা ও প্রতিরক্ষা পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি অধ্যায় ও বিভাগ সম্পর্কে পূর্ণাংগ ও সুপ্রমাণিত বিস্তারিত তথ্যাবলী পাই। সুতরাং, আমি এই একমাত্র উৎসটি থেকেই যথাযথ কর্মপন্থার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি।

আপনাদের জানা আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে আদিষ্ট হন, তখন সারা বিশ্বে নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসংখ্য সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন ছিলো। রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যবাদ তখন বর্তমান ছিলো। শ্রেণী বৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছিল। অবৈধ অর্থনৈতিক ফায়দা [Economic Exploitation] লুটার প্রতিযোতিা চলছিল। আর সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তার লাভ করেছিল নৈতিক অপরাধের জাল। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বদেশে ছিলো অসংখ্য জটিল সমস্যা। এসব জটিল সমস্যার সমাধানের জন্যে দেশ ছিলো একজন সুযোগ্য লীডারের অপেক্ষায় উদগ্রীব।

তাঁর গোটা দেশ ও জাতি ছিলো অজ্ঞতা নৈতিক অধঃপতন, দারিদ্র ও দীনতা এবং ব্যভিচার ও পারস্পরিক কলহ বিবাদে চরমভাবে নিমজ্জিত। কুয়েত থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণের গোটা উপকূল এলাকা এবং উর্বর শস্য শ্যামল ইরাক প্রদেশ পারস্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রেখেছিল জবর দখল করে। উত্তর দিকে রোম শাসকরা হিজাযের সীমানা পর্যন্ত বিস্তার করে রেখেছিল তাদের সাম্রাজ্যবাদী থাবা। ইহুদী পূজিপতিরা স্বয়ং হিজাযের অর্থনীতিকেই করছিল নিয়ন্ত্রণ। গোটা আরবের লোকদের তারা আবদ্ধ করে রেখেছিল চক্রবৃদ্ধি সুদের অক্টোপাশে। তাদের শোষণ নিপীড়ন পৌঁছে গিয়েছিল চরম সীমানায়। পশ্চিম উপকূলের সোজা অপর পাড়ে হাবশায় প্রতিষ্ঠিত ছিলো খৃষ্টান রাষ্ট্র। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে এরাই আক্রমণ চালিয়েছিল মক্কায়। হিজায এবং ইয়েমেনের মধ্যবর্তী প্রদেশ নাজরানে বাস করতো এই খৃষ্টানদেরই স্বজাতির লোকেরা। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ছিলো তারা জোটবদ্ধ। এমন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশেই অবস্থান করছিল তখনকার আরব দেশ, নবীর স্বদেশ।

কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্যে যে মহান নেতাকে নিযুক্ত করেন, তিনি গোটা বিশ্বের, এমনকি স্বদেশের এতোসব জটিল সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যার প্রতিও মনোনিবেশ করেননি। সকল সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি কেবল একটি দিকেই মানুষকে আহবান জানালেন ঃ

"হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর সকল প্রভুত্ব শক্তিকে অস্বীকার করো, পরিত্যগ করো এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব ও আনুগত্য মেনে নাও।"

এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর দৃষ্টিতে এই একটি ছাড়া অন্য সকল সমস্যার কোনা গুরুত্বই ছিলোনা, কিংবা সেগুলো কোনো গুরুত্ব পাবারই উপযুক্ত ছিলনা। আপনারা

জানেন পরবর্তীকালে তিনি এ সবগুলো সমস্যার প্রতি নযর দেন। একটি একটি করে সবগুলো সমস্যা সমাধান করেন। প্রাথমিক অবস্থায় এসব সমস্যা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে শুধু মাত্র একটি বিষয়ের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেয়া এবং তার সমাধানেই সকল শক্তি নিয়োগ করার পেছনে ছিলো বাস্তব কারণ। এর মধ্যেই নিহিত ছিলো সকল সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি। ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের নৈতিক ও সামাজিক জীবনে যতো অধঃপতনই সৃষ্টি হোক না কেন, সেগুলোর মূলীভূত কারণ হলো, মানুষের নিজেকে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী [Independent] এবং দায়িত্বহীন [Irresponsible] মনে করা। অন্য কথায়, নিজেকেই নিজের ইলাহ বানিয়ে নেয়া। কিংবা এর কারণ হলো, মানুষ কর্তৃক বিশ্বজাহানের একমাত্র ইলাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকেও হুকুমকর্তা ও সার্বভৌম শক্তি হিসেবে মেনে নেয়া। চাই সে মানুষ হোক কিংবা অন্য কিছু। ইসলামারে দৃষ্টিতে এই বুনিয়াদী ভুলকে তার অবস্থানের উপর বহাল রেখে কোনো প্রকার বাহ্যিক সংশোধন দ্বারা ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক অধঃপতন ও বিপর্যয় বিদূরিত করার ব্যাপারে কিছুতেই সফলতা লাভ করা যেতে পারেনা। এমতাবস্থায় এক স্থানের কোনো একটি অপরাধ সংস্কার করা হলেও অন্য জায়গা দিয়ে তা মাথা গজিয়ে উঠবে। সুতরাং কার্যকর সংশোধনের সূচনা কেবল একটি পন্থায়ই করা যেতে পারে। আর তাহলো, মানুষের মন মগজ থেকে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতার ধারণা নির্মূল করে দিতে হবে। তার মগজে একথা বসিয়ে দিতে হবে যে, তুমি যে জগতে বাস করছো, তা কোনো সম্রাট বা শাসকবিহীন সাম্রাজ্য নয়। নিঃসন্দেহে এ জগতের একজন বাদশাহ রয়েছেন। তাঁর কর্তৃত্ব কারো স্বীকৃতির মুখাপেক্ষী নয়। তাঁর কর্তৃত্ব মিটিয়ে দেয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর সাম্রাজ্য থেকে অন্য কোথাও বেরিয়ে যাবার শক্তি তোমার নেই। তাঁর এই শাশ্বত ও অলংঘনীয় কর্তৃত্বের অধীনে অবস্থান করে নিজেকে স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী মনে করাটা তোমার পক্ষে এক বিরাট বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার পরিণতি তোমাকেই ভোগ করতে হবে। তুমি যদি বুদ্ধিমান ও বাস্তববাদী হয়ে থাকো, তবে বুদ্ধিমত্তা ও বাস্তববাদীতার [Realism] দাবি হলো, সেই মহান সম্রাটের হুকুমের সম্মুখে মাথা নতো করে দাও। তাঁর একান্ত অনুগত দাস হয়ে থাকো।

অপরদিকে, বাস্তবতার এই দিকটিও ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া দরকার। তাহলো, এই গোটা বিশ্বজগতের কেবলমাত্র একজনই সম্রাট, একজনই মালিক এবং একজনই স্বাধীন সার্বভৌম কর্তা রয়েছেন। এখানে অপর কারো কর্তৃত্ব চলেনা। সুতরাং তুমি তাঁর ছাড়া কারো দাস হয়োনা। অপর কারো কর্তৃত্ব স্বীকার করোনা। অপর কারো সামনে মাথা নতো করোনা। এখানে "হিজ হাইনেজ" কেউ নেই। সকল হাইনেস শুধুমাত্র সেই একমাত্র সত্তার জন্যেই নির্দিষ্ট। এখানে 'হিজ হোলিনেস' কেউ নেই। সমস্ত 'হোলিনেস' কেবলমাত্র সেই একমাত্র শক্তির জন্যেই নির্ধারিত। এখানে 'হিজ লর্ডশীপ' কেউ নেই। পূর্ণাংগ 'লর্ডশীপ' কেবল সেই সত্তার। এখানে বিধানকর্তা কেউ নেই। আইন ও বিধানকর্তা কেবলমাত্র তিনি এবং কেবলমাত্র তাঁরই হওয়া উচিত। এখানে অন্য কোনো সরকার নেই। অন্নদাতা নেই। অলী ও কর্মকর্তা নেই। নেই কেউ ফরিয়াদ শুনার

যোগ্য। ক্ষমতার চাবিকাঠি কারো কাছে নেই। কারো কোনো প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদা নেই। যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত সবাই এবং সবকিছু কেবল দাসানুসদাস। সমস্ত মালিকানা, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের। তিনিই একমাত্র 'রব' এবং 'মাওলা'। সুতরাং, তুমি সকল প্রকার গোলামী, আনুগত্য ও শৃংখলকে অস্বীকার করো। কেবলমাত্র তাঁরই গোলাম, অনুগত এবং হুকুমের অধীন হয়ে যাও। এটাই হচ্ছে সকল প্রকার সংস্কার সংশোধনের মূলভিত্তি। এই ভিত্তির উপরই ব্যক্তিগত চরিত্র এবং সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণাংগ অট্টালিকা সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে উঠে। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হবে, তা সবই একমাত্র এই বুনিয়াদী পন্থায়ই সমাধান হওয়া সম্ভব।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি, ভূমিকা এবং প্রারম্ভিক কার্যক্রম ছাড়াই সরাসরি এই মৌলিক সংশোধনের আহবান জানান। এই আহবানের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছা পর্যন্ত তিনি কোনো প্রকার বাঁকাচোরা পথ অবলম্বন করেননি। এ উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাজ করে মানুষের উপর কৌশলগত প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। এভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করে ধীরে ধীরে স্বীয় লক্ষ্যে উপনীত হতে পারতেন। কিন্তু এসবের কিছুই তিনি করেননি। বরঞ্চ আমরা দেখি, হঠাৎ আরবের বুকে একব্যক্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্- আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।' তাঁর দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যেও এই মৌলিক ঘোষণার চাইতে নিম্নতর কোনো কিছুর প্রতি নিবদ্ধ হয়নি। কেবল নবী সুলভ সাহসিকতা আর আবেগ উদ্যমই এর কারণ নয়। বস্তুত এটাই ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃত কর্মপন্থা। এছাড়া অন্যান্য উপায়ে যে প্রভাব, কার্যকরিতা ও কর্তৃত্ব সৃষ্টি হয়, এই মহান সংস্কার কাজের জন্যে তা কিছুমাত্র সহায়ক নয়। যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর মৌলিক আদর্শ ছাড়া অন্য কোনো কারণে আপনার সহযোগী হয়, এই মহান পূণর্গঠনের কাজে তারা আপনার কোনো উপকারে আসতে পারেনা।

এই মহান কাজে কেবল সেসব লোকই আপনার সহায়ক ও সহযোগী হতে পারে, যারা শুধুমাত্র 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহুর' আওয়ায শুনে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ মহাসত্যকেই জীবনের বুনিয়াদ ও জীবনোদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয় এবং এরি ভিত্তিতে কাজ করতে প্রস্তুত হয়। সুতরাং ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্যে যে বিশেষ ধরনের চিন্তা ও কর্মকৌশল প্রয়োজন, তার দাবিই হচ্ছে, কোনো প্রকার ভূমিকা ও ভনিতা ছাড়াই সরাসরি তাওহীদের এই মৌলিক দাওয়াতের মাধ্যমে কাজ আরম্ভ করতে হবে।

তাওহীদের এই ধারণা নিছক কোনো ধর্মীয় ধ্যান ধারণা নয়। বরঞ্চ এ হচ্ছে এক পূর্ণাংগ জীবন দর্শন। এ দর্শন স্বেচ্ছাচারিতা এবং গাইরুল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের উপর সমাজ জীবনে যে কাঠামো বিনির্মিত হয়েছে, তাকে সম্পূর্ণ মূলোৎপাটিত করে দেয়। বিলকুল এক ভিন্ন ভিত্তি ও বুনিয়াদের উপর গড়ে তোলে নতুন অট্টালিকা। আজ পৃথিবীর লোকেরা আপনাদের মুয়াযযিনের আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর বিপ্লবী

আওয়াযকে নীরবে শুনে যায়। কারণ, ঘোষণাকারীও জানেনা সে কি ঘোষণা করছে? আর শ্রোতাদেরও নযরে পড়েনা এর কোনো অর্থ আর উদ্দেশ্য। কিন্তু ঘোষণাকারী যদি জেনে বুঝে ঘোষণা দেয় আর দুনিয়াবাসীও যদি বুঝতে পারে, এই ঘোষণাকারী বলছে ঃ আমি কাউকেও বাদশাহ্ মানিনা, শাসক মানিনা। কোনো সরকারকে আমি স্বীকার করিনা। কোনো আইন আমি মানিনা। কোনো আদালতের আওতাভুক্ত [Jurisdiction] আমি নই। কারো নির্দেশ আমার কাছে নির্দেশ নয়। কারো প্রথা আমি স্বীকার করিনা। কারো বৈষম্যমূলক উচ্চ অধিকার, কারো রাজশক্তি, কারো অতি পবিত্রতা এবং কারো স্বেচ্ছাচারী উচ্চক্ষমতা আমি মাত্রই স্বীকার করিনা। এক আল্লাহ্ ছাড়া আমি সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। সকলের থেকে বিমুখ। ঘোষক আর শ্রোতারা যদি ঘোষণার এই প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারে, তবে কি আপনি মনে করছেন বিশ্ববাসী এই ঘোষণাকে সহজভাবে হজম করে নেবে? বরদাশত করবে নীরবে? বিশ্বাস করুন, সে অবস্থায় আপনি কারো সাথে লড়তে যান বা না যান, বিশ্ববাসী কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবে। এই ঘোষণা উচ্চারণ করার সাথে সাথে আপনি অনুভব করবেন, গোটা বিশ্ব আপনার দুশমন হয়ে গেছে। চতুর্দিক থেকে সাপ, বিচ্ছু আর হিংস্র পশুরা আপনাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করছে।

মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই আওয়ায উচ্চারণ করেছিলেন, তখনো ঠিক এই একই অবস্থা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো। ঘোষক জেনে বুঝেই ঘোষণা দিচ্ছিলেন। শ্রোতারাও বুঝতে পারছিলো কি কথার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে? তাই এই ঘোষণার যে দিকটি যাকে আঘাত করছে, সেই উদ্যত হয়ে উঠেছে একে নিভিয়ে দেবার জন্যে। পোপ ও ঠাকুররা দেখলো এ আওয়ায তাদের পৌরহিত্যের জন্য বিপজ্জনক। জমিদার মহাজনরা তাদের অর্থ সম্পদের, অবৈধ উপার্জনকারীরা অবৈধ উপার্জনের, ঘোষ্ঠী পূজারীরা গোষ্ঠীগত শ্রেষ্ঠত্বের [Racial Superiority] জাতি পূজারীরা জাতীয়তাবাদের, পূর্বপুরুষ পূজারীরা পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পথ ও মতের, মোটকথা এ আওয়ায শুনে সব ধরনের মূর্তি পূজারীরা নিজ নিজ মূর্তি বিচূর্ণ হবার ভয়ে আতংকিত হয়ে উঠলো। তাই এতোদিন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধোমত্ত থাকা সত্ত্বেও, এখন সকল কুফরী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলো। 'আল কুফর মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ,' এই নীতিকথাটি তারা বাস্তবে রূপ দিলো। এক নতুন আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে তারা সমবেত হয়ে গেলো এক প্লাটফরমে।

এই কঠিন অবস্থাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী কেবল তারাই হলো, যাদের ধ্যান ধারণাও মনমগজ ছিলো পরিষ্কার পরিশুদ্ধ। যাদের মধ্যে যোগ্যতা ছিলো সত্যকে বুঝার এবং গ্রহণ করার। যাদের মধ্যে সত্যপ্রিয়তা ছিলো এতোটা প্রবল যে, সত্য উপলব্ধির পর সে জন্যে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেবার এবং মৃত্যুকে আলিংগন করবার জন্যে ছিলো তারা সদা প্রস্তুত। এই মহান আন্দোলনের জন্যে এই ধরনের লোকদেরই ছিলো প্রয়োজন। এ ধরনের লোকেরা দু'একজন করে আন্দোলনে আসতে থাকে। আর বৃদ্ধি পেতে থাকে সংঘাত। অতঃপর কারো রুজি রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কাউকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়। কেউ আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

কারো **ছুটে যায় বন্ধু**, কারো হিতাকাংখী। কারো উপরে আসে মারধর। কাউকেও করা **হয় জিঞ্জীরাবদ্ধ**। কাউকে পাথর চাপা দিয়ে শুয়ে রাখা হয় তপ্ত বালুকার উপর। **কাউকেও জর্জরিত** করা হয় গালি দিয়ে, কাউকেও বা পাথর দিয়ে। উৎপাটিত করা হয় কারো চোখ। বিচূর্ণ করা হয় কারো শির। নারী, সম্পদ, ক্ষমতা, নেতৃত্ব এবং সকল প্রকার লোভনীয় জিনিস দিয়ে খরিদ করার চেষ্টাও করা হয় কাউকে। এই সকল অগ্নিপরীক্ষা ইসলামী আন্দোলনের উপর এসেছে। আসা জরুরী ছিলো। এগুলো ছাড়া ইসলামী আন্দোলন না মজবুত হতে পারতো , আর না পারতো ক্রমবিকাশ ও প্রসার লাভ করতে।

এসব অগ্নিপরীক্ষা ইসলামী আন্দোলনের জন্যে ছিলো খুবই সহায়ক। এসব অগ্নিপরীক্ষার পয়লা ফায়দা এই ছিলো যে, এর ফলে ভীরু কাপুরুষ, হীন চরিত্র ও দুর্বল সংকল্পের লোকেরা এ আন্দোলনের কাছেই ঘেঁষতে পারেনি। ফলে সমাজের মণিমুক্তাগুলোই এসে শরীক হলো আন্দোলনে। আর এ মহান আন্দোলনের জন্যে প্রয়োজন ছিলো এদেরই। তাই যিনিই এ আন্দোলনে শরীক হলেন, কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়েই তাকে শরীক হতে হয়েছে। বস্তুত এক মহান বিপ্লবী আন্দোলনের উপযোগী শ্রেষ্ঠ লোকদের বাছাইর জন্যে এর চাইতে উত্তম আর কোনো পন্থা হতে পারেনা।

এই অগ্নিপরীক্ষার দ্বিতীয় ফায়দা হলো, এই চরম কঠিন অবস্থার মধ্যে যারা আন্দোলনে শরীক হয়েছে, তাঁরা কোনো প্রকার ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতীয় স্বার্থে নয়, বরঞ্চ কেবল মাত্র সত্যপ্রিয়তা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যেই এই ভয়াবহ বিপদ মসীবত ও দুঃখ লাঞ্ছনার মুকাবিলা করেছেন। এরই জন্যে তাদের সইতে হয়েছে শত অত্যাচার নির্যাতন। এরই জন্যে হতে হয়েছে আহত প্রহৃত। এরই জন্যে তাদের পড়তে হয়েছে কায়েমী স্বার্থবাদীদের হিংস্র কোপানলে। কিন্তু এর ফল হয়েছে শুভ। এর ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী মন মানসিকতা। পয়দা হতে থাকে নিরেট ইসলামী চরিত্র। আল্লাহ্‌র ইবাদতে সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হতে থাকে পরম আন্তরিকতা আর নিষ্ঠা। বস্তুত বিপদ মসীবতের এই মহা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইসলামী চরিত্র ও ভাবধারা সৃষ্টি হওয়া ছিলো এক স্বাভাবিক ব্যাপার। কোনো ব্যক্তি যখন একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্যে প্রবল উদ্যমে যাত্রা শুরু করে, আর তার সেই লক্ষ্য পথে যদি তাকে সম্মুখীন হতে হয় প্রাণান্তকর সংগ্রাম, চরম দ্বন্দ্ব সংঘাত, অবর্ণনীয় বিপদ মসীবত, দুঃখ কষ্ট, সীমাহীন হয়রানী, যাতনাকর আঘাত, অমানবিক কারা নির্যাতন, বিরামহীন ক্ষুধা আর দুঃসহনীয় নির্বাসনের, তবে এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে তার সেই মহান লক্ষ্য ও আদর্শের সমস্ত বৈশিষ্ট প্রবলভাবে রেখাপাত করে তার হৃদয় মনে। তার মন মগজ, শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হতে থাকে তার সেই মহান লক্ষ্যেরই ফল্গুধারা। তার গোটা ব্যক্তিসত্ত্বাই তখন তার জীবনোদ্দেশ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। লক্ষ্য অর্জনের পরিপূর্ণতা সাধনের এ সময়টিতে তাদের উপর ফরয করা হয় সালাত। এর ফলে, দূর হয়ে যায় তাদের দৃষ্টির সকল সংকীর্ণতা। গোটা দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি এসে নিবদ্ধ হয় আপন লক্ষ্যের উপর। যাকে তারা একচ্ছত্র সার্বভৌম শাসক বলে স্বীকার করে নিয়েছে, বার বার স্বীকৃতির মাধ্যমে তাদের ধ্যান ধারণা ও মনমস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে যায় তাঁর প্রভুত্ব আর

সার্বভৌমত্ব। যার হুকুম ও নির্দেশনার ভিত্তিতে আঞ্জাম দিতে হবে জীবন ও জগতের সকল কাজ, তিনি যে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবকিছুই অবহিত। তিনি যে বিচার দিনের সম্রাট। তিনি যে সকল বান্দাহর উপর দুর্দন্ড প্রতাপশালী। এই কথাগুলো বদ্ধমূল হয়ে যায় তাদের মন ও মস্তিষ্কে। কোনো অবস্থাতেই তাঁর আনুগত্য ছাড়া অপর কারো আনুগত্যের বিন্দুমাত্র চিন্তাও তাদের অন্তরে প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় সম্পুর্ণরূপে।

এই অগ্নিপরীক্ষা ও চরম সংঘাতের তৃতীয় সুফল ছিলো, এর ফলে একদিকে এই বিপ্লবী কাফেলায় যারা শরীক হচ্ছিলো, বাস্তব ময়দানে তাদের হতে থাকে যথার্থ প্রশিক্ষণ। অপরদিকে দিনের পর দিন প্রসারিত সম্প্রসারিত হতে থাকে ইসলামী আন্দোলন। মানুষ যখন দেখতে থাকলো, কিছু লোক দিনের পর দিন মার খাচ্ছে। নির্যাতিত হচ্ছে। তখন স্বাভাবিকভাবেই এর মূলীভূত কারণ জানবার প্রবল আগ্রহ পয়দা হতে থাকে তাদের মনে। এই লোকগুলোকে নিয়ে কেন এতো হৈ হট্টগোল? এই প্রশ্নের জবাব পেতে উৎসুক হয়ে উঠে তাদের মন। অতঃপর তাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি যখন জানতে পারতো, আল্লাহ্‌র এই বান্দাগুলো কোনো নারী, সম্পদ, প্রতিপত্তি বা কোনো প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, এক মহাসত্য তাদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে এবং তারা তা একনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরে আছে বিধায় এভাবে তাদের অত্যাচারিত করা হচ্ছে, তখন স্বঃতই সেই মহাসত্যকে জানার জন্যে তাদের মন হয়ে উঠতো ব্যাকুল। অতঃপর যখন লোকেরা জানতে পারতো, সেই মহাসত্য হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এ জিনিসই মানব জীবনে এমন ধরনের বিপ্লব সৃষ্টি করে আর এরই দাওয়াত নিয়ে এমন সব লোকেরা উত্থিত হয়েছে, যারা কেবল এই সত্যেরই জন্যে দুনিয়ার সমস্ত ফায়দা ও স্বার্থকে ভূলুণ্ঠিত করছে। নিজেদের জমি, মাল, সন্তান সন্ততিসহ প্রতিটি জিনিস অকাতরে কুরবানী করছে। তখন তারা বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে যেতো। খুলে যেতো তাদের চোখ। ফেটে যেতো তাদের মন মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখা পর্দা। আর এই মহাসত্য তাদের হৃদয়ের মধ্যে বিদ্ধ হতো তীরের তীব্র ফলকের মতো। এরই ফলে সকল মানুষ এই আন্দোলনে এসে শামীল হয়েছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেবল সেই গুটিকয়েক লোকই এ আন্দোলনে শরীক হতে পারেনি, যাদেরকে আভিজাত্যের অহংকার, পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ আর পার্থিব স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। এছাড়া সে সমাজের প্রতিটি নিঃস্বার্থ সত্যপ্রিয় লোককেই, কেউ আগে কেউ পরে, শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনে এসে শরীক হতে হয়েছে।

এ সময় আন্দোলনের নেতা নিজ ব্যক্তিগত জীবনের মাধ্যমে তার এই আন্দোলনের যাবতীয় মূলনীতি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে মানব সমাজের সম্মুখে তুলে ধরেন। তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ এবং চালচলন ও গতিবিধির মধ্যে ফুটে উঠতো ইসলামে প্রাণসত্তা। এতে লোকেরা বাস্তব ভাবে বুঝতে পারতো ইসলাম কি জিনিস? এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যাখ্যামূলক আলোচনার অবকাশ নেই। তাই অতি সংক্ষেপে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক এখানে উপস্থাপন করছি।

এই বিপ্লবী আন্দোলনের নেতার স্ত্রী হযরত খাদীজা ছিলেন তৎকালীন আরবের সর্বাধিক অর্থশালী মহিলা। তিনি তাঁর স্ত্রীর এই অর্থ সম্পদ দিয়ে ব্যবসা করতেন। ইসলামের দাওয়াত শুরু করার পর তাঁর সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। কেননা, অনুক্ষণ দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত থাকা এবং এর ফলে গোটা আরববাসীকে নিজের শত্রু বানিয়ে নেয়ার পর ব্যবসায়ের কাজ আর কিছুতেই চলা সম্ভব ছিলোনা। নিজেদের হাতে যা কিছু পূর্বের জমা ছিলো, আন্দোলন সম্প্রসারণের কাজে স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তা নিঃশেষ করে দেন। এরপর তাদেরকে এক চরম অর্থ সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। দীন প্রচারের কাজে তিনি যখন তায়েফ গমন করেন, তখন হিজাযের এক সময়কার এই বাণিজ্য সম্রাটের ভাগ্যে সোয়ারীর জন্যে একটি গাধা পর্যন্ত জোটেনি।

কুরাইশের লোকেরা তাঁকে হিজাযের রাজতখ্‌ত গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়। তারা বলে, আমরা আপনাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নেবো। আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে আপনার কাছে বিয়ে দেবো। সম্পদের স্তূপ আপনার পদতলে ঢেলে দেবো। এ সব কিছু আমরা আপনার জন্যে করবো। একটি শর্তে। তাহলো, এই আন্দোলন থেকে আপনাকে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু মানবতার মুক্তিদূত তাদের এসব লোভনীয় প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। এই সবের পরিবর্তে তিনি তাদের উপহাস, তিরস্কার আর প্রস্তরাঘাতকেই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন।

কুরাইশ এবং আরবের সমাজপতিরা বললো, হে মুহাম্মদ, আপনার দরবারে তো সব সময় কৃতদাস, দরিদ্র এবং নীচু শ্রেণীর (নাউযুবিল্লাহ) লোকেরা বসে থাকে। এমতাবস্থায় আমরা কী করে আপনার দরবারে এসে বসতে পারি? আমাদের ওখানে যারা একেবারে নীচু শ্রেণীর, তারাই সব সময় আপনার চারপাশ ঘিরে থাকে। তাদেরকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিন, তবেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারি, কথাবার্তা বলতে পারি। কিন্তু গোটা মানবতার যিনি নেতা, যিনি এসেছেন মানুষের উঁচু নিচু শ্রেণীভেদ মিটিয়ে দেবার জন্যে, তিনি তো কিছুতেই সমাজপতিদের মন রক্ষার জন্যে দরিদ্রদের বিতাড়িত করতে পারেননা।

এই বিপ্লবী আন্দোলনের মহান নেতা মুহাম্মদ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর আন্দোলনের ব্যাপারে স্বীয় দেশ, জাতি, গোত্র ও বংশের কারো স্বার্থেরই কোনো পরোয়া করেননি। আন্দোলনের ব্যাপারে কোনো স্বার্থের সাথেই তিনি আপোষ করেননি। তাঁর এই নৈতিক দৃঢ়তাই মানুষের মনে এক চরম আস্থার জন্ম দিলো যে, নিঃসন্দেহে মানুষের কল্যাণের জন্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। আর এ আস্থার ফলেই প্রত্যেকটি কওমের লোক এসে তাঁর আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। তিনি যদি কেবল নিজ খান্দানের কল্যাণ চিন্তা করতেন, তবে হাশেমী গোত্রের লোক ছাড়া আর কারোই এ আন্দোলনের প্রতি কোনো আগ্রহ থাকতো না। তিনি যদি কুরাইশদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যস্ত হতেন, তবে অকুরাইশ আরবরা তাঁর আন্দোলনে শরীক হবার কল্পনাই করতোনা। কিংবা আরব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা যদি হতো তাঁর উদ্দেশ্য, তবে হাবশী বেলাল, রোমদেশী সুহাইব আর পারস্যের সালমান রাদিয়াল্লাহু

তায়ালা আনহুমের কি স্বার্থ ছিলো তাঁর সহযোগিতা করার? বস্তুত, যে জিনিস সকল জাতির লোকদেরকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছে, তা ছিলো নিরেট আল্লাহ্‌র দাসত্বের প্রতি আহবান। ব্যক্তিগত, বংশগত, গোত্রগত ও জাতিগত স্বার্থের ব্যাপারে পরিপূর্ণ অনাগ্রহ। গোটা মানবতাকে নিরেট আল্লাহ্‌র দাসত্বের প্রতি আহবানের ফলেই বংশ বর্ণ ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধরনের মানুষ এ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রাণোৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য হন, তখনো তাঁর শত্রুদের প্রচুর ধনসম্পদ তাঁর নিকট আমানত ছিলো। এগুলো স্ব স্ব মালিকের কাছে ফেরৎ দেবার জন্যে তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বুঝিয়ে দিয়ে যান। কোনো দুনিয়া পূজারী লোকের পক্ষে এধরনের সুযোগ হাতছাড়া করা সম্ভব নয়। সে সবকিছুই আত্মসাৎ করে সাথে নিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র দাস তখনো স্বীয় জানের দুশমন ও রক্ত পিপাসুদের সম্পদ তাদের হাতে পৌঁছে দেবার চিন্তা করেন, যখন তারা তাঁকে হত্যা করবার ফায়সালা গ্রহণ করেছে। নৈতিক চরিত্রের এই অকল্পনীয় উচ্চতা অবলোকন করে আরবের লোকেরা বিস্মিত না হয়ে পেরেছিল কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দুই বছর পর যখন বদর ময়দানে তারা তাঁর বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করেছিল, তখন তাদের মন হয়তো তাদের বলছিল, এ কোন্ মহা মানবের সাথে তোমরা লড়ছো? সেই মহানুভবের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করছো, জন্মভূমি থেকে বিদায়ের কালেও যিনি মানুষের অধিকার ও আমানতের দায়িত্বের কথা ভুলেননি? হয়তো জিদের বশবর্তী হয়ে তখন তারা লড়াই করেছিল, কিন্তু তাদের বিবেক তাদের দংশন করছিল। আমার বিশ্বাস, বদর যুদ্ধে কাফিরদের পরাজয়ের নৈতিক কারণগুলোর মধ্যে এটাও ছিলো অন্যতম।

তের বছরের প্রাণান্তকর সংগ্রামের পর মদীনায় একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসে। এ সময় আন্দোলনে এমন আড়াই-তিনশ লোক সংগৃহীত হয়ে গিয়েছিল, যারা ইসলামের পূর্ণ প্রশিক্ষণ পেয়ে এতোটা যোগ্য হয়েছিল যে, তারা যে কোনো অবস্থা ও পরিস্থিতিতে মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম ছিলো। একটি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে এ লোকগুলো পূরোপূরী তৈরী করা ছিলো। সুতরাং সেই কাংখিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হলো। দশ বছর পর্যন্ত স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রাষ্ট্রের নেতৃত্ব প্রদান করেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি তাদেরকে রাষ্ট্রের সকল বিভাগ ইসলামী পদ্ধতিতে পরিচালনা করার প্রশিক্ষণ দিয়ে যান। এ যুগটি ছিলো ইসলামী আদর্শের তাত্ত্বিক ধারণার [Abstract Idea] স্তর পেরিয়ে পূর্ণাংগ সমাজ কাঠামোর স্তরে পৌঁছার যুগ। এ যুগে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, সমর ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি সকল বিষয়ে ইসলামের নীতি ও পলিসি সুস্পষ্ট রূপরেখা লাভ করে। জীবনের প্রতিটি বিভাগের মূলনীতি প্রণীত হয়। সেসব মূলনীতিকে বাস্তবে রূপদানও করা হয়। এই বিশেষ পন্থা ও পদ্ধতিতে কাজ করার জন্যে শিক্ষা দীক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কর্মী বাহিনী তৈরী করা হয়। এই লোকেরাই বিশ্ববাসীর সম্মুখে ইসলামী শাসনের এমন আদর্শ নমূনা পেশ করেছিল যে, মাত্র আট বছর সময়কালের মধ্যে

মদীনার মতো একটি ক্ষুদ্রায়তনের রাষ্ট্র গোটা আরব রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেখান থেকেই যে লোক ইসলামের বাস্তবরূপ দেখতে পেলো এবং এর শুভ পরিণাম অনুভব করতে পারলো, সে স্বঃতই বলে উঠলো, প্রকৃতপক্ষে এরই নাম মানবতা। এরি মধ্যে রয়েছে মানবতার কল্যাণ। দীর্ঘকালব্যাপী যারা মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো, শেষ পর্যন্ত তাদেরকেও এই মহান আদর্শ গ্রহণ করতে হয়েছিল। খালিদ বিন ওলীদ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়। আবু জাহিলের পুত্র ইকরামা ইসলাম কবূল করে নেয়। আবু সুফিয়ান ইসলামের পক্ষে এসে যায়। হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হন্তা ওহাশী ইসলামের বিধান গ্রহণ করে নেয়। হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কলিজা ভক্ষণকারী হিন্দাকেও শেষ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির সত্যবাণীর সম্মুখে মাথা নত করে দিতে হয়, যার চাইতে ঘৃণিত ব্যক্তি তার দৃষ্টিতে আর কেউই ছিলনা।

ঐতিহাসিকরা ভুল করেই তখনকার যুদ্ধগুলোকে বিরাট গুরুত্ব দিয়ে আলোকপাত করেছেন। এ ভুলের কারণে লোকেরা মনে করে বসেছে, আরবের সেই মহান বিপ্লব যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছে। অথচ আসল ব্যাপার এর সম্পূর্ণ উল্টো। সেই আট বছরে যে যুদ্ধগুলো দ্বারা আরবের যুদ্ধবাজ কওমগুলো তিরস্কৃত হয়েছিল, তার সবগুলোতে উভয় পক্ষের হাজার বারশ'র বেশী লোক নিহত হয়নি। পৃথিবীর বিপ্লব সমূহের ইতিহাস যদি আপনার জানা থাকে, তবে আপনাকে অবশ্যি স্বীকার করতে হবে, এ বিপ্লব রক্তপাতহীন বিপ্লব [Bloodless Revolution] নামে আখ্যায়িত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া এ বিপ্লবের ফলাফলও পৃথিবীর সকল বিপ্লবের চাইতে ভিন্নধর্মী। এ বিপ্লব দ্বারা কেবল রাষ্ট্র ব্যবস্থারই পরিবর্তন হয়নি। বরঞ্চ মানুষের মন মানসিকতা ও চিন্তাভাবনাও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এতে মানুষের দৃষ্টিভংগি পাল্টে যায়। চিন্তাপদ্ধতি বদলে যায়। জীবন যাপন পদ্ধতির পরিবর্তন হয়ে যায়। নৈতিক চরিত্রের জগতে আসে আমূল পরিবর্তন। স্বভাব ও অভ্যাস যায় পাল্টে। মোট কথা, এ মহান বিপ্লব গোটা জাতির কায়া পরিবর্তন করে দেয়। ব্যভিচারী নারী সতীত্বের রক্ষক হয়ে যায়। মদ্যপায়ী মাদকবিরোধী আন্দোলনের পতাকাবাহী হয়ে যায়। আগে যে চুরি করতো, এ বিপ্লব তার মধ্যে আমানতদারীর অনুভূতি এতোটা তীব্রভাবে জাগ্রত করে দেয় যে, এখন সে এ ভেবে বন্ধুর বাড়ীর খানা খেতেও দ্বিধান্বিত হয়, না জানি এটাও অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ভক্ষণ বলে গণ্য হয়ে যায়! এমনকি এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাকে কুরআনের মাধ্যমে তাদের আশ্বস্ত করতে হয়েছে যে, এ ধরনের খাবার খেতে কোনো দোষ নেই।[১] ডাকাত ও ছিনতাইকারীরা এমন অনুপম দীনদার ও বিশ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, ইরান বিজয়ের সময় এদেরই একজন সাধারণ সৈনিক কোটি কোটি টাকা মূল্যের রাজমুকুট হস্তগত হবার পর, তা রাতের অন্ধকারে কম্বলের নিচে লুকিয়ে সেনাপতির নিকট পৌঁছে দেয়। সে এই গোপণীয়তা এই জন্যে অবলম্বন

---

১. দেখুন সূরা নূর, আয়াতঃ ৬১।

করেছিল, যাতে করে এই অস্বাভাবিক ঘটনা দ্বারা লোক সমাজে তার আমানতদারীর খ্যাতি ছড়িয়ে না পড়ে। তার ইখলাস বা নিয়তের নিষ্ঠার মধ্যে 'রিয়া' ও প্রদর্শনী মনোবৃত্তির কলঙ্ক লেগে না যায়। যাদের কাছে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য ছিলোনা, যারা নিজ হাতে স্বীয় কন্যাদের জীবন্ত কবর দিতো, তাদের মধ্যে নিরাপত্তা ও মর্যাদাবোধ এমন তীব্রভাবে জাগ্রত হয়েছিল যে, নির্দয়ভাবে একটি মুরগী জবাই করতে দেখলেও তাদের কাছে চরম কষ্ট লাগতো। যাদের গায়ে কখনো সত্যবাদিতা ও ন্যায় পরায়ণতার বাতাস পর্যন্ত লাগেনি, তাদের মধ্যে ন্যায় পরায়ণতা, সততা ও সত্যবাদিতার এমন উচ্চতম বৈশিষ্ট সৃষ্টি হয়েছিল যে খায়বরের সন্ধির পর এদের তহসীলদার ইহুদীদের কাছ থেকে সরকারী রাজস্ব আদায় করতে গেলে ইহুদীরা তাকে এই উদ্দেশ্যে একটা মোটা অংকের অর্থ দিতে চায়, যাতে করে সে সরকারী পাওনা কম করে নেয়। কিন্তু সে তাদের মুখের উপর উৎকোচ নিতে অস্বীকার করে দেয় এবং উৎপন্ন ফসল তাদের ও সরকারের মধ্যে সমান দুই স্তূপে বন্টন করে তাদেরকে যে কোনো একস্তূপ গ্রহণ করার অধিকার প্রদান করে। মুসলিম তহসীলদারের ইনসাফ ও সততার এই চরম পরাকাষ্ঠা দেখে ইহুদীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল, আর অজ্ঞাতেই তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, এই ধরনের আদল ও ইনসাফের উপরই আসমান ও যমীন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাদের মধ্যে এমন সব শাসনকর্তার আর্বিভাব ঘটে, যাদের কোনো প্রসাদ ছিলনা। বরঞ্চ তারা জনগণের সাথে বসবাস করতেন এবং তাদের মতো সাধারণ কুটীরেই বাস করতেন। পায়ে হেঁটে হাটবাজারে যেতেন। দরজায় দ্বাররক্ষী রাখতেননা। রাত দিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যে কেউ যখন ইচ্ছা তাদের সাথে সাক্ষাত করতে পারতো। তাদের মধ্যে এমন সব ন্যায় পারয়ণ বিচারপতির আবির্ভাব ঘটে, যাদেরই একজন জনৈক ইহুদীর বিরুদ্ধে স্বয়ং খলীফার দাবী একারণে খারিজ করে দেন যে, খলীফা স্বীয় গোলাম এবং পুত্র ব্যতিত আর কাউকেও সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করাতে পারেননি।[১] তাদের মধ্যে এমন সব সেনাপতির আবির্ভাব ঘটে, যাদেরই একজন কোনো একটি শহর থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে শহরবাসীদের থেকে আদায়কৃত সমস্ত জিনিস এই বলে তাদের ফেরত দিয়ে যান যে, এখন থেকে যেহেতু আমরা তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে পারবোনা, সে কারণে তোমাদের থেকে আদায়কৃত কর আমাদের হাতে রাখার কোনো অধিকার আমাদের নেই। এমনি করে তাদের মধ্যে জন্ম নেয় অসংখ্য নির্ভীক রাষ্ট্রদূত। এদেরই একজন ইরানী সেনাধ্যক্ষের ভর দরবারে ইসলাম বর্ণিত মানবিক সাম্যনীতি নির্ভীকভাবে প্রকাশ করেন। তীব্র সমালোচনা করেন ইরানী শ্রেণী বৈষম্যের। আল্লাহ্ জানেন সেদিনকার এই ঘটনায় কতো ইরানী সিপাহীর অন্তরে এই মানব ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ জাগ্রত হয়েছিল। ইসলামী বিপ্লব তাদের মধ্যে এমন সব তীব্র নৈতিক দায়িত্বনুভূতি সম্পন্ন

---

১. এটা হযরত আলীর (রাঃ) খিলাফত কালের ঘটনা।

নাগরিকের জন্ম দেয়, যাদের দ্বারা হাত কাটা এবং পাথর মেরে হত্যার করার মতো অপরাধ সংঘটিত হয়ে যাবার পরও, নিজেরাই এসে নিজেদের উপর দন্ড প্রয়োগের দাবী করতে থাকে, যাতে করে তাদের চোর বা ব্যভিচারী হিসেবে আল্লাহ্‌র আদালতে হাজির হতে না হয়। ইসলামী বিপ্লব এমন সব আদর্শ সিপাহীর জন্ম দেয়, যারা বেতন বা কোনো পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্যে যুদ্ধ করেনি। বরঞ্চ কেবলমাত্র সেই মহান আদর্শের জন্যে যুদ্ধ করেছে, যার প্রতি তারা ঈমান এনেছিলো। বেতন ভাতা তো তারা গ্রহণ করেইনি, তদুপরি নিজ খরচে তারা যুদ্ধের ময়দানে যেতো এবং গনীমতের মাল হস্তগত হলে, তা সরাসরি সেনাপতির দরবারে এনে হাজির করতো। নিজে হস্তগত করতোনা।

এখন বলুন, সামাজিক চরিত্র ও সমষ্টিগত মানসিকতার এই আমূল পরিবর্তন কি শুধু যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা সম্ভব ছিলো? ইতিহাস আপনাদের সম্মুখে রয়েছে। এমন কোনো উদাহরণ কি আপনারা তাতে পেয়েছেন যে, শুধুমাত্র তরবারি কোনো মানব গোষ্ঠির মধ্যে এরূপ আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে?

মূলত এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার, যেখানে প্রথম তের বছরে মাত্র আড়াই তিনশ' লোক সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে পরবর্তী দশ বছরে গোটা দেশ মুসলমান হয়ে গেলো। এর রহস্য উদঘাটনে ব্যর্থ হয়ে লোকেরা নানাপ্রকার অমূলক অবাস্তব ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করে থাকে। অথচ এর কারণ দিবালোকের মতো পরিষ্কার, সুস্পষ্ট। যতোদিন এই নতুন আদর্শ অনুযায়ী মানব জীবনের বাস্তব রূপায়ণ লোকেরা দেখতে পায়নি, ততোদিন এই অভিনব আন্দোলনের নেতা আসলেই কি ধরনের সমাজ গড়তে চান, তা তারা বুঝে উঠতে পারেনি। এ সময় নানা প্রকার সন্দেহ সংশয় তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কেউ বলতো, এতো কেবল কবির কল্পনাবিলাস। কেউ বলতো, এটাতো কেবল ভাষার যাদুগিরি। কেউ বলতো, লোকটি আসলে পাগল হয়ে গিয়েছে। আবার কেউ তাকে নিছক একজন কল্পনাবিলাসী [Visionary] লোক বলে ঘোষণা করতো।

এ সময় কেবল অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভাবান লোকেরাই ঈমান এনেছিল। যারা বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলেন, এই আদর্শের মধ্যেই রয়েছে মানবতার কল্যাণের প্রকৃত চিহ্ন। কিন্তু যখন এই কল্পিত আদর্শের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, লোকেরা স্বচক্ষে এর বাস্তব চিত্র দেখতে পেলো এবং তাদের চোখের সামনে সীমাহীন সুফল দেখতে পেলো, তখন তারা বুঝতে পারলো, আল্লাহ্‌র এই বান্দাহ এই মহান সমাজ গঠনের জন্যেইতো এতো দুঃখ কষ্ট আর অত্যাচার নির্যাতন সয়ে আসছেন। এরপর জিদ আর হঠকারিতার উপর অটল থাকার আর কোনো সুযোগই থাকলোনা। যার কপালেই দুটি চোখ ছিলো, আর চোখের মধ্যে জ্যোতি ছিলো, তার পক্ষে এই চোখে দেখা বাস্তবতাকে অস্বীকার করার আর কোনো উপায়ই ছিলনা।

বস্তুত ইসলাম যে সমাজ বিপ্লব সংঘটিত করতে চায়, এই হলো তার সঠিক পন্থা। এই হচ্ছে সেই বিপ্লবের রাজপথ। এই পন্থায়ই তার সূচনা হয় আর এই ক্রমধারায়ই হয়

তা বিকশিত। এই বিপ্লবকে একটা মু'জিযা মনে করে লোকেরা বলে বসে, এ কাজ এখন আর সম্ভব নয়। এটাতো নবীর কাজ। নবী ছাড়া তা করা সম্ভব নয়। কিন্তু ইতিহাসের অধ্যয়ন আমাদের একথা পরিষ্কার করে বলে দেয়, এ বিপ্লব এক স্বাভাবিক বিপ্লব। এর মধ্যে কার্যকারণ পরম্পরাপর পূর্ণ যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই। আজো যদি ঐ একই পদ্ধতিতে কাজ করি, তবে একই ধরনের ফলাফল প্রকাশ হতে পারে। তবে, একথা সত্য, এ কাজের জন্যে প্রয়োজন ঈমান, ইসলামী চেতনা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, মজবুত ইচ্ছাশক্তি এবং ব্যক্তিগত আবেগ উচ্ছাস ও স্বার্থের নিঃশর্ত কুরবানী। এ কাজের জন্যে এমন একদল দুঃসাহসী যুবকের প্রয়োজন, যারা সত্যের প্রতি ঈমান এনে তার উপর পাহাড়ের মতো অটল হয়ে থাকবে। অন্য কোনো দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবেনা। পৃথিবীতে যাই ঘটুকনা কেন, তারা নিজেদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পথ থেকে এক ইঞ্চিও বিচ্যুত হবেনা। পার্থিব জীবনে নিজেদের ব্যক্তিগত উন্নতির সকল সম্ভবনাকে অকাতরে কুরবানী করে দেবে। স্বীয় সন্তান সন্ততি, পিতা মাতা ও আপনজনের স্বপ্ন সাধ বিচূর্ণ করতে কুণ্ঠাবোধ করবেনা। আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবদের বিচ্ছেদ বিরাগে চিন্তিত হবেনা। সমাজ, রাষ্ট্র, আইন, জাতি, স্বদেশ, যা কিছুই তাদের উদ্দেশ্য পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, তারই বিরুদ্ধে লড়ে যাবে। অতীতেও এ ধরনের লোকেরাই আল্লাহ্র কালেমাকে বিজয়ী করেছে। আজোও এ ধরনের লোকেরাই আল্লাহ্র কালেমাকে বিজয়ী করবে। এ মহান বিপ্লব কেবল এ ধরনের লোকের দ্বারাই সংঘটিত হতে পারে। [তর্জমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ঃ ১৯৪০ইং।]

৫. শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পন্থা

প্রশ্ন ঃ নিম্নে দুটি সন্দেহের কথা উল্লেখ করছি। মেহেরবানী করে এ দুটি বিষয়ে সঠিক ধারণা দান করবেন ঃ

১. তরজমানুল কুরআনের গত সংখ্যায় একজন প্রশ্নকারীর এ প্রশ্ন প্রকাশ হয়েছে যে, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো সুসংগঠিত রাষ্ট্র শক্তির মুকাবিলা করতে হয়নি। অথচ হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সামনে ছিলো এক সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। তিনি যখন পূর্ণ রাষ্ট্র ক্ষমতা তার হাতে ন্যস্ত করার ব্যাপারে রাষ্ট্রকে সম্মত পেলেন, তখন তিনি এগিয়ে গিয়ে তা কবুল করেন। প্রথমে ঈমানদার সৎ লোকদের একটি জামায়াত তৈরী করতে হবে এ পন্থা তিনি অবলম্বন করেননি। আজকের যুগেও কি তাঁর অনুসৃত সে নীতি অবলম্বন করা যেতে পারেনা? কেননা বর্তমানে রাষ্ট্র ব্যবস্থা তো আগের তুলনায় আরো অধিক শক্তি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে?"-এ প্রশ্নের জবাবে আপনি যা কিছু লিখেছেন, তাতে আমি পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারিনি। আমার প্রশ্ন হলো আমাদেরকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের অনুসরণ কেন করা উচিত? আমাদের জন্যে তো শুধু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণই ওয়াজিব। তিনি তো মক্কাবাসীদের বাদশাহীর প্রস্তাব প্রত্যাখান করে নিজস্ব পন্থায় পৃথক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফায়সালা করেন এবং বর্তমানে আমাদের জন্যেও এটাই একমাত্র কর্মপন্থা। আমার এ মত কতোটা সঠিক কিংবা কতোটা ভুল মেহেরবানী করে বিস্তারিতভাবে জানাবেন।

২. আপনি আরো লিখেছেন ঃ কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে যদি এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, প্রচলিত সাংবিধানিক পন্থায় অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আমাদের আদর্শের ছাঁচে ঢেলে গড়া সম্ভব, তখন আমরা সে সুযোগ গ্রহণে দ্বিধা করবোনা।' এ বাক্য দ্বারা লোকদের এ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে যে জামায়াতে ইসলামীও পার্লামেন্টে আসার জন্যে অনেকটা প্রস্তুত এবং জামায়াত নির্বাচনকে জায়েয মনে করছে। এ বিষয়ে জামায়াতের নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

জবাব ঃ ১. সকল নবীই আমাদের জন্যে অনুসরণীয়। স্বয়ং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এই নির্দেশই দেয়া হয়েছিলো যে, "সেই পন্থা ও তরীকায় চলো যা ছিলো আম্বিয়ায়ে কিরামের পন্থা ও তরীকা।" কোনো নবী কোনো বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন বলে যদি আমরা কুরআন থেকে অবগত হই এবং কুরআন যদি সেই কর্মপন্থাকে মনসূখ ঘোষণা না করে থাকে তবে সেটাও আমাদের জন্যে মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসৃত পন্থার মতোই দীনি কর্মপন্থা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে বাদশাহী প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছিল তা ছিলো এই শর্ত সাপেক্ষে যে, আপনি এই দীন এবং এর প্রচার বন্ধ করুন, তাহলে আমরা সবাই মিলে আপনাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নেবো। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সামনেও যদি এই শর্ত পেশ করা হতো তবে তিনি সেই বাদশাহীকে অভিশপ্ত মনে করতেন, যেমন মনে করেছিলেন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে যে সব ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল সেগুলো ছিলো নিঃশর্ত এবং প্রতিবন্ধকতাহীন। তা গ্রহণের সাথে সাথে তিনি রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সত্য দীন মুতাবিক পরিচালনার ক্ষমতাও লাভ করেছিলেন। এমনটি যদি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেও পেশ করা হতো, তবে তিনিও তা গ্রহণ করতেন এবং বিনা কারণে লড়াই করে সেই জিনিস লাভ করার প্রয়োজন পড়তোনা, যা এমনি তাঁকে দেয়া হচ্ছিলো। একইভাবে জনমতের সাহায্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তগত করে নিরেট ইসলামী বিধানের ভিত্তিতে তা পরিচালনা করার সুযোগ যদি আমাদেরও আসে তবে তা গ্রহণ করতে আমরা কোনো প্রকার দ্বিধা করবোনা।

২. নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া এবং পার্লামেন্টে যাওয়ার উদ্দেশ্য যদি হয় অনৈসলামী সংবিধানের অধীনে একটি ধর্মহীন [Secular] গণতান্ত্রিক [Democratic] রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করা, তবে সেটা আমাদের তাওহীদী আকীদাহ এবং আমাদের দীনের সম্পূর্ণ খিলাফ। কিন্তু আমরা যদি কখনো দেশের জনমতকে আমাদের আকীদাহ ও নীতির পক্ষে এতোটা ব্যাপকভাবে একমত করতে পারি, যার ফলে আমাদের জন্যে রাষ্ট্রীয় সংবিধানে পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে, তখন এ পন্থা অবলম্বন না করার কোনো কারণ থাকবেনা। বিনা লড়াইতে সোজা পন্থায় যে জিনিস লাভ করা সম্ভব, তাকে বিনা কারণে বাঁকা আংগুলে বের করার হুকুম শরীয়াহ আমাদের দেয়নি। কিন্তু একথা ভালোভাবে বুঝে নিন, এ কর্মপন্থা আমরা কেবল তখনই অবলম্বন করবো, যখন ঃ

এক. দেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে শুধু জনমত সৃষ্টি হলেই তা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে;

দুই. দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে আমরা দেশবাসীর একটা বিরাট সংখ্যক লোককে আমাদের ধ্যান ধারণার সংগে একমত করতে পারবো এবং অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্ব সাধারণের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপিত হবে;

তিন. নির্বাচন এ উদ্দেশ্য অনুষ্ঠিত হবে যে, দেশের ভবিষ্যত রাষ্ট্র ব্যবস্থা কোন্ ধরনের শাসনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে। [তরজমানুল কুরআন ঃ মুহাররাম ঃ ১৩৬৫ হিঃ, ডিসেম্বর ঃ ১৯৪৫ ইং]

৬. আধুনিক রাষ্ট্রে ইসলামী আন্দোলনের কর্মপন্থা

প্রশ্ন ঃ একথা আর বেশী দলীল প্রমাণসহ পেশ করার অপেক্ষা রাখেনা যে, কোনো মুসলমান যদি ইসলামকে যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করে থাকে, তবে তার জীবনের কেবলমাত্র একটিই উদ্দেশ্য হতে পারে, আর তা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। একথা খুবই স্পষ্ট, এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে কেবল সেই কর্মপন্থাই অবলম্বন করা যেতে পারে, যা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে তার প্রকৃতির সংগে সামঞ্জস্যশীল এবং যা তার মূল আহবায়কগণ বাস্তবে অবলম্বন করেছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল আহবায়ক ছিলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম। সুতরাং এর কর্মনীতি ও কর্ম পন্থাও হবে তাই, যা ছিলো আম্বিয়ায়ে কিরামের কর্মপন্থা ও কর্মনীতি।

আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবনের দিকে তাকালে মোটামুটি আমরা দু'প্রকার পয়গম্বর দেখতে পাই।

এক ঃ সেসব পয়গম্বর যাঁদের দাওয়াতী কাজের প্রাক্কালে রাষ্ট্র শক্তি খুবই সংহত এবং প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব রাষ্ট্রের অবস্থা এমন ছিলো যে, রাষ্ট্রের সার্বিক ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছিলো এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত। যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম এবং হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম।

দুই ঃ সেসব আম্বিয়ায়ে কিরাম যাঁদেরকে দীনের কাজ করতে হয়েছিল এমন সোসাইটিতে যেখানে রাষ্ট্র ছিলো একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় এবং খুব বেশী হলে গোত্রীয় প্রধান শাসিত ধরনের [Patriachal] রাষ্ট্র ছিলো। যেমন ঃ শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

উভয় অবস্থায় কর্মপন্থাগত পার্থক্য স্পষ্ট। আর এর পার্থক্য সম্ভবত রাজনৈতিক পরিবেশগত পার্থক্যের কারণেই হয়ে থাকে।

কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি এখন যতোটা সংহতি ও মজবুতি অর্জন করেছে এবং ব্যক্তিকে যেভাবে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে আর চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে যতোটা সুশৃংখল প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করেছে, সম্ভবত অতীতের ইতিহাসে এর কোনো নযীর নেই। এখন প্রশ্ন হলো, প্রায় রাষ্ট্রহীন [Stateless] সমাজ বা বেশীর পক্ষে গোত্র প্রধান শাসিত রাষ্ট্রে যে কর্মপন্থা সফলভাবে ব্যবহার করা গিয়েছিল, এখনো কি সেই একই কর্মপন্থা ঐ ধরনের সফলতার গ্যারান্টি দিতে পারে? এখনকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেসব দল এ উদ্দেশ্যে কাজ করছে, বিপ্লব সাধনের জন্যে তাদের কি নিজেদের কর্মপন্থার যথেষ্ট পরিবর্তন করতে হবেনা?

আখিরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র শক্তির মুকাবিলা করতে হয়নি। পক্ষান্তরে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সম্মুখে

ছিলো এক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তি। সুতরাং তিনি যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন তা ছিলো এই যে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীকে [Sovereign Power] ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহী দেখে বললেন ঃ

"দেশের অর্থভান্ডার আমার নিকট সোর্পদ করুন।"

এভাবে ক্ষমতা হস্তগত করে নিয়ে তিনি স্বীয় মিশন পূর্ণ করার জন্য পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে ব্যবহার করেন। বর্তমান কালের রাষ্ট্র তো হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের যুগের রাষ্ট্র থেকেও অধিক সংহত ও ক্ষমতাশালী। এ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে উৎখাত করে একটি নতুন রাষ্ট্র জন্ম দেয়ার জন্যে যে ধরনের বিপ্লবই সংঘটিত হোক না কেন, রক্ত বন্যা পেরিয়েই তা সংঘটিত হবে। যেমনটি হয়েছে বলশেভিক রাশিয়ায়। তাছাড়া এটাও জানা কথা যে, কেবল সবকিছু ভেংগে তোলপাড় করে দেয়ার মতো বিপ্লব ইসলামের কাম্য নয়। বরঞ্চ ইসলামের প্রোগ্রাম এর চাইতেও নাজুক।

এমতাবস্থায় পরিবেশের সংগে সামঞ্জস্যশীল পন্থা তো এটাই মনে হয় যে পূর্ণাংগ বিপ্লবের পরিবর্তে যতোটা ক্ষমতা লাভ করা যায় তা গ্রহণ করে সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। এ পন্থা যদি গ্রহণ করা হয় তবে দেশের বর্তমান মুসলমান দলগুলোর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়া সমীচীন হবেনা। শুধু তাই নয়, বরঞ্চ তাদের সহযোগিতাই প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

একথা স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন রাখেনা যে, ক্ষমতা মানে শুধু সিভিল সার্ভিসের পদসমূহ দখল করা নয়। যেমনটি তরজমানের কোনো এক সংখ্যায় জনৈক নওয়াব সাহেব লিখেছেন। রবঞ্চ এর অর্থ, একটি সুসংগঠিত দলের চেষ্টা সংগ্রামের পর দল হিসেবে সর্বোচ্চ ক্ষমতাধরের [Sovereign Power] নিকট থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের কাজে ব্যবহার করা।

জবাব ঃ যখন অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যাপক শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিশালী হয়, তা নিঃসন্দেহে বিপর্যস্ত সামাজিক ব্যবস্থার প্রাথমিক অবস্থা থেকে অনেক ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এজন্যে কমপক্ষে পরিবেশের প্রেক্ষিতেও কর্মপদ্ধতিতে কিছুটা রদবদল জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু মূলনীতির দিক থেকে কর্মপন্থায় কোনো রদবদলের প্রয়োজন পড়েনা। আর মূলনীতিগত কর্মপন্থা হচ্ছে এই যে, আমরা প্রথমে মানুষের নিকট দাওয়াত পেশ করবো। অতঃপর যারা আমাদের দাওয়াত কবূল করবে তাদের সংগঠিত করতে থাকবো। এরপর গণরায় কিংবা অবস্থার পরিবর্তনের ফলে কখনো যদি এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক পদ্ধতিতে আমাদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা এসে যাওয়া সম্ভব, আর তাতে এ সম্ভাবনা থাকে যে আমরা সমাজে নৈতিক তামাদ্দুনিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের মূলনীতির ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে সক্ষম হবো, তখন ঐ সুযোগ থেকে ফায়দা উঠাতে আমরা কোনো প্রকার দ্বিধা করবোনা। কারণ, উদ্দেশ্য হাসিলই আমাদের নিকট আসল বিষয়, কর্মপদ্ধতি [Method] নয়। কিন্তু শান্তিপূর্ণ মাধ্যমসমূহ দ্বারা যদি মূল ক্ষমতা [Substance of Power] লাভের সম্ভাবনা না থাকে, তবে আমরা অবশ্যি সাধারণ দাওয়াত অব্যাহত রাখবো এবং শর'য়ী দিক থেকে সকল বৈধ মাধ্যম ব্যবহার করে পূর্ণাংগ বিপ্লব সাধনের চেষ্টা করবো। [তরজমানুল কুরআন ঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ঃ ১৯৪৫]

৭. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঠিক কর্মধারা

প্রশ্ন ঃ যে লোকদের সাথেই দেশের ভবিষ্যত রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হয়, তাদের অধিকাংশই এ মত প্রকাশ করেন যে, আপনি এবং অন্যান্য বড় বড় আলেমগণ মিলে কেন ইসলামী রাষ্ট্রের একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করে দিচ্ছেন না, যাতে করে তা পার্লামেন্টে উত্থাপন করে পাশ করানো যায়? শুধু আমাকেই নয়, অন্যান্য কর্মীদেরকেও অধিকাংশ সময় এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। লোকদের যদিও আমরা যথাসাধ্য বুঝানোর চেষ্টা করি কিন্তু আপনার পক্ষ থেকে প্রশ্নটির জবাব তরজমানুল কুরআনে আসা প্রয়োজন। এতে করে এ প্রশ্নের ভিত্তিতে সৃষ্ট ভুল বুঝা বুঝি দূর হয়ে যেতে পারে।

জবাব ঃ আপনার প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব তো এখানে দেয়া সম্ভব নয়। তবে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি কথা বলবো। আশা করি এতেই আপনি মূল বিষয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

যেখানকার সমাজ সঠিক অর্থে ইসলামী নয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো অনৈসলামী পদ্ধতিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং যেখানে নিরেট একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের বদৌলতে আকস্মিকভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসে গেছে, সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা বুঝি কেবল এতোটুকু জিনিসের জন্যই আটকে রয়েছে যে, আমরা একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে উত্থাপন করবো আর ক্ষমতাশীন ব্যক্তিরা তা কার্যকর করে দেবে। তাহলে তো ব্যাপারটা ঠিক সে রকম দাঁড়ায়, যেমন কোনো ব্যক্তি ধারণা করলো যে, একটি স্কুল বা ব্যাংককে হাসপাতালে রূপান্তরিত করার জন্যে কেবল কতিপয় ডাক্তার একত্র হয়ে একটি আদর্শ হাসপাতালের রূপরেখা ও নীতিমালা প্রণয়ন করে সেই স্কুলের শিক্ষক বা ব্যাংকের ষ্টাফদের হাতে দিয়ে দেবে। আর তারা সেটা দেখে দেখে সুষ্ঠুভাবে হাসপাতালের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকবে। আমি খুবই বিস্ময় বোধ করছি, আমাদের দেশের অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকও এতোটা হালকাভাবে চিন্তা করে, যেনো শাসনতন্ত্রকে তারা কোনো তাবীজ মনে করছে।

পরিষ্কারভাবে বুঝে নিন, আমাদের এখানে শুধুমাত্র দুটি পন্থায়ই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ঃ

তন্মধ্যে একটি হলো এই যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা এখন যাদের হাতে রয়েছে ইসলাম সম্পর্কে তারা আন্তরিক হবে। জাতির সাথে কৃত ওয়াদাসমূহের ব্যাপারে তারা সত্যবাদী হবে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের মধ্যে যোগ্যতার যে অভাব রয়েছে তা তারা

অনুভব করবে। ঈমানদারীর সাথে একথা স্বীকার করবে যে, পাকিস্তান লাভের পর তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং এদেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সেসব লোকদেরই কাজ যারা একাজের উপযুক্ত।

উপরে বর্ণিত অবস্থা সৃষ্টি হলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যুক্তিসংগত পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমত আমাদের পার্লামেন্ট সেসব মৌলিক বিষয়ের সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করবে, একটি অনৈসলামী রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার জন্য যেসব মূলনীতি অপরিহার্য। [এসব মূলনীতি আমরা আমাদের "দাবী" আকারে প্রকাশ করেছি।] অতঃপর ইসলামের ইল্‌ম রাখেন এমন লোকদের তারা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে শরীক করবেন। তাদের সাহায্যে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। অতঃপর নতুন করে নির্বাচন দিতে হবে এবং জাতিকে এমন একদল লোক নির্বাচন করার সুযোগ দিতে হবে যাদেরকে তারা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য যোগ্যতম মনে করবে। এভাবেই সহজ ভাবে সঠিক ও নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা যোগ্যতম লোকদের হাতে অর্পিত হবে। আর এ যোগ্য লোকেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও যাবতীয় উপায় উপাদানকে কাজে লাগিয়ে, গোটা জীবন ব্যবস্থাকে নতুন ভাবে ইসলামী পন্থা ও পদ্ধতিতে ঢেলে সাজাতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয় পন্থা হলো, সমাজকে গোড়া থেকেই আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একটি গণসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের মাঝে ক্রমান্বয়ে খাঁটি ইসলামী চেতনা, অনুভূতি ও আকাংখা তীব্র ও চাংগা করে তুলতে হবে। আর এ চেতনা ও আকাংখা তাদের মধ্যে যখন দৃঢ়তা ও মজবুতি অর্জন করবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই একটি পূর্ণাংগ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করবে।

এখন আমরা প্রথম পদ্ধতির উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছি। তাতে যদি সফলতা অর্জন করি তবে তার অর্থ হবে পাকিস্তান অর্জনের জন্য আমাদের কওম যে চেষ্টা সংগ্রাম করেছিল, তা ব্যর্থ হয়নি। বরঞ্চ তার বদৌলতে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য একটি সহজ ও নিকটতম রাস্তা আমাদের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু খোদা না করুন এই পদ্ধতিতে যদি আমরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হই এবং এই দেশে একটি অনৈসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হয়, তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানরা যে বিরাট কষ্ট ও কুরবানী পেশ করেছিল তা সবই বৃথা যাবে। এমনটি যদি হয়, তবে তার অর্থ হবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও আমরা সে রকম দেশেই আছি, যেখানে ছিলাম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে। এমতাবস্থায় আমরা দ্বিতীয় পন্থায় কাজ করে যাবো।

আশা করি এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে লোকেরা আমাদের পজিশন ভালো ভাবে বুঝে নেবে। সময় হবার পূর্বে আমরা কোনো কাজ করতে চাইনা। [তরজমানুল কুরআনঃ যুল কা'দাহ ১৩৬৭ হিজরী, সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ইং]

৮. রাজনৈতিক বিপ্লব আগে না সমাজ বিপ্লব?

প্রশ্ন ঃ আমাদের দেশে সাধারণভাবে এ অনুভূতি বিরাজিত যে, ইসলামের মূলনীতি এবং নির্দেশাবলী পছন্দনীয় ও উত্তম বটে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তা কার্যকর করার মতো পরিবেশ নেই। সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ইসলামের সাথে আবেগময় সম্পর্ক আছে ঠিকই, কিন্তু দীন ইসলামের সঠিক বুঝ এবং আমল করার ইচ্ছা অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম চিন্তা ও চরিত্রের যে সম্পর্ক দাবী করে তার আলোকে এ আশংকা সৃষ্টি হয় যে, ইসলামী আইন কানুন চালু হয়ে গেলে এর বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। তাই সময়ের এহেন প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক বিপ্লবের পূর্বে সামাজিক বিপ্লব জরুরী এবং সংশোধনের চেতনা বাহির ও ওপর থেকে সৃষ্টি করার পরিবর্তে ভিতর থেকে সৃষ্টি করা জরুরী। এহেন অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী অসময়োপযোগী হয়ে যায় নাতো?

জবাব ঃ এ সমস্যাকে পুরোপুরি এবং স্পষ্ট করে আলোচনা করতে গেলে এর বিস্তারিত জবাব দেয়া দরকার। তবুও সংক্ষিপ্ত জবাব হলো ঃ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক বিপ্লবের পূর্বে একটি তামাদ্দুনিক, সামাজিক এবং নৈতিক বিপ্লবের প্রয়োজন। ইসলামী বিপ্লবের এটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি। আর নিঃসন্দেহে এটাও সত্য যে, ইসলামের নির্দেশাবলী এবং আইন কানুন শুধু উপর থেকে চাঁপিয়ে দেয়া হয়না বরং তা পালন ও অনুসরণ করার জন্য ভিতর থেকে একটি আন্তরিক আগ্রহও সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে একটা রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে, সে সত্যকে কে অস্বীকার করতে পারে? এখন এ প্রশ্ন তোলা অবান্তর ও অর্থহীন যে, সর্বপ্রথম সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টি করা দরকার, তারপর রাজনৈতিক বিপ্লব। এখন বরং এ প্রশ্নই উঠতে পারে যে, যতোদিন পর্যন্ত গোটা জাতির মধ্যে চিন্তা ও চরিত্রের বিপ্লব সৃষ্টি না হচ্ছে ততোদিন আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কুফরী নীতির ভিত্তিতে ব্যবহার করবো, নাকি ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে কাজে লাগাবো? রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের কোনো না কোনো মূলনীতি আমাদেরকে স্থির করতেই হবে। যাই হোক, নৈতিক বিপ্লব সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিকল করা যেতে পারেনা। যে জাতি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শাসন ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের উপর বিশ্বাসী, যার সামষ্টিক ও জাতীয় জীবনের লাগাম নিজের নিয়ন্ত্রণে, নিজের জীবন ব্যবস্থা নিজেই নির্মাণ করতে সক্ষম এবং অনৈসলামী কোনো শক্তি তার উপর কুফরী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার মতোও না থাকে, সে জাতির লোকদের জন্য এটা কি করে জায়েয এবং বৈধ হতে পারে যে, তারা একে অপরকে নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার জন্য শুধু ওয়ায নসীহত করতে থাকবে আর

নিজেদের শাসন কাঠামো অনৈসলামী নীতিতে চালানোর জন্য ছাড় দিয়ে দেবে। আমি মনে করি আমরা যদি এ অবস্থা সহ্য করে যাই, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে মুরতাদ হওয়ার অপরাধে অপরাধী না হলেও সমষ্টিগত ও জাতীয়ভাবে মুরতাদ আমাদের হওয়াই লাগবে।

তারপর এ বিষয়ের আরো একটি দিক হলো, আপনি সামাজিক ও নৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি করতে চাইলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে এ বিপ্লবের মাধ্যম ও উপায় উপাদান কি হতে পারে? এটা পরিষ্কার যে, শিক্ষা দীক্ষা, সমাজ সংস্কার, নৈতিক সংশোধন এবং এই ধরনের আরও বহু বিষয় ঐসব উপায় উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর সাথে আরও রয়েছে রাষ্ট্রের আইনগত ও রাজনৈতিক মাধ্যম ও উপায় উপকরণ। সংশোধনের জন্য রাষ্ট্রশক্তি শুধু একটি বড় মাধ্যমই নয় বরং এটা সমগ্র সংস্কারমূলক ব্যবস্থা ও চেষ্টাকে আরও অধিক প্রভাবশালী, ফলদায়ক এবং ব্যাপকরূপ দেয়ার বলিষ্ঠ উপায়ও। এখন নৈতিক বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন উপায় উপকরণও ব্যবহার না করার কারণ কি হতে পারে? আমাদের ভোট, আমাদের দেয়া ট্যাক্স এবং অর্থের উপর ভিত্তি করেই তো রাষ্ট্রের সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এখন এ মূর্খতা ও বোকামী আমরা কেন করতে যাবো যে, একদিকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের সমাজ বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা করতে থাকবো, অপরদিকে আমাদের রাষ্ট্রের সমস্ত মাধ্যম ও উপায় উপকরণ জাতির নৈতিক চরিত্র ধ্বংস ও সর্বনাশের মূলে ইন্ধন যোগাবে, অধিকন্তু নানা প্রকার নৈতিক অপরাধ ছড়ানোর কাজে লেগে থাকবে [অথচ এগুলো দূর করার কোনো বাস্তব পদক্ষেপই আমরা গ্রহণ করবোনা]? [তরজমানুল কুরআন, জিলহজ্জ ১৩৭৩ হিঃ, সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ খৃঃ।]

সমাপ্ত